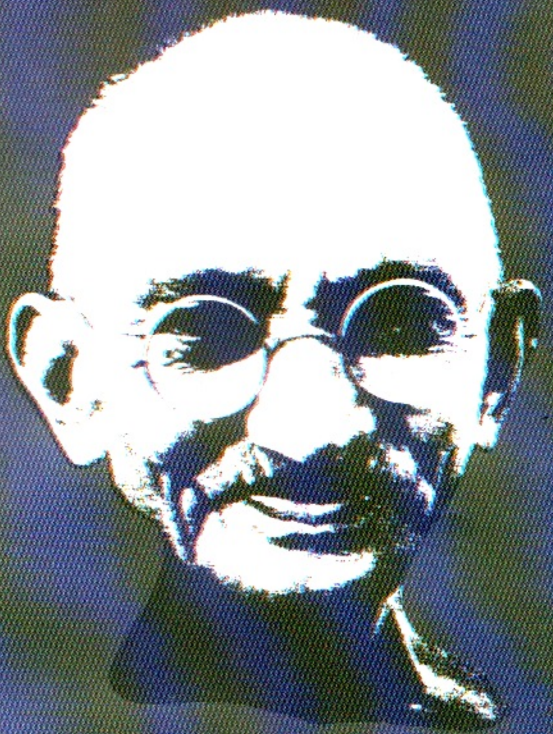

আমার আত্মজীবনী

মহাত্মা গান্ধী

অনুবাদ • আবদুল ওয়াহাব

অনুবাদকের পরিচয়

আবদুল ওয়াহাব ১৯৫৩ সালের ২৮ আগস্ট সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার রূপনাই-গোপালপুর গ্রামে নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে একই জেলার বেলকুচি থানার শেরনগর গ্রামে বসবাস করছেন।

চক সোহাগপুর প্রাইমারী স্কুল হতে প্রাথমিক, সোহাগপুর শ্যাম কিশোর হাই স্কুল হতে এসএসসি (১৯৭০), বেলকুচি কলেজ হতে এইচএসসি (১৯৭২), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি সাহিত্যে বি এ অনার্স (১৯৭৫, ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত) এবং এম এ (১৯৭৬, ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত) ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

১৯৭৯ সালে সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তা হিসাবে কর্মজীবনের শুরু। অতঃপর ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রাফিক ক্যাডারে এসিস্ট্যান্ট ট্রাফিক সুপারিনটেনডেন্ট (এ টি এস) পদে যোগদান। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সততা ও সুনামের সাথে দয়িত্ব পালন শেষে বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের চীফ অপারেটিং সুপারিনটেনডেন্ট (সি ও পি এস) পদ হতে ২০১০ সালে অবসরগ্রহণ করেন। বর্তমানে একটি বেসরকারি কনস্ট্রাকশন ফার্মে কর্মরত।

মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনী বইখানি তাঁর প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী–যাঁকে আমরা মহাত্মা গান্ধী নামে চিনি, নতুন করে তাঁর পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ, জনবহুল এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্র ভারতের তিনি জাতির পিতা। সমসাময়িক বহু নেতাকে ম্লান করে বিশ্ববাসীর হৃদয়ে মহাত্মা গান্ধীর নাম ও ব্যক্তিত্ব স্থান লাভ করেছে। আর আপন আদর্শ ও কর্মগুণে তিনি বিশ্বাবাসীকে এতোটাই প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, শান্তিকামী মানবসমাজের কাছে আজও তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর ভারতের গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত পোর বন্দরে মহাত্মা গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা করমচাঁদ গান্ধী ছিলেন রাজকোট নামের এক সামন্ত-রাজ্যের দেওয়ান। মাতা পুতলী বাঈ অত্যন্ত নম্র এবং ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তার চারিত্রিক স্বভাব গান্ধীজী নিজের ব্যক্তিত্ব ও কর্মে আমৃত্যু লালন করেছেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের পর ভবনগরে শ্যামচাঁদ কলেজে পড়াশুনা করেন এবং ১৯ বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ইংল্যান্ড যান। সেখানে বহু জাতীয়তাবাদী ভারতীয় ও ইংরেজ নেতাদের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর পরিচয় ঘটে। যথাসময়ে ব্যারিস্টারি পাশ করে ভারতে ফিরে এসে আইন ব্যবসা শুরু করেন। তবে ১৮৯৩ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা যান। সে সময়ে সেখানে কর্মরত ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের বৈশম্যমূলক আচরণ দেখে তিনি ব্যথিত হন। আর এই ব্যথা এবং ক্ষোভ থেকেই মহাত্মা গান্ধীর অন্তরে জাতীয়তাবাদের বীচ অঙ্কুরিত হয়। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার স্থানীয় জুলু সম্প্রদায় ও ভারতীয়দের স্বপক্ষে অধিকার আন্দোলন গড়ে তুলে সফলতা লাভ করেন। দীর্ঘ বিশ বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটিয়ে মহাত্মা গান্ধী যখন নিজ জন্মভূমি ভারতে ফিরে আসেন, ভারতে তখন দুর্দান্ত প্রতাপে ইংরেজরা শাসন করে যাচ্ছে। তারা ভারতীয়দের সঙ্গে শুধু বৈশম্যমূলক নয়, পশুর মতো আচরণ করে যাচ্ছে– এই ব্যাপারটি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে বিচলিত করে তোলে এবং তিনি সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয়দের স্বাধীনতা আদায় করার জন্য আমৃত্যু প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। গান্ধীজী ছিলেন এক বিশাল হৃদয়ের অধিকারী। অত্যাচারীদের অত্যাচারের মাধ্যমে পরাজিত করা নয়– ভালোবাসার বিনিময়ে জয় করে নেওয়া ছিলো গান্ধীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন অহিংস আন্দোলনের স্রষ্টা এবং পথপ্রদর্শক। এই মহান মানুষটির কর্মবহুল ও স্মৃতিজড়িত ঘটনা নিয়ে সমৃদ্ধ 'আমার আত্মজীবনী' যা গান্ধীজী নিজে লিখেছেন। নিঃসন্দেহে এই বইটি পাঠ করা শান্তিকামী প্রতিটি মানুষের আবশ্যক কর্তব্য।

আমার আত্মজীবনী

www.pathagar.com

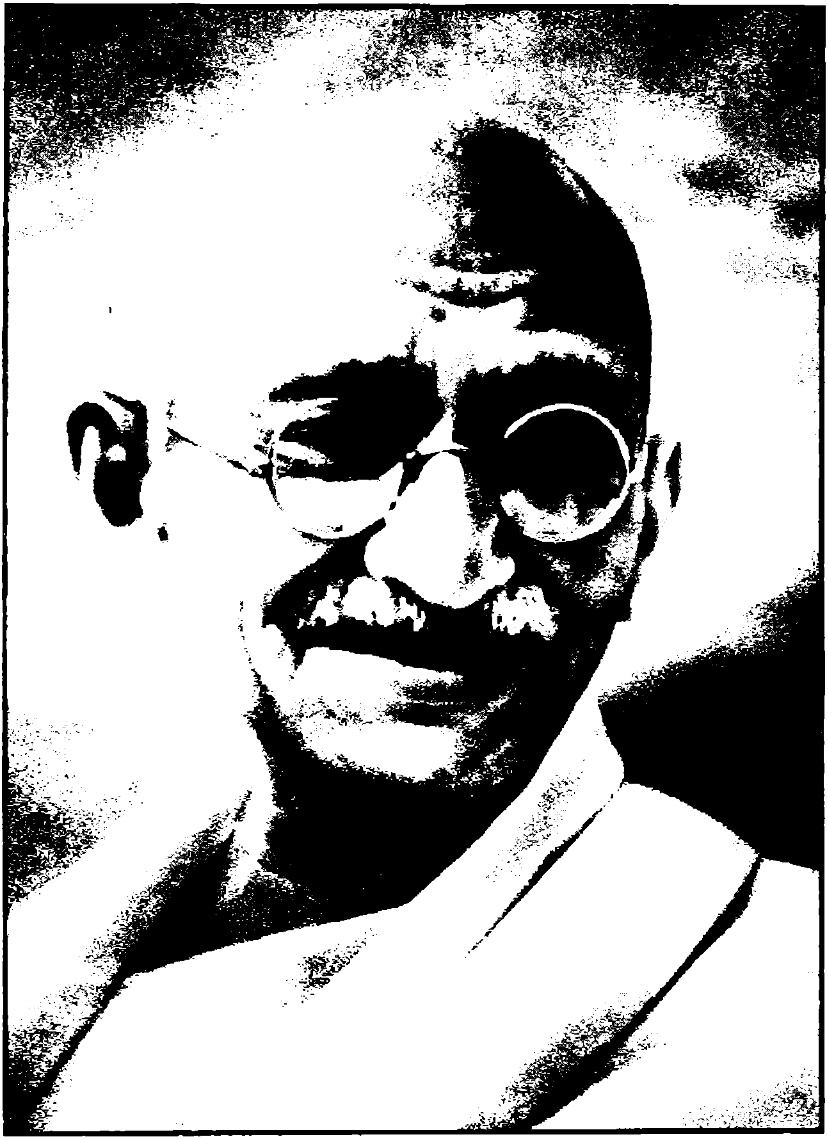

মহাত্মা গান্ধী

জন্ম: ২ অক্টোবর ১৮৬৯; মৃত্যু: ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮

www.pathagar.com

আমার আত্মজীবনী

মহাত্মা গান্ধী

অনুবাদ: আবদুল ওয়াহাব

স্বরবৃত্ত

www.pathagar.com

©
অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৩

স্বরবৃত্ত প্রকাশন ৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০'র পক্ষে মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ্ কর্তৃক
প্রকাশিত এবং ঢাকা প্রিন্টার্স ৩৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত
অক্ষরবিন্যাস ঈশিন কম্পিউটার ৩৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
নিয়াজ চৌধুরী তুলি

দাম : ৫০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978 984 8939 58 1

Auto-Biography of Mahatma Gandhi
Tranlated by Md. Abdul Wahab
Published by Mohammad Rahmat Ullah,
Saravritta Prakashan, 45 Banglabazar, Dhaka-1100
First Edition : February 2013, Price Tk. 500.00 Only $ 18.00

U.K. Distributor : Sangeeta Limited, 23 Brick Lane, London.
U.S.A. Distributor : Muktadhara, 37-69. 2nd floor, 74 St, Jackson Height, N.Y. 11372.
Canada Distributor : Anyamela, 300 Danforth Ave. (1st floor, Suite-202), Toronto
ATN Mega Store, 2970 Danforth Ave, Toronto.

www.pathagar.com

অনুবাদকের নিবেদন

২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নেয়ার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের কয়েকজন সহকর্মী অফিসারের সাথে সরকারি সফরে ভারতের নয়াদিল্লী গমন করি। সে সময় বোম্বেতে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি যাদুঘর "মণি ভবন" পরিদর্শনকালে কৌতূহলবশত ইংরেজিতে লেখা গান্ধীজীর An Autobiography or the Story of My Experiments with Truth বইখানি ক্রয় করি। কিন্তু ভারতে অবস্থানকালে কাজের চাপে বইখানি পড়া হয়নি। প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে বইখানি পড়ে এতো মুগ্ধ হই যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে এর বেশ কয়েকটি অধ্যায় বাংলায় অনুবাদ করে ফেলি। আমার সহকর্মী অফিসার আব্দুল আউয়াল ভুঁইয়া খসড়া অনুবাদ পড়ে পুরো বইটি অনুবাদ করতে আমাকে উৎসাহ দেন।

মহাত্মা গান্ধীর বইখানি পড়তে গিয়ে তাঁর নিজের জবানীতে বিভিন্ন ঘটনার সত্যনিষ্ঠ সরল স্বীকারোক্তি আমাকে মুগ্ধ করেছে। সত্যের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা, অন্যের প্রতি সহনশীলতা, সেবাপরায়ণতা, শিক্ষাগ্রহণ ও প্রদানে অসীম অনুরাগ, অহিংস নীতির উদ্ভাবন, প্রচার ও বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ সংক্রান্ত মহৎ গুণাবলী আমাকে মোহাবিষ্ট করে ফেলে। অতি সাধারণ আত্মবিশ্বাসহীন বালক থেকে সৎ গুণাবলীর চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে নিজেকে বহু জাতি-গোষ্ঠী অধ্যুষিত জাতির পিতায় উন্নীত করার এবং "মহাত্মা" (Great Soul) খেতাব অর্জনের নেপথ্য কাহিনী শুধু কৌতূহলোদ্দীপক গল্পই নয়, বরং বাস্তবনির্ভর শিক্ষণীয় ঘটনাবলীতে পূর্ণ। দিন বদলের শ্লোগানের এই সময়ে যদি কেউ নিজেকে বদলে নিতে চায়, তার জন্য এ বইখানি হতে পারে জীবন বদলের অমূল্য দিক-নির্দেশনা।

উল্লেখ্য যে, বর্তমান সংঘাতপূর্ণ বিশ্বে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির গুরুত্ব এবং এর প্রতি বিশ্ব-মানবতার সমর্থন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মহাত্মা গান্ধীর মতো একজন ব্যক্তিত্বকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়নি।

বইখানি পড়ে আমার মনে হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও আদর্শ থেকে শিক্ষাগ্রহণ ও নিজেদের জীবনাচরণে তা প্রতিফলিত করতে পারলে আমাদের

www.pathagar.com

দেশের বর্তমান হিংসা-বিদ্বেষ, দলাদলি-মারামারি ও রাজনৈতিক সহিংসতার কালচার হতে দেশের মানুষ মুক্তি পেতে পারে। বিশেষত আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে প্রভাবিত হতেন তাহলে আমাদের দেশ ও সমাজ অনেকখানি বদলে যেতে পারত। জানি আমার এ আশা দুরাশা। তবুও মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ আমার দেশের মানুষ জানুক, তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হোক, এ কামনা নিয়ে দীর্ঘ দু'বছরে অনুবাদটি সমাপ্ত করি এবং অনুবাদের সাথে সাথেই কম্পিউটার কম্পোজের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাই।

অনুবাদকর্মটি শেষ করার পর এর প্রিন্ট কপি স্পাইরাল বাইন্ডিং করে আমার সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ী অনেককে দিয়েছি। তাঁরা অনুবাদটি পড়ে ছাপানোর জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। অবশেষে আমার এক সময়ের সহকর্মী কবি মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক স্বরবৃত্ত প্রকাশন-এর স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ রহমত উল্লাহর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন এবং তাঁর উদ্যোগে এটি ছাপানো হয়। বইখানির অনুবাদে যাঁরা আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং যাঁরা বই আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে এ অনুবাদ গ্রন্থখানি পাঠকবর্গের নিকট সুখপাঠ্য ও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

বিনীত
আবদুল ওয়াহাব

www.pathagar.com

ভূমিকা

চার কি পাঁচ বছর আগে অতি ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহকর্মীর অনুরোধে আমি আত্মজীবনী লিখতে রাজি হই। লিখতে শুরু করলাম, কিন্তু প্রথম পাতা শেষ হতে না হতেই বোম্বেতে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল এবং লেখার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ রইল। এরপর পর্যায়ক্রমে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল যার চূড়ান্ত পরিণতি হলো ইয়েরাভদা জেলে আমার কারাবরণ। কারাগারে আমার সহবন্দী শ্রীযুক্ত জেরামদাস আমাকে সকল কাজ ফেলে রেখে আত্মজীবনী লেখা শেষ করতে বললেন। আমি তাঁকে বললাম পড়ালেখার জন্য আমি একটা সময়সূচী ঠিক করে ফেলেছি এবং এ কাজটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি অন্য কিছু করার চিন্তা করতে পারছি না। ইয়েরাভদা জেলে আমার কারাবাসের মেয়াদ পূর্ণ করতে পারলে সত্যিই আত্মজীবনী লেখা শেষ করতে পারতাম, যা করতে আর মাত্র এক বছর সময় লাগত। কিন্তু আমাকে জেল হতে মুক্তি দেয়া হলো। যেহেতু দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে *সত্যাগ্রহের ইতিবৃত্ত* লেখা শেষ করে ফেলেছিলাম, এবারে স্বামী আনন্দের পুনঃ প্রস্তাবে *সাপ্তাহিক নবজীবন* এর জন্য আত্মজীবনী লিখতে আগ্রহী হলাম। স্বামী আনন্দ চেয়েছিলেন এটি বই আকারে প্রকাশের জন্য আমি যেন আলাদাভাবে লিখি। কিন্তু আমার অতো সময় ছিল না। প্রতি সপ্তাহে মাত্র একটি করে অধ্যায় লিখতে পারছিলাম। *নবজীবন* এর জন্য প্রতি সপ্তাহে একটা কিছু লিখতেই হতো। সেই একটা কিছু কি আত্মজীবনী হতে পারে না? স্বামীজি আমার প্রস্তাবে রাজি হলেন। এভাবে শুরু হলো আমার এ কঠিন কাজ।

কিন্তু একজন ধর্মভীরু বন্ধু সংশয় প্রকাশ করে বললেন, "এ দুঃসাহসী কাজ কেন হাতে নিলে? আত্মজীবনী লেখাতো পশ্চিমাদের রীতি। প্রাচ্যের এমন কাউকে দেখিনি যিনি পাশ্চাত্যের প্রভাবমুক্ত হয়ে আত্মজীবনী লিখেছেন। আর তুমি লিখবেই বা কি? ধরো আজ তুমি যে নীতিতে বিশ্বাসী আগামীতে তা বাতিল করবে, আজকের পরিকল্পনা আগামী দিনে বদলে ফেলবে। সেক্ষেত্রে তোমার মুখের কথা বা লেখা অনুসরণ করে যারা তাদের কর্মপন্থা ঠিক করবে, তারা কি ভ্রান্তির শিকার হবে না? তোমার কি মনে হয় না যে আত্মজীবনীর মতো কিছু না লেখাই ভালো, অন্তত জীবনের এই পর্যায়ে এসে?" তাঁর এ যুক্তি আমার ওপর কিছুটা প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু প্রকৃত আত্মজীবনী লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। সত্য নিয়ে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার অসংখ্য কাহিনী আমি সহজভাবে বলতে চাই। আর আমার জীবন যেহেতু ঐ সব কাহিনীর সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়, কাজেই তা

www.pathagar.com

লিখলে সত্যিই একটা আত্মজীবনী হয়ে যাবে। যদি এর প্রতি পৃষ্ঠায় শুধু আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার বর্ণনাই থাকে তাতেও আমার মনে কোনো খেদ থাকবে না। আমি বিশ্বাস করি, অন্তত মনকে বিশ্বাস করাতে চাই যে, এ সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধারাবাহিক বর্ণনা পাঠকের উপকারে আসবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখন শুধু ভারতে নয়, তথাকথিত "সভ্য" জগতেও কিছুটা পরিচিত। আমার নিকট এগুলোর মূল্য বেশি নয়, আর এগুলো আমার জন্য যে "মহাত্মা" খেতাব এনে দিয়েছে, তার মূল্য আরো কম।

ঐ খেতাব আমাকে প্রায়ই গভীর বেদনা দিয়েছে। এমন একটি মুহূর্তও মনে পড়ে না যখন আমি পরিতুষ্ট হয়েছি। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথাও বলা উচিত, যা কেবল আমি নিজেই জানি এবং যা থেকে আমি রাজনীতির অঙ্গনে কাজ করার শক্তি অর্জন করেছি। পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো যদি সত্যিই আধ্যাত্মিক হয় তা হলে তাতে আত্মপ্রশংসার কোনো অবকাশ থাকতে পারে না। যদি থাকে, তা কেবল আমার দীনতাকেই বাড়াতে পারে। যত বেশি অতীতের স্মৃতিচারণ করি আর পেছন ফিরে তাকাই, ততই আমার সীমাবদ্ধতাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমি যা অর্জন করতে চাই, যা অর্জনের জন্য গত ত্রিশ বছর ধরে চেষ্টা ও সাধনা করে যাচ্ছি, তা হলো আত্ম-উপলব্ধি, ঈশ্বরকে সামনাসামনি দেখা, মোক্ষ অর্জন করা। আমার জীবন ধারণ, চলাফেরা এবং অস্তিত্ব এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিবেদিত। আমি বরাবরই বিশ্বাস করে এসেছি, একজনের জন্য যা করা সম্ভব সকলের জন্যই তা করা সম্ভব। আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চার দেয়ালের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ ছিল না, বরং তা ছিল খোলামেলা এবং আমার ধারণা, এ সত্য তার আধ্যাত্মিক মূল্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। কিছু ব্যাপার আছে যা কেবল একজন মানুষ নিজে জানে, আর জানে তার স্রষ্টা। স্পষ্টতই তা অন্যের নিকট প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমি যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলব তা এ প্রকৃতির নয়। কিন্তু সেগুলো আধ্যাত্মিক বা নৈতিক, কারণ নৈতিকতাই হচ্ছে ধর্মের মূল কথা। এ কাহিনীতে ধর্মের বিষয় ততটুকুই অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যতটুকু শিশু ও বয়স্ক উভয়েই বুঝতে পারে। তা যদি আমি আবেগহীন বিনয়ের সাথে ব্যক্ত করতে পারি তবে এর মাধ্যমে আরো অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অগ্রযাত্রার পথ প্রশস্ত হবে। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে ন্যূনতম মাত্রার পরিপূর্ণতাও আমি দাবি করি না। এ বিষয়ে আমার দাবি একজন বিজ্ঞানীর চেয়ে বেশি নয়, যিনি পূর্বচিন্তা, সূক্ষ্মতা ও সর্বোচ্চ নির্ভুলতা সহকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করেন, অথচ কখনো তার সিদ্ধান্তগুলোকে চূড়ান্ত বলে দাবি করেন না এবং ওগুলোর বিষয়ে চিন্তার দুয়ার খোলা রাখেন। আমি গভীর অন্তর্দর্শনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছি, নিজের মধ্যে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছি। আমার সিদ্ধান্তগুলোকে চূড়ান্ত ও নির্ভুল বলে দাবি করা থেকে আমি এখনো অনেক দূরে। একটি দাবি অবশ্য আমি করতেই পারি। আর তা হচ্ছে ওগুলো আমার কাছে পরম নির্ভুল ও সাময়িকভাবে চূড়ান্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রতি পদে পদে আমি গ্রহণ ও বর্জনের প্রক্রিয়া প্রয়োগ

www.pathagar.com

করেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কাজ যুক্তি ও হৃদয়কে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে, ততক্ষণ আমি আমার মূল সিদ্ধান্তে অটল থেকেছি।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ নীতিগর্ভ আলোচনাই যদি আমার উদ্দেশ্য হতো তাহলে আমি আত্মজীবনী লেখার চেষ্টা করতাম না। যেহেতু আমার উদ্দেশ্য হলো এসব নীতিমালার বাস্তব প্রয়োগের বিভিন্ন বিবরণ দেওয়া, তাই আমি এ অধ্যায়গুলোর শিরোনাম প্রস্তাব করেছি *"সত্য নিয়ে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাহিনী"*। এতে অবশ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে অহিংসা, কৌমার্য ও অন্যান্য আচরণের নীতিমালা যা সত্য থেকে আলাদা বলে বিশ্বাস করা হয়। কিন্তু আমার কাছে সত্য হলো সার্বভৌম নীতি যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অন্যান্য অসংখ্য নীতি। এ সত্য বলতে শুধু কথায় সত্যবাদিতা নয়, শুধু চিন্তার ও ধ্যান-ধারণার সততা নয়, বরং এ সেই পরম সত্য, চিরন্তন ন্যায়নীতি অর্থাৎ ঈশ্বরকে বুঝায়। ঈশ্বরের অসংখ্য সংজ্ঞা আছে, কারণ তাঁর প্রকাশ অসংখ্য রূপে। আমি তাঁকে এখনো পাইনি, কিন্তু তাঁর অন্বেষণ করে যাচ্ছি। এ অন্বেষণের জন্য আমার প্রিয়তম সবকিছু ত্যাগ করতেও আমি প্রস্তুত। এমন কি সে ত্যাগের বস্তু যদি আমার জীবনও হয়, আশা করি তাও দিতে পারব। যতদিন পর্যন্ত সেই পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে না পারি, ততদিন পর্যন্ত আমি যে আপেক্ষিক সত্যকে আত্মস্থ করেছি তাতেই অটল থাকব। ততদিন এই আপেক্ষিক সত্যই হবে আমার আলোক বর্তিকা, আমার ঢাল, আমার বর্ম। যদিও এ পথ সোজা, সরু ও ক্ষুরের ফলার ন্যায় তীক্ষ্ণ ধারালো, আমার জন্য তা দ্রুততম ও সহজতম। এমনকি হিমালয় পর্বতসম ভুল ভ্রান্তিও আমার কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছে, কারণ এপথে আমি দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছি। এ পথই আমাকে দুঃখ-যাতনায় পতিত হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে এবং আমি আলোর পথে এগিয়ে গিয়েছি। আমার অগ্রযাত্রায় প্রায়ই আমি ক্ষণিকের তরে, সেই পরম সত্য তথা ঈশ্বরের দেখা পেয়েছি এবং প্রতিদিন আমার এ বিশ্বাস দৃঢ়তর হচ্ছে যে তিনিই একমাত্র সত্য, বাকী সব মায়া। আমার ভিতরে এ বিশ্বাস কিভাবে বেড়ে উঠল তা যারা জানতে চায় তারা ইচ্ছে করলে আমার এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্বাসের অংশীদার হতে পারে। আমার অন্তরের বিশ্বাস আরো বেড়ে চলেছে যে, আমার পক্ষে যা করা সম্ভব একটা শিশুর পক্ষেও তা সম্ভব এবং এ বক্তব্যের সমর্থনে আমার অকাট্য যুক্তিও আছে। সত্য অন্বেষণের উপায়গুলো যেমন সরল, তেমনি দুঃসাধ্য। একরোখা লোকের কাছে তা অসাধ্য মনে হতে পারে। অবোধ শিশুর কাছেও। সত্যসন্ধানীকে হতে হবে ধূলিকণার চাইতেও বিনয়াবনত। সারা পৃথিবীর লোক যখন পায়ের নিচে ধূলিকণাকে চূর্ণ করে, তখন সত্যসন্ধানীকে এতটাই বিনয়ী হতে হবে যেন ধূলিকণাই তাকে চূর্ণ করতে পারে। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কথোপকথনে এর স্পষ্ট উলেখ রয়েছে। খৃষ্টধর্ম ও ইসলামেও এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এখানে আমি যা লিখছি তাতে গর্বের ছোঁয়া আছে বলে যদি পাঠকের মনে হয়, তাহলে অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে আমার সত্যের সন্ধানে গলদ আছে এবং আমি সত্যের যে ক্ষণিক দেখা পেয়েছি তা মরীচিকা মাত্র। আমার মতো শত শত মানুষ বিলীন

www.pathagar.com

হয়ে যাক, কিন্তু সত্য টিকে থাক। আমার মতো ভ্রান্তিপ্রবণ মানুষের নশ্বর বিচারে আমরা যেন সত্যের মানদণ্ড চুল পরিমাণেও খর্ব না করি।

আমার আশা ও অনুরোধ পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে যে উপদেশ ব্যক্ত হয়েছে তা যেন কেউ কর্তৃত্বমূলক বলে না ভাবেন। যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বর্ণনা করেছি তাকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গণ্য করে এর আলোকে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও ধীশক্তি অনুযায়ী তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালাতে পারেন। আমার বিশ্বাস, একটা সীমিত পর্যায় পর্যন্ত এ দৃষ্টান্তগুলো সত্যিই সহায়ক হবে; কারণ বলা আবশ্যক এমন যে কোনো কদর্য বিষয়ও আমি লুকিয়ে বা এড়িয়ে যাচ্ছি না। আমি পাঠককে আমার সকল দোষ ও ভ্রান্তির সাথে পরিচিত করতে চাই। আমার উদ্দেশ্য হলো সত্যাগ্রহ বিজ্ঞানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিবরণ দেয়া, আমি নিজে কতটা ভালো সেটা বলা নয়। নিজের বিচারে আমি সত্যের মতোই কঠোর হতে চেষ্টা করব। আমি চাই অন্যেরাও তাই করবেন। নিজেকে সেই মানদণ্ডে বিচার করে সুরদাসের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই—

কে আছে এমন নিচু হতভাগা
আমা হেন ঘৃণ্য পাপাত্মা?
স্রষ্টারে আমি করেছি ত্যাগ
করেছি বিশ্বাসঘাতকতা।

আমার স্রষ্টার থেকে এখনো আমি এতো দূরে এটা আমার জন্য এক অবিরাম যাতনা, কারণ আমি ভালো করেই জানি যে তিনিই আমার জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস চালাচ্ছেন এবং আমি তাঁরই সন্তান। আমি জানি আমার অন্তরের অশুভ আবেগ তাঁর থেকে আমাকে এতোটা দূরে সরিয়ে রেখেছে, তবুও আমি ওগুলো ত্যাগ করতে পারি না।

এবার আমাকে থামতে হবে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমি কেবল সত্য ঘটনাই তুলে ধরব।

আশ্রম, সবরমতি — এম কে গান্ধী

২৬ নভেম্বর, ১৯২৫

www.pathagar.com

আত্মজীবনী

[প্রথম পর্ব]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক

জন্ম ও বংশ পরিচয়

গান্ধী পরিবার বেনিয়া বংশোদ্ভূত এবং মূলত মুদি ব্যবসায়ী ছিল বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু আমার ঠাকুরদাদার পূর্বে তিন পুরুষ ধরে তাঁরা কাথিয়াওয়ার রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আমার ঠাকুরদাদা উত্তমচাঁদ গান্ধী ওরফে ওটা গান্ধী ছিলেন নীতিবান মানুষ। তিনি পোরবন্দরের দেওয়ান ছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি পোরবন্দর ছেড়ে জুনাগড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেখানে তিনি নবাবকে কুর্ণিশ করেছিলেন বাম হাতে। বাহ্যতঃ তাঁর এ অসৌজন্য দেখে একজন সভাসদ কৈফিয়ত চাইলে তিনি এ ভাষায় জবাব দিয়েছিলেন, 'আমার ডান হাত ইতিপূর্বেই পোরবন্দরের নিকট দায়বদ্ধ।'

প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর ওটা গান্ধী দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। প্রথম স্ত্রীর ঘরে তাঁর চার পুত্র ও দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে দুই পুত্র ছিল। ওটা গান্ধীর পুত্ররা সবাই যে একই মায়ের সন্তান নয় বাল্যকালে আমি তা বুঝতে বা জানতে পারিনি। ছয় ভাই এর মধ্যে পঞ্চম ছিলেন করমচাঁদ গান্ধী ওরফে কাবা গান্ধী এবং ষষ্ঠ জন ছিলেন তুলসীদাস গান্ধী। এঁরা দুই ভাইই একের পর এক পোরবন্দরের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। কাবা গান্ধী ছিলেন আমার বাবা। তিনি রাজস্থানের কোর্ট সদস্যও ছিলেন। পদটি এখন বিলুপ্ত, কিন্তু বিভিন্ন গোত্রপতি ও তাদের অধীনস্থদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সে সময়ে এটা ছিল খুব কার্যকর প্রতিষ্ঠান। কিছু সময়ের জন্য তিনি রাজকোটের এবং পরে ভাঙ্কনরের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি রাজকোট রাজ্যের পেনশনভোগী ছিলেন। কাবা গান্ধী প্রতিবার স্ত্রী বিয়োগের পর ক্রমাগত চারবার বিয়ে করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রী হতে তাঁর দুই কন্যা ছিল। তাঁর শেষ স্ত্রী পুতলীবাই এক কন্যা ও তিন পুত্রের জন্ম দেন যাঁদের মধ্যে আমি সর্বকনিষ্ঠ।

আমার বাবা তাঁর গোত্রের লোকদের ভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী, সাহসী ও দানশীল কিন্তু উগ্র মেজাজী। হয়তো কিছু পরিমাণে ইন্দ্রিয় আসক্তিও তাঁর ছিল। কারণ তিনি যখন চতুর্থ বিয়ে করেন তখন তাঁর বয়স চল্লিশের ওপরে। তিনি ছিলেন নীতিভ্রষ্টতার উর্ধ্বে। নিজ পরিবারের ভিতরে ও বাইরে কঠোরভাবে পক্ষপাতহীনতার খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি। রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল সুপরিচিত। তাঁর গোত্রপতি রাজকোট ঠাকুর সাহেব সম্পর্কে একজন সহকারী রাজনৈতিক এজেন্ট মানহানিকর কথা বললে তিনি তার প্রতিবাদ করেন। ঐ

www.pathagar.com

এজেন্ট ক্রোধান্বিত হয়ে কাবা গান্ধীকে ক্ষমা চাইতে বলেন। তিনি তা করতে অস্বীকার করেন এবং তাঁকে কয়েক ঘন্টা আটক রাখা হয়। এজেন্ট যখন দেখলেন যে কাবা গান্ধী অটল, তখন তাঁকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

ধন-সম্পদ সঞ্চয় করার আকাঙ্ক্ষা আমার বাবার কখনো ছিল না এবং আমাদের জন্য অতি অল্প সম্পদ রেখে তিনি মারা যান। অভিজ্ঞতা ছাড়া তাঁর কোনো শিক্ষা ছিল না। বড় জোর বলা যেতে পারে তিনি গুজরাটী পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন। ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে তিনি ছিলেন অজ্ঞ। কিন্তু বাস্তব জীবনে তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তাঁকে সবচেয়ে কঠিন সমস্যাগুলো সমাধানের ও শত শত লোককে পরিচালনার ক্ষমতা দিয়েছিল। তাঁর ধর্মীয় শিক্ষা ছিল খুব কম, কিন্তু ঘন ঘন মন্দিরে গমন ও ধর্মীয় বক্তৃতা শ্রবণের মাধ্যমে হিন্দুদের ধর্মীয় সংস্কৃতি তিনি অর্জন করেছিলেন। জীবনের শেষ দিনগুলোতে একজন জ্ঞানী ব্রাহ্মণ বন্ধুর অনুরোধে তিনি গীতা পাঠ শুরু করেছিলেন এবং প্রতিদিন পুজোর সময়ে গীতার শ্লোকগুলো জোরে জোরে আবৃত্তি করতেন।

আমার স্মৃতিতে মায়ের যে রূপ ভাস্বর হয়ে আছে তা হলো তাঁর সন্ন্যাসীতুল্য পুতঃ চরিত্র। তিনি ছিলেন গভীর ধর্মানুরাগী। নিত্য দিনের পুজোর পূর্বে তিনি অন্ন গ্রহণের চিন্তাও করতেন না। তাঁর নিত্য দিনের কর্তব্যের একটি ছিল বৈষ্ণব মন্দির হাভেলীতে যাওয়া। অতীত স্মৃতি থেকে আমার যত দূর মনে পড়ে তিনি কখনো "চতুর্মাস" (বর্ষাকালে চার মাস ব্যাপী উপোসের মানত) পালন বাদ দেননি। তিনি সবচেয়ে কঠিন কঠিন মানত করতেন আর অকুণ্ঠ চিত্তে তা পালন করতেন। অসুস্থতার কারণেও মানত পালন হতে বিরত হতেন না। আমার মনে পড়ে একবার তিনি "চন্দ্রায়ন"মানত (উপোসের মানত যাতে দৈনিক আহারের পরিমাণ চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির অনুপাতে কম-বেশি করা হয়) পালনকালে অসুস্থ হয়ে পড়েন, কিন্তু অসুস্থতা তার মানত ভঙ্গ করাতে পারেনি। একটানা দু বা তিন দিনের উপোষ তাঁর জন্য কোনো ব্যাপারই ছিল না। এতে সন্তুষ্ট না হতে পেরে এক চতুর্মাসকালে তিনি একদিন পর পর উপোষ করেছিলেন। অন্য এক চতুর্মাসে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন সূর্যের মুখ না দেখে তিনি আহার করবেন না। ঐ দিনগুলোতে আমরা ছেলেরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম, অপেক্ষা করতাম কখন মায়ের কাছে সূর্য দেখার ঘোষণা দেব বলে। সকলেই জানেন যে ভরা বর্ষা মওসুমে সূর্যদেব প্রায়ই দর্শন দেন না। আমার মনে পড়ে, এরকম দিনে হঠাৎ সূর্য দেখা গেলে দৌড়ে গিয়ে মাকে বলতাম। তিনি দৌড়ে বের হয়ে আসতেন নিজের চোখে দেখতে, ততক্ষণে পলাতক সূর্য আবার মেঘের আড়ালে। ঐদিন আর তাঁর আহার হতো না। তিনি বলতেন, "ও কিছু না, আজ আমি আহার করি ভগবান তা চাননি।" এরপর তাঁর কাজে ফিরে যেতেন।

আমার মায়ের সাধারণ জ্ঞান ছিল টনটনে। রাষ্ট্রের সকল বিষয়ে তাঁর ভালো জ্ঞান ছিল এবং বিচারালয়ের মহিলাদেরও তাঁর বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা ছিল। যখন তিনি শিশু অধিকার বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করতেন তখন প্রায়ই আমি

তাঁর সাথে থাকতাম। গোত্রের বিধবাদের সম্পর্কে ঠাকুর সাহেবের সাথে তাঁর প্রাণবন্ত আলোচনা আমার এখনো মনে পড়ে।

এহেন পিতামাতার ঘরে ২রা অক্টোবর, ১৮৬৯ তারিখে আমার জন্ম হয় পোরবন্দরে, যার আরেক নাম "সুদামাপুরী"। আমার বাল্যকাল কাটে পোরবন্দরে। স্কুলে যাবার কথা আমার মনে আছে। গুণের নামতা মুখস্ত করতে আমার কিছুটা অসুবিধা হতো। সেই দিনগুলোতে অন্য ছেলেদের কাছে শিখে শিক্ষকদেরকে সব রকম গালি দেবার কথা ছাড়া আর বেশি কিছু মনে পড়ে না। এতেই জোরালোভাবে প্রমাণিত হয় যে আমার মেধা ছিল মন্থর, আর স্মৃতি ছিল অপরিপক্ব।

দুই
ছেলেবেলা

আমার বয়স যখন প্রায় সাত বছর তখন আমার বাবা পোরবন্দর ত্যাগ করে রাজকোটে যান রাজস্থানী কোর্টের সদস্য হবার জন্য। সেখানে আমাকে একটি প্রাইমারী স্কুলে পাঠানো হয়। আমাকে যাঁরা শিক্ষা দিয়েছেন সেই সব শিক্ষকদের নাম-ধামসহ সে সময়ের স্মৃতি আমার বেশ ভালোই মনে আছে। পোরবন্দরের মতো এখানেও আমার পড়ালেখার বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। আমি মধ্যম মানের একজন ছাত্র ছিলাম। এ স্কুল থেকে আমি উপশহরের স্কুলে যাই। সেখান থেকে ১২ বছর বয়সে হাই স্কুলে যাই। এই স্বল্পকালের মধ্যে আমার শিক্ষক বা সহপাঠীদের সাথে কখনো মিথ্যা কথা বলেছি বলে আমার মনে পড়ে না। আমি অত্যন্ত লাজুক ছিলাম এবং সকলের সঙ্গ এড়িয়ে চলতাম। আমার বই এবং পড়াই ছিল আমার একমাত্র সাথী। ঘন্টা বাজার সাথে সাথে স্কুলে হাজির হওয়া ছিল আমার প্রতিদিনের অভ্যাস। ছুটির পর আসলেই আমি দৌড়ে বাড়ি ফিরতাম, কারণ আমি কারো সাথে কথা বলতে পারতাম না। আমি ভয়ে ভয়ে থাকতাম পাছে আমাকে নিয়ে কেউ তামাশা না করে।

হাই স্কুলে প্রথম বছরে পরীক্ষার সময়ে একটি ঘটনা ঘটল যা এখানে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা পরিদর্শক মি. গাইলস এসেছিলেন স্কুল পরিদর্শনে। বানান পরীক্ষার জন্য তিনি আমাদেরকে পাঁচটি করে শব্দ লিখতে বললেন। একটি শব্দ ছিল কেতলি (Kettle)। আমি ভুল বানান লিখেছিলাম। আমার শিক্ষক তাঁর পায়ের বুটের মাথা দিয়ে গুতো মেরে আমাকে শুধরে দিতে চাইলেন, কিন্তু আমি তাতে সাড়া দিলাম না। তিনি চেয়েছিলেন আমি পাশের ছেলের শ্লেট থেকে দেখে বানানটা শুদ্ধ করি, কিন্তু আমি সেটা বুঝতেই পারিনি। আমি বরং ভেবেছিলাম শিক্ষক নকল করার বিরুদ্ধে তদারকী করছেন। ফল হয়েছিল এই যে কেবল আমি ছাড়া সব ছেলেই প্রতিটি শব্দ শুদ্ধ লিখেছিল। আমিই কেবল বোকা ছিলাম। পরে শিক্ষক আমার বোকামীটা ধরিয়ে দিলেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। "নকল" করার বিদ্যা আমি কখনো রপ্ত করতে পারিনি। এ ঘটনাটিতে শিক্ষকের প্রতি

www.pathagar.com

আমার শ্রদ্ধা এতটুকু কমেনি। আমার স্বভাবই ছিল বড়দের দোষ না দেখা। পরে আমি এই শিক্ষকের অনেক দোষ-ত্রুটির কথা জেনেছিলাম, তবুও তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা অটুট ছিল।

এ সময়ের আরো দুটি ঘটনা স্মৃতিতে জেগে আছে। নিয়মানুযায়ী স্কুলের বই ছাড়া অন্য বই পড়ার প্রতি আমার অনীহা ছিল। প্রতিদিনের পড়া করতেই হতো, কারণ শিক্ষকের গাল-মন্দ যেমন অপছন্দ করতাম, তেমনই অপছন্দ করতাম তাঁকে ফাঁকি দেয়া। অতএব পড়া করতাম ঠিকই, কিন্তু তাতে আমার মন বসত না। ফলে ক্লাশের পড়াই যখন ঠিকমতো করতে পারতাম না, অতিরিক্ত বই পড়ার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু হঠাৎ একদিন বাবার কেনা একটি বই এর ওপর নজর পড়ল। বইটির নাম "শ্রাবনার পিতৃভক্তি নাটক"। গভীর আগ্রহে বইটি পড়লাম। প্রায় এই সময়ে আমাদের এলাকায় এলো ভ্রাম্যমাণ ছবি প্রদর্শক দল। ছবিগুলোর একটিতে দেখানো হয়েছিল শ্রাবনা কাঁধে ঝুলানো দোলনাতে তার অন্ধ পিতাকে নিয়ে তীর্থে যাচ্ছে। এ বই ও ছবি আমার মনের ওপর অমোচনীয় ছাপ ফেলেছিল। নিজেকে বললাম, "তোমার নকল করার মতো একটা দৃষ্টান্ত।" শ্রাবনার মৃত্যুতে তার পিতার যন্ত্রণাকাতর বিলাপ এখনো আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল। নাটকের করুণ সুর আমাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। বাবা আমাকে একটি কনসার্টিনা বাদ্যযন্ত্র কিনে দিয়েছিলেন। তাতে আমি ঐ সুর বাজাতাম।

একই রকম আরেকটি ঘটনা ছিল অন্য একটি নাটকের সূত্রে। ঠিক এ সময়েই বাবার অনুমতি পেয়েছিলাম কোনো একটি নাট্যদলের অভিনীত নাটক দেখার। নাটকটি ছিল "হরিশচন্দ্র," যা আমার হৃদয় জয় করেছিল। নাটকটি দেখতে গিয়ে আমি কখনো ক্লান্ত হতাম না। কিন্তু আমাকে নাটক দেখার অনুমতি কতবার দেবে? আমি নিজের মনে হরিশচন্দ্রের অভিনয় কতবার যে করেছি তার শেষ নেই। রাত-দিন কেবল নিজেকে প্রশ্ন করেছি "সবাই কেন হরিশচন্দ্রের মতো সত্যবাদী হয় না?" সত্যের অনুসরণ করা এবং হরিশচন্দ্র যে সব অগ্নিপরীক্ষা পার হয়েছে তা একমাত্র আদর্শ হিসেবে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। হরিশচন্দ্রের কাহিনী আমি আসলেই বিশ্বাস করেছিলাম। তার কথা চিন্তা করে আমি প্রায়ই কাঁদতাম। আজ আমি সাধারণ জ্ঞানে বুঝি হরিশচন্দ্র ইতিহাসের চরিত্র হতে পারে না। তা সত্ত্বেও হরিশচন্দ্র ও শ্রাবনা উভয়েই আমার কাছে জীবন্ত সত্য এবং আমি নিশ্চিত যে, ঐ নাটকগুলো আবার পড়লে এখনো তা আমাকে আগের মতোই নাড়া দেবে।

তিন
বাল্য বিবাহ

এ অধ্যায়টি যদি না লিখতে হতো তাহলেই বুঝি ভালো হতো। কিন্তু আমি জানি এ বই এর বর্ণনাকালে এরকম তেতো ওষুধ আমাকে অনেকবার গিলতে হবে। নিজেকে যদি আমি সত্যের পূজারী বলে দাবি করি তাহলে অন্যরকম কিছু করতে

www.pathagar.com

পারব না। তের বছর বয়সে আমার বিয়ের বিবরণ লেখা আমার জন্য একটা বেদনাদায়ক কর্তব্য। যখন আশেপাশে আমার সমবয়সী ছোকরাদের দেখি আর আমার বিয়ের কথা ভাবি, তখন নিজেকে করুণা করতে, আর আমার ভাগ্য বরণ করতে হয়নি বলে ওদেরকে অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছে করে। এরকম অযৌক্তিক বাল্য বিবাহের পক্ষে আমি কোনো যুক্তি খুঁজে পাইনি।

পাঠক যেন আমাকে ভুল না বুঝেন। আমার বিয়ে হয়েছিল, বাগদান নয়। কাথিয়াওয়াড়ে দুটো আলাদা রীতি ছিল—বাগদান ও বিয়ে। বাগদান হলো ছেলে ও মেয়ের বিয়ে দেয়ার জন্য উভয়ের পিতা-মাতার আগাম প্রতিশ্রুতি যা অলংঘনীয় নয়। বাগদত্ত ছেলের মৃত্যুতে মেয়ে বিধবা হয় না। এটা উভয়ের পিতা-মাতার মধ্যে কেবলমাত্র একটা অঙ্গীকারনামা, এর সাথে ছেলে ও মেয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। প্রায়ই বিষয়টি তাদের জানানোও হয় না। মনে হয় আমার বাগদান হয়েছিল তিন বার, যদিও আমি কিছুই জানতাম না। পরে আমাকে বলা হয়েছিল যে, আমার জন্য পছন্দ করা দুটি মেয়ে পর পর মারা গিয়েছিল। এ থেকে অনুমান করি যে তিনবার আমার বাগদান হয়েছিল। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে আমার তৃতীয় বাগদান হয়েছিল সাত বছর বয়সে। কিন্তু আমাকে তা জানানো হয়েছিল বলে মনে পড়ে না। এ অধ্যায়ে আমার বিয়ের কথা বলব যা আমার অতি স্পষ্ট মনে আছে।

আপনাদের মনে থাকতে পারে যে আমরা তিন ভাই ছিলাম। প্রথম ভাই ইতিপূর্বেই বিবাহিত। গুরুজনেরা সিদ্ধান্ত নিলেন, আমার দ্বিতীয় ভাই, যিনি আমার থেকে দুই কি তিন বছরের বড়, এক কাকাতো ভাই যিনি এক বছরের বড় ও আমি—এই তিনজনের বিয়ে এক সঙ্গে হবে। আমাদের মঙ্গল চিন্তায় এটা করা হয়নি, ইচ্ছাতে তো নয়ই। এটা ছিল পুরোপুরি তাদের সুবিধা ও ব্যয় কমানোর জন্য।

হিন্দুদের মধ্যে বিয়ে কোনো মামুলি ব্যাপার নয়। এর মাধ্যমে বর-কনের পিতারা প্রায়ই নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যায়। তাদের সময় ও সম্পদ নষ্ট করে। কয়েক মাস ধরে প্রস্তুতি নেয়, পোষাক ও গয়না বানায়, ভোজের আয়োজন করে। খাবারের পদ ও বৈচিত্র বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় একে অপরকে হারিয়ে দিতে চেষ্টা করে। মহিলাদের গানের গলা থাক বা না থাক, হেড়ে গলাতেই গান গেয়ে নিজেদেরকে অসুস্থ করে, আর প্রতিবেশীদের শান্তি ভঙ্গ করে। প্রতিবেশীরাও সকল হৈ-হুলোড়, উচ্ছিষ্ট খাবারের ময়লা আবর্জনার গন্ধ নীরবে মেনে নেয়, কারণ তারা জানে একসময় তারাও একই রকম আচরণ করবে।

আমার গুরুজনেরা ভাবলেন বিয়ের সব ঝামেলা একসাথে একবারে মিটিয়ে ফেলাই উত্তম। কম খরচে বেশি আড়ম্বরও করা যাবে। যেহেতু তিন বার অনুষ্ঠানের বদলে একবার, তাই টাকা খরচও করা যাবে দরাজ হাতে। আমার বাবা ও কাকা দুজনেই ছিলেন বৃদ্ধ এবং আমরা তাঁদের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান বলে এটাই তাঁদের দেওয়া শেষ বিয়ে। তাই স্বভাবতই তাঁরা জীবনের সেরা আনন্দ

www.pathagar.com

করতে চেয়েছিলেন। এসব চিন্তা করেই একসঙ্গে তিন বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল এবং আগেই বলেছি এ বিয়ের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল কয়েক মাস ধরে।

আয়োজনের বহর দেখে আঁচ করতে পেরেছিলাম কি ঘটতে যাচ্ছে। আমার কাছে তখন বিয়ের অর্থ ভালো পোষাক পরা, ঢাকের বাদ্যসহ বরযাত্রীদের মিছিল, রসালো খাবারে ভূরিভোজ আর খেলার সাথী একটি মেয়ে পাওয়া এর বেশি কিছু নয়। দৈহিক কামনা পরে এসেছিল। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়া এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনার ওপর আমি লজ্জার আবরণ টেনে দিতে চাই। এগুলোর বর্ণনায় পরে আসব। এ কাহিনীর মূল বিষয়বস্তুর সাথে ওগুলোর তেমন সম্পর্কও নেই।

আমার ভাই ও আমাকে রাজকোট থেকে পোরবন্দরে নিয়ে যাওয়া হলো। এ নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বেশ মজার কিছু ঘটনা আছে, যেমন আমাদের গায়ে হলুদ বাঁটা মাখানো। কিন্তু সব কিছু বলতে চাই না। আমার বাবা ছিলেন "দেওয়ান", তথাপি একজন কর্মচারী এবং "ঠাকুর সাহেব" এর সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঠাকুর সাহেব তাঁকে ছাড়েননি। যখন তিনি ছাড়লেন তাঁর জন্য ঘোড়ায় টানা বিশেষ কোচের ব্যবস্থা করলেন যাতে ভ্রমণ সময় দুই দিন কম লাগে। কিন্তু ভাগ্যের লিখন ছিল অন্য রকম। পোরবন্দর থেকে রাজকোটের দূরত্ব ছিল ১২০ মাইল, গরুর গাড়িতে ৫ দিনের পথ। বাবা ঐ পথ ৩ দিনে পাড়ি দিতে গিয়ে তৃতীয় দিনে তাঁর কোচ উল্টে গেল এবং তিনি গুরুতর আঘাত পেলেন। সারা শরীরে ব্যান্ডেজ নিয়ে তিনি পোরবন্দর পৌঁছলেন। আসন্ন অনুষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে তাঁর ও আমাদের আগ্রহ অর্ধেক হয়ে গেল। কিন্তু অনুষ্ঠানতো করতেই হবে। কারণ বিয়ের তারিখ তখন আর বদলানো যায় কি করে? যাহোক, বিয়ের অনুষ্ঠানে শিশুসুলভ আনন্দে মেতে উঠে আমি বাবার আঘাতের শোক ভুলে গেলাম।

আমি বাবার খুব ভক্ত ছিলাম। কিন্তু যৌন আসক্তিও কম ছিল না। তখন পর্যন্ত আমার শিক্ষা এতটা হয়নি যে নিজের আনন্দ-সুখ ত্যাগ করে বাবার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করব। তবে আমার যৌনসুখ ভোগের উগ্র আকাঙ্ক্ষার শাস্তি হিসেবেই যেন একটি ঘটনা ঘটল এবং তা আমার মনে কাঁটার মতো বিঁধে রইল, যার বর্ণনা আমি পরে দেব। সাধক নিষ্কলুষানন্দ গেয়েছেন, "যত চেষ্টাই কর না কেন, কামনা-বাসনা ত্যাগ ব্যতীত পার্থিব সকল ত্যাগ ক্ষণস্থায়ী।" যখনই আমি এ গানটা গাই বা শুনি তখনই এই তিক্ত অপ্রীতিকর ঘটনাটি আমার মনে পড়ে এবং আমাকে লজ্জায় আচ্ছন্ন করে ফেলে।

আহত অবস্থাতেও বাবা সাহসের সাথে সবকিছু সামলালেন এবং বিয়ের সকল অনুষ্ঠানে পুরোপুরি যোগদান করলেন। যখনই আমি চিন্তা করি তখনই আমার মানস চোখে সে জায়গাটি দেখতে পাই যেখানে বসে বাবা বিয়ের প্রতিটি অনুষ্ঠান পালন করেছেন। তখন স্বপ্নেও ভাবিনি আমার বাল্য বিবাহের জন্য একদিন বাবার কঠোর সমালোচনা করব। সেদিনের সব কিছুই আমার কাছে সঠিক, উপযুক্ত ও আনন্দের মনে হয়েছিল এবং বাবা যা কিছু করেছিলেন তার

www.pathagar.com

সবকিছুই তখন সমালোচনার উর্ধ্বে বলে মনে হয়েছিল। আমার স্মৃতিতে সেগুলো এখনো অমলিন আছে। আজো ছবির মতো মনে পড়ে কিভাবে আমরা বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলাম, কিভাবে সপ্তপদী (বর-কনে একত্রে সাত পাক হাঁটা এবং বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকার শপথ করা) করেছিলাম, কিভাবে আমরা নব দম্পতি একে অপরের মুখে মিষ্টি তুলে দিয়েছিলাম এবং কিভাবে আমরা একত্রে বাসর যাপন করেছিলাম। আহ্ সেই প্রথম রাত! দুটি অবোধ শিশু, অনিচ্ছা সত্ত্বেও যারা নিজেদেরকে সংসার সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিল। আমার বৌদি আমাকে বাসর রাতের আচরণ সম্পর্কে ভালো করে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আমার স্ত্রীকে কে শিখিয়েছিল জানি না। এ ব্যাপারে তাকে কখনো জিজ্ঞেস করিনি, আর এখনো করতে চাই না। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমরা একে অপরের সামনে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। অবশ্যই আমরা খুব লাজুক ছিলাম। তার সাথে কিভাবে কথা বলব, কি বলব? বৌদির শিক্ষা আমাকে বেশিদূর এগিয়ে নিতে পারেনি। আসলে এসব ব্যাপারে কোনো শিক্ষারই প্রয়োজন নেই। পূর্বজন্মের স্মৃতির জোর থাকলে এ বিষয়ে শিক্ষা অপ্রয়োজনীয়। আস্তে আস্তে আমরা একে অপরকে জানতে শুরু করলাম, নিঃসংকোচে কথা বললাম। আমরা ছিলাম সমবয়সী। কিন্তু স্বামীর কর্তৃত্ব ফলাতে আমার তেমন দেরি হয়নি।

চার
স্বামীর ভূমিকায়

আমার যখন বিয়ে হয় তখন এক পয়সা বা এক পাই (এখন মনে করতে পারছি না কোনটি) মূল্যের ছোট পুস্তিকা বের হতো। তাতে দাম্পত্য ভালোবাসা, মিতব্যয়িতা, বাল্য বিবাহ এবং এ ধরনের আরো অনেক বিষয়ের আলোচনা থাকত। এগুলোর কোনো একটা পেলেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলতাম এবং আমার অভ্যাসমতো যা পছন্দ হতো না তা ভুলে যেতাম, আর যা পছন্দ হতো তা কাজে লাগাতাম। এসব পুস্তিকায় স্বামীর কর্তব্য হিসেবে স্ত্রীর প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত থাকার উপদেশ আমার হৃদয়ে চিরস্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। অধিকন্তু সত্যের প্রতি তীব্র অনুরাগ ছিল আমার সহজাত প্রবৃত্তি। সুতরাং স্ত্রীর সাথে মিথ্যাচার করার প্রশ্নই আসে না। তা ছাড়া ঐ অল্প বয়সে অবিশ্বস্ত হওয়ার সুযোগও ছিল খুবই কম।

কিন্তু বিশ্বস্ততার শিক্ষার খারাপ দিকও ছিল। আমি নিজেকে বললাম, "আমি যদি স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকব বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, তাহলে তারও স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত।" এই চিন্তা আমাকে ঈর্ষাপরায়ণ স্বামীতে পরিণত করল। আমার প্রতি তার বিশ্বস্ততা ও কর্তব্য যেন আমার অধিকারে পরিণত হলো এবং তা আদায় করে নেবার জন্য তার পিছে গোয়েন্দার মত সর্বক্ষণ লেগে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। স্ত্রীর বিশ্বস্ততার প্রতি আমার সন্দেহ করার কোনোই কারণ ছিল না, কিন্তু ঈর্ষা কোনো কারণের ধার ধারে না। স্থির

www.pathagar.com

করলাম আমাকে তার গতিবিধির ওপর নজর রাখতে হবে। সুতরাং আমার অনুমতি ছাড়া সে কোথাও যেতে পারবে না। এতে আমাদের মধ্যে তিক্ত ঝগড়ার বীজ বপন করা হয়ে গেল। নিষেধাজ্ঞাটা ছিল এক ধরনের বন্দীদশা। এবং কস্তুর বাই তা মেনে নেয়ার মতো মেয়ে ছিল না। সে ইচ্ছা করেই যেখানে খুশী, যখন খুশী যেতে লাগল। আমার পক্ষ থেকে আরো নিষেধাজ্ঞার ফল হিসেবে সে আরো বেশি করে স্বাধীনতা নিতে থাকল এবং তার প্রতি আমি আরো বেশি বেশি বৈরী হতে লাগলাম। এভাবে আমাদের দুজনের অর্থাৎ দুই বিবাহিত শিশুর একে অপরের সাথে কথা বলতে অস্বীকার করাটা নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আমার মনে হয় আমার নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রেক্ষিতে কস্তুরবাই-এর আরো বেশি করে স্বাধীন হওয়া মোটেও দোষের ছিল না। ছলনাহীন একটি বালিকা তার মন্দিরে যাওয়া বা বন্ধুদের সাথে দেখা করতে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা কি করে মেনে নেবে? আমার যদি তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের অধিকার থাকে, তারও কি আমার ওপর সেরকম অধিকার নেই? এখন আমার কাছে এসব পরিষ্কার। কিন্তু সেই সময়ে স্বামী হিসেবে আমার অধিকার আদায় করতে গিয়েছিলাম!

যাহোক, পাঠক যেন মনে না করেন যে আমাদের জীবন শুধুই তিক্ততায় পূর্ণ ছিল। আমার কড়াকড়ি আরোপের ভিত্তি ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা। আমার স্ত্রীকে আমি আদর্শ স্ত্রী হিসেবে গড়ে নিতে চেয়েছিলাম। আমার উচ্চ আশা ছিল সে শুদ্ধ জীবন যাপন করবে, আমি যা শিখি সেও তাই শিখবে এবং তার জীবন ও চিন্তা আমার সাথে একাত্ম করে নেবে।

আমি জানি না কস্তুরবাই-এরও এরকম উচ্চাশা ছিল কিনা। সে লেখাপড়া জানত না। স্বভাবে ছিল সরলমতি, স্বাধীনচেতা, অধ্যবসায়ী এবং অন্তত আমার সাথে স্বল্পভাষী। অক্ষরজ্ঞান না থাকার জন্য তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর ছিল না এবং আমার বিদ্যার্জনের চেষ্টা তার মধ্যে শিক্ষার প্রতি কোনো আগ্রহ সৃষ্টি করত বলে মনে হয় না। সুতরাং আমার ধারণা, তাকে নিয়ে আমার উচ্চাশা ছিল একতরফা। আমার সমস্ত আবেগ ছিল তাকে ঘিরেই এবং তার কাছ থেকে আমি এর প্রতিদান চেয়েছিলাম। প্রতিদান যদিও ছিল না কিন্তু তা একটানা যন্ত্রণাও ছিল না, কারণ অন্তত এক পক্ষের সক্রিয় ভালোবাসা তো ছিল।

আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে তার প্রতি আমার ভালোবাসা ছিল আবেগে পূর্ণ। এমনকি স্কুলে বসেও আমি তার কথা ভাবতাম এবং কখন রাত হবে, আর আমরা মিলিত হব এ চিন্তাই আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখত। বিরহ ছিল অসহ্য। খুচরো কথা বলে আমি তাকে গভীর রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখতাম। এহেন আগ্রাসী কামনার পাশাপাশি আমার মধ্যে যদি তীব্র কর্তব্যবোধ না থাকত তাহলে হয় আমি রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মারা পড়তাম, না হয় অন্যের ঘাড়ে বোঝা হয়ে বেঁচে থাকতাম। প্রতিদিন নির্ধারিত বাড়ির পড়া করতেই হতো এবং এ ব্যাপারে মিথ্যা বলারও উপায় ছিল না। এই মিথ্যা না বলাটাই আমাকে বহু অধঃপতন থেকে বাঁচিয়েছে।

www.pathagar.com

আগেই বলেছি, কস্তুরবাই অশিক্ষিত ছিল। আমি তাকে পড়াতে খুবই অধীর ছিলাম। কিন্তু কামুক ভালোবাসাতেই সময় ফুরিয়ে যেত। কারণ তাকে পড়াতে হতো তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তাও আবার রাতে। দিনের বেলা গুরুজনদের সামনে তার সাথে দেখা করতেই সাহস পেতাম না, কথা বলতাম আরো কম। সেই সময়ে কাঁথিয়াওয়াড়ে অদ্ভুত, অপ্রয়োজনীয় ও বর্বর পর্দা প্রথা চালু ছিল, যার কিছুটা এখনো আছে। ফলে পরিবেশ ছিল প্রতিকূল। সুতরাং আমি স্বীকার করছি যে কস্তুরবাইকে যৌবনকালে শিক্ষিত করে তোলার জন্য আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। কামনার ঘোর থেকে যখন জেগে উঠলাম ততদিনে আমি জন-জীবনে প্রবেশ করেছি, তখন আর আমার অবসর সময় ছিল না। গৃহশিক্ষক দ্বারা তাকে শিক্ষা দানের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছিল। এর ফলে কস্তুরবাই এখন পর্যন্ত অতি কষ্টে সহজ ভাষায় পত্র লিখতে আর সহজ গুজরাটী পড়তে পারে। আমি নিশ্চিত যে তার প্রতি আমার ভালোবাসা যদি পুরোপুরি কামনামুক্ত হতো তাহলে পড়ার প্রতি তার অনীহা দূর করতে পারতাম এবং সে আজ একজন বিদূষী রমণী হতে পারত। আমি জানি পবিত্র ভালোবাসার অসাধ্য কিছুই নেই।

একটি ঘটনার উল্লেখ করেছি যা আমাকে দৈহিক কামনার বিপর্যয় হতে রক্ষা করেছিল। এরকম আরো একটি ঘটনা আছে। অসংখ্য দৃষ্টান্ত থেকে আমি বিশ্বাস করি, যার উদ্দেশ্য সৎ শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর তাকে রক্ষা করেন। বাল্য বিবাহের "নিষ্ঠুর" প্রথার পাশাপাশি হিন্দু সমাজে আর একটি প্রথা চালু আছে, যা বাল্য বিবাহের কুফল অনেকটা নির্মূল করে। তা হলো বাল্য দম্পতিদের দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকতে না দেওয়া। বালিকা বধূকে বছরের অর্ধেক সময় পিত্রালয়ে কাটাতে হয়। আমাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। সত্যি বলতে কি, আমাদের বিয়ের প্রথম পাঁচ বছরে (তের বছর হতে আঠার বছর বয়স পর্যন্ত) সর্বসাকুল্যে তিন বছরের বেশি আমরা একত্রে বাস করতে পারিনি। আমরা ছয় মাস একত্রে থাকতে না থাকতেই তার পিত্রালয়ে যাবার ডাক পড়ত। সেকালে পিত্রালয়ে যাবার এরূপ আমন্ত্রণ মোটেই ভালো চোখে দেখা হতো না, কিন্তু তা আমাদের দুজনকেই রক্ষা করেছে। আঠার বছর বয়সে আমি ইংল্যান্ডে চলে গেলাম, যার অর্থ দীর্ঘ কিন্তু স্বাস্থ্যকর বিচ্ছেদের পালা। ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পরেও আমরা একত্রে ছয় মাস থাকতে পারিনি। কারণ আমাকে ঘন ঘন বোম্বে-রাজকোট যাওয়া-আসা করতে হয়েছে। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার ডাক এলো যা আমাকে দৈহিক কামনা থেকে মোটামুটি মুক্ত করে দিল।

পাঁচ
হাই স্কুলে

আগেই বলেছি, যখন হাই স্কুলে পড়ি তখন আমি বিবাহিত। আমরা তিন ভাই তখন একই স্কুলে পড়ি। সবার বড় ভাই অনেক উপরের ক্লাশে এবং আমার ও যে ভাইয়ের একই সাথে বিয়ে হলো, সে আমার এক ক্লাশ উপরে পড়ে। বিয়ের

www.pathagar.com

কারণে আমাদের দু'ভাইয়েরই এক বছর নষ্ট হয়েছে। আমার ভাই-এর পরীক্ষার ফল খুব খারাপ হলো, কারণ সে লেখাপড়া একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিল। ঈশ্বর জানেন, কত জনের অবস্থা এরকম হয়। বিয়ে ও লেখাপড়া একই সাথে কেবল হিন্দু সমাজেই দেখা যায়।

আমার পড়ালেখা চলতে থাকল। ছাত্র হিসেবে আমি নিতান্ত গবেট ছিলাম না। শিক্ষকরা সব সময়ই আদর করতেন। প্রতি বছর আমার প্রমোশন ও চরিত্রের সার্টিফিকেট বাবার নিকট পাঠানো হতো। আমি কখনো খারাপ সার্টিফিকেট পাইনি। এমনকি আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর পরীক্ষা পাশের পর পুরস্কারও পেয়েছিলাম। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে আমি চার ও দশ টাকা করে বৃত্তিও পেয়েছিলাম, এর জন্য আমি আমার মেধার চাইতে সৌভাগ্যকেই ধন্যবাদ জানাই। কারণ বৃত্তি সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল না, কেবল কাথিয়াওয়াড়ের সুরাট বিভাগের সেরা ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। আর সেই সময়ে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন ছাত্রের ক্লাশে সুরাটের ছেলে তেমন বেশি ছিল না।

যতদূর মনে পড়ে, নিজের মেধা সম্পর্কে আমার উচ্চ ধারণা ছিল না। আমি যখন পুরস্কার ও বৃত্তি পেতাম তখন অবাক হতাম। কিন্তু অতি যত্ন সহকারে আমার চরিত্র রক্ষা করেছি। চরিত্র সম্পর্কে সামান্যতম অপবাদ এলেও আমার চোখে পানি আসত। সঙ্গত কারণেও শিক্ষকের গালি আমার নিকট অসহনীয় ছিল। মনে পড়ে, একবার আমাকে দৈহিক শাস্তি দেয়া হয়েছিল। শাস্তির চাইতে স্কুল পালানোর অপবাদই আমাকে বেশি কষ্ট দিয়েছিল। আমি করুণভাবে কেঁদেছিলাম। এটা ছিল যখন আমি প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি তখনকার ঘটনা। এরকম আরেকটি ঘটনা ছিল যখন আমি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি। দোরাবজী এদুলজী গিমি তখন হেডমাস্টার ছিলেন। তিনি ছাত্রদের প্রিয় ছিলেন, কারণ তিনি শৃঙ্খলাপরায়ণ, নীতিবান ও ভালো শিক্ষক ছিলেন। উপর ক্লাশের ছাত্রদের জন্য তিনি শরীর চর্চা ও ক্রিকেট খেলা আবশ্যিক করেছিলেন। আমি দুটো খেলাই অপছন্দ করতাম। ওগুলো আবশ্যিক বিষয় হওয়ার আগে আমি কখনই শরীর চর্চা, ক্রিকেট ও ফুটবল খেলায় যোগ দেইনি। আমার লাজুক স্বভাবই ওগুলো থেকে দূরে থাকার কারণ। এখন বুঝি, আমি ভুল করেছি। আমার ভুল ধারণা ছিল যে, শরীর চর্চার সাথে শিক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। এখন জানি, শিক্ষাসূচীতে মানসিক শিক্ষার পাশাপাশি শারীরিক শিক্ষারও সমান গুরুত্ব থাকা উচিত।

যাহোক, শরীর চর্চা না করার জন্য আমি কিন্তু মোটেই খারাপ ছিলাম না। তার কারণ আমি বই পড়ে মুক্ত বাতাসে দীর্ঘ পথ হাঁটার উপকারিতা সম্পর্কে জেনেছিলাম এবং প্রতিদিন হাঁটার অভ্যাস করেছিলাম যা আজো অব্যাহত আছে। এই হাঁটার ফলে আমার শরীরের গঠন মোটামুটি মজবুত হয়েছে।

ব্যায়ামের প্রতি আমার অনীহার কারণ হলো নার্সের মতো বাবার সেবা করার প্রবল ইচ্ছে। স্কুল ছুটি হওয়ার সাথে সাথে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেই বাবার সেবায় লেগে যেতাম। বাধ্যতামূলক শরীর চর্চা বাবার সেবা করার পথে সরাসরি বাধা

www.pathagar.com

হয়ে দাঁড়াল। শরীর চর্চা থেকে আমাকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য মি. গিমিকে অনুরোধ করলাম, যাতে আমি ইচ্ছেমতো বাবার সেবা করতে পারি। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না। এক শনিবারে হলো কি—স্কুলের সময় ছিল সকালে, কিন্তু আমি শরীর চর্চার জন্য স্কুলে হাজির হলাম বিকেল চারটায়। আমার ঘড়ি ছিল না, আর মেঘ আমাকে ধোঁকা দিয়েছিল। আমি স্কুলে পৌছার আগেই সব ছেলে চলে গিয়েছিল। পরদিন মি. গিমি হাজিরা খাতা পরীক্ষা করে আমাকে অনুপস্থিত দেখলেন। অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলে যা ঘটেছিল আমি তাই বললাম। তিনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না এবং এক আনা কি দু'আনা (সঠিক মনে পড়ছে না কত) জরিমানা দেয়ার আদেশ দিলেন।

আমি মিথ্যা বলার দায়ে অভিযুক্ত হলাম, যা আমাকে গভীর ব্যথা দিয়েছিল। কিভাবে প্রমাণ করব আমি নির্দোষ? কোনো উপায় ছিল না। গভীর যাতনায় আমি কাঁদলাম। আমি শিক্ষা পেলাম যে একজন সত্যবাদী মানুষকে সাবধানীও হতে হয়। এটাই ছিল স্কুলে আমার অসাবধান হওয়ার প্রথম ও শেষ ঘটনা। আমার অস্পষ্ট মনে পড়ে, ঐ জরিমানা মওকুফ করাতে সক্ষম হয়েছিলাম। শরীর চর্চা থেকে অব্যাহতি অবশ্য পেয়েছিলাম। বাবা নিজে হেডমাস্টারকে পত্র লিখে জানিয়েছিলেন যে স্কুল ছুটির পর তিনি আমাকে বাড়িতে দেখতে চান।

যদিও শরীর চর্চায় অবহেলার জন্য আমার কোনো ক্ষতি হয়নি, কিন্তু অন্য একটি বিষয়ে অবহেলার জন্য আজো আমাকে পস্তাতে হচ্ছে। কিভাবে যেন আমার ধারণা জন্মেছিল যে সুন্দর হাতের লেখা শিক্ষার প্রয়োজনীয় অঙ্গ নয়। তবে ইংল্যান্ড যাওয়া পর্যন্ত তা বহাল ছিল। পরবর্তীকালে, বিশেষতঃ দক্ষিণ আফ্রিকাতে যখন দেখলাম আইনজীবী ও যুবকদের সুন্দর হাতের লেখা তখন লজ্জা পেলাম এবং আমার অবহেলার জন্য অনুতপ্ত হলাম। অসুন্দর হাতের লেখাকে অসম্পূর্ণ শিক্ষার প্রতীক বলে মনে হলো। হাতের লেখা সুন্দর করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেছে। ছোটবেলার অবহেলার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া আর সম্ভব হয়নি। আমার দৃষ্টান্ত থেকে প্রত্যেক বালক বালিকা সতর্ক হোক, আর জেনে রাখুক যে সুন্দর হাতের লেখা শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। আমার এখনকার অভিমত হলো, বাচ্চাদের লেখা শেখানোর আগে ছবি আঁকা শেখানো উচিত। বাচ্চারা যেমন ফুল, পাখি ইত্যাদি দেখে দেখে চেনে, তেমনি দেখে দেখে তাদের অক্ষর চিনতে দিন। আর হাতের লেখা শিখতে দিন অন্য বস্তুর ছবি আঁকা শেখার পরে। তখন সে সুন্দর গড়নের অক্ষর লিখতে পারবে।

স্কুল জীবনের আরো দুটি স্মৃতির কথা এখানে উল্লেখ করার মতো। বিয়ের কারণে আমার লেখাপড়া এক বছর নষ্ট হয়েছিল। আমার শিক্ষক এক ক্লাশ ডিঙ্গিয়ে সে ক্ষতি পুষিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। অধ্যবসায়ী ছেলেদের এ সুযোগ দেয়া হতো। সুতরাং আমি তৃতীয় শ্রেণীতে ৬ মাস থাকলাম এবং পরীক্ষার পর প্রমোশন পেয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠলাম। অতঃপর গ্রীষ্মের ছুটি। চতুর্থ শ্রেণী

www.pathagar.com

থেকেই প্রায় সকল বিষয়ে শিক্ষার মাধ্যম হলো ইংরেজি। আমি যেন একেবারে সাগরে পড়ে গেলাম। জ্যামিতি ছিল নতুন বিষয়, এতে আমি দুর্বল ছিলাম। আর ইংরেজি মাধ্যম একে আরো কঠিন করে তুলল। শিক্ষক খুব ভালো পড়াতেন, কিন্তু আমি বুঝতে পারতম না। প্রায়ই আমি হতাশ হয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে নেমে যাবার চিন্তা করতাম। ভাবতাম দু'বছরের পড়া এক বছরে চাপিয়ে দেয়া বেশি মাত্রার উচ্চাশা। কিন্তু তাতে শুধু আমারই বদনাম হতো না, আমার অধ্যবসায়ের ওপর ভরসা রেখে যে শিক্ষক আমাকে প্রমোশন দিয়েছিলেন তাঁরও বদনাম হতো। সুতরাং এ দুই বদনামের ভয় আমাকে টিকিয়ে রাখল। যাহোক অনেক কষ্টে যখন আমি ইউক্লিডের ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত পৌছালাম, হঠাৎ করে এ বিষয়ের সরলতা আমার বোধগম্য হলো। যে বিষয় পড়তে প্রয়োজন কেবল খাঁটি ও সহজ যুক্তির জোর তা কঠিন হতে পারে না। তখন থেকে জ্যামিতি আমার কাছে সহজ ও আকর্ষণীয় মনে হয়েছে।

সংস্কৃত আমার কাছে অপেক্ষাকৃত কঠিন মনে হয়েছে। জ্যামিতিতে মুখস্ত করার কিছু ছিল না, কিন্তু সংস্কৃতে সব কিছুই মুখস্ত করতে হবে বলে মনে হতো। এ বিষয়টিও চতুর্থ শ্রেণী হতেই শুরু। ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠে আমি একেবারে হতাশ হয়ে গেলাম। শিক্ষক কঠিন পড়া চাপিয়ে দিতেন এবং ছাত্রদের ওপর জুলুম করতেন। সংস্কৃত আর ফার্সী শিক্ষকদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগীতা চালু ছিল। ফার্সী শিক্ষক ছিলেন উদার। ছেলেরা বলাবলি করত যে ফার্সী খুব সহজ, ফার্সী শিক্ষক খুব ভালো এবং ছাত্রদের প্রতি নমনীয়। এই "সহজ" কথাটা আমাকে প্রলুব্ধ করল এবং একদিন আমি ফার্সী ক্লাশে যোগ দিলাম। সংস্কৃত শিক্ষক দুঃখ পেলেন। আমাকে ডেকে বললেন, "তুমি কি ভুলে যাচ্ছ যে তুমি একজন বৈষ্ণব পিতার সন্তান? তুমি কি নিজ ধর্মের ভাষা শিখতে চাও না? কোনো অসুবিধা থাকলে আমার কাছে কেন আস না? আমি তোমাদেরকে আমার সামর্থ্য অনুযায়ী সংস্কৃত শেখাব। কিছুদূর শিখলে এতে তোমরা মনোযোগী হতে পারবে। হতাশ হয়ো না। এসো, আবার সংস্কৃত ক্লাশে বসো।"

তাঁর এ দয়া আমাকে লজ্জা দিল। শিক্ষকের স্নেহ আমি ফেলতে পারলাম না। আজো আমি কৃষ্ণশংকর পাণ্ডের প্রতি কৃতজ্ঞ। ঐ সময় যেটুকু সংস্কৃত শিখেছিলাম তা যদি না শিখতাম তাহলে আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে আকৃষ্ট হওয়া আমার জন্য কঠিন হতো। এ ভাষাটি আরো ভালো করে শিখতে পারিনি বলে আমার খুব দুঃখ হয়। কারণ আমি বুঝতে পেরেছি, প্রতিটি হিন্দু বালক-বালিকার সংস্কৃত ভাষায় পূর্ণ জ্ঞান থাকা উচিত।

এখন আমার অভিমত এই যে, ভারতের সকল উচ্চ শিক্ষার পাঠ্যসূচীতে মাতৃভাষা ছাড়াও হিন্দী, সংস্কৃত, ফার্সী, আরবী ও ইংরেজির স্থান থাকা উচিত। এই লম্বা তালিকা দেখে ভয়ের কিছু নেই। যদি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আরো সুশৃঙ্খল হতো, ছাত্ররা বিদেশী ভাষার ভার থেকে মুক্ত হয়ে সকল বিষয় নিজ ভাষায় শিখতে পারত, তাহলে আমি নিশ্চিত যে এ সকল ভাষা শেখা তাদের জন্য

www.pathagar.com

কঠিন হতো না, বরং তা গভীর আনন্দের হতো। একটি ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অর্জন অন্য ভাষা শিক্ষাকে তুলনামূলকভাবে সহজ করে দেয়।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দী, গুজরাটি ও সংস্কৃতকে এক ভাষা, আর ফার্সী ও আরবীকে এক ভাষা বলা যেতে পারে। যদিও ফার্সী আর্য এবং আরবী সেমিটিক ভাষা পরিবার থেকে উদ্ভূত, এ দুই ভাষার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, কারণ উভয়েই ইসলামের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে তাদের পূর্ণতা প্রাপ্তির দাবি করে। উর্দুকে আমি আলাদা কোনো ভাষা মনে করি না, কারণ এর ব্যাকরণ হিন্দী কিন্তু শব্দভাণ্ডার মূলত ফার্সী ও আরবী। কেউ যদি ভালো উর্দু শিখতে চায়, তাকে ফার্সী ও আরবী জানতে হবে, যেমন ভালো গুজরাটি, হিন্দী, বাংলা বা মারাঠী শিখতে চাইলে অবশ্যই সংস্কৃত শিখতে হবে।

ছয়

একটি দুঃখজনক অভিজ্ঞতা

হাই স্কুলে আমার অল্প ক'জন বন্ধুর মধ্যে বলা যেতে পারে দু'জন ছিল অন্তরঙ্গ। এর মধ্যে একজনের বন্ধুত্ব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, যদিও আমি তাকে ত্যাগ করিনি। বরং সেই আমাকে ত্যাগ করেছে, কারণ আমি অন্য একজনের সাথে বন্ধুত্ব করেছি। শেষোক্ত জনের সাথে এ বন্ধুত্বকেই আমি আমার জীবনের দুঃখজনক অভিজ্ঞতা বলে মনে করি। এ বন্ধুত্ব দীর্ঘস্থায়ী ছিল। তাকে সংশোধনের অভিপ্রায়ে আমি এ বন্ধুত্ব করেছিলাম।

আমার এ বন্ধুটি ছিল মূলত আমার দাদার বন্ধু। তারা ছিল সহপাঠী। তার দুর্বলতা আমি জানতাম, কিন্তু বন্ধু হিসেবে তাকে বিশ্বস্ত মনে করতাম। আমার মা, বড়দা ও আমার স্ত্রী সতর্ক করে দিয়েছিল যে আমি অসৎ সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছি। স্ত্রীর সতর্কবাণী আমি সদম্ভে প্রত্যাখ্যান করলাম। কিন্তু মা ও বড়দার মতামতকে উপেক্ষা করার সাহস পাইনি। তথাপি তাদের সাথে যুক্তি দেখিয়ে বললাম, "তোমরা যেসব দোষের কথা বলছ সেসব দোষ তার আছে, কিন্তু তার গুণের কথা তোমরা জানো না। সে আমাকে বিপথে নিতে পারবে না, কারণ তার সাথে আমার মেলামেশার উদ্দেশ্য হলো তাকে সংশোধন করা। আমি নিশ্চিত যে যদি সে সংশোধন হয়, তাহলে সে হবে একজন উত্তম মানুষ। আমার অনুরোধ তোমরা আমাকে নিয়ে শংকিত হয়ো না।"

আমার যুক্তি শুনে তারা খুশী হয়েছিল বলে মনে হয় না, কিন্তু তা মেনে নিয়ে আমাকে তারা নিজের মতো পথ চলতে দিয়েছিল।

তখন থেকে আমি দেখে আসছি আমার হিসেবে ভুল ছিল। একজন সংস্কারক যাকে সংশোধন করতে চায় তার সাথে অন্তরঙ্গ হতে পারে না। সত্যিকার বন্ধুত্ব হলো আত্মার সাথে একাত্মতা, যা পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া বিরল। স্বভাবে মিল থাকলেই কেবল বন্ধুত্ব মর্যাদাপূর্ণ ও স্থায়ী হতে পারে। বন্ধুদের একে অন্যের ওপর প্রভাব ফেলে। এ কারণে বন্ধুত্বের মাধ্যমে সংশোধনের সুযোগ নেই। আমার মতে

www.pathagar.com

একান্ত অন্তরঙ্গতা সর্বদা বর্জনীয়, কারণ অন্তরঙ্গতার মাধ্যমে মানুষ গুণের চেয়ে দোষকে অনেক বেশি সহজে গ্রহণ করে। যে ঈশ্বরের বন্ধুত্ব চায় তাকে অবশ্যই একা চলতে হবে অথবা সারা বিশ্বের সাথে তাকে বন্ধুত্ব করতে হবে। আমার মত সঠিক নাও হতে পারে, কিন্তু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

এ বন্ধুটির সাথে আমার যখন প্রথম দেখা হয় তখন রাজকোটে তথাকথিত সংস্কারের ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল। সে আমাকে জানিয়েছিল আমাদের শিক্ষকদের অনেকেই গোপনে মাংস ও মদ খেতে শুরু করেছে। সে রাজকোটের অনেক খ্যাতিমান লোকের নাম বলেছিল, যারা নাকি ঐ দলে ভিড়েছিল। সে আরো বলেছিল হাই স্কুলের কিছু ছাত্রও ঐ দলে ছিল।

আমি অবাক ও দুঃখিত হয়েছিলাম। বন্ধুটিকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে যে ব্যাখ্যা দিয়েছিল তা হলো—"মাংস খাই না বলে আমরা দুর্বল হয়ে যাচ্ছি। ইংরেজরা আমাদেরকে শাসন করছে, কারণ তারা মাংসভোজী। তুমিতো জান আমি কেমন শক্তিশালী আর দৌড়ে কেমন দক্ষ। এর কারণ আমি মাংস খাই। মাংসভোজীদের ফোড়া বা টিউমার হয় না, যদি কখনো হয়ও তাহলে তা অতি শীঘ্র সেরে যায়। আমাদের শিক্ষক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যারা মাংস খাচ্ছেন, তারা তো আর বোকা নন। তারা এর গুণাগুণ জানেন। তাদের মতো তোমারও মাংস খাওয়া উচিত। পরখ করে দেখতে তো কোনো দোষ নেই। একবার পরখ করে দেখোই না এটা কেমন বলকারক।"

মাংস খাবার পক্ষে এতসব যুক্তি একদিনে দেয়া হয়নি। আমার বন্ধু আমাকে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন সময়ে যেসব যুক্তি-তর্কের অবতারণা করত এগুলো তারই সারাংশ। ইতিমধ্যে আমার দাদার পতন হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং সে আমার বন্ধুর যুক্তিকেই সমর্থন করছিল। দাদা ও বন্ধুর পাশে আমার শরীর অবশ্যই দুর্বল দেখাত। তারা দু'জনেই ছিল অধিকতর শক্ত-সমর্থ, দৈহিকভাবে শক্তিশালী আর সাহসীও বটে। এ বন্ধুর প্ররোচনা আমাকে মুগ্ধ করল। সে অসাধারণ দ্রুততায় দীর্ঘ পথ দৌড়াতে পারত। হাই জাম্প ও লং জাম্পে তার দক্ষতা ছিল। যে কোনো দৈহিক শাস্তি সে অকাতরে সহ্য করত। প্রায়ই সে আমার কাছে তার বীরত্ব প্রদর্শন করত। আর নিজের মধ্যে নেই এমন গুণ অন্যের মধ্যে দেখে মানুষের যেমন চোখ ধাঁধিয়ে যায়, তেমনি এ বন্ধুর বীরত্ব দেখে আমারও চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। এর পরই প্রবল ইচ্ছে জাগল আমি তার মতো হব। আমি কদাচিৎ লাফাতে বা দৌড়াতে পারতাম। মনে মনে বললাম আমিও কেন তার মতো হতে পারব না?

তাছাড়া আমি ছিলাম ভীতু। চোর, সাপ আর ভূতের ভয় আমাকে তাড়া করে ফিরত। রাতের বেলা ঘরের বাইরে যাবার সাহস হতো না। অন্ধকার ছিল আমার আতঙ্ক। অন্ধকারে ঘুমানো ছিল প্রায় অসম্ভব, কারণ আমি কল্পনায় দেখতাম এদিক থেকে ভূত, ওদিক থেকে চোর, আরেক দিক থেকে সাপ আমার দিকে

www.pathagar.com

তেড়ে আসছে। সুতরাং রাতে আমার ঘরে আলো না জ্বেলে ঘুমাতে পারতাম না। আমার পাশে ঘুমন্ত স্ত্রী, তখন সে আর ছোটটি নয়, বরং যৌবনের দ্বার প্রান্তে, তাকে কি করে আমার ভয়ের কথা বলব? আমি জানি তার সাহস আমার চেয়ে ঢের বেশি, আর এতে আমি নিজের কাছে লজ্জা পেতাম। সাপ আর ভূতের ভয় তার নেই। সে অন্ধকারে যেখানে সেখানে যেতে পারে। আমার বন্ধুটি আমার এসব দুর্বলতার কথা জানত। সে আমাকে বলত যে সে জ্যান্ত সাপ নিজের হাতে ধরতে পারে, চোরের সাথে লড়াই করতে পারে, আর ভূতের ওপর তার বিশ্বাসই নেই। নিশ্চিতভাবেই এসব হলো তার মাংস খাওয়ার ফল।

আমার স্কুলের ছেলেদের মধ্যে গুজরাটী কবি নরমাদের একটি ছড়া প্রচলিত ছিল, যা নিম্নরূপ :

দ্যাখ চেয়ে ঐ ইংরেজ শক্তিমান, শাসন করিছে দুর্বল ইন্ডিয়ান,
পাঁচ হাত লম্বা শরীর তার, প্রতিদিন করে সে মাংস আহার।

যথারীতি এসব কথা আমাকে প্রভাবিত করল। আমি হেরে গেলাম। বিশ্বাস করতে লাগলাম যে মাংস খাওয়া ভালো, এটা আমাকে শক্তি ও সাহস দেবে এবং দেশের সব লোক যদি মাংস খায়, তাহলে একদিন ইংরেজদেরকে পরাজিত করা যাবে।

পরীক্ষামূলকভাবে মাংস খাওয়া শুরু করার জন্য একটা দিন ঠিক করা হলো। কাজটা গোপনে করতে হবে। গান্ধী বংশ ছিল বৈষ্ণব। আমার পিতা-মাতাও ছিলেন গোঁড়া বৈষ্ণব। তাঁরা নিয়মিত হাভেলীতে যেতেন। এমনকি এ পরিবারের নিজস্ব মন্দিরও ছিল। গুজরাটে জৈন ধর্মমত বেশ প্রবল ছিল এবং এর প্রভাব ছিল সর্বক্ষেত্রে, সকল অনুষ্ঠানে। গুজরাটের জৈন ও বৈষ্ণবদের মধ্যে মাংস খাওয়ার প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা এতই প্রবল ছিল, যা ভারতের অন্য কোথাও দেখা যেত না। ভারতের বাইরেও কোথাও তা এত প্রবল ছিল না। এই ঐতিহ্যের মধ্যে আমি জন্ম নিয়েছি ও লালিত হয়েছি। আর পিতা-মাতার প্রতি আমি ছিলাম গভীরভাবে নিবেদিতপ্রাণ। আমি জানতাম, যে মুহূর্তে তাঁরা আমার মাংস খাবার কথা জানতে পারবেন তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড আঘাতে মারা যাবেন। উপরন্তু সত্যের প্রতি ভালোবাসা আমাকে সতর্ক করে দিল। পিতা-মাতাকে ধোঁকা দিতে "আমি না বুঝে মাংস খেয়েছি"—এমন মিথ্যা কথা আমি বলতে পারব না। কিন্তু আমার মন ঝুঁকে আছে তথাকথিত সংস্কারের দিকে। এতে রসনা তৃপ্ত করার ব্যাপার ছিল না। আমি জানতাম না মাংস কতটা সুস্বাদু। আমার বাসনা ছিল শক্তিশালী ও সাহসী হওয়ার, আর চেয়েছিলাম আমার দেশবাসীও এমন হোক যাতে ইংরেজকে পরাজিত করতে ও ভারতকে স্বাধীন করতে পারি। "স্বরাজ" কথাটি আমি তখনো শুনিনি। কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ আমার জানা ছিল। তথাকথিত সংস্কারের উন্মাদনা আমাকে

www.pathagar.com

অন্ধ করে ফেলেছিল। গোপনীয়তা নিশ্চিত করার পর নিজেকে বোঝালাম, মাংস খাওয়ার বিষয়টি পিতা-মাতার কাছে চেপে গেলে তাতে সত্যের বরখেলাপ হবে না।

সাত
একটি দুঃখজনক অভিজ্ঞতা (চলমান)

অতঃপর প্রতিক্ষিত দিনটি এলো। আমার অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। একদিকে ছিল সংস্কারের উদ্দীপনা ও জীবনের পথে স্মরণীয় যাত্রার নতুনত্ব। অপর দিকে ছিল এ কাজ করতে গিয়ে চোরের মতো লুকিয়ে থাকার লজ্জা। এ দুটোর মধ্যে কোনটির প্রভাব আমার ওপর বেশি ছিল তা বলতে পারব না। আমরা নদীর পাড়ে একটা নির্জন স্থানের খোঁজে বের হলাম। জীবনে এই প্রথম আমি মাংস দেখলাম। সাথে পাউরুটিও ছিল। তবে কোনোটাই আমার কাছে সুস্বাদু মনে হলো না। ছাগলের মাংস ছিল চামড়ার মতো শক্ত। ওটা আমি খেতেই পারলাম না। আমি অসুস্থ বোধ করলাম এবং খাওয়া ছেড়ে চলে গেলাম। পরবর্তী রাতটা আমার খুব খারাপ কাটল। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন আমাকে তাড়া করে ফিরল। যতবার ঘুম আসতে থাকে ততবারই মনে হয় একটা জ্যান্ত ছাগল যেন আমার পেটের মধ্যে "ব্যা" করে ডেকে উঠছে আর আমি অনুশোচনায় লাফিয়ে উঠছি। কিন্তু এর পরই নিজের মনে বললাম যে মাংস খাওয়াটা একটা কর্তব্য ছিল। সুতরাং দুশ্চিন্তা ছেড়ে আনন্দ কর।

আমার বন্ধুটি কিন্তু সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। সে এবার মাংস দিয়ে বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার রান্না করতে লাগল এবং সেগুলো সুন্দর করে পরিবেশন করতে লাগল। ভোজনের স্থান হিসেবে আর সেই নদীর পাড় নয়, একেবারে চেয়ার-টেবিলসহ স্টেট হাউজের ডাইনিং হল। ওখানকার প্রধান পাচকের সাথে যোগসাজসে বন্ধুটি এ ব্যবস্থা করেছিল।

এই টোপে কাজ হলো। পাউরুটির প্রতি আমার অনীহা দূর হলো, ছাগলের প্রতি অনুকম্পার অবসান হলো, আর আমি মাংসের খাবারের ভক্ত হয়ে উঠলাম। প্রায় এক বছর ধরে এভাবে চলল। কিন্তু আধা ডজনের বেশি ভোজ উপভোগ করতে পারিনি। কারণ স্টেট হাউজ প্রতিদিন খালি পাওয়া যেত না, আর ঘন ঘন ব্যয়বহুল রুচিকর মাংসের খাবার রান্না করার আর্থিক অসুবিধাও ছিল। এ সংস্কারের জন্য আমার কোনো ব্যয় হয়নি। আমার বন্ধুকেই প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে হয়েছে। সে কোথা হতে টাকা যোগাড় করত তা আমি জানি না। টাকার ব্যবস্থা সেই করত, কারণ তার লক্ষ্য ছিল আমাকে সে মাংসভোজী করেই ছাড়বে। তথাপি তার অর্থের সংস্থান ফুরিয়ে এলো, আর এরকম ভোজের আয়োজনও ক্রমশ দুর্লভ হয়ে উঠল।

যখনই এরকম গোপন ভোজের মওকা মিলত, বাড়িতে খাওয়ার প্রয়োজন হতো না। স্বভাবতই মা জিজ্ঞেস করতেন কেন আমি খেতে চাচ্ছি না। আমি

www.pathagar.com

বলতাম, "আজ আমার খিদে নেই, হজমের গোলমাল হয়েছে।" এরকম ছলনার আশ্রয় নিতাম, কিন্তু বিবেকের দংশন আমাকে ছাড়ত না। জানতাম আমি মিথ্যা বলছি, তাও আমার মায়ের কাছে। এটাও জানতাম যে যদি আমার বাবা-মা জানতে পারেন যে আমি মাংসভোজী হয়ে গিয়েছি, তাহলে তাঁরা গভীর দুঃখ পাবেন। এ চিন্তা আমার হৃদয়কে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল।

সুতরাং আমি নিজেকে বললাম, "যদিও মাংস খাওয়া অত্যাবশ্যক এবং সারা দেশে খাদ্য সংস্কার জরুরি, তথাপি বাবা-মায়ের কাছে মিথ্যা বলার চেয়ে মাংস না খাওয়া বরং ভালো। সুতরাং তাঁদের জীবনকালে মাংস খাওয়ার প্রশ্নই নেই। যখন তাঁরা ইহধামে থাকবেন না এবং আমি স্বাধীনতা পাব, তখন আমি খোলাখুলিভাবে মাংস খাব। কিন্তু সেই সময় না আসা পর্যন্ত এ থেকে বিরত থাকব।"

আমার এ সিদ্ধান্ত বন্ধুকে জানিয়ে দিলাম এবং আর কখনো মাংস খাওয়াতে ফিরে যাইনি। আমার বাবা-মা কখনো জানতে পারেননি যে তাঁদের দুটি ছেলে মাংসভোজী হয়ে গিয়েছিল। বাবা-মায়ের সাথে মিথ্যা না বলার সদিচ্ছা থেকে আমি মাংস খাওয়া ছাড়লাম, কিন্তু বন্ধুর সঙ্গ ছাড়লাম না। তাকে সুপথে ফিরিয়ে আনার জন্য আমার সকল উদ্যম আমার নিজের জন্য যে মর্মান্তিক হয়েছিল সে সম্পর্কে আমি মোটেই সচেতন ছিলাম না।

এই বন্ধুর সঙ্গ আমাকে স্ত্রীর প্রতি প্রায় অবিশ্বস্ত করে ফেলেছিল। কিন্তু অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছি। বন্ধুটি একবার আমাকে গণিকালয়ে নিয়ে গেল। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে সে আমাকে ভেতরে পাঠাল। এটা ছিল সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত। বিল আগেই পরিশোধ করা হয়েছিল। আমি পাপের গহ্বরে ঢুকে গেলাম, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর অসীম দয়ায় আমার নিজের হাত থেকেই আমায় রক্ষা করলেন। পাপের গহ্বরে ঢুকে আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। আমি মহিলার বিছানায় তার পাশে বসলাম, কিন্তু কোনো কথা বলতে পারলাম না। সে আমার ব্যবহারে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল এবং গালি-গালাজ ও অপমান করে আমাকে ঘর থেকে বের করে দিল। অনুভব করলাম, আমার পৌরুষ যেন আহত হয়েছে এবং লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম আমাকে রক্ষা করার জন্য। আমার জীবনে এরকম আরো চারটি ঘটনার কথা মনে পড়ে, যেসব ঘটনায় আমার নিজের চেষ্টার চেয়ে ভাগ্যই আমাকে বাঁচিয়েছিল। কঠোর নৈতিকতার বিচারে এসব ঘটনা অবশ্যই নৈতিক স্খলন। এগুলোর পিছনে ছিল কাম চরিতার্থ করার ইচ্ছে, যা ঐ কাজ করে ফেলার সমতুল্য। কিন্তু সাধারণ বিচারে যে ব্যক্তি দৈহিকভাবে পাপ কাজে লিপ্ত হয়নি, তাকে পাপমুক্ত বলে ধরে নেয়া হয়। আর সে অর্থেই আমি পাপমুক্ত। কিছু কিছু ঘটনা আছে যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেন দৈব আশীর্বাদ, যে পরিত্রাণ পায় তার জন্য এবং তার সহচরদের জন্যও। সত্য চেতনা ফিরে পাওয়ার সাথে সাথেই মানুষ তার পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের দয়ার প্রতি ধন্যবাদ জানায়। আমরা জানি, মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন, প্রায়ই সে প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে। আমরা এও জানি

www.pathagar.com

ঈশ্বরের ইচ্ছা মানুষকে তার নিজ কর্ম থেকে রক্ষা করে। এগুলো কিভাবে ঘটে, মানুষ কতটা স্বাধীন, আর কতটা পরিস্থিতির শিকার, স্বাধীন ইচ্ছে কতটা কার্যকর এবং ভাগ্য কখন দৃশ্যপটে প্রবেশ করে—এসবই রহস্যময় এবং তা রহস্যাবৃতই থাকবে।

এবারে মূল কাহিনীতে ফিরে আসি। এতসব ঘটনাও বন্ধুটির সঙ্গদোষ ও তার কুকীর্তির ব্যাপারে আমার চোখ খুলে দেয়নি। সুতরাং তার অনেক অপ্রত্যাশিত দোষ চাক্ষুষ না দেখা পর্যন্ত আমার কপালে আরো অনেক দুর্ভোগ জমা ছিল। কিন্তু বর্ণনার ধারাবাহিকতায় সেগুলো পরে আসবে।

একটা বিষয় অবশ্য আমাকে এখনই বলতে হবে, কারণ তা ঐ একই সময়ের ঘটনা। নিঃসন্দেহে আমার এই বন্ধুর সঙ্গ ছিল স্ত্রীর সাথে আমার মতবিরোধের অন্যতম কারণ। স্বামী হিসেবে আমি ছিলাম নিবেদিতপ্রাণ ও ঈর্ষাকাতর। আর আমার বন্ধুটি স্ত্রীর সম্পর্কে আমার সন্দেহের আগুনে ঘৃতাহুতি দিত। আমি কখনো তার সত্যনিষ্ঠা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলাম না। তার কথার ওপর ভিত্তি করে স্ত্রীর প্রতি অন্যায় আচরণ করে যে দোষ আমি করেছি, তার জন্য নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারিনি। একজন হিন্দু স্ত্রীই কেবল এতটা কষ্ট সহ্য করতে পারে, আর এজন্য আমি স্ত্রী জাতিকে ধৈর্যের প্রতিমূর্তি মনে করি। একজন চাকরকে অন্যায়ভাবে সন্দেহ করলে সে চাকরী ছেড়ে দিতে পারে, একই কারণে পুত্র পিতার গৃহ ত্যাগ করতে পারে, আর একজন বন্ধু পারে বন্ধুত্বের ইতি টানতে। স্ত্রী যদি তার স্বামীকে সন্দেহ করে, তাহলে সে নীরব থাকবে। কিন্তু স্বামী যদি তাকে সন্দেহ করে তাহলে তার সর্বনাশ। তখন সে কোথায় যাবে? একজন হিন্দু স্ত্রী আদালতে তালাক চাইতে পারে না, তার পক্ষে কোনো আইনী প্রতিকার নেই। আমার স্ত্রীকে সেই ভয়াবহ অবস্থায় ঠেলে দেয়ার কথা আমি কখনো ভুলতে পারি না, আর নিজেকে ক্ষমাও করতে পারি না।

অহিংস নীতি পূর্ণাঙ্গরূপে বুঝতে পারার পরেই কেবল সন্দেহের বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটন সম্ভব হয়েছিল। তখন আমি ব্রহ্মচর্যের মহিমাও দেখতে পেয়েছিলাম এবং বুঝতে পেরেছিলাম যে স্ত্রী কেবল স্বামীর ক্রীতদাসী নয়, বরং তার সঙ্গী, সাহায্যকারী, তার আনন্দ-বেদনার সমান অংশীদার, নিজের পথ বেছে নিতে সেও স্বামীর মতোই স্বাধীন। যখনই আমি ঐসব সন্দেহের দিনগুলোর কথা ভাবি, আমার ভ্রান্তি আর নিষ্ঠুরতার প্রতি ঘৃণায় আমার মন ভরে যায় এবং বন্ধুর প্রতি অন্ধ আসক্তির জন্য আমি অনুশোচনায় দগ্ধ হই।

আট
চুরি ও প্রায়শ্চিত্ত

মাংস ভোজন ও তার পূর্ববর্তী সময়ের আরো কিছু ব্যর্থতার কথা বলব যার সময়কাল আমার বিয়ের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে।

এক আত্মীয় ও আমার ধূমপানের ঝোঁক চাপল। ধূমপানের মধ্যে ভালো কিছু ছিল, অথবা সিগারেটের সুগন্ধ আমাদেরকে পাগল করে তুলেছিল, তা নয়। মুখ

www.pathagar.com

থেকে মেঘের মতো ধোঁয়া বেরুচ্ছে—এটা কল্পনা করতেই এক ধরনের আনন্দ পেতাম। আমার কাকার এ অভ্যেসটা ছিল। আমরা যখন তাঁকে ধূমপান করতে দেখতাম, ভাবতাম তাঁকে অনুকরণ করা উচিত। কিন্তু আমাদের হাতে টাকা ছিল না। সুতরাং কাকার ফেলে দেয়া সিগারেটের পোড়া অংশগুলো আমরা চুরি করতে লাগলাম।

সিগারেটের পোড়া অংশ অবশ্য সবসময় পাওয়া যেত না এবং তা থেকে বেশি ধোঁয়াও বের হতো না। সুতরাং আমরা চাকরের পকেট থেকে খুচরো পয়সা চুরি করতে লাগলাম দেশী সিগারেট কেনার জন্য। কিন্তু ওগুলো কোথায় রাখব তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। গুরুজনদের সামনে তো ধূমপান করতে পারব না। এভাবে চুরির পয়সায় কয়েক সপ্তাহ কোনো রকমে চলল। ইতিমধ্যে জানতে পারলাম যে ছিদ্রযুক্ত এক প্রকার গাছের কাণ্ড আছে যা দিয়ে সিগারেটের মতো ধূমপান করা যায়। আমরা সেগুলো সংগ্রহ করে ধূমপান করতে লাগলাম। কিন্তু এভাবে ধূমপান করে আমরা মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। আমাদের স্বাধীনতার অভাববোধ তীব্র হতে থাকল। গুরুজনদের অনুমতি ছাড়া কিছু করতে পারব না—এটা আমাদের কাছে অসহ্য বোধ হতে লাগল। জীবনের প্রতি চরম ঘৃণায় অবশেষে আমরা আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু আত্মহত্যা কিভাবে করা যায়? বিষ কোথায় পাওয়া যাবে? আমরা শুনেছি ধুতরা বীজ বিষ হিসেবে বেশ কার্যকর। এই বীজের সন্ধানে জঙ্গলে চলে গেলাম এবং পেয়েও গেলাম। বিকেল বেলাটাকে শুভক্ষণ মনে হলো। আমরা কেদারজীর মন্দিরে গেলাম, মন্দিরের প্রদীপে ঘি দিলাম, দেব দর্শন করলাম এবং একটা নির্জন স্থান খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা সাহস হারিয়ে ফেললাম। যদি আমরা তৎক্ষণাৎ মারা না যাই তাহলে কি হবে? আর নিজেদেরকে মেরেই বা কি লাভ হবে? তার চেয়ে কম স্বাধীনতা নিয়েই বেঁচে থাকি না কেন? কিন্তু এসব চিন্তা সত্ত্বেও আমরা দু' তিনটি করে বীজ খেয়ে ফেললাম। এর বেশি খেতে সাহস পেলাম না। মৃত্যুর ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হয়ে আমরা মন স্থির করতে রামজী মন্দিরে গেলাম এবং মৃত্যু চিন্তা ত্যাগ করলাম। বুঝতে পারলাম আত্মহত্যার চিন্তা করা যত সহজ, কাজটা করা তত সহজ নয়। সেই তখন থেকে কেউ আত্মহত্যার হুমকি দিয়েছে শুনলে আমার ওপর তার কোনো প্রভাব পড়ত না।

আত্মহত্যার চিন্তা থেকে অবশেষে আমরা দু'জনেই সিগারেটের মোথা দিয়ে ধূমপান ছেড়ে দিলাম এবং সেই সাথে ধূমপানের জন্য চাকরের পকেট থেকে পয়সা চুরিও বন্ধ হলো।

বড় হবার পর থেকে আমি আর কখনো ধূমপান করিনি এবং ধূমপানকে সর্বদা বর্বর, নোংরা ও ক্ষতিকর অভ্যাস বলে মনে করেছি। আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না কেন দুনিয়া জুড়ে ধূমপানের জোয়ার বইছে। রেলগাড়িতে ভ্রমণকালে লোকে ধূমপান করছে এরকম কামরায় আমি ভ্রমণ করতে পারি না, দম বন্ধ হয়ে আসে। এর কিছুদিন পরে আমি আরো একটা চুরি করেছিলাম যা আগেরটার চেয়ে

www.pathagar.com

অনেক বেশি দোষণীয় ছিল। আমি যখন পয়সা চুরি করেছিলাম তখন আমার বয়স ছিল তের বছর বা আরো কম। অন্য চুরিটা করেছিলাম পনের বছর বয়সে। এবারে আমার মাংসভোজী দাদার বাজুবন্ধ থেকে এক টুকরো সোনা চুরি করেছিলাম। দাদা পঁচিশ টাকার মতো ঋণ করেছিলেন। তার হাতে একটি খাঁটি সোনার বাজুবন্ধ ছিল যা থেকে ছোট একটি অংশ খুলে নেয়া কঠিন ছিল না।

কাজটা ভালোভাবেই হয়ে গেল এবং ঋণ শোধ হলো। কিন্তু এ কাজের জন্য আমার বিবেকের চাপ ছিল অসহনীয়। প্রতিজ্ঞা করলাম, আর কখনো চুরি করব না। মন স্থির করে ফেললাম বাবার কাছে চুরির স্বীকারোক্তি করব। কিন্তু বলতে সাহস হলো না। বাবার মারের ভয়ে বলিনি তা নয়। না, বাবা আমাদের কখনো মারেননি। ব্যাপারটা শুনলে তিনি যে ব্যথা পাবেন তা নিয়েই আমার ভয় হচ্ছিল। ভেবে দেখলাম, ঝুঁকিটা নিতেই হবে। স্বীকারোক্তি না করলে আমার দোষ স্খলন হবে না।

অবশেষে আমি স্বীকারোক্তিটা লিখে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলাম। এটা বাবাকে দেব এবং তার ক্ষমা চেয়ে নেব। একটা চিরকুটে ঘটনাটা লিখলাম এবং নিজ হাতে বাবাকে দিলাম। আমার লেখায় শুধু নিজের দোষ স্বীকার নয়, আমাকে শাস্তি দেয়ার এবং আমার অন্যায়ের জন্য তিনি যেন নিজেকে কষ্ট না দেন তার জন্যও অনুরোধ করলাম। ভবিষ্যতে আর কখনো চুরি করব না তার অঙ্গীকারও করলাম। কাঁপা কাঁপা হাতে আমি স্বীকারোক্তিটা বাবার হাতে দিলাম। তিনি তখন ফিষ্টুলায় আক্রান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। বিছানাটা ছিল শক্ত কাঠের তক্তার। আমি চিরকুটটি তার হাতে দিয়ে বিছানার অপর দিকে বসলাম। তিনি ওটা পড়লেন। তাঁর গণ্ড বেয়ে মুক্তার মতো অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ল এবং চিরকুটটি ভিজে গেল। কয়েক মুহূর্ত তিনি চোখ বন্ধ করে চিন্তা করলেন এবং চিরকুটটি ছিঁড়ে ফেললেন। এটা পড়ার জন্য তিনি উঠে বসেছিলেন। পড়া শেষে আবার শুয়ে পড়লেন। আমিও কাঁদলাম। আমি তাঁর যন্ত্রণা অনুভব করতে পারছিলাম। আমি যদি চিত্রকর হতাম তাহলে আজো আমি ঐ দিনের ঘটনার জীবন্ত ছবি এঁকে ফেলতাম। ঘটনাটি আমার মনে এতই জীবন্ত হয়ে আছে। ভালোবাসার অশ্রুর ঐ মুক্তা বিন্দুগুলো আমার হৃদয়কে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিল। আমার পাপকে ধুয়ে নিয়ে গেল। এরকম অভিজ্ঞতা যার হয়েছে সেই কেবল জানে এর মর্ম কি। ধর্মীয় গীতিতে যেমন আছে—

সেই তো কেবল জানে, বিঁধেছে যারে ভালোবাসার বাণে।

আমার জন্য এটা ছিল অহিংস নীতির বাস্তব পাঠ। ঐ সময়ে এর মধ্যে বাবার ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু দেখিনি। কিন্তু আজ আমি জানি যে এটাই খাঁটি অহিংসা। এ অহিংসা যাকেই আলিঙ্গন করে, স্পর্শ করে, সেই বদলে যায়। এর ক্ষমতার কোনো সীমা নেই।

এ ধরনের স্বর্গীয় ক্ষমাশীলতা আমার বাবার সহজাত ছিল না। আমি ভেবেছিলাম তিনি রেগে যাবেন, কটু কথা বলবেন এবং কপাল চাপড়াবেন।

www.pathagar.com

কিন্তু তিনি আশ্চর্য রকম শান্ত ছিলেন। আমার বিশ্বাস আমার অকপট স্বীকারোক্তির ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যতে পাপ না করার প্রতিশ্রুতিসহ গুরুজনের নিকট অতীত পাপের স্বীকারোক্তি করলে সেটাই সবচেয়ে শুদ্ধ অনুশোচনা। আমি জানি আমার স্বীকারোক্তির ফলে বাবা আমার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন এবং আমার প্রতি তাঁর স্নেহ অপরিমিতভাবে বেড়ে গিয়েছিল।

নয়

বাবার মৃত্যু ও আমার দ্বিগুণ লজ্জা

আমার বয়স তখন ষোল বছর। বাবা তখন ফিষ্টুলায় আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী। গৃহ পরিচারিকাতুল্য আমার বৃদ্ধা মা আর আমি তাঁর প্রধান সহচর। আমি নার্সের মতো দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলাম। যার মধ্যে ছিল ক্ষত ড্রেসিং করা, ওষুধ খাওয়ানো, ওষুধ তৈরি করে দেয়া ইত্যাদি। প্রতি রাতেই আমি তাঁর পা মালিশ করে দিতাম। কেবল তিনি বললে অথবা ঘুমিয়ে পড়লে তারপর আমি ঘুমাতে যেতাম। এই সেবা করতে আমি ভালোবাসতাম। এতে কোনো অবহেলা করেছি বলে মনে পড়ে না। দৈনন্দিন কাজের পরে যতটা সময় পেতাম তা ব্যয় হতো স্কুলে যাওয়া আর বাবার সেবা করায়। তিনি অনুমতি দিলে অথবা ভালো বোধ করলেই কেবল বিকেলে হাঁটতে যেতাম।

এ সময়ে আমার স্ত্রী ছিল সন্তান সম্ভবা। ঐ পরিস্থিতিতে যা ছিল আমার জন্য দ্বিগুণ লজ্জার বিষয়। কারণ, প্রথমত ঐ সময়ে আমার উচিত ছিল সংযমী হওয়া, যেহেতু আমি তখনো ছাত্র। দ্বিতীয়ত আমার দৈহিক কামনা আমার কর্তব্য তথা বাবার প্রতি আমার আনুগত্যকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। প্রতি রাতেই আমার দু'হাত যখন বাবার পা মালিশ করতে ব্যস্ত, তখন মন পড়ে থাকত শোবার ঘরে—তাও আবার এমন একটা সময়ে যখন ধর্ম, চিকিৎসা শাস্ত্র ও সাধারণ জ্ঞানে স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ। বাবার সেবাকার্য থেকে মুক্তি পেয়ে খুশী হতাম, তাঁকে প্রণাম জানিয়ে সোজা শোবার ঘরে চলে যেতাম।

এ সময়ে বাবার অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছিল। আয়ুর্বেদ চিকিৎসকগণ সকল প্রকার মলম, হেকিমরা বেদনানাশক পট্টি আর স্থানীয় হাতুড়ে কবিরাজরা টোটকা চিকিৎসা কোনোটাই বাদ রাখলেন না। একজন ইংরেজ সার্জনও তার বিদ্যা কাজে লাগালেন। সর্বশেষ ও একমাত্র চিকিৎসা হিসেবে তিনি সার্জিক্যাল অপারেশনের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু পারিবারিক চিকিৎসক এতে বাধা দিলেন। এরকম বৃদ্ধ বয়সে তিনি অপারেশনের চিন্তা নাকচ করে দিলেন। পারিবারিক চিকিৎসকটি ছিলেন দক্ষ এবং সুপরিচিত। তাঁর মতই বহাল রইল। অপারেশন হলো না এবং এর জন্য কেনা ওষুধগুলো পড়ে রইল। আমার ধারণা, অপারেশন করতে দেয়া হলে তাড়াতাড়িই ঘা শুকিয়ে যেত। অপারেশন যিনি করবেন তিনিও

www.pathagar.com

ঐ সময়ে বোম্বের বিখ্যাত সার্জন ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছে ছিল অন্য রকম। মরণকালে নিদান কোথায়? বাবা বোম্বে থেকে অপারেশনের জন্য সংগৃহীত সকল যোগাড়পাতিসহ ফিরে এলেন। তিনি বাঁচার আশা ছেড়ে দিলেন। দুর্বল থেকে আরো দুর্বল হয়ে পড়লেন। অবশেষে তাঁকে বিছানাতেই মল-মূত্র ত্যাগ করতে বলা হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্তও তিনি এতে রাজি হননি। সর্বদাই বিছানা ছেড়ে উঠে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করেছেন। বাহ্যিক পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে বৈষ্ণব নীতি ছিল এ রকমই অলঙ্ঘনীয়।

এরূপ পবিত্রতা নিঃসন্দেহে আবশ্যক, কিন্তু পশ্চিমা চিকিৎসা শাস্ত্র আমাদেরকে শিখিয়েছে যে, কঠোরভাবে পবিত্রতা বজায় রেখেই স্নানসহ সকল প্রাকৃতিক কর্ম বিছানাতেই সম্পন্ন করা যায়। এতে রোগীর বিন্দুমাত্র আরামের ব্যাঘাত হয় না, বিছানাও থাকে দাগহীন, পরিষ্কার। এরকম পরিচ্ছন্নতা আমার মতে বৈষ্ণব নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু ঐ সময়ে বাবার বিছানা ছেড়ে যাবার জেদ আমাকে অবাক করেছে এবং তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ বেড়ে গেছে।

সেই ভয়াবহ রাত এলো। কাকা তখন রাজকোটে। আমার আবছা মনে আছে, বাবার অবস্থা খারাপ হচ্ছে শুনে তিনি রাজকোটে এসেছিলেন। দু'ভাই একে অন্যকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। সারাদিন কাকা বাবার বিছানার পাশে বসে থাকতেন এবং আমাদের সকলকে বিছানায় পাঠিয়ে তিনি নিজে বাবার পাশে ঘুমাতেন। আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি এটাই হবে শেষ রাত। বিপদটা ছিল সেখানেই। রাত তখন সাড়ে দশ কি এগারোটা। আমি বাবার পা মালিশ করছি। কাকা আমাকে অব্যাহতি দিলেন। আমি খুশী হয়ে সোজা বেডরুমে চলে গেলাম। আমার স্ত্রী তখন গভীর ঘুমে অচেতন। আমি জেগে থাকা অবস্থায় সে কি করে ঘুমায়? আমি তাকে জাগালাম। পাঁচ/ছয় মিনিট পরেই চাকর এসে দরজায় ধাক্কা দিল। আমি শংকিত হলাম। সে বলল উঠুন, বাবার অসুখ খুব বেশি। বাবা যে খুব অসুস্থ তাতো আমি জানিই এবং এ মুহূর্তে "খুব অসুস্থ" কথাটার অর্থ কি তাও অনুমান করলাম। বিছানা থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম।

"কি ব্যাপার, বল কি হয়েছে?"

"বাবা নেই।"

সুতরাং সব শেষ। হাতের আঙ্গুল মোচড়ানো ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিল না। গভীর লজ্জা আর হতাশায় ডুবে গেলাম। বাবার ঘরে দৌড়ে গেলাম। পাশবিক আবেগ আমাকে অন্ধ করে না দিলে বাবার শেষ মুহূর্তে তাঁর কাছে না থাকার যন্ত্রণা আমাকে পোহাতে হতো না। আমার উচিত ছিল তাঁকে মালিশ করে যাওয়া এবং ভালো হতো যদি তিনি আমার বাহুতে মাথা রেখে মারা যেতেন। এ সৌভাগ্যটা আমার কাকা পেলেন। তিনি তাঁর দাদার প্রতি এতটাই নিবেদিত প্রাণ ছিলেন যে সর্বশেষ সম্মানটা তিনিই পেলেন। বাবা তাঁর আসন্ন মৃত্যুর কথা জানতে পেরেছিলেন। তিনি ইশারায় কাগজ-কলম চেয়েছিলেন। লিখেছিলেন,

www.pathagar.com

"শেষকৃত্যের প্রস্তুতি নাও।" বাহু থেকে মন্ত্রপুত কবচ আর গলা থেকে সোনা ও তুলসীর মালা খুলে ফেললেন। পর মুহূর্তেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করলেন।

পূর্বের এক অধ্যায়ে আমার যে লজ্জার কথা বলেছি এটা সেই লজ্জা, বাবার মৃত্যুকালেও আমার পাশবিক কামনার লজ্জা। ঐ সময়ে আমার কর্তব্য ছিল জেগে থেকে বাবার সেবা করা। আমার এ কলঙ্ক কখনো মুছে যাবে না বা ভুলতে পারব না। যদিও বাবার জন্য আমার ভক্তির সীমা ছিল না এবং এর জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু যে মুহূর্তে এর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি অমার্জনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছি। কারণ আমি তখন দৈহিক কামনায় ডুবে ছিলাম। সুতরাং আমি নিজেকে সর্বদা কামুক কিন্তু বিশ্বস্ত স্বামী বলে মনে করেছি। কামনার শৃঙ্খলমুক্ত হতে আমার দীর্ঘ সময় লেগেছে এবং বহু পরীক্ষার পর আমি একে অতিক্রম করেছি। আমার দ্বিগুণ লজ্জার এ অধ্যায় শেষ করার আগে উল্লেখ করতে চাই যে, আমার স্ত্রী যে সন্তান প্রসব করল তা তিন কি চার দিন বেঁচে ছিল। এর চেয়ে ভালো আর কিই বা হতে পারত। সুতরাং আমার দৃষ্টান্ত থেকে বিবাহিত ব্যক্তিরা শিক্ষা নিতে পারেন।

দশ
ধর্মের প্রতি ক্ষণিক দৃষ্টিপাত

ছয় কি সাত বছর বয়স থেকে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত আমি স্কুলে পড়েছি। সেখানে ধর্ম ছাড়া সব বিষয়ই পড়ানো হয়েছে। আমি স্বীকার করছি যে শিক্ষকরা বিনা চেষ্টায় যা দিতে পারতেন তার সবটাই আমি নিতে পারিনি। তবে আমার চার পাশ থেকে যেখানে যেটুকু জ্ঞান পেয়েছি তা আহরণ করেছি। "ধর্ম" কথাটা আমি বৃহত্তর অর্থে ব্যবহার করছি, যার অর্থ দাঁড়ায় আত্ম-উপলব্ধি বা নিজেকে জানা। বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম হওয়ায় আমাকে প্রায়ই হাভেলিতে যেতে হতো। কিন্তু এর প্রতি আমার তেমন আকর্ষণ ছিল না। আমি এর চাকচিক্য ও জাঁকজমক পছন্দ করতাম না। সেখানে অনৈতিক কাজ হয় বলেও গুজব শুনেছি এবং এর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি। কাজেই হাভেলিতে গেলেও তাতে আমার কোনো লাভ হয়নি।

কিন্তু হাভেলিতে যা পাইনি আমার দাসীর কাছ থেকে তা পেয়েছি। সে ছিল আমাদের পরিবারের বৃদ্ধা দাসী, যার স্নেহের কথা আজো আমার মনে পড়ে। আগেই বলেছি আমার ভেতর ভূত প্রেতের ভয় ছিল। রম্ভা নামের এই দাসী ভূতের ভয়ের প্রতিকার স্বরূপ আমাকে রাম নাম জপ করার পরামর্শ দিয়েছিল। তার পরামর্শের চেয়ে তার নিজের ওপরই আমার বিশ্বাস ছিল বেশি। আর তাই ঐ অল্প বয়সে ভূতের ভয় সারাতে আমি রাম নাম জপতে শুরু করলাম। এ অবস্থা স্বল্পস্থায়ী ছিল, কিন্তু বাল্য জীবনে যে ভালোর বীজ রোপিত হলো তা বৃথা যায়নি। আমার মনে হয় ঐ ভালো মহিলা যে বীজ বপন করেছিল তার কারণেই রাম নাম আজ আমার কাছে একটা অব্যর্থ দাওয়াই। প্রায় একই সময়ে রামায়ণ ভক্ত আমার

www.pathagar.com

এক কাকাতো ভাই আমার ও আমার দ্বিতীয় ভাই এর জন্য "রামরক্ষা" শেখার ব্যবস্থা করল। আমরা তা মুখস্ত করে ফেললাম এবং প্রতিদিন সকালে স্নানের পরে তা নিয়ম করে আবৃত্তি করতাম। যতদিন পোরবন্দরে ছিলাম ততদিন অভ্যাসটা চালু ছিল। রাজকোট পৌছার সাথে সাথেই তা ভুলে গিয়েছিলাম। কারণ ওতে আমার তেমন বিশ্বাস ছিল না। ওটা আবৃত্তি করার একটা কারণ ছিল সবাইকে দেখানো যে আমি রামরক্ষা সঠিক উচ্চারণে আবৃত্তি করতে পারি।

তবে বাবার সামনে বসে রামায়ণ পড়া আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। বাবার অসুস্থতার সময়ে তিনি কিছুদিন পোরবন্দরে ছিলেন। তখন প্রতিদিন বিকেলে তিনি রামায়ণ পাঠ শুনতেন। যিনি পাঠ করে শুনাতেন তিনি ছিলেন বিখ্যাত রামভক্ত বিল্বেশ্বরের লাধা মহারাজ। তাঁর সম্পর্কে কথিত আছে যে তিনি নিজের কুষ্ঠরোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেছিলেন কোনো ওষুধের দ্বারা নয়, আক্রান্ত স্থানে বিল্বেশ্বর মন্দিরে মহাদেবের বিগ্রহে নিবেদিত বিল্বপত্র লাগিয়ে এবং নিয়মিত রাম নাম জপ করে। তাঁর বিশ্বাসই তাঁকে পূর্ণতা দিয়েছিল বলে শোনা যায়। এটা সত্য হতে পারে, নাও পারে। যে কোন ভাবেই হোক আমরা গল্পটা বিশ্বাস করেছিলাম। তবে এটা সত্য যে যখন লাধা মহারাজ রামায়ণ পড়া শুরু করেছিলেন তখন তাঁর শরীর থেকে কুষ্ঠ রোগ সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়। তাঁর সুরেলা কণ্ঠ ছিল। তিনি দুই ও চার লাইনের শ্লোকগুলো সুর করে পড়তেন এবং ব্যাখ্যা করতেন। ব্যাখ্যা করার সময় জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মধ্যে আত্মহারা হয়ে যেতেন এবং সেইসাথে শ্রোতাদেরকেও ভাব সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যেতেন। আমার বয়স তখন তের বছর হবে, কিন্তু বেশ মনে আছে, তাঁর রামায়ণ পাঠ আমাকে পরমানন্দিত করত। সেই থেকে রামায়ণের প্রতি আমার গভীর ভক্তির ভিত গড়ে উঠেছিল। ভক্তিমূলক সকল সাহিত্যের মধ্যে আজো আমি তুলসী দাসের রামায়ণকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করি।

অল্প কয়েক মাস পরেই আমরা রাজকোট এলাম। এখানে কোনো রামায়ণ পাঠ ছিল না। প্রতি একাদশীতে অবশ্য ভগবত গীতা পড়া হতো। আমি কখনো কখনো সে পাঠ শুনেছি। কিন্তু পাঠক ছিলেন অনুপ্রেরণাহীন। এখন আমি বুঝি যে ভগবত গীতা এমন একটি গ্রন্থ যা ধর্মীয় উদ্দীপনা জাগাতে পারে। গুজরাটী ভাষায় গ্রন্থটি আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। কিন্তু আমি যখন একুশ দিনের উপোষকালে পণ্ডিত মদন মোহন মালবিয়ার মূল পাঠ শুনলাম তখন মনে হলো তাঁর মতো ভক্তের গীতাপাঠ যদি বাল্যকালে শুনতাম তাহলে অল্প বয়স হতেই এর প্রতি আমার ভক্তি জন্মাত। বাল্য বয়সে মনের ওপর যে ছাপ পড়ে তা স্বভাবের গভীরে শেকড় গাড়ে। আমার আজীবন দুঃখ যে ঐ বয়সে এ ধরনের আরো গ্রন্থের পাঠ শোনার সুযোগ হয়নি।

রাজকোটে থাকাকালে হিন্দু ধর্মের সকল শাখা ও এর সহযোগী অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে আমার মধ্যে সহনশীলতার ভাব গড়ে উঠল। আমার বাবা-মা হাভেলিতে যাওয়া ছাড়াও শিব ও রামের মন্দিরে যেতেন এবং আমাদের মতো ছোটদেরকে

www.pathagar.com

সাথে করে নিয়ে যেতেন অথবা কারো সাথে পাঠাতেন। জৈন সাধুরা প্রায়ই বাবার কাছে আসতেন, এমনকি তাঁরা নিয়ম ভেঙে আমাদের সাথে অর্থাৎ অজৈনদের ঘরে খাবারও খেয়েছেন। তাঁরা বাবার সাথে ধর্মীয় ও পার্থিব বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন।

এগুলো ছাড়াও বাবার মুসলমান ও পার্সী বন্ধু ছিলেন যাঁরা বাবার সাথে তাঁদের ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করতেন এবং তিনি সর্বদা সম্মান ও আগ্রহ নিয়ে তাঁদের কথা শুনতেন। বাবার সেবক হিসেবে এসব আলোচনায় আমার হাজির থাকার সুযোগ হয়েছে। এসব কিছু সম্মিলিতভাবে সকল ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আমার সহনশীলতা সৃষ্টি করেছে।

তবে খৃষ্টধর্ম ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। এর প্রতি আমার এক ধরনের অনীহা সৃষ্টি হয়েছিল। তার পেছনে কারণও ছিল। সেকালে খৃষ্টান মিশনারীগণ হাই স্কুলের নিকটে এক কোনায় দাঁড়িয়ে থেকে ছাত্রদের ধরে হিন্দুধর্ম ও তাদের দেবতাদের বিরুদ্ধে গালি বর্ষণ করত। এটা আমার সহ্য হতো না। আমি একবার মাত্র দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনেছি এবং সেটাই পুনরায় তাদের কাছে না যাওয়ার কারণ হিসেবে যথেষ্ট। প্রায় একই সময়ে শুনলাম একজন বিখ্যাত হিন্দু খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। শহরে সবার মুখে মুখে রটে গেল যে ব্যাপটাইজ করার সময় তাকে মদ ও গোমাংস খেতে হয়েছিল, তার পোষাক বদল করতে হয়েছিল এবং তখন থেকে তাকে সাহেবী টুপিসহ ইউরোপীয়ান পোষাক পরতে হতো। এগুলো আমার স্নায়ু ভারাক্রান্ত করেছিল। ভাবলাম, যে ধর্ম মদ ও গোমাংস খেতে আর নিজস্ব পোষাক ছেড়ে বিদেশী পোষাক পরতে বাধ্য করে তাকে নিশ্চয়ই ধর্ম বলা যায় না। এটাও শুনেছি যে ঐ নব দীক্ষিত ব্যক্তি ইতিমধ্যে তার পূর্ব পুরুষের ধর্ম, আচার আচরণ ও দেশকে গালি দিতেও শুরু করেছে। এসব কিছু মিলে খৃষ্টধর্মের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা তৈরি হয়েছিল।

কিন্তু অন্যান্য ধর্মের প্রতি আমার সহনশীলতার অর্থ এই নয় যে আমি ভগবানে বিশ্বাস করতাম। এই সময়ে বাবার সংগ্রহ থেকে ঘটনাচক্রে আমি "মনুস্মৃতি" (হিন্দু আইন প্রণেতা মনুর আইন) বইখানা পড়ে ফেললাম। বিশ্ব সৃষ্টির কাহিনী এবং ঐ জাতীয় বিষয়গুলো আমাকে আকৃষ্ট করেনি, বরং নাস্তিকতার দিকে কিছুটা ঝোঁক তৈরি করেছিল।

আমার এক কাকাতো ভাই, যে এখনো জীবিত, তার জ্ঞানের প্রতি আমার অগাধ আস্থা ছিল। আমার সন্দেহের কথা তাঁকে বললাম, কিন্তু তিনি কোনো সমাধান দিতে পারলেন না। তিনি আমাকে এই বলে ফিরিয়ে দিলেন, "বড় হয়ে তুমি নিজেই এসব সন্দেহের অবসান করতে পারবে। এ বয়সে তোমার এসব প্রশ্ন তোলা উচিত নয়।" আমি চুপ করে গেলাম কিন্তু শান্তি পেলাম না। মনুস্মৃতি বইতে খাদ্য ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত অধ্যায়গুলোতে যা লেখা হয়েছে তা আমার কাছে প্রচলিত অভ্যাসের বিপরীত বলে মনে হলো। এগুলোর বিষয়ে আমার সন্দেহের কথা বলেও একই জবাব পেলাম। নিজেকে বোঝালাম, জ্ঞান

www.pathagar.com

বাড়লে এবং আরো পড়াশুনা করলে আমি নিজেই ভালো বুঝতে পারব। "মনুস্মৃতি" কিন্তু আমাকে কোনোভাবেই নাস্তিকতা শিক্ষা দেয়নি। আমি আমার মাংস খাওয়ার কাহিনী ইতিপূর্বে বলেছি। মনে হলো, মনুস্মৃতি তা সমর্থন করে। অনুভব করলাম যে সাপ, ছারপোকা ও এ জাতীয় প্রাণীহত্যা সম্পূর্ণ নৈতিক। মনে পড়ে, ঐ বয়সে ছারপোকা ও ঐ জাতীয় প্রাণী হত্যা করেছি নিজের কর্তব্য ভেবেই।

কিন্তু একটি বিশ্বাস আমার মনে শিকড় গাড়ল, তা হলো—নৈতিকতাই সকল বস্তুর মূল এবং সত্য হলো সকল নৈতিকতার সার কথা। সত্য হলো আমার একমাত্র লক্ষ্য। এ বিশ্বাস প্রতিদিন বাড়তে থাকল আর এর সংজ্ঞাও হতে থাকল ব্যাপকতর।

একটি শিক্ষামূলক গুজরাটী কবিতার কয়েকটি লাইন আমার হৃদয় মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এর নীতিকথা, মন্দের বিপরীতে ভালো কাজ করো—আমার জন্য পথ প্রদর্শক নীতিতে পরিণত হলো। এটা আমাকে এতই পেয়ে বসল যে এ নিয়ে আমি অগণিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলাম। আমার মতে সেই আশ্চর্য সুন্দর লাইনগুলো হলো—

> একপাত্র পানির বদলে দান কর পরিপূর্ণ আহার;
> সাদর সম্ভাষণের জবাবে সানন্দে নত কর শির;
> নগণ্য পয়সার বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা কর দান;
> মৃত্যু হতে বেঁচে গেলে, মুক্ত করে দাও তব প্রাণ।
> কথা ও কাজে গুণীজনে করেছেন প্রমাণ
> ছোট ছোট সেবার বিনিময়ে পাবে দশগুণ প্রতিদান।
> যাঁর কাছে সমগ্র মানব সত্তা এক, তিনিই মহান;
> তিনিই করেন ভালো দিয়ে মন্দের প্রতিদান।

এগার
ইংল্যান্ড যাত্রার প্রস্তুতি

১৮৮৭ সালে আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করলাম। এ পরীক্ষা তখন দুটি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হতো আহমেদাবাদ ও বোম্বেতে। দেশের দরিদ্রাবস্থার জন্য স্বাভাবিকভাবেই কাথিয়াওয়াড়ের ছাত্ররা নিকটবর্তী ও কম ব্যয়বহুল কেন্দ্র বেছে নিত। আমার পরিবারের দারিদ্র্যও আমাকে ঐরূপ কেন্দ্র বেছে নিতে বাধ্য করল। এটাই ছিল রাজকোট থেকে আহমেদাবাদে আমার প্রথম যাত্রা, তাও আবার সঙ্গীবিহীন। আমার গুরুজনেরা চাইলেন ম্যাট্রিকুলেশনের পরে আমি কলেজে লেখাপড়া চালিয়ে যাই। একটা কলেজ ছিল ভাবনগরে, আরেকটা বোম্বেতে। যেহেতু প্রথমটি ছিল কম ব্যয়বহুল, তাই আমি সেখানেই অর্থাৎ ভাবনগরের শ্যামলদাস কলেজে ভর্তি হলাম। ভর্তির পরে যেন সাঁতারে পড়ে গেলাম।

www.pathagar.com

সবকিছুই কঠিন মনে হলো। প্রফেসারদের লেকচার বুঝতেই পারছিলাম না, মজা পাওয়া তো দূরের কথা। এতে তাঁদের কোনো ত্রুটি ছিল না। কলেজের প্রফেসারগণ ছিলেন প্রথম সারির, বরং আমিই ছিলাম অপরিপক্ব। প্রথম টার্মের শেষে আমি বাড়ি ফিরলাম।

মাভজীদেব আমাদের পরিবারের একজন পুরনো বন্ধু ও পরামর্শদাতা। তিনি ছিলেন একজন চতুর ও বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ। বাবার মৃত্যুর পরেও তিনি আমাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। আমার ছুটির সময়ে তিনি আমাদের বাড়িতে এলেন। আমার মা ও দাদার সাথে কথা প্রসঙ্গে আমার লেখাপড়ার খোঁজ-খবর নিলেন। আমি শ্যামলদাস কলেজে পড়ছি জেনে তিনি বললেন, "সময় বদলে গেছে। সঠিক বিদ্যা শিক্ষা ছাড়া তোমরা কেউই তোমাদের বাবার গদির উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। বি. এ ডিগ্রী পেতে ওর আরো চার থেকে পাঁচ বছর লাগবে। এর পরও সে বড়জোর ষাট টাকা মাইনের চাকরীর যোগ্যতা অর্জন করবে, কিন্তু দেওয়ানের পদ পাবে না। আমার ছেলের মতো সে যদি আইন শাস্ত্র পড়ে, তাতে আরো বেশি সময় লাগবে এবং ততদিনে একদল আইনজীবী তৈরি হয়ে যাবে দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হবার আশায়। আমি বরং তাকে ইংল্যান্ড যাবার পরামর্শ দিচ্ছি। আমার পুত্র কেবলরাম বলেছে ব্যারিস্টার হওয়া খুব সোজা। তিন বছরের মধ্যেই সে ফিরে আসবে। আর খরচও চার থেকে পাঁচ হাজার টাকার বেশি হবে না। সদ্য বিলাত ফেরত অমুক ব্যারিস্টারের কথা ভেবে দ্যাখো। কি ঠাঁট-বাট তাঁর! চাইলেই সে দেওয়ানের পদ পেত। আমি জোর দিয়ে বলছি, মোহনদাসকে এবছরই বিলাতে পাঠাও। বিলাতে কেবলরামের অগণিত বন্ধু আছে। সে মোহনদাসের জন্য বন্ধুদের কাছে পরিচিতি পত্র দেবে এবং তার জন্য বিলেতে অবস্থান সহজ হবে।"

মাভজীদেবকে আমরা যোশীজী বলে ডাকতাম। তিনি আমাকে পূর্ণ আশ্বাস দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে কি তুমি এখানে পড়ার চাইতে বিলাতে যেতে চাও না?" আমার কাছে এর চাইতে আনন্দের আর কিছু ছিল না। কলেজে আমার কঠিন পড়াগুলো এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। সুতরাং আমি প্রস্তাবটি লুফে নিয়ে বললাম যত তাড়াতাড়ি আমাকে পাঠানো হয় ততই মঙ্গল। তাড়াতাড়ি পরীক্ষা পাশ করা সহজ নয়। আমাকে কি ডাক্তারী পড়তে পাঠানো যায় না? দাদা আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, "বাবা এটা পছন্দ করতেন না। তোমার কথা মনে রেখেই তিনি বলতেন আমাদের বৈষ্ণবদের মৃতদেহ কাটা-ছেঁড়া করা উচিত নয়। তাঁর ইচ্ছে ছিল তোমাকে আইন পড়ানোর।"

যোশীজী সায় দিয়ে বললেন, "গান্ধীজীর মতো আমি ডাক্তারী পড়ার বিরুদ্ধে নই। আমাদের শাস্ত্রও এর বিপক্ষে নয়। কিন্তু ডাক্তারী ডিগ্রী নিলে দেওয়ান হতে পারবে না। আমি চাই যে তুমি দেওয়ান হবে, অথবা সম্ভব হলে আরো ভালো কিছু। এ পন্থাতেই তুমি কেবল তোমাদের এত বড় সংসারের হাল ধরতে পারবে। সময় দ্রুত বদলে যাচ্ছে এবং দিন দিন কঠিন হচ্ছে। সুতরাং ব্যারিস্টার হওয়াটাই

www.pathagar.com

বুদ্ধিমানের কাজ।" মাকে তিনি বললেন, "এখন আমাকে যেতে হবে। যা বললাম তা ভেবে দেখার অনুরোধ করছি। এরপর আমি যখন আসব, আশা করি তখন ইংল্যান্ড যাত্রার প্রস্তুতির কথা শুনব। যে কোনো ব্যাপারে আমার সাহায্য দরকার হলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন।"

যোশীজী চলে গেলেন। আর আমি আকাশ কুসুম কল্পনা করতে থাকলাম।

আমার দাদা বিষয়টি নিয়ে মনে মনে অনেক ভাবলেন। আমাকে ইংল্যান্ডে পাঠানোর অর্থ-সংস্থান কোথা থেকে হবে? আর আমার মতো অল্প বয়সের ছেলেকে একা বিদেশে পাঠানো কি ঠিক হবে?

আমার মা একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। আমি তাঁকে ছেড়ে যাব এটা তাঁর পছন্দ হলো না। তিনি আমাকে যেভাবে বিরত করতে চেষ্টা করলেন তা হলো—" তোমার কাকা এখন পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। আগে তাঁর সাথে আলোচনা করা উচিত। তিনি যদি সম্মতি দেন তাহলে আমরা বিষয়টি বিবেচনা করব।"

দাদার মাথায় আর একটা চিন্তা ছিল। তিনি বললেন, "পোরবন্দর রাজ্যের ওপর আমাদের কিছুটা দাবি তো আছেই। লেলি সাহেব এখন এর প্রশাসক। আমাদের পরিবার সম্পর্কে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন এবং কাকাও তাঁর সুনজরে আছেন। খুব সম্ভব তিনি ইংল্যান্ডে তোমার পড়ালেখার জন্য কিছু সরকারী সাহায্যের সুপারিশ করবেন।"

এসব পরামর্শ আমার পছন্দ হলো এবং আমি পোরবন্দর যাবার জন্য তৈরি হলাম। তখন পর্যন্ত রেলওয়ে স্থাপিত হয়নি। গরুর গাড়িতে পাঁচ দিনের পথ। আগেই বলেছি আমি একটা ভীতু। কিন্তু ঐ মুহূর্তে ইংল্যান্ড যাবার ইচ্ছে আমাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল যে আমার ভীতি কোথায় চলে গেল টেরই পেলাম না। দোরাজি পর্যন্ত আমি গরুর গাড়ি ভাড়া করলাম এবং একদিন আগে পৌঁছানোর জন্য দোরাজি থেকে উটের পিঠে সওয়ার হলাম। এটাই আমার প্রথম উটে চড়া।

অবশেষে আমি পোরবন্দর পৌঁছলাম। কাকাকে প্রণাম করে সবকিছু খুলে বললাম। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "আমি জানি না নিজের ধর্মহানি না করে কারো পক্ষে ইংল্যান্ডে অবস্থান করা সম্ভব কিনা। এ যাবৎ যা কিছু শুনেছি তাতে আমার সন্দেহ হয়। বড় বড় ব্যারিস্টারদের দিকে যখন তাকাই, তাদের ও ইউরোপীয়ানদের জীবন যাত্রার মধ্যে কোনো তফাৎ দেখি না। খাদ্য-খাওয়ার ব্যাপারে তাদের কোনো বাছ-বিচার নেই। মুখ থেকে কখনো চুরুট সরে না। তারা ইংরেজদের মতো নির্লজ্জ পোষাক পরে। এ সকল কাজ আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের সাথে বেমানান। শিগগীরই আমি তীর্থ করতে যাব। হয়তো আমি আর বেশিদিন বাঁচবও না। মৃত্যুর দুয়ারে এসে আমি কি করে তোমাকে ইংল্যান্ড যাবার ও সাগর পাড়ি দেবার অনুমতি দেব? কিন্তু আমি তোমাকে বাধা দেব না। তোমার মায়ের অনুমতিটাই আসল। তিনি অনুমতি দিলে তোমার যাত্রা শুভ হোক এই

www.pathagar.com

কামনা করি। তাঁকে ব'লো আমি এ ব্যাপারে নাক গলাব না। তোমার যাত্রায় আমার আশীর্বাদ রইল।"

আমি বললাম, "আমি আপনার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করিনি। এখন আমি আমার মায়ের সম্মতি আদায়ের চেষ্টা করব। কিন্তু আপনি কি আমার জন্য মি. লেলির নিকট সুপারিশ করবেন না?"

তিনি বললেন, "সেটা আমি কি করে করি? তবে তিনি একজন ভালো মানুষ। আমার সাথে তোমার সম্পর্কের উল্লেখ করে তুমি দেখা করার অনুমতি প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি অনুমতি দেবেন, এবং সাহায্যও করতে পারেন।"

আমি জানি না কাকা কেন সেদিন আমার জন্য সুপারিশ করে পত্র দেননি। আমার মনে হয়েছিল যে কাকা আমার ইংল্যান্ড যাবার ব্যাপারে সরাসরি সহযোগিতা করতে দ্বিধা করছিলেন, কারণ তাঁর মতে এটা ছিল অধর্মের কাজ।

আমি মি. লেলির সাথে দেখা করার অনুমতি চেয়ে পত্র লিখলাম। তিনি আমাকে তাঁর বাসায় দেখা করার অনুমতি দিলেন। তিনি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময়ে তাঁর সাথে আমার দেখা হলো। আমাকে দেখে দ্রুত বললেন, "আগে বি.এ পাশ করো, তারপর দেখা করতে এসো। এখন তোমাকে কোনো সাহায্য করা যাবে না," বলতে বলতে তিনি ওপর তলায় উঠে গেলেন। আমি তাঁর সাথে দেখা করার জন্য অনেক প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। সযত্নে কয়েকটি ইংরেজি বাক্য মুখস্ত করেছিলাম এবং তাঁকে দেখামাত্র মাথা নুইয়ে দুই হাতে স্যালুট করেছিলাম। কিন্তু সবই বৃথা!

আমি আমার স্ত্রীর গহনাগুলোর কথা চিন্তা করলাম। আমার বড় দাদার কথা ভাবলাম, যাঁর ওপর আমার অবিচল আস্থা ছিল। তাঁর বদান্যতা ছিল দোষের পর্যায়ে এবং তিনি আমাকে তাঁর সন্তানতুল্য ভালোবাসতেন। পোরবন্দর থেকে রাজকোট ফিরে গেলাম এবং সকল ঘটনা সবিস্তারে বললাম। যোশীজির সাথে আলোচনা করলাম, তিনি প্রয়োজনে ঋণ করারও পরামর্শ দিলেন। আমি আমার স্ত্রীর গহনা বিক্রীর প্রস্তাব করলাম, যা থেকে দুই/তিন হাজার টাকা পাওয়া যেতে পারে। দাদা প্রতিজ্ঞা করলেন, যে করেই হোক তিনি টাকা যোগাড় করবেন।

আমার মা তখনো আমার ইংল্যান্ড যাবার বিষয়ে অনুমতি দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। কেউ একজন তাঁকে বলেছিল অল্প বয়সের ছেলেরা ইংল্যান্ডে গিয়ে গোল্লায় যায়, আরেকজন তাঁকে বলেছিল সেখানে গেলে মদ না খেয়ে কেউ থাকতে পারে না। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এসব ব্যাপারে তুমি কি বলবে?" আমি বললাম, "আমার ওপর কি তোমার বিশ্বাস নেই? আমি তোমার কাছে মিথ্যা বলব না। আমি শপথ করে বলছি, ওসবের কিছুই আমি ছোঁব না। এ ধরনের বিপদের আশংকা থাকলে কি যোশীজি আমাকে যেতে দিতেন?"

www.pathagar.com

তিনি বললেন, "তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু দূর বিদেশে গিয়ে তুমি কি করবে, না করবে তার বিশ্বাস কি? আমার মাথার ঠিক নেই, বুঝতে পারছি না কি করা উচিত। স্বামী বেচারজীকে জিজ্ঞেস করে দেখি, তিনি কি বলেন।"

বেচারজী স্বামী ছিলেন মূলত একজন মধ বেনিয়া, কিন্তু এখন তিনি জৈন পুরোহিত হয়ে গেছেন। যোশীজির মতো তিনিও আমাদের পারিবারিক পরামর্শদাতা। তিনি আমার সাহায্যে এগিয়ে এলেন, এবং বললেন, "আমি আপনার ছেলেকে ধর্ম সাক্ষী করে তিনটি শপথ করাব, তারপর তাকে ইংল্যান্ড যাবার অনুমতি দেয়া হবে।" তিনি আমাকে শপথ করালেন, এবং আমি মদ, মেয়ে-মানুষ ও মাংস ছোঁব না বলে শপথ নিলাম। এটা করার পরে আমার মা অনুমতি দিলেন।

হাই স্কুল থেকে আমার সম্মানে বিদায় সম্বর্ধনার আয়োজন করা হলো। রাজকোটের কোনো যুবকের ইংল্যান্ড যাত্রা একটা বিরল ঘটনা। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কয়েকটি কথা লিখেছিলাম, কিন্তু তা পড়তে গিয়ে তোতলাতে থাকলাম, পড়া হলো না। আমার মনে আছে, ওগুলো পড়ার জন্য উঠে দাঁড়াতেই কেমন যেন মাথা ঘুরে উঠল আর শরীর কাঁপছিল।

অবশেষে গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে আমি বোম্বের পথে রওনা হলাম। রাজকোট থেকে বোম্বের পথে এটাই আমার প্রথম যাত্রা। আমার দাদাও আমার সাথে চললেন। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছার পূর্বে অনেক অঘটনই ঘটতে পারে। বোম্বেতে আমার জন্য অনেক সমস্যা অপেক্ষা করছিল।

বার
জাতিচ্যুত

মায়ের অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে কয়েক মাসের বাচ্চাসহ আমার স্ত্রীকে রেখে আমি উৎফুল্ল মনে বোম্বের পথে রওনা হলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছার পরে দাদার বন্ধুরা বলল যে জুন-জুলাই মাসে সমুদ্র অশান্ত থাকে। যেহেতু এটা আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রা, নভেম্বর পর্যন্ত আমাকে যাত্রার অনুমতি দেয়া ঠিক হবে না। একজন এ খবরও দিল যে অতি সম্প্রতি ঝড়ে একটি জাহাজ ডুবে গেছে। এতে দাদা চিন্তায় পড়লেন এবং আমাকে তৎক্ষণাৎ যাত্রার অনুমতি দেয়ার ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। আমাকে তাঁর এক বন্ধুর কাছে রেখে তিনি রাজকোটে ফিরে গেলেন কাজে যোগদানের জন্য। আমার ভ্রমণব্যয়ের টাকা আমার এক শ্যালকের নিকট রাখলেন, আর কয়েকজন বন্ধুকে বলে গেলেন আমাকে প্রয়োজনমতো যে কোনো সাহায্য করতে।

বোম্বেতে আমার সময় আর কাটে না। আমি ইংল্যান্ড যাবার অবিরাম স্বপ্ন দেখতে থাকলাম।

ইতিমধ্যে আমার স্বজাতির লোকেরা আমার বিদেশ গমনের খবরে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। আজ পর্যন্ত বেনিয়া বংশের কেউ ইংল্যান্ডে যায়নি। আমি যদি সে

www.pathagar.com

সাহস দেখাই তবে আমাকে শাস্তি পেতে হবে। আমার স্বজাতীয়দের একটি সভা আহ্বান করে তাতে আমাকে হাজির থাকতে বলা হলো। আমি ঐ সভায় গেলাম। হঠাৎ করে কিভাবে আমি সাহস সঞ্চয় করলাম তা বলতে পারব না। সম্পূর্ণ নির্ভয়ে আর নির্দ্বিধায় আমি সভায় হাজির হলাম। শেঠ, যিনি গোত্র প্রধান এবং আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়, বাবার সাথে যাঁর সুসম্পর্ক ছিল, তিনি এভাবে আমাকে আহ্বান জানালেন :

"গোত্রের লোকদের মতে তোমার ইংল্যান্ড যাবার প্রস্তাব সঠিক নয়। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশ যাত্রা আমাদের ধর্মে নিষেধ আছে। আমরা এও শুনেছি যে সেখানে গেলে ধর্ম বিসর্জন না দিয়ে বাস করা সম্ভব নয়। ইউরোপীয়ানদের সাথে পান-ভোজনে বাধ্য হতে হয়।"

যার জবাবে আমি বললাম, "ইংল্যান্ডে যাওয়া আমাদের ধর্মবিরুদ্ধ তা আমি মোটেই মনে করি না। আমি সেখানে যেতে চাই আরো পড়াশুনা করতে। এবং আমি মায়ের কাছে ধর্মসাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করেছি আপনারা যে তিনটি জিনিসকে বেশি ভয় পাচ্ছেন তা থেকে আমি দূরে থাকব। আমি নিশ্চিত যে আমার প্রতিজ্ঞা আমাকে নিরাপদে রাখবে।"

শেঠ প্রতিবাদ করলেন, "কিন্তু আমরা বলছি যে সেখানে আমাদের ধর্ম রক্ষা করা সম্ভব হবে না। তুমি তোমার বাবার সাথে আমার সম্পর্কের কথা জান। তাই আমার উপদেশ তোমার শোনা উচিত।"

আমি বললাম, "সে সম্পর্কে আমি জানি। আপনি আমার গুরুজন। কিন্তু এই বিষয়ে আমি অসহায়। ইংল্যান্ড যাবার সিদ্ধান্ত আমি পরিবর্তন করতে পারি না। বাবার একজন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ বন্ধু ও পরামর্শদাতা আছেন, আমার ইংল্যান্ড যাওয়াতে তাঁর আপত্তি নেই। তদুপরি আমার মা ও দাদা আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।"

"কিন্তু তুমি কি স্বগোত্রের আদেশ অমান্য করবে?"

"আমি সত্যিই অপারগ। আমার মনে হয় এ বিষয়ে গোত্রের লোকদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।"

এতে শেঠ ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি আমাকে গালিগালাজ করলেন। আমি অবিচল বসে রইলাম। অতএব শেঠ তাঁর আদেশ ঘোষণা করলেন "আজ থেকে এই বালককে জাতিচ্যুত ঘোষণা করা হলো। যে তাকে সাহায্য করবে, বা তাকে বিদায় জানাতে বন্দরে যাবে, শাস্তি স্বরূপ তাকে এক টাকা চার আনা জরিমানা করা হবে।"

আমার ওপর এ আদেশের কোনো প্রভাব পড়েনি এবং আমি শেঠের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম। কিন্তু আমি ভাবছিলাম দাদা এটা কিভাবে নেবেন। সৌভাগ্যের কথা তিনি অনড় থাকলেন। আমাকে পত্র লিখে আশ্বস্ত করলেন যে শেঠের আদেশ থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে যাবার অনুমতি দিচ্ছেন।

এ ঘটনা যাত্রার জন্য আমাকে আরো বেশি উদ্বিগ্ন করে তুলল। দাদার ওপর চাপ প্রয়োগ করে যদি তারা সফল হতো তাহলে কি ঘটত? অপ্রত্যাশিত কিছু যদি

www.pathagar.com

ঘটত? আমি যখন এভাবে আমার দুর্দশার বিষয়ে চিন্তা করছিলাম তখন শুনতে পেলাম যে জুনাগড় কোর্টের একজন উকিল বার কর্তৃক ডেকে পাঠানোতে ইংল্যান্ড যাচ্ছেন, ৪ঠা সেপ্টেম্বর তার জাহাজ ছাড়বে। দাদা যেসব বন্ধুর কথা বলেছিলেন আমি তাদের সাথে দেখা করলাম। তারাও একমত হলেন যে এরকম একজন সঙ্গীর সাথে যাত্রার সুযোগ হারানো উচিত নয়। হাতে মোটেই সময় ছিল না। দাদাকে টেলিগ্রাম করলাম অনুমতির জন্য। তিনি অনুমতি দিলেন। আমি আমার শ্যালককে তার নিকট গচ্ছিত টাকা দিতে বললাম। কিন্তু সে শেঠের আদেশের কথা তুলে বলল যে সে জাতিচ্যুত হতে পারবে না। আমি তখন আমাদের এক পারিবারিক বন্ধুকে খুঁজে বের করলাম এবং তাঁকে অনুরোধ করলাম আমাকে জাহাজ ভাড়া ও আনুষঙ্গিক খরচার টাকা দিতে এবং পরে আমার দাদার কাছ থেকে তা নিয়ে নিতে। বন্ধুটি আমার অনুরোধে শুধু টাকাই দিলেন না, আমাকে উৎসাহও দিলেন। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালাম। ঐ টাকার মধ্যে থেকে যাত্রা পথের টিকেট কিনলাম। তারপর সমুদ্র যাত্রার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকলাম। আরেকজন বন্ধু ছিল যার এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা ছিল। সে কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ করে দিল। কিছু কাপড় আমার পছন্দ হলো, আর কিছু মোটেই পছন্দ হলো না। নেকটাইকে তখন আমি ঘৃণা করতাম, পরবর্তীতে যা আনন্দের সাথেই পরেছি। শর্ট জ্যাকেটকে মনে হতো অশালীন। আমার মধ্যে তখন ইংল্যান্ড যাবার ইচ্ছাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, যার তুলনায় এ অপছন্দ কিছুই না। যাত্রা পথের জন্য রসদ পত্রও যথেষ্ট ছিল। বন্ধুরা আমার জন্য জুনাগড় উকিল শ্রীযুক্ত ত্রিয়ামবাক্রাই মাজমুদারের সাথে একই কেবিনে একটি বার্থ রিজার্ভ করলেন। তারা আমাকে তাঁর হেফাজতে সোপর্দ করলেন। তিনি পরিণত বয়সের অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন এবং দুনিয়া সম্পর্কে জানতেন। আমি তখনো দুনিয়াদারী সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ১৮ বছরের তরুণ মাত্র। শ্রীযুক্ত মাজমুদার আমার সম্পর্কে দুশ্চিন্তা করতে বন্ধুদেরকে নিষেধ করলেন।

অবশেষে ৪ঠা সেপ্টেম্বর আমি বোম্বে থেকে যাত্রা করলাম।

তের
অবশেষে লন্ডনে

যাত্রাপথে সমুদ্রপীড়া আমার একেবারেই হয়নি। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল আমি ততই অস্থির হতে থাকলাম। স্টুয়ার্ডের সাথে কথা বলতেও আমার লজ্জা লাগত। ইংরেজিতে কথা বলার অভ্যাস আমার মোটেই ছিল না এবং শ্রীযুক্ত মাজমুদার ছাড়া দ্বিতীয় সেলুনের সকল যাত্রীই ছিল ইংরেজ। আমি তাদের সাথে কথা বলতে পারতাম না। কারণ তারা যখন আমার সাথে কথা বলত আমি তাদের কথা বুঝতাম না, আর বুঝলেও জবাব দিতে পারতাম না। প্রতিটি বাক্য বলার আগে মনে মনে গুছিয়ে নিতে হতো। আমি কাঁটা চামচ ও ছুরির ব্যবহার জানতাম না এবং খাবারের মেনুতে মাংস ছাড়া আর কি আছে তা জিজ্ঞেস করার সাহসও

www.pathagar.com

হতো না। সুতরাং আমি কখনো টেবিলে খাবার খেতাম না। সর্বদা আমার কেবিনে খেতাম এবং আমার খাবার ছিল মূলত কিছু মিষ্টি ও ফল যা আমি সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম। শ্রীযুক্ত মাজমুদারের কোনো অসুবিধা ছিল না, এবং তিনি সবার সাথে মিশতেন। ডেকের ওপর তিনি স্বাধীনভাবে বিচরণ করতেন। আর আমি সারাদিন নিজেকে কেবিনে লুকিয়ে রাখতাম। ডেকের ওপর যখন লোকজন প্রায় থাকত না, কেবল তখন সাহস করে বের হতাম। শ্রীযুক্ত মাজমুদার মুক্তভাবে সকল যাত্রীদের সাথে মিশতে ও কথা বলতে পরামর্শ দিতেন। তিনি বলতেন, আইনজীবীদের জিভ লম্বা হতে হয় এবং তাঁর ওকালতির অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেন। ইংরেজি বলার সকল সম্ভাব্য সুযোগ কাজে লাগাতে তিনি উপদেশ দিতেন। বলতেন, ভুল বললেও কিছু যায় আসে না, কারণ বিদেশী ভাষা বলতে গিয়ে ভুল তো হবেই। কিন্তু আমি কিছুতেই লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারলাম না।

একজন ইংরেজ যাত্রী দয়া করে আমার সাথে কথোপকথন শুরু করলেন। তিনি বয়সে আমার বড়। জিজ্ঞেস করলেন আমি কি খাই, কি করি, কোথায় যাচ্ছি, কেন আমি লাজুক ইত্যাদি। তিনি আমাকে খাওয়ার টেবিলে গিয়ে খাওয়ার পরামর্শ দিলেন। আমার মাংস না খাবার প্রতিজ্ঞায় অটল থাকা নিয়ে হাসাহাসি করলেন এবং আমরা যখন লোহিত সাগরে তখন তিনি বন্ধুসুলভভাবে বললেন, "এতদিন যা করেছ ভালোই করেছ, বিসকে উপসাগরে গেলে তোমাকে তোমার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হবে। আর ইংল্যান্ডে এত ঠাণ্ডা যে সম্ভবত মাংস না খেয়ে কেউ বাঁচতে পারে না।"

আমি বললাম, "কিন্তু আমি শুনেছি লোকে মাংস না খেয়েও সেখানে বাঁচতে পারে।"

তিনি বললেন, "সম্পূর্ণ মিথ্যা, এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো। আমার জানামতে সেখানে কেউই মাংসভোজী না হয়ে থাকতে পারে না। তুমি কি দেখছ না যে আমি তোমাকে মদ পান করতে বলছি না, যদিও আমি নিজে পান করি? কিন্তু আমি মনে করি মাংস তোমার খাওয়া উচিত, তা না হলে তুমি বাঁচতে পারবে না।"

"আপনার সদয় উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি মায়ের কাছে ধর্ম সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করেছি মাংস ছোঁব না, সুতরাং আমি তা খেতে পারি না। যদি মাংস না খেয়ে থাকা অসম্ভবই হয়, তাহলে আমি বরং ভারতেই ফিরে যাব, তবু ইংল্যান্ডে থাকার জন্য মাংস খাব না।"

আমরা বিসকে উপসাগরে প্রবেশ করলাম। কিন্তু আমি মাংস বা মদ কোনোটারই প্রয়োজন অনুভব করলাম না। আমাকে মাংস না খাওয়ার সনদ সংগ্রহ করতে বলা হয়েছিল এবং আমি এই ইংরেজ বন্ধুকে একটা সনদ দিতে বললাম। তিনি খুশী মনে সনদ দিলেন। আমি ওটা কিছুদিন যত্ন করে রেখেছিলাম। কিন্তু পরে যখন জানলাম মাংসভোজী হয়েও এরকম সনদ সংগ্রহ করা যায় তখন এর প্রতি আমার আগ্রহ উবে গেল। আমার মুখের কথা যদি বিশ্বাস করা না হয়, তাহলে সনদ রেখেই বা লাভ কি?

www.pathagar.com

যাহোক শেষ পর্যন্ত আমরা সাউদাম্পটন পৌঁছলাম, যতদূর মনে পড়ে, কোনো এক শনিবারে। জাহাজে আমি কালো স্যুট পরেছিলাম। বন্ধুদের যোগাড় করে দেয়া সাদা ফ্লানেল স্যুট বিশেষ করে জাহাজ থেকে নামার সময় পরব বলে রেখে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম যখন তীরে নামব তখন সাদা কাপড়েই আমাকে মানাবে ভালো। তাই সাদা ফ্লানেল স্যুট পরেই তীরে নামলাম। সময়টা ছিল সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে। আমি দেখলাম সাদা পোষাক একমাত্র আমিই পরেছি। গ্রীনলে অ্যান্ড কোম্পানীর এক এজেন্টের নিকট আমার চাবিসহ সব মালপত্র জমা রাখলাম, কারণ অন্য সবাই তাই করছিল এবং আমি তাদেরকে অনুসরণ করলাম।

আমি চার জনের কাছে পরিচিতি পত্র নিয়ে এসেছিলাম—ড. পি.জে. মেহতা, শ্রীযুক্ত ডালপাত্রাম শুক্লা, প্রিন্স রঞ্জিত সিংজী এবং দাদাভাই নওরোজির কাছে। জাহাজে আমাকে একজন পরামর্শ দিয়েছিল লন্ডনে ভিক্টোরিয়া হোটেলে উঠতে। তদনুযায়ী শ্রীযুক্ত মাজমুদার আর আমি সেখানেই গেলাম। সাদা পোষাক পরা একমাত্র ব্যক্তি হওয়ার লজ্জা আমার জন্য দুঃসহ হয়ে উঠেছিল এবং হোটেলে পৌঁছার পর আমাকে যখন বলা হলো যে পরদিন রোববার হওয়ায় গ্রীনলেজ থেকে আমার মালামাল পাব না তখন আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

ড. মেহতা, যাকে আমি সাউদাম্পটন থেকে টেলিগ্রাম করেছিলাম, ঐ দিনই রাত প্রায় আটটায় দেখা করতে এলেন। তিনি আমাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন। আমার সাদা ফ্লানেল স্যুট দেখে হাসলেন। আমরা কথা বলার সময়ে অন্যমনস্কভাবে আমি তাঁর রেশমী টুপি (টপ হ্যাট) হাতে তুলে নিচ্ছিলাম এবং এটা কেমন মোলায়েম তা দেখার জন্যে ওটার লোমের মধ্যে ভুল করে আঙ্গুল চালিয়ে দিলাম এবং তাতে এর লোমগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। ড. মেহতা আমার দিকে রাগতভাবে তাকিয়ে দেখলেন আমি কি করছি এবং আমাকে থামালেন। কিন্তু অনিষ্ট যা হবার তা হয়েই গেছে। ঘটনাটা আমার ভবিষ্যতের জন্য ছিল সতর্ক সংকেত। এটা ছিল আমার ইউরোপীয়ান শিষ্টাচারের প্রথম পাঠ যার বিশদ শিক্ষা ড. মেহতা পরে আমাকে হাস্যরসের মাধ্যমে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "অন্যের জিনিস ধরবে না। প্রথম পরিচয়েই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে না, যা আমরা ভারতে করে থাকি; জোরে কথা বলবে না, কারো সাথে কথা বলতে গেলে তাকে কখনো স্যার বলে সম্বোধন করবে না, যেমনটা আমরা ভারতে করি, চাকর ও অধস্তনরাই কেবল তাদের মনিবকে স্যার সম্বোধন করে" ইত্যাদি আরো অনেক। তিনি এও বললেন হোটেলে বাস করা খুবই ব্যয়বহুল এবং কোনো একটা পরিবারের সাথে আমার থাকা উচিত বলে আমাকে পরামর্শ দিলেন। আমরা সোমবার পর্যন্ত বিষয়টি বিবেচনা করা স্থগিত রাখলাম।

শ্রীযুক্ত মাজমুদার ও আমার জন্য হোটেলে অবস্থান ছিল ক্লান্তিকর। খুব ব্যয়বহুলও বটে। অবশ্য সেখানে মাল্টা থেকে আসা একজন সিন্ধী সহযাত্রী ছিলেন যার সাথে শ্রীযুক্ত মাজমুদারের বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনি আমাদের জন্য বাসা খুঁজে দেয়ার প্রস্তাব দিলেন, কারণ লন্ডন তার পূর্ব পরিচিত শহর। আমরা রাজি হলাম

www.pathagar.com

এবং সোমবারে আমাদের মালামাল পাওয়ার সাথে সাথে আমরা বিল পরিশোধ করে আমাদের জন্য সিন্ধী বন্ধুর ভাড়া করা বাসায় চলে গেলাম। মনে আছে আমার হোটেল বিল এসেছিল তিন পাউন্ড, যা আমাকে স্তম্ভিত করেছিল। এত বেশি বিল দেয়া সত্ত্বেও আমাকে আসলে উপোষই করতে হয়েছে। কারণ কোন খাবারেই আমার রুচি ছিল না। একটা পছন্দ না হলে আরেকটার অর্ডার দিতাম, সেটাও ভালো লাগত না, কিন্তু বিল দিতে হতো দুটোরই। আসলে এই পুরো সময় ধরে আমি বোম্বে থেকে যে খাবার নিয়ে এসেছিলাম সেগুলোর ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছিল।

নতুন বাসায় এসেও আমার খুবই অস্বস্তি লাগল। সারাক্ষণ আমি কেবল বাড়ি আর দেশের কথা ভাবতাম। মায়ের ভালোবাসা আমাকে ঘিরে থাকত সর্বক্ষণ। রাতে গণ্ড বেয়ে অশ্রুর স্রোত বইত এবং বাড়ির যত রকম স্মৃতি আছে সব এসে ঘুম কেড়ে নিত। অন্য কারো পক্ষে আমার কষ্টের ভাগীদার হওয়া ছিল অসম্ভব। আর তা সম্ভব হলেই বা কি লাভ হতো? জানতাম না কিসে আমার শান্তি হবে। সবকিছুই কেমন অদ্ভুত মনে হচ্ছিল—এখানকার মানুষ, তাদের চাল-চলন, এমনকি তাদের বাসস্থান পর্যন্ত। ইংরেজদের শিষ্টাচার আমার জন্য ছিল সম্পূর্ণ নতুন এবং এ বিষয়ে আমাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হতো। তার ওপরে অতিরিক্ত অসুবিধা ছিল নিরামিষ ভোজনের প্রতিজ্ঞা। যে খাবারগুলো আমি খেতে পারতাম সেগুলোও কেমন বিস্বাদ ও পানসে লাগত। ফলে আমি উভয় সঙ্কটে পড়ে গেলাম। ইংল্যান্ডে থাকা সহ্য হচ্ছে না, আবার ভারতে ফিরে যাবার চিন্তাও করতে পারছি না। আমার অন্তর-সত্তা বলল, একবার যখন এসেছি তখন তিন বছর পুরো করতেই হবে।

চৌদ্দ
আমার পছন্দ

ড. মেহতা সোমবারে ভিক্টোরিয়া হোটেলে গেলেন আমাকে পাবেন সেই আশায়। সেখানে তিনি জানতে পারলেন আমরা চলে গিয়েছি। নতুন ঠিকানায় গিয়ে তিনি আমাদের সাথে দেখা করলেন। জাহাজে অবস্থানকালে নিরেট বোকামীর জন্য আমার দাদ হয়েছিল। ধোয়া মোছা ও গোছলের জন্য আমাদের সমুদ্রের পানি ব্যবহার করতে হতো। ওই পানিতে সাবান গলে না। সভ্যতার প্রতীক হিসেবে আমি সাবান ব্যবহার করেছিলাম। ফল স্বরূপ চামড়া পরিষ্কার হওয়ার পরিবর্তে তৈলাক্ত হয়ে গেল। যার ফলে দাদ হলো। আমি এটা ড. মেহতাকে দেখালাম। তিনি অ্যাসটিক এসিড লাগাতে বললেন। মনে আছে এসিডের পোড়ানীতে কেঁদেছিলাম। ড. মেহতা আমার রুম ও আসবাবপত্র খুঁটিয়ে দেখলেন এবং অননুমোদনসূচক মাথা নাড়লেন। তিনি বললেন, "এ স্থানে থাকা চলবে না। আমরা ইংল্যান্ডে আসি যতটা না পড়ার জন্য, তার চেয়ে বেশি ইংরেজদের জীবনযাত্রা ও চালচলন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। এজন্য তোমার কোনো

www.pathagar.com

একটা পরিবারের সাথে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু তার আগে অমুকের সাথে তোমার কিছুদিন শিক্ষানবিশ হিসেবে থাকা ভালো। আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব।"

তাঁর পরামর্শ আমি কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করলাম এবং সেই বন্ধুর রুমে গেলাম। তিনি আমার প্রতি খুব দয়ালু ও যত্নশীল ছিলেন। তিনি আমার সাথে আপন ভাই এর মতো ব্যবহার করলেন, ইংরেজদের চাল-চলন ও জীবন প্রণালীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং ইংরেজীতে কথা বলতে অভ্যস্ত করে তুললেন। কিন্তু খাবার নিয়ে গুরুতর সমস্যা দেখা দিল। লবণ-মশলা ছাড়া সিদ্ধ সব্জী আমি খেতে পারছিলাম না। বাড়িওয়ালী বুঝতে পারছিলেন না আমার জন্য কি রাঁধবেন। সকালের নাশতায় আমরা ওটমিল পরিজ খেতাম যা দিয়ে মোটামুটি পেট ভরত, কিন্তু দুপুরে আর রাতে আমাকে প্রায় উপোষই করতে হতো। বন্ধুটি মাংস খাওয়ার পক্ষে অবিরাম যুক্তি দেখিয়ে চললেন, কিন্তু আমি আমার প্রতিজ্ঞার কথা বলে চুপ করে গেলাম। দুপুর ও রাতের খাবারে স্পিনিজ, রুটি ও জ্যাম থাকত। আমি বেশ খেতে পারতাম, পেটটাও বেশ বড়ই ছিল। কিন্তু দু'-তিন স্লাইস এর বেশি রুটি চেয়ে নিতে আমার লজ্জা করত এবং মনে হতো চাওয়াটা ঠিক হবে না। তার ওপর দুপুর ও রাতে দুধও থাকত না। এ অবস্থা দেখে বন্ধুটি একদিন বিরক্ত হয়ে বললেন, "তুমি যদি আমার আপন ভাই হতে তাহলে তোমাকে বের করে দিতাম। একজন অশিক্ষিত মা যিনি এখানকার অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানেন না তার কাছে করা প্রতিজ্ঞার কি মূল্য আছে? এটা কোনো প্রতিজ্ঞাই নয়। এরকম প্রতিজ্ঞা পালন করা নির্জলা কুসংস্কার। বলে রাখছি, এ গোয়ার্তুমির জন্যে এখানে তুমি কিছুই শিখতে পারবে না। তুমি স্বীকার করছ যে আগে তুমি মাংস খেয়েছ এবং ভালোও লেগেছে। যখন মাংস খাওয়ার কোনো প্রয়োজনই ছিল না তখন মাংস খেয়েছ, আর এখন খাওয়া অত্যাবশ্যক অথচ খাচ্ছো না। কি অযৌক্তিক কথা?"

কিন্তু আমি আমার প্রতিজ্ঞায় অটল রইলাম।

দিনের পর দিন বন্ধুটি যুক্তি দেখাতেন আর আমি চিরাচরিতভাবে না বলে যেতাম। তিনি যতই বেশি যুক্তি দেখাতেন, আমি ততই অনমনীয় হতাম। প্রতিদিন আমি ঈশ্বরের সাহায্য চেয়েছি এবং তা পেয়েছি। এর মানে এই নয় যে ঈশ্বর সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল। আমার বিশ্বাস, যে বিশ্বাসের বীজ বুনেছিল পুণ্যবতী দাসী রম্ভা, সেই বিশ্বাস এক্ষেত্রে কাজ করেছে।

একদা বন্ধুটি আমাকে বেন্থামের 'উপযোগের তত্ত্ব' বইটি পড়ে শোনাতে লাগলেন। আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম, কারণ বইটির ভাষা এত কঠিন যে আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তিনি আমাকে ব্যাখ্যা করে বুঝালেন। আমি বললাম, "মাফ করবেন, এসব গূঢ় তত্ত্ব বুঝা আমার অসাধ্য। আমি স্বীকার করি যে মাংস খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে পারব না। আমি এ ব্যাপারে তর্কও করতে চাই না। আমি নিশ্চিত, তর্কে আমি আপনার সাথে পারব না। আমাকে বোকা বা একগুঁয়ে ভেবে দয়া করে রেহাই দিন। আমার প্রতি আপনার ভালোবাসা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি এবং আপনাকে আমার

www.pathagar.com

শুভাকাঙ্ক্ষী বলে জানি। আমি এও জানি যে আপনি আমাকে ভালোবাসেন বলেই এ ব্যাপারে আমাকে এতো করে বলছেন। কিন্তু আমি নিরুপায়। প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই, তা ভঙ্গ করা যায় না।"

বন্ধুটি আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। বই বন্ধ করে বললেন, "বেশ, আমি এ ব্যাপারে আর কিছু বলব না।" আমি খুশি হলাম। আর কখনো তিনি এ বিষয়ে আমার সাথে আলোচনা করেননি। কিন্তু আমাকে নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা গেল না। তিনি মদ খেতেন, ধূমপান করতেন, কিন্তু আমাকে কখনো ওগুলো খেতে বলেননি। আসলে তিনি ওগুলো থেকে দূরে থাকতেই বলেছেন। তাঁর একটাই ভয় ছিল, মাংস না খেয়ে শেষে আমি অতি দুর্বল হয়ে পড়ব এবং ইংল্যান্ডে অবস্থান করতে অসমর্থ হব।

এভাবেই আমার শিক্ষানবিশীর এক মাস কাটল। বন্ধুটির বাড়ি ছিল রিচমন্ডে এবং সেখান থেকে সপ্তাহে এক বা দু'বারের বেশি লন্ডনে যাওয়া সম্ভব হতো না। সুতরাং ড. মেহতা ও শ্রীযুক্ত ডালপাত্রাম শুক্লা স্থির করলেন যে আমাকে কোনো একটা পরিবারের সাথে থাকতে হবে। শ্রীযুক্ত শুক্লা পশ্চিম কেনসিংটনে এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ানের বাড়ি খুঁজে বের করলেন এবং আমাকে সেখানে তুলে দিলেন। বাড়িওয়ালী ছিলেন এক বিধবা। আমি তাঁকে আমার প্রতিজ্ঞার কথা জানালাম। বৃদ্ধা মহিলা আমার সঠিক যত্ন নেবেন বলে কথা দিলেন এবং আমি তাঁর বাড়িতে বসবাস শুরু করলাম। এখানেও প্রকৃতপক্ষে আমাকে উপোষই করতে হলো। আমি বাড়ি থেকে মিষ্টি ও অন্যান্য খাবার পাঠাতে বলেছিলাম, কিন্তু সেগুলো এখনো এসে পৌঁছায়নি। সব খাবারই পানসে লাগছিল। প্রতিদিন মহিলা জিজ্ঞেস করেন খাবার আমার পছন্দ মতো হয়েছে কিনা। কিন্তু তিনিই বা কি করতে পারেন? বরাবরের মতোই আমাকে যা দেয়া হতো লজ্জা করে তার বেশি কিছু চাইতাম না। তাঁর দুটি মেয়ে ছিল। তারা আমাকে এক বা দু' স্লাইস অতিরিক্ত রুটি দেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করত। কিন্তু একটা পুরো রুটির কমে যে আমার পেট ভরবে না তা তারা জানত না।

এতোদিনে আমি দাঁড়াবার মতো একটা অবস্থায় এলাম। আমার নিয়মিত লেখাপড়া তখনো শুরু হয়নি। *শ্রীযুক্ত* শুক্লাকে ধন্যবাদ, তাঁর অনুগ্রহে কেবলমাত্র খবরের কাগজ পড়তে শুরু করেছি। ভারতে আমি কখনো খবরের কাগজ পড়িনি। কিন্তু এখানে প্রতিদিন পড়ার ফলে খবরের কাগজ পড়াটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। প্রতিদিন আমি ডেইলি নিউজ, ডেইলি টেলিগ্রাফ ও পলমল গেজেটে চোখ বুলাতাম। এতে মাত্র এক ঘন্টার বেশি লাগত না। তাই আমি হেঁটে বেড়ানো শুরু করলাম। একটা নিরামিষ রেস্তোরাঁর খোঁজে বের হলাম। বাড়িওয়ালী আমাকে বলেছিলেন এরকম রেস্তোরাঁ নগরীতে আছে। প্রতিদিন দশ-বারো মাইল হাঁটতাম। সস্তা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পেট ভরে রুটি খেতাম, কিন্তু তৃপ্তি হতো না। এভাবে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ফ্যারিংডন স্ট্রীটে একদিন হঠাৎ করে একটি নিরামিষ রেস্তোরাঁ পেয়ে গেলাম।

www.pathagar.com

রেস্তোরাঁটি দেখামাত্রই আমার মন আনন্দে নেচে উঠল, ঠিক যেমন কোনো বাচ্চা ছেলে মনের মতো জিনিস পেলে আনন্দিত হয়। ভেতরে ঢোকার আগে আমি লক্ষ করলাম দরজার পাশে কাঁচের জানালার নিচে বিক্রীর জন্য বই সাজানো রয়েছে। দেখলাম ওগুলোর মধ্যে সল্টের লেখা "নিরামিষ ভোজনের পক্ষে যুক্তি"। এক শিলিং দিয়ে বইটা কিনলাম এবং সোজা ডাইনিং রুমে চলে গেলাম। এটাই ছিল ইংল্যান্ডে আসার পরে আমার প্রথম প্রাণভরে আহার। ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করলেন।

সল্ট এর বইটি আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লাম এবং পড়ে মুগ্ধ হলাম। আমি দাবি করতে পারি যে, এ বইটি পড়ার দিন থেকে আমি স্বেচ্ছায় নিরামিষ আহার বেছে নিলাম। ঐ দিনকে আশীর্বাদ করলাম যেদিন মায়ের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আমার প্রতিজ্ঞা ও সত্যের খাতিরে আমি বরাবরই মাংস খাওয়া থেকে বিরত থেকেছি। এক সময় আশা করতাম যে প্রত্যেক ভারতীয়ই যেন মাংসভোজী হয়, একদিন আমিও যেন স্বাধীন ও খোলামেলাভাবে তাদের সাথে যোগ দিতে পারি এবং অন্য সবাইকেও একই পথে উদ্বুদ্ধ করতে পারি। কিন্তু এখন নিরামিষ আহার বেছে নিয়েছি এবং এখন থেকে এর প্রচার ও প্রসার হলো আমার জীবনের ব্রত।

পনের
ইংলিশ জেন্টলম্যানের ভূমিকায়

নিরামিষবাদী হিসেবে আমার বিশ্বাস দিন দিন বাড়তে থাকল। সল্ট এর বই "পথ্যবিদ্যা" অধ্যয়ন আমার আগ্রহে আরো শান দিল। নিরামিষ খাবার সম্পর্কে যত বই আছে খুঁজে বের করে পড়ে ফেললাম। এগুলোর একটা ছিল হাওয়ার্ড উইলিয়ামস এর "পথ্যের নীতিশাস্ত্র" যা ছিল আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানবিক পথ্যবিদ্যার জীবনেতিহাস। এতে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, পিথাগোরাস ও যীশুখৃষ্ট থেকে বর্তমান পর্যন্ত সকল দার্শনিক ও প্রেরিতপুরুষ নিরামিষাশী ছিলেন। ড. এ্যানা কিংসফোর্ডের লেখা "উৎকৃষ্ট পথ্যের সহজ উপায়" (The Perfect Way in Diet) বইটিও ছিল আকর্ষণীয়। স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধির ওপর ড. এ্যালিসনের লেখাগুলোও খুবই সহায়ক ছিল। রোগীর পথ্য নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে রোগ আরোগ্যের ব্যবস্থার পক্ষে তিনি প্রচার চালাতেন। তিনি নিজে ছিলেন নিরামিষাশী এবং তাঁর রুগীদের জন্যও কঠোরভাবে নিরামিষ পথ্যের ব্যবস্থাপত্র দিতেন। এ সকল বইপত্র পড়ার ফলে পথ্য বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। শুরুতে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সুস্বাস্থ্য। কিন্তু পরবর্তীতে ধর্মই পরম উদ্দেশ্য হয়ে উঠল।

এতদিনেও কিন্তু আমার জন্য বন্ধুর দুঃশ্চিন্তার অবসান হয়নি। আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসা তাঁকে ভাবিয়ে তুলল যে, মাংস খেতে আপত্তির ফলে আমি কেবল শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ব তাই নয়, উপরন্তু ইংরেজ সমাজে কখনো

www.pathagar.com

সহজভাবে মিশতে না পারার কারণে একজন অকর্মণ্য ব্যক্তিতে পরিণত হব। যখন তিনি জানলেন যে আমি নিরামিষ সংক্রান্ত বইপত্র পড়ছি তখন তিনি ভয় পেলেন যে এসব পড়ে আমার মাথা বিগড়ে না যায় এবং লক্ষ্যহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জীবনের মূল্যবান সময় অপচয় করে আসল কাজ ভুলে বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তিতে পরিণত না হই। সুতরাং তিনি আমাকে সংশোধনের শেষ চেষ্টা করলেন। একদিন আমাকে নাটক দেখার আমন্ত্রণ করলেন। নাটক শুরুর আগে আমাদেরকে হলবর্ণ রেস্তোরাঁতে একত্রে খেতে হবে। রেস্তোরাঁটি ছিল আমার চোখে প্রাসাদতুল্য এবং ভিক্টোরিয়া হোটেল ছাড়ার পরে এত বড় রেস্তোরাঁয় আমার এই প্রথম প্রবেশ। হোটেলে থাকার অতীত অভিজ্ঞতা সুখের ছিল না, কারণ তখন আমি সুস্থভাবে নিজ বুদ্ধিতে চলতে পারিনি। বন্ধুটি পরিকল্পিতভাবেই আমাকে এ রেস্তোরাঁয় নিয়ে এসেছিলেন এই ভেবে যে অন্তত ভদ্রতার খাতিরেও আমি আপত্তি করব না। এখানে অনেক লোক এক সঙ্গে খাচ্ছিল যাদের মাঝে আমরা দু'জন একটা টেবিলের দু'পাশে বসলাম। খাবারের প্রথম পর্বে ছিল স্যুপ। এটা কি দিয়ে বানানো তাই ভাবতেছিলাম, কিন্তু বন্ধুকে জিজ্ঞেস করতে সাহস হচ্ছিল না। সুতরাং ওয়েটারকে ডাকলাম। বন্ধুটি অবস্থা বুঝতে পেরে রাগতস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? বেশ খানিকটা ইতস্ততঃ করে আমি বললাম যে, আমি জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম এটা ভেজিটেবল স্যুপ কিনা। তিনি অসহিষ্ণুভাবে বললেন, "ভদ্র সমাজে তুমি বড়ই বেমানান। মার্জিত আচরণ যদি করতে নাই পার তাহলে চলে যাওয়াই ভালো। অন্য কোনো রেস্তোরাঁয় গিয়ে খাও এবং আমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করো।" এতে আমি বরং আনন্দিত হলাম। তবে ঐ রাতে আমাকে উপোষ করতে হলো। বন্ধুর সঙ্গে নাটক দেখলাম কিন্তু আমি যা করেছিলাম সে সম্পর্কে একটি কথাও তিনি বললেন না। আমার পক্ষ থেকেও অবশ্য বলার কিছু ছিল না।

ওটাই ছিল দু'বন্ধুর মধ্যে শেষ ঝগড়া। আমাদের সম্পর্কের ওপর এর বিন্দুমাত্রও প্রভাব পড়েনি। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম বন্ধুর প্রচেষ্টার পেছনে আমার জন্য তাঁর ভালোবাসাই কাজ করেছে এবং আমাদের মাঝে চিন্তা ও কাজের ভিন্নতা তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিলাম তাঁকে স্বস্তি দেব। তাঁকে আশ্বস্ত করব যে আমি আর অমার্জিত থাকব না, বরং চেষ্টা করব ভদ্র সমাজের উপযুক্ত অন্যান্য গুণাবলী অর্জন করে নিরামিষ আহারের ঘাটতি পূরণ করতে। আর এ উদ্দেশ্য নিয়েই ইংলিশ জেন্টলম্যান হওয়ার জন্য যত্তসব অসম্ভব চেষ্টায় রত হলাম। বোম্বেতে বানানো কাপড়-চোপড় যা আমি পরছি সেসব বেমানান মনে করে আর্মি ও নেভী স্টোর থেকে নতুন কাপড় কিনলাম। একটা চিমনীপট হ্যাটও কিনলাম উনিশ শিলিং দিয়ে—ঐ সময়ের জন্য দামটা অত্যন্ত বেশি। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে লন্ডনের ফ্যাশান কেন্দ্র বন্ড স্ট্রীট থেকে দশ পাউন্ড ব্যয় করে ইভনিং স্যুট বানালাম। আমার ভালোমানুষ দাদাকে বললাম আমার জন্য সোনার ডবল

www.pathagar.com

চেইনসহ ঘড়ি পাঠাতে। রেডিমেড টাই পরা ঠিক নয় ভেবে নিজে টাই বাঁধার কৌশল রপ্ত করলাম। ভারতে যখন নাপিত শেভ করত তখন আয়নার ব্যবহার ছিল বিলাসিতা। এখানে আমি প্রতিদিন দশ মিনিট ব্যয় করতে থাকলাম বিরাট এক আয়নার সামনে টাই পরা আর চুলের ভাঁজ সঠিক ফ্যাশান মতো হয়েছে কিনা তা দেখতে। আমার চুল মোটেই নরম ছিল না এবং তা সঠিক অবস্থানে রাখতে ব্রাশ নিয়ে রীতিমতো কসরত করতে হতো। প্রতিবারে টুপি পরা আর খোলার সময় হাত অটোমেটিক মাথায় উঠে যেত চুল ঠিক করতে। ভদ্র সমাজে যখন বসতাম তখন হাতের অন্যান্য ব্যবহারের অভ্যাসের কথা নাই বা বললাম।

এত কিছু করার পরেও তা যথেষ্ট মনে হলো না। আরো খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হলাম যা আমাকে ইংলিশ জেন্টলম্যান করে তুলতে পারে। আমাকে বলা হলো নাচ শিখতে হবে, ফ্রেঞ্চ ভাষা ও বাগ্মীতা শিখতে হবে। ফ্রেঞ্চ কেবল প্রতিবেশী দেশ ফ্রান্সের ভাষা নয়, তা ছিল ইউরোপ মহাদেশের সর্বজনীন ভাষা। আর আমার ইচ্ছেও ছিল পুরো মহাদেশ ঘুরে বেড়ানোর। আমি নাচের ক্লাশে ভর্তি হলাম, এক টার্মের জন্য তিন পাউন্ড দিয়ে। তিন সপ্তাহে বোধ হয় ছয়টি পাঠ নিয়েছিলাম। কিন্তু তালে তালে অঙ্গ সঞ্চালন আমার দ্বারা সম্ভব ছিল না। পিয়ানোর সুর বুঝতাম না। তাই তাল মিলানো ছিল আমার পক্ষে অসম্ভব। এ অবস্থায় কি আর করা? হিতোপদেশ এর সন্ন্যাসী ইঁদুর তাড়াতে বিড়াল, বিড়ালকে খাওয়াতে গরু, গরু পুষতে রাখাল রেখেছিলেন। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ঐ সন্ন্যাসীর পরিবারের মতো বেড়ে চলল। ভাবলাম, পশ্চিমা সংগীত বোঝার জন্য শ্রবণ শক্তি উন্নত করতে বেহালা বাজানো শেখা উচিত। সুতরাং তিন পাউন্ড দিয়ে বেহালা কিনলাম এবং শেখার জন্য ফি বাবদ আরো কিছু ব্যয় করলাম। বাগ্মীতা শেখার জন্য তৃতীয় একজন শিক্ষকের নিকট গেলাম এবং প্রাথমিক ফি বাবদ তাকে এক গিনি দিলাম। তিনি বেল এর লেখা "স্ট্যান্ডার্ড ইলোকিউশান" বইটি পড়তে বললেন টেক্সট বুক হিসেবে। আমি ওটা কিনে ফেললাম এবং পিট এর একটা বক্তৃতা দিয়ে শুরু করলাম।

কিন্তু মি. বেল আমার কানে বিপদের বেল (ঘন্টা) বাজিয়ে দিলেন এবং আমার চৈতন্যোদয় হলো। আমিতো সারা জীবন ইংল্যান্ডে থাকতে আসিনি- নিজেই নিজেকে বললাম। সুতরাং বাগ্মীতা শিখে লাভ কি? আর নাচ শিখলেই আমি কিভাবে জেন্টলম্যান হব? বেহালা বাজানো তো আমি ভারতেও শিখতে পারি। আমি একজন ছাত্র এবং পড়াশুনা করাই আমার কর্তব্য। আমাকে ইনস অব কোর্ট এর সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। আমার চরিত্র যদি আমাকে ভদ্রলোক করে তোলে সেটাই হবে আমার জন্য উত্তম। আমার অন্যায় উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে।

এ জাতীয় চিন্তা ভাবনা আমাকে পেয়ে বসল। এসব চিন্তার কথা জানিয়ে আমি বাগ্মীতার শিক্ষককে একটা পত্রে লিখলাম এবং অনুরোধ করলাম তাঁর ক্লাশ করা থেকে আমাকে অব্যাহতি দিতে। আমি মাত্র দুটো কি তিনটে ক্লাশ

www.pathagar.com

করেছিলাম। অনুরূপ পত্র লিখলাম নাচের শিক্ষককে। আর বেহালা শিক্ষকের কাছে নিজেই গেলাম। বেহালাটা যে কোন দামে বেচে দেয়ার অনুরোধ করলাম। তিনি আমার বন্ধুর মতো ছিলেন। সুতরাং তাকে আমি বললাম কিভাবে আমি মিথ্যা আদর্শের পেছনে ছুটছি। আমি পূর্ণ পরিবর্তনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাতে তিনি উৎসাহ যোগালেন।

আমার এ মোহ মাস তিনেক টিকেছিল। পোষাকের কেতা দুরস্ততা টিকেছিল কয়েক বছর। কিন্তু এর পর থেকে আমি পুরোদস্তুর ছাত্র বনে গেলাম।

ষোল
পরিবর্তন

পাঠক যেন না ভাবেন যে নাচ বা এরকম বিষয় নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমার জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতার পর্ব ছিল। তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ করে থাকবেন যে তখনো আমার জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পায়নি। আমার অন্তর্দর্শনের ফলে সেই সময়ের মোহগ্রস্ততা কিছুটা কাটিয়ে উঠেছি। যা খরচ করতাম তার প্রতিটি পয়সার হিসাব রাখতাম। খরচও করতাম খুব হিসাব করে। খরচের প্রতিটি খাত যেমন—বাস ভাড়া, পোস্টাল খরচ, খবরের কাগজ কেনা সবই লিখতাম এবং প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে হিসাব মিলাতাম। সেই থেকে ঐ অভ্যাস আমার আজো রয়েছে এবং আমি জানি, এ অভ্যাসের ফলেই আমি লক্ষ লক্ষ সরকারী টাকা ব্যয় করেছি, কিন্তু সে টাকা বিতরণে কঠোর মিতব্যয়িতা অবলম্বনে সফল হয়েছি এবং অতিরিক্ত ব্যয়জনিত ঘাটতির পরিবর্তে প্রতিটি ক্ষেত্রেই টাকা বাঁচিয়েছি। প্রত্যেক যুবকের উচিত আমার খাতার কোনো একটি পাতা থেকে কিভাবে তার পকেটে আসা ও পকেট থেকে বের হয়ে যাওয়া প্রতিটি পয়সার হিসাব রাখতে হয় তার শিক্ষা নেয়া। তাহলে সে আমার মতোই লাভবান হবে।

যেহেতু নিজের জীবন যাত্রার ওপর কড়া নজর রাখতাম, বুঝতাম যে মিতব্যয়িতার প্রয়োজন আছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিলাম আমার খরচ অর্ধেক কমাব। ব্যয়ের তালিকায় অগণিত ভাড়ার হিসাব ছিল। আবার একটা পরিবারের সাথে থাকার বাবদ সাপ্তাহিক বিল পরিশোধ করতে হতো। এর মধ্যে সৌজন্যের খাতিরে ঐ পরিবারের সদস্যদের মাঝে মধ্যে বাইরে নিয়ে খাওয়ানো ও তাদের সাথে বিভিন্ন পার্টিতে যোগ দেয়ার ব্যয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব কারণে যাতায়াত ভাড়া বাবদ অনেক বেশি ব্যয় হতো। বিশেষ করে যদি মেয়ে বন্ধু থাকত তাহলে প্রচলিত নিয়মে পুরুষ সংগীকেই সকল ব্যয়ভার বহন করতে হতো। এ ছাড়াও বাইরে খাওয়ার অর্থ হলো অতিরিক্ত ব্যয়, কারণ ঘরে না খাওয়ার টাকা সপ্তাহের নিয়মিত বিল থেকে বাদ যেত না। ভাবলাম, এসব খাতের ব্যয় এবং মেকী শালীনতাবোধের জন্য অযাচিত ব্যয় সাশ্রয় করা সম্ভব। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিলাম কোনো পরিবারের সাথে থাকার বদলে নিজের জন্য আলাদা রুম নেব এবং আমার

www.pathagar.com

কাজের ধরন বুঝে স্থান পরিবর্তন করব। এতে আমার অভিজ্ঞতাও বাড়বে। রুমগুলো এমনভাবে বেছে নিতাম যেন আধা ঘন্টা হাঁটলে কর্মস্থলে পৌঁছা যায়। এতে বাস ভাড়া বাঁচবে। ইতিপূর্বে কোথাও যাওয়ার জন্য সর্বদা কোন এক ধরনের যানবাহন ভাড়া করতাম, পরে আবার হাঁটার জন্য অতিরিক্ত সময়ও বের করতে হতো। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় হাঁটার সাথে ব্যয় সাশ্রয় যুক্ত হলো। কারণ এতে ভাড়া বাঁচল আর প্রতিদিন আট থেকে দশ মাইল হাঁটাও হলো। আসলে এই দীর্ঘ পথ হাঁটার অভ্যাসই ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে আমাকে রোগ বালাই থেকে রক্ষা করেছে এবং শরীরকে শক্ত সমর্থ করেছে।

অতএব আমি দু'রুমের একটি বাসা ভাড়া নিলাম—এর একটি শোবার ঘর, অপরটি বসার। এটা ছিল দ্বিতীয় পর্ব। তৃতীয় পর্ব আসবে আরো পরে।

এ পরিবর্তনের ফলে আমার ব্যয় অর্ধেক কমে গেল। কিন্তু আমি সময় কাটাব কিভাবে? জানতাম, বারের পরীক্ষার জন্য বেশি পড়ার প্রয়োজন নেই। সেজন্য আমার সময় সাশ্রয়ের চাপ ছিল না। ইংরেজী ভাষায় দুর্বলতা আমার সার্বক্ষণিক দুঃশ্চিন্তার কারণ ছিল। মি. (পরবর্তীতে স্যার) লেলির কথা "প্রথমে গ্রাজুয়েট হও, তারপর এসো" এখনো আমার কানে বাজে। ভাবলাম, কেবল বারে যোগদান করলেই হবে না আমাকে সাহিত্যেও একটা ডিগ্রী নিতে হবে। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স সম্পর্কে খোঁজ নিলাম, বন্ধুদের সাথে আলাপ করলাম এবং জানলাম যে এ দুটোর কোনো একটাতে ভর্তি হলে আমার ব্যয় যেমন বাড়বে তেমনি যত দিনের প্রস্তুতি নিয়ে এসেছি তার চেয়ে অনেক বেশি দিন ইংল্যান্ডে থাকতে হবে। এক বন্ধু পরামর্শ দিলেন, আমি যদি কঠিন কিছু পড়তে চাই তাহলে লন্ডন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে পারি। এতে যথেষ্ট খাটতে হবে এবং সাধারণ জ্ঞানের ভাণ্ডার অনেক উন্নত হবে। উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যয়ও হবে না। সানন্দে এ পরামর্শ গ্রহণ করলাম। কিন্তু সিলেবাস দেখে ভড়কে গেলাম। ল্যাটিন ও আরেকটি আধুনিক ভাষা অবশ্যপাঠ্য। ল্যাটিন কিভাবে আয়ত্ত করব? কিন্তু বন্ধুটি জোরালো যুক্তি দেখালেন, "আইনজীবীদের জন্য ল্যাটিন অতি মূল্যবান। আইনের বই বুঝতে হলে ল্যাটিন ভাষার জ্ঞান খুবই সহায়ক। রোমান ল' এর একটি পেপার সম্পূর্ণই ল্যাটিন ভাষায়। তদুপরি ল্যাটিনের জ্ঞান থাকা মানে ইংরেজীর ওপর বেশি দখল।" আমি গুরুত্বটা বুঝলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম যে যত কঠিনই হোক ল্যাটিন শিখবই। ইতিমধ্যে ফ্রেঞ্চ শেখা শুরু করেছিলাম। সুতরাং ওটাই আধুনিক ভাষা বলে চালিয়ে দেয়া যাবে। বেসরকারীভাবে পরিচালিত ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশে যোগ দিলাম। প্রতি ছয় মাসে একবার করে পরীক্ষা হতো। আমার হাতে সময় ছিল পাঁচ মাস। আমার জন্য এটা প্রায় অসম্ভব কাজ ছিল। কিন্তু ইংলিশ জেন্টলম্যান হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাকে একনিষ্ঠ ছাত্রে পরিণত করল। প্রতিটি মিনিট হিসেব করে নিজের সময়সূচী তৈরি করলাম। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও ল্যাটিন ও ফ্রেঞ্চ আয়ত্ত করতে আমার মেধা ও স্মরণ শক্তি কোনোটাই সক্ষম হবে বলে মনে হলো না। ফলে

www.pathagar.com

দেখা গেল আমি ল্যাটিনে ফেল করেছি। দুঃখ পেলাম কিন্তু আশা ছাড়লাম না। ল্যাটিন আমার পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। এটাও ভাবলাম, ফ্রেঞ্চ নিয়ে আরো একবার চেষ্টা করাই ভালো হবে এবং বিজ্ঞান গ্রুপে আর একটা নতুন বিষয় নির্বাচন করব। বিজ্ঞানের বিষয় হিসেবে আমার রসায়ন ছিল, কিন্তু পরীক্ষণের অভাবে এতে আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। অথচ এটা খুব গভীর আগ্রহের একটা বিষয় হওয়া উচিত ছিল। ভারতে এটা ছিল আমার আবশ্যিক বিষয় এবং সে কারণে আমি লন্ডন ম্যাট্রিকুলেশনেও এটা রাখলাম। অবশ্য এবারে আমি রসায়নের পরিবর্তে "তাপ ও আলো" বেছে নিলাম। বলা হতো এগুলো সহজ এবং পড়তে গিয়েও এগুলো সহজই মনে হয়েছে।

আরেকটি পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্বে আমার জীবনযাত্রা আরো সহজ করার চেষ্টা করলাম। অনুভব করলাম যে আমার জীবনযাত্রা এখনো আমার পরিবারের সামর্থ্যের সাথে মানানসই হয়নি। আমার সংগ্রামী দাদা, যিনি একজন মহৎপ্রাণ ব্যক্তি, প্রতিবার টাকা চাওয়ার সাথে সাথেই টাকা পাঠাতেন। তাঁর কষ্টের কথা চিন্তা করে মন ব্যথা ভারাক্রান্ত হতো। লক্ষ করলাম, যারা প্রতি মাসে আট থেকে পনের পাউন্ড খরচ করে তাদের অধিকাংশই বৃত্তির সুবিধা পায়। আরো অনেক সহজভাবে জীবন যাপনের দৃষ্টান্ত আমার সামনেই ছিল। বেশ কয়েকজন গরিব ছাত্রের সাথে পরিচয় হয়েছিল যারা আমার চেয়েও সরল জীবন যাপন করে। এদের একজন বস্তির এক রুমে সপ্তাহে দু' শিলিং ভাড়ায় থাকত এবং লকহার্টের সস্তা কোকো রুম থেকে দুই পেনির কোকো ও রুটি খেয়ে নিত। তাদের সমকক্ষ হওয়ার চিন্তা করতাম না, তবে ভাবলাম নিশ্চয়ই আমার দুই রুমের বদলে একটা রুম হলেই চলে এবং কিছু খাবার আমি নিজেই রেঁধে নিতে পারি। তাতে মাসে আমার চার থেকে পাঁচ পাউন্ড সাশ্রয় হবে। সাদাসিধে জীবন যাপনের ওপর কিছু বইও পেয়ে গেলাম। দুই রুমের বাসা ছেড়ে দিয়ে এক রুম ভাড়া নিলাম, কিছু ব্যয় করে একটা চুলা কিনলাম এবং সকালের নাস্তা রুমেই তৈরি করতে শুরু করলাম। এতে আমার বিশ মিনিটের বেশি সময় লাগত না, কারণ রান্নার মধ্যে ছিল যবের ছাতুর পরিজ (ওটমিল) আর কোকোর জন্য পানি ফোটানো। দুপুরে বাইরে খেয়ে নিতাম আর রাতে রুমেই কোকোর সাথে রুটি খেয়ে নিতাম। এভাবে আমি দৈনিক ব্যয় এক শিলিং তিন পেনিতে নামিয়ে আনলাম। এ সময়টা কঠোর পড়াশুনারও সময় ছিল। সহজ সরল জীবন যাপন আমার প্রচুর সময় বাঁচিয়েছিল এবং আমি পরীক্ষায় পাশ করলাম।

পাঠক যেন না ভাবেন যে এরূপ জীবন যাপন আমার জন্য নিরানন্দের ব্যাপার ছিল। বরং উল্টো তা আমার আত্মিক ও বাহ্যিক জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছিল। এবং তা আমার পরিবারের সামর্থ্যের সাথেও ছিল মানানসই। নিশ্চিতভাবেই আমার জীবন হয়ে উঠল আরো সত্যাশ্রয়ী ও অপার আনন্দে ভরপুর।

www.pathagar.com

সতের

পথ্যবিদ্যা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

আত্ম-অনুসন্ধান যতই গভীর হতে থাকল নিজের অন্তর ও বাইরে পরিবর্তনের তাগিদ ততই বাড়তে থাকল। জীবন যাপনের ব্যয় ও পদ্ধতিতে পরিবর্তন সাধনের সাথে সাথেই আমার খাদ্যেরও পরিবর্তন ঘটাতে থাকলাম। দেখলাম যে নিরামিষ সমর্থক লেখকগণ নিরামিষ আহারের বিষয়টি ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে গভীরভাবে পরীক্ষা করেছেন। ন্যায় নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের ওপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মানে এই নয় যে সে ওদেরকে মেরে খাবে, বরং সবলের উচিত দুর্বলকে রক্ষা করা এবং উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তোলা, যেমনটি মানুষে মানুষে হয়ে থাকে। তাঁরা এ সত্যও প্রচার করেছেন যে মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে আনন্দের জন্য নয়, বেঁচে থাকার জন্য। তদনুযায়ী তাঁদের কেউ কেউ শুধু মাংস নয়, ডিম-দুধ খেতেও নিষেধ করেছেন এবং নিজেদের জীবনে পালনও করেছেন। কেউ কেউ এমন সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষের দৈহিক গঠন রান্না করা খাদ্য গ্রহণের উপযোগী করে সৃষ্ট নয়, বরং সে একটা ফলাহারী প্রাণী যে কেবল মায়ের দুধ পান করতে পারে এবং দাঁত ওঠার সাথে সাথেই সে শক্ত খাবার খেতে পারে। চিকিৎসা শাস্ত্র রান্নায় সকল প্রকার মশলা-পাতির ব্যবহার বাতিল করে দিয়েছে। বাস্তবতা ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা প্রমাণ দেখিয়েছেন যে নিরামিষ আহার সবচেয়ে কম ব্যয়বহুল। এসব বিবেচনা আমাকে প্রভাবিত করেছিল। নিরামিষ রেস্টুরেন্টে আমি সকল শ্রেণীর নিরামিষ ভোজীর সাক্ষাৎ পেলাম। ইংল্যান্ডে নিরামিষ ভোজীদের একটি সমিতি ছিল। তাদের নিজস্ব সাপ্তাহিক পত্রিকাও ছিল। আমি চাঁদা দিয়ে ঐ সমিতিতে যোগদান করলাম এবং অল্প দিনের মধ্যেই নির্বাহী কমিটির সদস্য হলাম। এখানে আমি নিরামিষ ভোজনের প্রবক্তা বলে খ্যাত ব্যক্তিদের সাথে পরিচিত হলাম এবং পথ্য শাস্ত্রে আমার নিজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলাম।

বাড়ি থেকে আনানো মিষ্টি ও মশলা খাওয়া বন্ধ করে দিলাম। মনের গতি পরিবর্তনের ফলে মশলাদার খাবারে আগ্রহ কমে গেল। রিচমন্ডে থাকতে মশলা বিহীন যে সিদ্ধ সবজি পানসে বিস্বাদ লাগত তা এখন সুস্বাদু বলে মনে হলো। এরকম আরো অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে নিশ্চিত হলাম যে খাবারের আসল স্বাদ জিহ্বায় নয়, মনে।

আমার কাছে ব্যয়ের বিষয়টা সর্বদাই বিবেচ্য ছিল। সেকালে একদলের অভিমত ছিল চা ও কফি ক্ষতিকর। তাঁরা কোকো পানের পক্ষে ছিলেন। আমি যেহেতু বুঝতে পেরেছিলাম শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যা প্রয়োজন আমার তাই কেবল খাওয়া উচিত, তাই আমি চা ও কফি ত্যাগ করে তার বদলে কোকো পানের সিদ্ধান্ত নিলাম।

www.pathagar.com

আমি যে রেস্টুরেন্টে যেতাম সেখানে দুটো ভাগ ছিল। এক ভাগে ধনী লোকেরা যেত। সেখানে বহু পদের খাবার থেকে যে কোনোটা বেছে নেয়া যেত। প্রতিবার আহারের ব্যয় ছিল এক থেকে দুই শিলিং। অন্য ভাগে এক স্লাইস রুটির সাথে থাকত তিন পদের খাবার, দাম ছয় পেনি। আমার কঠোর মিতব্যয়িতার সময়ে আমি সাধারণত এই দ্বিতীয় ভাগে খেতাম।

মূল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি আরো অনেক ছোটখাটো পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছিল। যেমন, এক বেলা শর্করা সমৃদ্ধ খাবার না খাওয়া, অন্য বেলায় শুধু রুটি ও ফলাহার করা, আবার কখনো পনির, দুধ ও ডিম খাওয়া। শেষের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাটা উল্লেখ করার মতো। এটা এক পক্ষকালও টেকেনি। যে খাদ্য বিশারদ শর্করা বিহীন খাবারের প্রবক্তা ছিলেন তিনি উচ্চ কণ্ঠে ডিম খেতে বলেছেন এবং তাঁর মত হলো ডিম তো মাংস নয়। স্পষ্টতই দেখা যচ্ছে যে ডিম খেতে গিয়ে কোনো জীবিত প্রাণীকে আঘাত দেয়া হচ্ছে না। এই যুক্তি মেনে নিয়ে আমার প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও ডিম খেতে থাকলাম। কিন্তু আমার এ ভ্রান্তি ছিল সাময়িক। প্রতিজ্ঞার নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করানো তো আমার কাজ নয়। আমার প্রতিজ্ঞার ব্যাখ্যা তো দেবেন আমার মা যিনি আমাকে এই প্রতিজ্ঞা করিয়েছেন। আমি জানি তাঁর মাংসের সংজ্ঞায় ডিমও অন্তর্ভুক্ত। যখনই আমি প্রতিজ্ঞার সত্যিকার মর্ম বুঝতে পারলাম তৎক্ষণাৎ ডিম খাওয়া ছেড়ে দিলাম, সেই সাথে এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষারও পরিসমাপ্তি ঘটল।

এ যুক্তির মধ্যে একটি সুন্দর অন্তর্নিহিত বক্তব্য আছে যা উল্লেখ করার মতো। ইংল্যান্ডে আমি মাংসের তিনটি সংজ্ঞা পেয়েছিলাম। প্রথমটার মতে মাংস বলতে কোনো পশু বা পাখির গোশত বুঝায়। যেসব নিরামিষ ভোজী এ সংজ্ঞা মানতেন তাঁরা পশু ও পাখির গোশত বাদ দিতেন, কিন্তু মাছ খেতেন, ডিমের তো কথাই নেই। দ্বিতীয় সংজ্ঞা মতে মাংস মানেই হচ্ছে সকল জীবিত প্রাণীর গোশত। সুতরাং এদের মতে মাছ খাওয়ার প্রশ্ন নেই, তবে ডিম খাওয়ার অনুমতি আছে। তৃতীয় সংজ্ঞাতে জীবিত প্রাণীর গোশতের মধ্যে ঐসব প্রাণীর উৎপাদিত দ্রব্যাদিও অন্তর্ভুক্ত যার মধ্যে ডিম-দুধও পড়ে। প্রথম সংজ্ঞা মানলে আমি শুধু ডিম নয়, মাছও খেতে পারতাম। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম যে আমার মায়ের দেয়া সংজ্ঞাই আমার জন্য পালনীয়। সুতরাং আমি প্রতিজ্ঞা পালন করতে গেলে অবশ্যই ডিম খাওয়া বাদ দিতে হবে। আমি করলামও তাই। এটা মেনে চলা কষ্টকর ছিল এজন্যে যে জিজ্ঞেস করলে জানা যেত নিরামিষ রেস্টুরেন্টে অনেক খাবারের পদে ডিম থাকত। তার অর্থ যতক্ষণ আমি না জানছি কোনটা কি দিয়ে তৈরি, আমাকে বিব্রতকর পদ্ধতিতে নিশ্চিত হতে হতো কোনো একটা বিশেষ খাবারে ডিম আছে কি না, কারণ অনেক পুডিং ও কেক ডিম ছাড়া তৈরি হতো না। যদিও এ যাচাই পদ্ধতি কষ্টকর ছিল তবু এতে আমার খাবার সহজ হয়ে গেল। খাবারের সহজীকরণ বিরক্তিরও কারণ হলো, কারণ আমাকে কয়েক প্রকার সুস্বাদু খাবার

www.pathagar.com

ছেড়ে দিতে হলো। তবে এসব অসুবিধা ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী কারণ কঠোরভাবে প্রতিজ্ঞা পালন আমার মধ্যে অন্য রকম স্বাদের অনুভূতি সৃষ্টি করল যা স্পষ্টভাবেই বেশি স্বাস্থ্যকর, সূক্ষ্ম ও স্থায়ী। অবশ্য প্রকৃত পরীক্ষা তখনো বাকী এবং সেটা অন্য প্রতিজ্ঞার বেলায়। কিন্তু ঈশ্বর যাকে রক্ষা করেন কে তার ক্ষতি করতে পারে!

প্রতিজ্ঞা বা শপথের ব্যাখ্যার পর্যালোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রতিজ্ঞার ব্যাখ্যা পৃথিবীব্যাপী সংঘাত সৃষ্টিতে সফল হয়েছে। প্রতিজ্ঞার ভাষা যত স্পষ্টই হোক, মানুষ তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এর বিকৃত ব্যাখ্যা করে থাকে। সমাজের সকল শ্রেণীতেই– কি ধনী কি গরিব, কি রাজপুত্র কি চাষা, সবার মধ্যেই তা পাওয়া যাবে। আত্ম-কেন্দ্রিকতা তাদেরকে অন্ধ করে দেয়, এবং দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করে তারা নিজেদেরকে ধোঁকা দেয়, সারা পৃথিবী এবং ঈশ্বরকেও ধোঁকা দিতে চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে একটা সুবর্ণ নীতি হচ্ছে যিনি শপথ করাচ্ছেন সততার সাথে তার ব্যাখ্যাকেই মেনে নেয়া। অন্যটি হচ্ছে যেখানে দুটি ব্যাখ্যা সম্ভব সেখানে দুর্বলটিকে মেনে নেয়া। এ দুটি নীতি বাতিল করলে দেখা দেয় সংঘাত ও অবিচার, যার শিকড় প্রথিত থাকে অসত্যের গভীরে। যে একাকী সত্যের সন্ধানে থাকে সে সুবর্ণ নীতি মেনে চলে। ব্যাখ্যার জন্য তার পণ্ডিতের উপদেশ দরকার হয় না। সুবর্ণ নীতি অনুসারে মাংস সম্পর্কে আমার মায়ের ব্যাখ্যাই ছিল আমার জন্য একমাত্র সত্য, বৃহত্তর অভিজ্ঞতা লব্ধ বা গর্বিত পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে শেখা ব্যাখ্যা নয়।

ইংল্যান্ডে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো পরিচালিত হয়েছিল মিতব্যয়িতা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের নিরিখে। দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার আগে পর্যন্ত ধর্মীয় দিক তখনো বিবেচনায় আসেনি। দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমি অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছি, যা পরে বর্ণনা করব। তার বীজ অবশ্য রোপিত হয়েছিল ইংল্যান্ডেই। জন্মসূত্রে ধার্মিকের তুলনায় একজন নবদীক্ষিতের ধর্মীয় উদ্দীপনা বেশি থাকে। নিরামিষ আহারের মতবাদ তখন ইংল্যান্ডে নতুন ছিল। আমার জন্যও তা ছিল নতুন। কারণ, আগেই বলেছি, আমি সেখানে গিয়েছি মাংস খাওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে এবং পরে নিরামিষ ভোজীতে রূপান্তরিত হয়েছি। নিরামিষ ভোজনে নব দীক্ষিতের পূর্ণ উদ্দীপনা নিয়ে বে'জ ওয়াটার (Bay's Water) এলাকায় একটি নিরামিষ ভোজী ক্লাব গঠনের সিদ্ধান্ত নিলাম। স্যার এডউইন আরনল্ড, যিনি ওখানেই থাকতেন, তাঁকে আমন্ত্রণ করলাম সহ-সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য। দি ভেজিটারিয়ান পত্রিকার সম্পাদক ড. ওল্ডফিল্ড হলেন সভাপতি। আমি নিজে হলাম সেক্রেটারী। ক্লাবটা কিছুদিন ভালোই চলল, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেল। কারণ আমি কিছুদিন পর পর এলাকা বদলের অভ্যাস মতো ঐ এলাকা ত্যাগ করলাম। কিন্তু এই স্বল্প ও সীমিত সময়ের অভিজ্ঞতা আমাকে কোনো প্রতিষ্ঠান সংগঠন ও পরিচালনার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল।

www.pathagar.com

আঠার
লজ্জা আমার বর্ম

আমি ভেজিটেরিয়ান সমিতির নির্বাহী কমিটির সদস্য পদে নির্বাচিত হলাম এবং প্রতিটি মিটিং এ উপস্থিত থাকাটা নিয়মে পরিণত করলাম। কিন্তু মিটিং-এ আমি বাকরুদ্ধ থাকতাম। ড. ওল্ডফিল্ড একবার আমাকে বললেন, "আমার সাথে তুমি ভালোই কথা বল, কিন্তু কমিটির মিটিং-এ তুমি মুখ খোল না কেন? তুমি একটা পুরুষ মৌমাছি।" তিরস্কারটা আমি মেনে নিলাম। মৌমাছিরা সদা ব্যস্ত, কিন্তু পুরুষ মৌমাছি পুরোপুরি অলস। আর এটা কম কৌতূহলের বিষয় ছিল না যে এসব মিটিং-এ সবাই যখন তাদের মতামত ব্যক্ত করছে, আমি তখন চুপচাপ বসে আছি। কথা বলার লোভ হয়নি তা নয়, কিন্তু নিজেকে কিভাবে প্রকাশ করব তা ভাবতেই হতবুদ্ধি হয়ে যেতাম। অন্য সব সদস্যগণ আমার চেয়ে বেশি জানে বলে মনে হতো। প্রায়ই এরকম ঘটত যে যখন আমি কথা বলার সাহস সঞ্চয় করে উঠেছি, তখন নতুন কোনো বিষয় নিয়ে কথাবার্তা শুরু হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে এভাবেই চলেছে।

ইত্যবসরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনায় স্থান পেল। ভাবলাম অনুপস্থিত থাকা ঠিক হবে না এবং নীরবে ভোট দিয়ে দেয়াও কাপুরুষতার লক্ষণ বলে মনে হলো। আলোচনাটা উঠল এভাবে। সমিতির সভাপতি ছিলেন মি. হিলস, টেমস আয়রন ওয়ার্কস এর মালিক। তিনি ছিলেন পিউরিটান। বলা যায় যে সমিতির অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে তাঁর আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। কমিটির সদস্যদের অনেকেই ছিলেন কম বেশি তাঁর অনুগ্রহভাজন। খ্যাতিমান নিরামিষ ভোজী ড. আলিসনও কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। তিনি ছিলেন নব্য জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের প্রবক্তা এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে তাঁর মতবাদ প্রচার করতেন। মি. হিলস আবার এই মতবাদকে নৈতিকতার মূলে কুঠারাঘাত বলে মনে করতেন। তিনি ভাবলেন ভেজিটেরিয়ান সমিতির উদ্দেশ্য কেবল পথ্যবিদ্যা সম্পর্কিত নয়, বরং নৈতিক সংস্কারও এর আওতাভুক্ত এবং ড. আলিসনের মতো অ্যান্টি-পিউরিটান ব্যক্তিকে সমিতিতে থাকতে দেয়া উচিত নয়। সুতরাং তাঁকে সরিয়ে দেয়ার প্রস্তাব আনা হলো। এ প্রশ্নটা আমাকে গভীরভাবে আগ্রহী করে তুলল। আমার বিবেচনায় ড. আলিসনের কৃত্রিম জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কিত মতামত ছিল বিপজ্জনক এবং একজন পিউরিটান হিসেবে মি. হিলস এর অধিকার ছিল তাঁর বিরোধিতা করার। মি. হিলস ও তাঁর বদান্যতার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু আমার মতে কোনো ব্যক্তি কেবল পিউরিটান নৈতিকতাকে সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য বলে স্বীকার না করার কারণে তাকে বহিষ্কার করাটা সঠিক নয়। অ্যান্টি পিউরিটানদেরকে সমিতি থেকে বহিষ্কার সংক্রান্ত মি. হিলস এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং সমিতির ঘোষিত উদ্দেশ্য অর্থাৎ নিরামিষ ভোজনে উৎসাহ প্রদান, নৈতিকতার উন্নয়ন নয়। এর সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং আমার মত হলো, যে কোনো নিরামিষ

www.pathagar.com

ভোজী সমিতির সদস্য হতে পারে, অন্য নৈতিকতার বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক না কেন।

কমিটিতে আমার সাথে একমত পোষণকারী সদস্য আরো ছিলেন, কিন্তু আমার মতামত নিজেই ব্যক্ত করা উচিত বলে মনে হলো। কিন্তু প্রশ্ন হলো কিভাবে তা করব? কথা বলার সাহস আমার ছিল না। সুতরাং আমার কথাগুলো লিখে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলাম। কাগজটা পকেটে নিয়ে মিটিং-এ গেলাম। যতদূর মনে পড়ে আমি নিজে ওটা পড়তেও পারিনি। সভাপতি অন্য একজনকে দিয়ে তা পড়িয়েছিলেন। ড. আলিসন হেরে গেলেন। এভাবে জীবনের প্রথম যুদ্ধে আমি নিজেকে দেখতে পেলাম হেরে যাওয়ার দলে। কিন্তু আমার যুক্তি সঠিক ছিল এই ভেবে সান্ত্বনা পেলাম। আমার হালকা মনে আছে যে ঐ ঘটনার পরে আমি কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছিলাম।

আমার এই লাজুকতা ইংল্যান্ডে থাকাকালে বরাবরই ছিল। এমনকি সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রেও অর্ধ ডজন বা তার বেশি লোকের উপস্থিতি আমাকে বাকরুদ্ধ করে ফেলত।

শ্রীযুক্ত মাজমুদার এর সাথে একদিন ভেন্টনর গেলাম। সেখানে আমরা একটা নিরামিষ ভোজী পরিবারের সাথে থাকলাম। "পথ্যের নীতি" (The Ethics of Diet) বইটির লেখক মি. হাওয়ার্ডও একই এলাকায় থাকতেন। আমরা তাঁর সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাদেরকে আমন্ত্রণ করলেন নিরামিষ আহারের পক্ষে আয়োজিত এক সভায় বক্তৃতা করতে। আমি দেখেছি যে লিখিত বক্তৃতা পাঠ করায় দোষের কিছু নেই। কারণ নিজেদের কথা সংক্ষেপে ও প্রাসঙ্গিকভাবে তুলে ধরতে অনেকেই তা করে থাকেন। আমার পক্ষে উপস্থিত বক্তৃতা করা অসম্ভব। সুতরাং আমি আমার বক্তৃতা লিখে নিয়েছিলাম। সেটা পড়ার জন্য দাঁড়ালাম বটে কিন্তু পড়তে পারলাম না। আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো, আমি কাঁপতে থাকলাম, যদিও বক্তৃতাটা ছিল ফুলস্কেপ এক পাতার। শ্রীযুক্ত মাজমুদারকে আমার পক্ষে ওটা পড়তে হলো। তাঁর নিজের বক্তৃতাটি অবশ্যই উত্তম হয়েছিল এবং প্রশংসিত হয়েছিল। আমি খুব লজ্জিত হলাম এবং নিজের অক্ষমতার জন্য খুব দুঃখ হলো।

ইংল্যান্ডে জনসমক্ষে বক্তৃতা করার শেষ চেষ্টা ছিল আমার দেশে ফেরার প্রাক্কালে। কিন্তু এবারেও আমি নিজেকে কেবল হাসির পাত্র করে তুলতে সক্ষম হলাম। আমার নিরামিষ ভোজী বন্ধুদেরকে হলবর্ণ রেস্টুরেন্টে আমার সাথে মধ্যাহ্ন ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। নিজের মনে বললাম, ভেজিটেরিয়ান ভোজ ভেজিটেরিয়ান রেস্টুরেন্টেই হওয়া উচিত। কিন্তু নন-ভেজিটেরিয়ান রেস্টুরেন্টেই বা তা হবে না কেন? এবং আমি হলবর্ন রেস্টুরেন্টের ম্যানেজারের সাথে কথা বলে বিশুদ্ধ ভেজিটেরিয়ান ভোজের ব্যবস্থা করলাম। নিরামিষ ভোজীরা আমার এ পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে স্বাগত জানাল। সব ভোজেরই উদ্দেশ্য থাকে আনন্দ উপভোগ, কিন্তু পশ্চিমারা এটাকে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। ভোজের আয়োজনে থাকে জাঁকজমক, সংগীত ও বক্তৃতা। এবং আমি যে ছোট্ট ভোজের আয়োজন

www.pathagar.com

করেছিলাম তা এসব প্রদর্শনী বর্জিত ছিল না। সুতরাং সেখানে বক্তৃতাও ছিল। আমার পালা এলে আমি বক্তৃতা করতে উঠে দাঁড়ালাম। খুব যত্ন করে ভেবে রেখেছিলাম অল্প কয়েকটি বাক্য বলব। কিন্তু প্রথম বাক্যের পরে আর বলতে পারলাম না। আমি এডিসনের গল্প পড়েছিলাম, যিনি হাউজ অব কমনস-এ তাঁর প্রথম বক্তৃতার শুরুতে "আমি মনে করি" (I conceive) তিন বার বলে আর কিছু বলতে পারেননি, তখন রসিক একজন উঠে বলেছিলেন, "ভদ্রলোক তিন বার গর্ভধারণ (conceive) করলেন, কিন্তু কিছুই প্রসব করলেন না।" ভেবেছিলাম, এ ঘটনার উলেখ করে একটি হাস্যরসপূর্ণ বক্তৃতা করব। সুতরাং এটা দিয়ে শুরু করতে গিয়েই আটকে গেলাম। আমার স্মৃতি পুরোপুরি লোপ পেল এবং হাস্যরসের বক্তৃতা করতে গিয়ে নিজেই হাসির পাত্র হয়ে গেলাম। "ভদ্রমহোদয়গণ, আমার নিমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে অনুগ্রহ করে আপনারা এসেছেন সে জন্য ধন্যবাদ"—এটুকু বলেই হঠাৎ বসে পড়লাম।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে গিয়ে আমার এ লাজুকতা কেটেছে, যদিও তা কখনো পুরোপুরি দূর হয়নি। পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া উপস্থিত বক্তৃতা করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। যখনই অজানা লোকদের সামনে যেতাম আমার সংকোচ বোধ হতো এবং পারলে কথা বলা এড়িয়ে যেতাম। এমনকি আজ পর্যন্তও আমার মনে হয় না যে কোনো সভায় বন্ধুদেরকে আমি খোশগল্পে মাতিয়ে রাখতে পারব।

তবে আমি বলব, কোনো কোনো সময় হাসির পাত্র হওয়া ছাড়া আমার স্বভাবজাত লাজুকতা নিয়ে কোনো অসুবিধা হয়নি। আমি দেখেছি প্রকৃতপক্ষে লাজুকতা বরং আমাকে সুবিধাই দিয়েছে। বক্তৃতা করতে দ্বিধা-সংকোচ, যা এক সময় বিরক্তিকর ছিল, এখন তা আনন্দের। এর সবচেয়ে বড় উপকারিতা হচ্ছে কি করে কম কথা বলতে হয় এটা আমাকে তা শিখিয়েছে। আমার চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার স্বাভাবিক অভ্যাস গড়ে তুলেছে। এখন নিজেকে আমি এমন সনদ দিতে পারি যে সুচিন্তিত নয় এমন কোনো কথা আমার মুখ বা কলম থেকে বের হয় না। আমার কথা বা লেখার মধ্যে কোনো কিছুর জন্য আমাকে কখনো অনুতাপ করতে হয়েছে বলে মনে পড়ে না। এভাবে আমি অনেক অঘটন ও সময়ের অপচয় থেকে বেঁচে গেছি। অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি যে সত্যের পূজারীর জন্য নীরবতা হচ্ছে আত্মিক শৃঙ্খলার অংশ। জ্ঞাতসারে হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, সত্যকে বাড়িয়ে বলার, গোপন করার বা পরিবর্তন করার প্রবণতা মানুষের স্বভাবজাত দুর্বলতা এবং একে পরাজিত করতে হলে নীরবতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। অল্প কথার লোক চিন্তা-ভাবনা না করে কথা বলেন না, তিনি প্রতিটা কথা বলেন মেপে মেপে। আমরা কত লোককে দেখি কথা বলার জন্য অধৈর্য হতে। এমন কোনো মিটিং নেই, যেখানে বক্তৃতা করার অনুমতি চেয়ে সভাপতির নিকট অসংখ্য চিরকুট পাঠানো হয় না। অনুমতি পাওয়ার পরে বক্তা সাধারণত সময়সীমা অতিক্রম করে, আরো বেশি সময় চায় এবং অনুমতি ছাড়াই

www.pathagar.com

বক্তৃতা চালিয়ে যেতে থাকে। এসব বক্তৃতার খুব কমই পৃথিবীর কোনো উপকারে আসে। এতে শুধু সময়ের অপচয় হয়। প্রকৃতপক্ষে আমার লজ্জা আমার জন্য ঢাল, আমার বর্ম। এটা আমাকে গড়ে উঠতে ও সত্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে।

উনিশ
অসত্যের দুষ্টক্ষত

এখনকার তুলনায় চল্লিশ বছর আগে ইংল্যান্ডে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা ছিল অনেক কম। বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও অবিবাহিতের ভান করা তাদের প্রচলিত রীতিতে পরিণত হয়েছিল। ইংল্যান্ডে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা সকলেই ছিল অবিবাহিত, কারণ ছাত্রদের জন্য দাম্পত্য জীবন শোভনীয় নয় বলে মনে করা হতো। প্রাচীনকালে আমাদের দেশেও সে ঐতিহ্য ছিল যখন ছাত্রদের পরিচয় ছিল ব্রহ্মচারী হিসেবে। আজকাল আমরা বাল্যবিবাহ দেই যা ইংল্যান্ডে সম্পূর্ণ অজানা। সুতরাং ভারতীয় যুবকেরা ইংল্যান্ডে গিয়ে বিবাহিত বলে স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করত। সত্য গোপনের আরো একটি কারণ অবশ্য ছিল। তা হলো, সত্যি কথাটি জানাজানি হয়ে গেলে যুবকটি যে পরিবারের সাথে থাকত সে পরিবারের যুবতী মেয়েদের সাথে ফষ্টি-নষ্টি করা সম্ভব হতো না। ফষ্টি-নষ্টির ব্যাপারটি অবশ্য কমবেশী নির্দোষ বলে মনে করা হতো। পিতামাতারা বরং এতে উৎসাহ দিতেন এবং তারা যুবক-যুবতীদের এরকম মেলামেশার প্রয়োজনও বোধ করতেন, কারণ প্রত্যেকেরই নিজ নিজ জীবন সঙ্গী বেছে নেয়ার একটা ব্যাপার ছিল। কিন্তু একজন ভারতীয় যুবকের ইংল্যান্ডে এসেই এরকম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া, ইংরেজ যুবকের জন্য যা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, ভারতীয় যুবকের জন্য প্রায়ই তার ফল হতো ভয়াবহ। আমি দেখেছি আমাদের যুবকেরা সঙ্গ-লিপ্সায় পড়ে অসত্যের জীবন বেছে নেয়, যা ইংরেজ যুবকদের জন্য নির্দোষ হলেও ভারতীয়দের জন্য মোটেই কাম্য নয়। আমাকেও এ রোগে ধরেছিল। আমি বিবাহিত ও এক পুত্র সন্তানের পিতা হয়েও নিজেকে অবিবাহিত বলে চালিয়ে দিতে দ্বিধা করিনি। কিন্তু সত্য গোপন করে আমি শান্তি পাইনি। শুধুমাত্র আমার গাম্ভীর্য আর নীরবতা আমাকে বড় ধরনের বিপদে পড়া থেকে বাঁচিয়েছে। আমি আগ বাড়িয়ে কথা না বললে কোনো মেয়েই আমার সাথে আলাপ করতে বা আমার সাথে বাইরে বেড়াতে যেতে চাইবে না সেটাই স্বাভাবিক।

আমার গাম্ভীর্যের সাথে ভীরুতাও ছিল সমানে সমান। আমি ভেন্টনরের যে বাড়িতে থাকতাম সেখানকার রীতি ছিল বাড়িওয়ালীর মেয়েরা অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যাবে। আমার বাড়িওয়ালীর মেয়ে একদিন আমাকে নিয়ে ভেন্টনরের সুন্দর পাহাড়ে বেড়াতে গেল। আমি দ্রুত হাঁটতাম, কিন্তু আমার সঙ্গী আমার চেয়েও দ্রুত হাঁটছিল। আমাকে সে তার পিছে প্রায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিল

www.pathagar.com

আর সারাক্ষণ বকবক করছিল। তার বকবকানির জবাবে আমি কখনো হ্যাঁ বা না, বড় জোর 'হ্যাঁ, কি সুন্দর' বলে জবাব দিচ্ছিলাম। সে যেন মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়ছিল, আর আমি ভাবছিলাম কখন বাড়ি ফিরব। এভাবে আমরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেলাম। সমস্যা দেখা দিল কি করে নামব তা নিয়ে। পায়ে হাই হিল জুতো নিয়েও পঁচিশ বছরের এই প্রাণবন্ত যুবতী পাহাড়ের গা বেয়ে তীর বেগে নিচে নেমে এলো। আর আমি লজ্জিতভাবে নিচে নামার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম। সে নিচে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে আমাকে সাহস দিচ্ছিল এবং টেনে নামিয়ে নিতে এগিয়ে আসছিল। মনে মনে বললাম আমি কি এতই ভীরু? অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে আছড়ে-পিছড়ে নিচে নামলাম। সে জোরে হেসে বলল "সাবাস"! এতে আমি আরো বেশি লজ্জা পেলাম।

কিন্তু প্রতিবারেই আমি অক্ষত অবস্থায় রেহাই পাইনি। কারণ ঈশ্বর আমাকে অসত্যের দুষ্টক্ষত থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। একবার আমি ব্রাইটনে গেলাম। ভেন্টনরের মতো এটাও ছিল একটা পর্যটন কেন্দ্র। ঘটনাটা ছিল ভেন্টনর যাবার আগের। সেখানে আমি একটা হোটেলে মধ্যবিত্ত এক বৃদ্ধা বিধবার দেখা পেলাম। এটা আমার ইংল্যান্ডে যাবার প্রথম বছরের কথা। হোটেলের মেনুতে খাবারের তালিকা ছিল ফরাসী ভাষায় লেখা যা আমার বোধগম্য ছিল না। ঐ মহিলা যে টেবিলে বসেছিলেন আমিও সেই একই টেবিলে। তিনি লক্ষ করলেন যে আমি এখানে নতুন এবং বুঝতে পারছি না কি করব। তৎক্ষণাৎ তিনি আমার সাহায্যে এগিয়ে এলেন। বললেন, "মনে হচ্ছে তুমি এখানে নতুন এসেছ এবং কি করবে বুঝতে পারছ না। তুমি খাবারের অর্ডার দিচ্ছ না কেন?" মেনুর লেখাগুলো আমি বানান করে পড়ছিলাম এবং ওয়েটারের নিকট হতে খাবারের উপাদান সম্পর্কে জেনে নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তখনই ঐ ভদ্রমহিলা হস্তক্ষেপ করলেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম এবং আমার অসুবিধার কথা বর্ণনা করে জানালাম যে খাবারের মধ্যে কোনগুলি নিরামিষ, ফরাসী ভাষা না জানার জন্য তা বুঝতে পারছি না।

তিনি বললেন, "আমি তোমাকে সাহায্য করছি। খাবারের তালিকা বিশ্লেষণ করে তুমি কোনটা খেতে পারবে তা বলে দিচ্ছি।" আমি কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁর সাহায্য গ্রহণ করলাম। এই ছিল তাঁর সাথে পরিচয়ের শুরু যা পরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে রূপ নিয়েছিল। আমার ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে এবং তার অনেক পরেও এ বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়েছিল। তিনি আমাকে লন্ডনে তাঁর ঠিকানা দিয়েছিলেন এবং প্রতি রোববারে তাঁর সাথে খাওয়ার আমন্ত্রণ করেছিলেন। বিশেষ অনুষ্ঠানাদিতেও তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন, লজ্জা কাটিয়ে উঠতে আমাকে সাহায্য করতেন এবং আমাকে যুবতী মহিলাদের সাথে পরিচয় ও আলাপ করিয়ে দিতেন। বিশেষ করে তাঁর সাথে বাস করত এরকম এক মহিলার সাথে আলাপচারিতার সুযোগ করে দিতেন এবং আমাদের দু'জনকে সম্পূর্ণ একান্তে থাকতে দিতেন।

www.pathagar.com

প্রথম প্রথম এসবে আমার বিরক্তি লাগত। আমি কোনো আলাপ শুরু করতে পারতাম না, কোনো রসিকতাও করতে পারতাম না। কিন্তু তিনি আমাকে সঠিক পথে পরিচালনা করতেন। আমি শিখতে শুরু করলাম এবং কিছুদিনের মধ্যে যুবতী বন্ধুদের সাথে আলাপে আমার আগ্রহ বাড়তে লাগল এবং আমি রোববারের অপেক্ষায় থাকতে লাগলাম।

বৃদ্ধা মহিলা প্রতিদিন তার জাল আরো বিস্তৃত করতে থাকলেন। আমাদের ঘন ঘন দেখা সাক্ষাতে তার আগ্রহ আরো বাড়তে লাগল। সম্ভবত আমাদের নিয়ে তার নিজস্ব কোনো পরিকল্পনা ছিল। আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম। নিজে নিজে বললাম, "আমি যে বিবাহিত একথা তাকে কিভাবে জানাই? জানাতে পারলে তিনি আমাদের জুটি বাঁধানোর চিন্তা করতেন না। অবশ্য সংশোধনের সময় কখনো শেষ হয় না। সত্যি কথাটা বলে দিলে আমি আরো দুর্ভোগ হতে রেহাই পেতে পারি।" মনে মনে এ চিন্তা নিয়ে আমি তাকে একটা পত্র লিখলাম, যা মোটামুটি এরকম :

"ব্রাইটনে আমাদের দেখা হবার পর থেকে আপনি আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছেন। আপনি আমার এমন যত্ন নিয়েছেন যেমন কোনো মা তার ছেলের যত্ন নেয়। আপনি হয়তো ভাবছেন আমার বিয়ে করা উচিত এবং সে বিবেচনায় যুবতী মেয়েদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। বিষয়টি বেশি দূর গড়ানোর আগেই আমি আপনার নিকট স্বীকার করছি যে আমি আপনার আদরের যোগ্য নই। আপনার নিকট যাতায়াতের শুরুতেই আমার বলা উচিত ছিল যে আমি বিবাহিত। আমি জানতাম ভারতীয় ছাত্ররা ইংল্যান্ডে এসে তাদের বিয়ে সংক্রান্ত সত্য গোপন করে থাকে। আমিও তাই করেছি। আমি এখন বুঝতে পারছি আমার এরূপ করা উচিত হয়নি। আমার এটাও বলা অবশ্য কর্তব্য যে আমি বাল্য বয়সে বিয়ে করেছি এবং আমি এক পুত্র সন্তানের পিতা। এতদিন বিষয়টি আপনাকে বলিনি সেজন্য আমি লজ্জিত। কিন্তু আজ আমি আনন্দিত যে ঈশ্বর আমাকে সত্য বলার সাহস দিয়েছেন। আপনি কি আমাকে ক্ষমা করবেন? আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে আমার সাথে যে যুবতী মহিলার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তার সাথে কোনো অসংগত আচরণ করিনি। তার সাথে আচরণের সীমা সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম। আমি বিবাহিত এটা না জানার কারণে আপনি চেয়েছিলেন যে আমাদের বিয়ে করা উচিত। এ বিষয়টি বর্তমানে যতদূর গড়িয়েছে তা থেকে আরো বেশিদূর যেন না গড়ায় সেজন্য আমাকে সত্য কথাটা বলতেই হবে। এ পত্র পাওয়ার পর আপনি যদি মনে করেন আমি আপনার আতিথেয়তার যোগ্য নই, তাহলে আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে আমি আপনাকে ভুল বুঝব না। আমার জন্য আপনার দয়া ও উৎকণ্ঠার দ্বারা আমাকে চির কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করেছেন। এর পরেও আমাকে পরিত্যাগ না করে যদি আমাকে আপনার আতিথেয়তার যোগ্য বলে গণ্য করতে থাকেন তাহলে স্বভাবতই আমি খুশী

www.pathagar.com

হব এবং এটাকে আমার প্রতি আপনার দয়ার আরো নিদর্শন বলে মনে করব।"

পাঠক জেনে রাখুন যে, এরকম একটা চিঠি এক দমে লেখা সম্ভব হয়নি। অবশ্যই আমাকে এটা বার বার লিখন ও পুনঃলিখন করতে হয়েছে। কিন্তু যে বোঝা আমাকে নুইয়ে দিচ্ছিল এ পত্রটা সে বোঝা থেকে আমাকে মুক্ত করল। প্রায় ফেরৎ ডাকেই পত্রটার জবাব এলো, অনেকটা এরকম ভাষায় :

"আমি তোমার স্বীকারোক্তিমূলক পত্রটা পেয়েছি। আমরা দু'জনেই আনন্দিত হয়েছি এবং এটা নিয়ে প্রাণ খুলে হেসেছি। যে অসত্যের জন্য তুমি নিজেকে দোষী ভাবছ তা ক্ষমার যোগ্য। এটা ভালোই হলো যে তুমি আমাদেরকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছ। তোমার জন্য আমার আমন্ত্রণ বহাল রইল। আশা করি আগামী রোববারে নিশ্চয়ই আসছ। আমরা তোমার বাল্যবিবাহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এবং আরো আনন্দ লাভ করতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। এ ঘটনা আমাদের বন্ধুত্বকে মোটেও প্রভাবিত করবে না—এ বিষয়ে তোমাকে আর আশ্বস্ত করার প্রয়োজন আছে কি?"

এভাবে আমি অসত্যের দুষ্টক্ষত থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলাম এবং এর পর থেকে যখনই প্রয়োজন হয়েছে তখনই আমার বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে বলতে দ্বিধা করিনি।

বিশ
ধর্মের সাথে পরিচয়

ইংল্যান্ডে আমার দ্বিতীয় বছরের শেষ দিকে দু'জন ব্রহ্মজ্ঞানী (Theosophist) ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তাঁরা ছিলেন দু'ভাই এবং অবিবাহিত। তাঁরা গীতা সম্পর্কে কথা বললেন। তাঁরা স্যার এডউইন আরনল্ডের অনুবাদ "স্বর্গীয় গীতমালা" (The Song Celestial) পড়ছিলেন এবং আমাকে তাঁদের সাথে মূল গ্রন্থ পাঠের আমন্ত্রণ জানালেন। আমি লজ্জা পেলাম, কারণ আমি এ পবিত্র গ্রন্থটি সংস্কৃত বা গুজরাটী কোনো ভাষাতেই পড়িনি। আমি গীতা পড়িনি এ কথা তাঁদেরকে বলতে বিব্রত বোধ করলেও তাঁদের সাথে গীতা পাঠে যোগ দিতে সানন্দে রাজি হলাম। যদিও সংস্কৃতে আমার জ্ঞান ছিল নগণ্য তথাপি আশা করছিলাম যে, মূল গ্রন্থ পাঠ করে অন্তত এটুকু বুঝতে পারব যে অনুবাদটি কোথায় সঠিক অর্থ তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। আমি তাঁদের সাথে গীতা পাঠ করতে শুরু করলাম। দ্বিতীয় অধ্যায়ের শোকগুলো ছিল এরকম—

"ইন্দ্রিয় চিন্তা আসক্তি আনে, আসক্তি থেকে কামনা, কামনা প্রজ্জ্বলিত করে প্রবল রিপুকে, রিপু থেকে জন্ম নেয় হঠকারিতা; স্মৃতি হয় বিলুপ্ত, সর্বভূতে বিশ্বাস ভেঙে পড়ে—মহৎ ইচ্ছা চলে যায়, মন হয় দুর্বল। পরিশেষে মহৎ ইচ্ছা, মন এবং মানব সত্তা—সবকিছুই লয়প্রাপ্ত হয়।"

www.pathagar.com

এ শ্লোকগুলো আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল এবং এগুলো এখনো আমার কানে বাজে। এ গ্রন্থটি যে মহামূল্যবান—আমার এ ধারণা এখনো দৃঢ়তর হচ্ছে। ফলে সত্যোপলব্ধির জন্য আমি এ গ্রন্থটিকে সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে করি। আমার বিষণ্নতার মুহূর্তগুলোতে এটা আমাকে অমূল্য সাহায্য করেছে। গীতার প্রায় সকল ইংরেজি অনুবাদই আমি পড়েছি এবং স্যার এডউইন আরনল্ড এর অনুবাদই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে। তিনি মূল রচনার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন, তা সত্ত্বেও এটাকে অনুবাদ বলে মনে হয় না। যদিও এই বন্ধুদের সাথে গীতা পড়েছি, তবুও তখন পর্যন্ত সঠিক অর্থে গীতা পড়েছি বলে দাবি করতে পারি না। আরো কয়েক বছর পরেই কেবল এটি আমার দৈনন্দিন পাঠ্য হয়েছে।

ঐ ভ্রাতৃদ্বয় আমাকে স্যার আরনল্ড এর "এশিয়ার আলো" (The Light of Asia) বইটি পড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। তখন পর্যন্ত স্যার এডউইন আরনল্ডকে আমি কেবল "স্বর্গীয় গীতমালা" (The Song Celestial) এর রচয়িতা বলে জানতাম এবং যা আমি ভগবদ্গীতার চেয়েও বেশি আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। একবার পড়তে শুরু করে আর ছাড়তে পারিনি। তাঁরা একবার আমাকে বাভাৎস্কি লজ-এ নিয়ে গেলেন এবং আমাকে মাদাম বাভাৎস্কি ও মিসেস বেসান্ট এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শেষের জন তখন সবেমাত্র থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে যোগদান করেছেন। তাঁর ধর্মান্তরের বিষয়ে সৃষ্ট বিতর্ক আমি গভীর আগ্রহে লক্ষ করছিলাম। বন্ধুরা আমাকে থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে যোগ দিতে বললেন, কিন্তু আমি এই বলে অস্বীকৃতি জানালাম—"নিজ ধর্মের নগণ্য জ্ঞান নিয়ে আমি কোনো ধর্মীয় সমিতির সদস্য হতে চাই না।" মনে পড়ে, ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্ররোচনায় মাদাম বাভাৎস্কির "থিওসফির মূল কথা" (Key to Theosophy) বইটি পড়েছিলাম। এ বইটি আমাকে হিন্দুত্ববাদের ওপর বইসমূহ পড়তে উৎসাহিত করেছিল এবং হিন্দুত্ববাদ কুসংস্কারে পরিপূর্ণ—খৃষ্টান মিশনারীদের লালিত এ ধারণা থেকে আমাকে মুক্ত করেছিল।

প্রায় একই সময়ে নিরামিষভোজী বোর্ডিং-এ আমি ম্যাঞ্চেস্টার থেকে আগত একজন খৃষ্টান সুধীর সাক্ষাৎ পেলাম। খৃষ্টান মতবাদ নিয়ে তিনি আমার সাথে কথা বললেন। আমি তাঁকে আমার রাজকোটের গল্প বললাম। তা শুনে তিনি ব্যথিত হলেন। তিনি বললেন, "আমি একজন নিরামিষভোজী। মদ্যপানও করি না। সন্দেহ নেই অনেক খৃষ্টানই মদ-মাংস খায়, কিন্তু বাইবেল মদ বা মাংস কোনোটাই খাওয়ার আদেশ দেয় না। দয়া করে বাইবেল পড়ে দেখো।" আমি তাঁর উপদেশ শুনলাম এবং তিনি আমাকে একখানি বাইবেল দিলেন। যতদূর মনে পড়ে, তিনি নিজেই বাইবেল বিক্রি করতেন। আমি তাঁর কাছ থেকে একখানি কিনেছিলাম যার মধ্যে মানচিত্র, বর্ণানুক্রমিক সূচী ও অন্যান্য সহায়িকা ছিল। আমি সেটা পড়তে শুরু করেছিলাম কিন্তু সম্ভবত ওল্ড টেস্টামেন্ট শেষ করতে পারিনি। আমি জেনেসিস পড়েছিলাম, কিন্তু তার পরের অধ্যায়গুলো আমাকে

www.pathagar.com

অবধারিতভাবেই নিদ্রাপ্লুত করত। ন্যূনতম আগ্রহ নিয়ে না বুঝে অতিকষ্টে অন্যান্য অধ্যায়গুলো পড়েছিলাম শুধুমাত্র আমি বইটি পড়েছি এটা বলতে পারার জন্য। বুক অব নাম্বার পড়া আমার একেবারেই পছন্দ হয়নি।

কিন্তু নিউ টেস্টামেন্ট আমার মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন ধারণার সৃষ্টি করল। বিশেষ করে "সারমন অন দি মাউন্ট" একেবারে আমার হৃদয়ে প্রবেশ করল। আমি এটাকে গীতার সাথে তুলনা করতাম। "আমি তোমাকে আদেশ করছি, তুমি অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে না, কিন্তু যে কেউ তোমার ডান গালে চড় মারবে তাকে তুমি বাম গালও এগিয়ে দেবে। আর কেউ যদি তোমার কোট নিয়ে যায় তাকে আলখেল্লাটাও দিয়ে দাও"—এ শ্লোকগুলি আমাকে অপরিসীম আনন্দ দিয়েছে এবং আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে শ্যামল ভাটের "একপাত্র পানির বদলে পরিপূর্ণ আহার কর দান..." ইত্যাদি। আমার তরুণ মন গীতার শিক্ষা, লাইট অব এশিয়া ও সারমন অন দি মাউন্ট কে এক করতে চেষ্টা করত। সেই আত্মত্যাগই ধর্মের সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করত।

এই পড়াশুনা অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষকদের জীবনী পড়তে আমাকে আগ্রহী করে তুলল। এক বন্ধু আমাকে কার্লাইলের "হিরো এন্ড হিরো ওয়ার্শিপ" (বীর ও বীর পূজা) বইটি পড়তে বললেন। আমি ঐ বই এর "পয়গাম্বর হিসেবে বীর" অধ্যায়টি পড়লাম এবং পয়গাম্বরের মহত্ত্ব, সাহসিকতা ও কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবন যাপন সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করলাম।

সেই সময়ে ধর্মের সাথে এই স্বল্প পরিচয় ছাড়া বেশি দূর এগোতে পারিনি, কারণ তখন পরীক্ষার পড়ার বাইরে অন্য কিছু পড়ার সময় ছিল না। কিন্তু আমি মনে মনে স্থির করে রাখলাম যে আমাকে ধর্মের ওপর আরো পড়তে হবে এবং প্রধান প্রধান ধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে।

আর নাস্তিকতা সম্পর্কে কিছুই জানব না সেটা কি করে হয়? প্রত্যেক ভারতীয় ছাত্রই ব্রাডলাফের নাম এবং তার তথাকথিত নাস্তিকতা সম্পর্কে জানত। আমি এ সম্পর্কে কিছু বই পড়েছিলাম যেগুলোর নাম ভুলে গিয়েছি। আমার ওপর এর কোনো প্রভাব পড়েনি, কারণ আমি ততদিনে নাস্তিকতার মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে গিয়েছি। মিসেস বেসান্ট, যিনি ঐ সময়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন, তিনি নাস্তিক থেকে আস্তিক হয়েছিলেন এবং সেই ঘটনাটিও নাস্তিকতার প্রতি আমার অনীহা বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাঁর লেখা "যেভাবে আমি দিব্যজ্ঞানী হলাম" (How I Became a Theosophist) বইটি আমি পড়েছি।

প্রায় এ সময়েই ব্রাডলাফ মারা গেলেন। কর্মজীবী কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হলো। তাঁর শেষ কৃত্যানুষ্ঠানে আমি যোগ দিয়েছিলাম এবং আমার বিশ্বাস, লন্ডনে বাসরত প্রত্যেক ভারতীয়ই যোগ দিয়েছিল। তাঁকে শেষ সম্মান জানাতে অল্প ক'জন পাদ্রীও উপস্থিত হয়েছিলেন। শেষ কৃত্যানুষ্ঠান শেষে বাসায় ফেরার পথে আমরা স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় ছিলাম। জনতার মধ্য হতে একজন নাস্তিকতার সমর্থক এই পাদ্রীদের

www.pathagar.com

একজনের কাপড় টেনে ছিঁড়ে দিল। তাঁর প্রশ্ন, "ভালো কথা মশাই, আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?"

"হ্যাঁ, করি," ভালো মানুষ পাদ্রীটি মিনমিনে গলায় জবাব দিলেন।

"পৃথিবীর ব্যাস ২৮০০০ মাইল এটাও আপনি স্বীকার করেন, নয় কি?" নাস্তিক ব্যক্তি আত্মতৃপ্তির হাসি দিয়ে বললেন।

"হ্যাঁ, তাই।"

"তাহলে দয়া করে বলুন আপনার ঈশ্বরের আকার কত বড়, আর কোথায় তার অবস্থান?"

"তিনি আমাদের দু'জনের হৃদয়েই আছেন, কিন্তু আমরা দেখতে পাই না।"

"দেখুন মশাই, আমাকে বাচ্চা ছেলে ভাববেন না" বিজয়ীর হাসি হেসে তিনি আমাদের দিকে তাকালেন।

পাদ্রীটি বিনয়ের সাথে নীরবতা পালন করলেন। এই বাক্য বিনিময়ের ঘটনা নাস্তিকতার প্রতি আমার অনীহা আরো বাড়িয়ে দিল।

একুশ
নির্বলের বল রাম

যদিও হিন্দু ধর্ম ও পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে আমি কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করেছিলাম, কিন্তু তা যে আমার বিপদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় তা আমার জানা ছিল। বিপদে পড়লে কিসে তাকে সাহায্য করবে মানুষ আগে থেকে তা জানতে পারে না। ঘটনার সময় সম্পর্কে সে আরো কম জানতে পারে। নাস্তিক হলে সে তার নিরাপত্তার দায়ভার অর্পণ করে দৈবের ওপর। আর আস্তিক হলে বলে থাকে ঈশ্বরই তাকে রক্ষা করেছেন। উপসংহারে সে এও বলতে পারে যে ধর্ম বিষয়ে তার পড়াশুনা ও আধ্যাত্মিক শৃংখলার ফলেই সে আত্মপ্রশান্তি লাভ করেছে। কিন্তু বিপদ মুক্তির মুহূর্তে সে জানে না তার আধ্যাত্মিক শৃংখলা না কি অন্য কিছু তাকে রক্ষা করেছে। এমন কেউ আছে কি যে আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান হয়ে আত্ম গর্ববোধ করেছে অথচ ধূলায় মিশে যায়নি? ধর্ম জ্ঞান, যা অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা, এরকম বিপদের মুহূর্তে একেবারেই তুচ্ছ বলে মনে হয়।

ইংল্যান্ডে থাকাকালে আমি সর্বপ্রথম ধর্ম জ্ঞানের অসারতা আবিষ্কার করি। ইতিপূর্বে কয়েকটি ঘটনায় আমি কিভাবে রক্ষা পেয়েছিলাম তা বলতে পারি না, কারণ তখন আমি খুব ছোট ছিলাম। কিন্তু এখন আমার বয়স বিশ এবং স্বামী ও পিতা হিসেবে কিছু অভিজ্ঞতাও হয়েছে।

যতদূর মনে পড়ে, ইংল্যান্ডে আমার অবস্থানের শেষ বছরে ১৮৯০ সালে পোর্টসমাউথে একটি ভেজিটেরিয়ান সম্মেলন হয়েছিল যাতে এক বন্ধু ও আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। পোর্টসমাউথ একটা সমুদ্র বন্দর যেখানকার জনসংখ্যার বড় একটা অংশ নাবিক। সেখানকার অনেক বাড়ির মহিলাদের বদনাম আছে। তারা ঠিক বেশ্যা নয়, কিন্তু তাদের নৈতিকতার বাছ-বিচারও নেই। এরকম একটা

www.pathagar.com

বাড়িতে আমাদের থাকতে দেয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য, অভ্যর্থনা কমিটি এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না। পোর্টসমাউথের মতো একটা শহরে কোন বাড়িটা ভালো আর কোনটা মন্দ তা খুঁজে বের করা আমাদের মতো কালে ভদ্রে বেড়াতে আসা পর্যটকদের জন্য সত্যিই কঠিন।

সন্ধ্যায় আমরা সম্মেলন থেকে ফিরলাম। রাতের আহারের পর আমরা তাস খেলতে বসলাম। প্রথা অনুযায়ী খেলাতে আমাদের বাড়িওয়ালীও যোগ দিলেন। এরূপ প্রথা ইংল্যান্ডের অভিজাত পরিবারেও প্রচলিত আছে। খেলোয়াড়গণ প্রত্যেকেই নির্দোষ রসিকতা করে থাকেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার সঙ্গী ও আমাদের বাড়িওয়ালী অশালীন রসিকতাও শুরু করলেন। আমি জানতাম না যে এ বিদ্যায় আমার সঙ্গীটি বেশ পারদর্শী। আমিও পটে গেলাম এবং তাদের সাথে যোগ দিলাম। তাস ও খেলা ছেড়ে দিয়ে যখন আমি সীমা অতিক্রম করতে উদ্যত হয়েছি তখনই ঈশ্বর যেন আমার মানস পটে আমার বন্ধুটির প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে সতর্ক বাণী শোনালেন, "বৎস, তোমার মধ্যে এ শয়তান কোথা থেকে এলো? সত্বর বিরত হও!"

আমি লজ্জা পেলাম। আমি সতর্ক হলাম এবং মনে মনে বন্ধুটির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। মায়ের কাছে আমার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে আমি সেখান থেকে পালিয়ে গেলাম। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দুরু দুরু বুকে শিকারীর থাবা থেকে পালিয়ে যাওয়া শিকারের মতো আমি আমার রুমে ফিরে গেলাম।

আমার জন্য এটাই প্রথম ঘটনা যাতে আমার স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো নারী আমাকে যৌন কামনায় আকৃষ্ট করেছিল। সে রাতটা বিনিদ্র কেটে গেল। সারা রাত ধরে সব ধরনের চিন্তা আমাকে ক্ষত-বিক্ষত করল। আমার কি এক্ষুনি এ বাড়ি ছেড়ে দেয়া উচিৎ? এ এলাকাও কি ছেড়ে যাওয়া উচিৎ? আমি কোথায় আছি? কি অবস্থা হতো আমার যদি শুভ বুদ্ধির উদয় না হতো? সিদ্ধান্ত নিলাম এর পর থেকে সব কাজে খুব সতর্ক থাকব। আর শুধু এ বাড়ি নয়, যে করেই হোক পোর্টসমাউথ ছাড়তে হবে। সম্মেলন আর দু'দিনের বেশি চলার কথা নয়। মনে পড়ে পরদিন সন্ধ্যায় আমি পোর্টসমাউথ ত্যাগ করলাম। বন্ধুটি আরো কিছু সময় সেখানে রয়ে গেলেন।

ধর্মের মূল বিষয় বা ঈশ্বর সম্পর্কে এবং তিনি কিভাবে আমাদের মাঝে কাজ করেন সে সম্পর্কে আমি তখনো জানতাম না। অস্পষ্টভাবে শুধু এটুকু বুঝেছিলাম যে সে যাত্রায় ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন। আমি জানি "রাখে হরি, মারে কে?" এ প্রবাদটি আমার জন্য আজ আরো অর্থবহ, কিন্তু অনুভব করি যে এর পূর্ণ অর্থ আমি এখনো আয়ত্ত করতে পারিনি। আরো অভিজ্ঞতাই কেবল পরিপূর্ণ উপলব্ধি অর্জনে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু আমার সকল বিপদের পরীক্ষায়—আধ্যাত্মিকতায়, আইন ব্যবসায়ে, প্রতিষ্ঠান পরিচালনায়, রাজনীতিতে, আমি বলতে পারি ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন। সকল আশা যখন তিরোহিত,

www.pathagar.com

সাহায্যকারীরা যখন ব্যর্থ, সান্ত্বনা যখন পলাতক, তখনো আমি দেখতে পাই কোনো না কোনোভাবে সাহায্য আসে, কোথা থেকে আসে তা জানি না। ঈশ্বর সমীপে বিনীত প্রার্থনা, পূজা-পার্বণ, ধর্মাচরণ-এগুলো কুসংস্কার নয়। এসব কাজ খাওয়া, পান করা, বসে থাকা বা হাঁটা-চলার চেয়েও বেশি বাস্তব। বরং এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে কেবল ঐসব কাজই বাস্তব, বাকী সকল কাজই অবাস্তব।

এ সকল পুজা-অর্চনা বা প্রার্থনা কেবল বাগাড়ম্বর নয়, কথার কথা নয়, অন্তরের গভীর থেকে উঠে আসা। সুতরাং যদি আমরা অন্তরের সেই বিশুদ্ধতা অর্জন করতে পারি যাতে সেখানে ভালোবাসা ছাড়া অন্য কিছুই থাকবে না। হৃদয় বীণার সকল তার যদি সঠিক সুরে বাঁধতে পারি, তাহলে অদৃশ্য সুরের মূর্ছনা প্রবেশ করবে আমাদের হৃদয়ের গভীরে। প্রার্থনার জন্য কথার প্রয়োজন হয় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে তা নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, হৃদয়কে আবেগমুক্ত করার অব্যর্থ মাধ্যম হলো প্রার্থনা। কিন্তু তা অবশ্যই করতে হবে পূর্ণ আত্ম-নিবেদন ও বিনয়ের সাথে।

বাইশ
নারায়ণ হেমচন্দ্র

প্রায় এ সময়েই নারায়ণ হেমচন্দ্র ইংল্যান্ডে এলেন। আমি শুনেছিলাম তিনি একজন লেখক। ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মিস ম্যানিং এর বাড়িতে আমাদের দেখা হয়েছিল। মিস ম্যানিং জানতেন যে আমি অন্যদের সাথে মিশতে পারি না। তার বাড়িতে গেলে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে বসে থাকতাম, কেউ আমার সাথে কথা না বললে আমি কখনো কথা বলতাম না। তিনি আমাকে নারায়ণ হেমচন্দ্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। নারায়ণ হেমচন্দ্র ইংরেজি জানতেন না। তার পোষাক ছিল অদ্ভুত—একটা বেমানান পাতলুন, পারসী ঢং-এর একটা কোঁচকানো ধূসর রং এর কোট, নেকটাই বা কলারের বালাই নেই এবং ঝুঁটিওয়ালা একটা পশমী টুপি। তার দাঁড়ি ছিল লম্বা।

তিনি ছিলেন হালকা পাতলা বেঁটে গড়নের মানুষ। তার গোলগাল মুখে ছিল বসন্তের দাগ, আর নাক ছিল না চোখা, না ভোতা। তার হাত সর্বক্ষণ দাঁড়ি নাড়াচাড়া করছিল।

এরকম অদ্ভুত দর্শন ও অদ্ভুত পোষাক পরা লোককে কেতাদুরস্ত ভদ্রসমাজে আলাদাভাবে চিনে বের করা অতি সহজ।

"আমি আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি" বললাম তাকে। "আপনার কিছু লেখাও পড়েছি। আপনি দয়া করে আমার বাসায় এলে খুব খুশি হব।"

নারায়ণ হেমচন্দ্রের গলার স্বর ছিল খুবই কর্কশ। হাসিমুখে তিনি বললেন—

"হ্যাঁ, তুমি কোথায় থাক?"

www.pathagar.com

"স্টোর স্ট্রীটে।"

"তাহলে তো আমরা প্রতিবেশী। আমি ইংরেজি শিখতে চাই। তুমি কি আমাকে শেখাবে?"

"আমি যতটা জানি তার সবটাই আপনাকে শেখাতে পারলে আমি খুশি হব এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনি চাইলে আমি আপনার বাসায় গিয়ে শেখাব।"

"না, না, আমিই তোমার কাছে যাব। আমার সাথে একটা অনুবাদের খাতাও নিয়ে যাব।"

সুতরাং আমরা একটা সময় স্থির করে ফেললাম। শীঘ্রই আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলাম।

নারায়ণ হেমচন্দ্র ব্যাকরণ জানতেন না। তিনি "ঘোড়া"কে ক্রিয়াপদ আর "দৌড়ানো"কে বিশেষ্য বলতেন। এরকম হাস্যকর অনেক উদাহরণ আমার মনে পড়ে। কিন্তু অজ্ঞতার জন্য তিনি মোটেই দমে যেতেন না। ব্যাকরণে আমার স্বল্প জ্ঞান তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। এটা নিশ্চিত যে ব্যাকরণে তার অজ্ঞতা নিয়ে তিনি মোটেই লজ্জিত ছিলেন না।

সম্পূর্ণ বেপরোয়া ভাব নিয়ে তিনি বলতেন, "আমি তোমার মতো কখনো স্কুলে যাইনি। আমার চিন্তা ভাবনা প্রকাশ করতে কখনো ব্যাকরণের প্রয়োজন হয়নি। ভালো কথা, তুমি কি বাংলা জান? আমি জানি। আমি বাংলাদেশে ভ্রমণ করেছি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গুজরাটী পাঠকদেরকে আমিই উপহার দিয়েছি। এবং আরো অনেক ভাষার মূল্যবান সাহিত্যকর্ম গুজরাটী ভাষায় অনুবাদের ইচ্ছা আছে। আর তোমরা জান, আমার অনুবাদ আক্ষরিক নয়। আমি সর্বদা মূল ভাবকে বের করে আনতে চাই। আরো ভালো জ্ঞান নিয়ে ভবিষ্যতে অন্যরা হয়তো আরো ভালো কিছু করতে সমর্থ হবে। কিন্তু আমি ব্যাকরণ ছাড়াই যতটা করেছি তাতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট। আমি মারাঠি, হিন্দী, বাংলা জানি। আর এখন ইংরেজি শেখা শুরু করেছি। আমার যা প্রয়োজন তা হলো বিশাল শব্দভাণ্ডার। তুমি কি ভাব আমার উচ্চাশা এখানেই থেমে থাকবে? ভয় পেয়ো না। আমি ফ্রান্সে যেতে চাই এবং ফ্রেঞ্চ ভাষা শিখতে চাই। আমি শুনেছি ফ্রেঞ্চ ভাষায় প্রচুর সাহিত্যকর্ম আছে। সম্ভব হলে আমি জার্মানীতেও যাব এবং জার্মান ভাষা শিখব।" এভাবে তিনি বিরতিহীন কথা বলে যেতেন। তার অসীম উচ্চাশা ছিল বিদেশ ভ্রমণের আর বিদেশী ভাষা শেখার।

"তারপর আপনি আমেরিকাতেও যাবেন?"

"নিশ্চয়ই। নয়া দুনিয়া না দেখে আমি কি করে ভারতে ফিরব?"

"কিন্তু আপনি টাকা পাবেন কোথায়?"

"আমার জন্য টাকার দরকার কি? আমি তোমার মতো কেতাদুরস্ত নই। ন্যূনতম খাবার আর ন্যূনতম কাপড়ই আমার জন্য যথেষ্ট। আর এর জন্য আমার বই বিক্রী ও বন্ধুদের কাছ থেকে যা পাই তাই যথেষ্ট। আমি সর্বদা

www.pathagar.com

তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করি। আমেরিকা যাবার পথেও আমি জাহাজের ডেকে ভ্রমণ করব।"

নারায়ণ হেমচন্দ্রের সরলতা ছিল সম্পূর্ণ তার নিজস্ব এবং তার খোলামেলা কথাবার্তাও ছিল একই রকম। তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অহংকার ছিল না, অবশ্য লেখক হিসেবে তার ক্ষমতা সম্পর্কে অতিমাত্রার উচ্চ ধারণা বাদে।

প্রতিদিন আমরা মিলিত হতাম। চিন্তায় ও কাজে আমাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মিল ছিল। আমরা দু'জনেই ছিলাম নিরামিষভোজী। প্রায়ই আমরা একত্রে দুপুরের খাবার খেতাম। এ সময়ে আমার সাপ্তাহিক ব্যয় ছিল ১৭ শিলিং। আমি নিজে রান্না করতাম। কোনো কোনো সময় আমি তার রুমে যেতাম, কখনো কখনো তিনিও আমার রুমে আসতেন। আমি রান্না করতাম ইংরেজদের মতো করে। ভারতীয় রান্না ছাড়া তার তৃপ্তি হতো না। ডাল না হলে তার চলত না। আমি গাজরের স্যুপ তৈরি করতাম, তিনি আমার রুচির জন্য করুণা বোধ করতেন। একবার কোনোভাবে তিনি মুগডাল সংগ্রহ করলেন এবং রান্না করে আমার বাসায় নিয়ে এলেন। আমি তা আনন্দের সাথে খেলাম। এ থেকে আমাদের মধ্যে খাবার বিনিময় নিয়মিত প্রথায় পরিণত হলো। আমার সুস্বাদু খাবার তার কাছে নিয়ে যেতাম, তারটা তিনি আমার জন্য নিয়ে আসতেন।

কার্ডিনাল ম্যানিং এর নাম তখন সবার মুখে মুখে। জন বার্নস ও কার্ডিনাল ম্যানিং এর চেষ্টায় ডক শ্রমিকদের ধর্মঘটের আশু সমাপ্তি ঘটেছিল। কার্ডিনাল মহাশয়ের সরলতার জন্য ডিজরেইলি সাহেব যে সম্মান দেখিয়েছিলেন সে বিষয়ে আমি নারায়ণ হেমচন্দ্রকে বললাম। শুনে তিনি বললেন, "তাহলে তো ঐ সাধু ব্যক্তির সাথে অবশ্যই দেখা করতে হয়।"

"তিনি এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। তাঁর সাথে আপনি দেখা করার আশা করেন কিভাবে?"

"কেন? আমি জানি কিভাবে দেখা করতে হবে। আমি তোমাকে দিয়ে আমার নাম করে তাঁর কাছে পত্র লিখিয়ে নেব। তুমি লিখবে, একজন লেখক এবং তাঁর মানবতাবাদী কাজের জন্য আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দন জানাতে চাই। আর এটাও লিখবে যে, দোভাষী হিসেবে তোমাকে আমার সঙ্গে নিতে হবে কারণ আমি ইংরেজি জানি না।"

আমি সেভাবেই একটা পত্র লিখলাম। এর জবাবে সাক্ষাতের দিনক্ষণ জানিয়ে দুই কি তিন দিনের মধ্যেই কার্ডিনাল ম্যানিং এর পত্র এলো। সুতরাং আমরা দু'জনেই কার্ডিনালের সাথে দেখা করতে গেলাম।

আমি দেখা-সাক্ষাতের উপযোগী সাধারণ স্যুট পরেছিলাম। নারায়ণ হেমচন্দ্র যথারীতি তার চিরাচরিত পোষাকেই ছিল—সেই একই কোট, একই পাতলুন। আমি তার পোষাক নিয়ে মজা করতে চাইলে তিনি আমার চেয়েও বেশি হেসে বললেন, "তোমরা সভ্য লোকেরা হচ্ছ ভীতু। মহৎ ব্যক্তিরা

www.pathagar.com

কখনোই কোনো ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা দেখেন না। তারা অন্তরের কথা চিন্তা করেন।"

আমরা কার্ডিনালের বাড়িতে প্রবেশ করলাম। আমরা বসার সাথে সাথেই একজন পাতলা লম্বা বৃদ্ধ ভদ্রলোক হাজির হলেন এবং আমাদের সাথে করমর্দন করলেন। নারায়ণ হেমচন্দ্র তাঁকে এভাবে অভিনন্দন জানালেন :

"আমি আপনার সময় বেশি নিতে চাই না। আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি এবং মনে হয়েছে যে আপনাকে আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত কারণ আপনি ধর্মঘটী শ্রমিকদের জন্য অনেক ভালো কাজ করেছেন। আমার রীতি হচ্ছে পৃথিবীর জ্ঞানী লোকদের সাথে দেখা করা এবং সে কারণেই আপনাকে একটুখানি কষ্ট দিলাম।" তিনি গুজরাটীতে যা বলেছিলেন এটা হলো তারই অনুবাদ।

"আপনার আগমনে আমি আনন্দিত হয়েছি। আশা করি লন্ডনে অবস্থান আপনার জন্য সহনীয় হবে এবং এখানে আপনি অনেক লোকের দেখা পাবেন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।" এ কথাগুলো বলে কার্ডিনাল উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাদেরকে বিদায় জানালেন।

একদা নারায়ণ হেমচন্দ্র শার্ট ও ধুতি পরে আমার বাসায় এলেন। আমার বাড়িওয়ালী দরজা খুলে দিলেন এবং ভয় পেয়ে দৌড়ে আমার নিকট এলেন। এই বাড়িওয়ালী ছিলেন নতুন এবং তিনি নারায়ণ হেমচন্দ্রকে চিনতেন না। আমাকে তিনি বললেন, "একটা পাগল তোমার সাথে দেখা করতে চায়।" আমি দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং নারায়ণ হেমচন্দ্রকে দেখে অবাক হলাম। আমি মানসিক ধাক্কা খেলাম। তার চেহারায় অবশ্য স্বাভাবিক হাসি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না।

"রাস্তায় বাচ্চা ছেলেরা আপনাকে নিয়ে টানাটানি করেনি তো?"

"ভালো কথা, তারা আমার পিছে পিছে এসেছে, কিন্তু আমি তাতে কিছু মনে করিনি। পরে তারা শান্ত হয়ে চলে গেছে।"

নারায়ণ হেমচন্দ্র অল্প কয়েক মাস লন্ডনে থাকার পর প্যারিস গিয়েছিলেন। তিনি ফ্রেঞ্চ ভাষা শেখা এবং ফ্রেঞ্চ ভাষার বই অনুবাদ করা শুরু করেছিলেন। তার অনুবাদ সংশোধন করতে পারার মতো ফ্রেঞ্চ ভাষার যথেষ্ট জ্ঞান আমার ছিল। সুতরাং তিনি তার বই আমাকে পড়তে দিলেন। তার ঐ লেখাগুলোকে অনুবাদ না বলে বলা যায় সার-সংক্ষেপ।

শেষ পর্যন্ত তিনি আমেরিকা ভ্রমণের ইচ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। বহু কষ্টে তিনি ডেকে ভ্রমণের একটি টিকেট সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আমেরিকায় অবস্থানকালে "অশালীন পোষাক পরিধানের" অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল, কারণ তিনি শার্ট ও ধুতি পরে রাস্তায় বের হয়েছিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, পরবর্তীতে মামলা হতে তাকে খালাসও দেয়া হয়েছিল।

www.pathagar.com

তেইশ
বিরাট প্রদর্শনী

১৮৯০ সালে প্যারিসে এক বিরাট প্রদর্শনী হয়েছিল। এর ব্যাপক প্রস্তুতি সম্পর্কে আমি পড়েছিলাম এবং প্যারিস দেখার প্রবল ইচ্ছাও ছিল। সুতরাং আমি ভাবলাম এক ঢিলে দুই পাখি মারাই উত্তম এবং এ সন্ধিক্ষণেই সেখানে যাওয়া উচিত। প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল আইফেল টাওয়ার—সম্পূর্ণ লোহার তৈরি এবং প্রায় ১০০০ ফুট উঁচু। প্রদর্শনীতে অবশ্য দেখার মতো আরো অনেক জিনিস ছিল কিন্তু আইফেল টাওয়ারই ছিল প্রধান, বিশেষত এ কারণে যে তখন পর্যন্ত মনে করা হতো এত উচ্চতার কোনো কাঠামো নিরাপদে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

শুনেছিলাম প্যারিসে নিরামিষ ভোজনের একটা রেস্টুরেন্ট আছে। আমি সেখানে একটা রুম ভাড়া নিয়ে সাত দিন থাকলাম। প্যারিস পর্যন্ত ভ্রমণ এবং দর্শনীয় স্থানগুলো দেখা—সবকিছুই খুব অল্প খরচে সারতে পারলাম। এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ আমি প্যারিসের একটা ম্যাপের সাহায্যে পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি এবং প্রদর্শনীর একটা ম্যাপ ও গাইডের সাহায্য নিয়েছিলাম। প্রধান রাস্তা ও দর্শনীয় স্থানগুলোতে যাবার জন্য এগুলোই যথেষ্ট ছিল।

প্রদর্শনীর বিশালতা ও বৈচিত্র ছাড়া আজ আর কিছু মনে নেই। তবে আইফেল টাওয়ারের কথা মোটামুটি মনে আছে, কারণ দু'বার কি তিনবার ওটায় উঠেছিলাম। এর প্রথম প্লাটফরমে একটা রেস্টুরেন্ট ছিল এবং শুধুমাত্র বিশাল উচ্চতায় লাঞ্চ খেয়েছি—এটা বলতে পারার সন্তুষ্টির জন্য সাত শিলিং অপব্যয় করে সেখানে দুপুরের লাঞ্চ খেয়েছিলাম।

প্যারিসের প্রাচীন গির্জাগুলোর কথা এখনো মনে আছে। এগুলোর বিশালতা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের কথা ভুলবার নয়। নটরডেমের বিস্ময়কর নির্মাণশৈলী এবং এর ভিতরের ব্যাপক সাজসজ্জা ও সুদৃশ্য ভাস্কর্য ভোলা যায় না। আমি অনুভব করলাম যে যাঁরা এ পবিত্র গির্জাগুলোর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন তাঁদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা না থেকেই পারে না।

প্যারিসের লোকদের ফ্যাশনপ্রীতি ও বালখিল্যতা সম্পর্কে আমি অনেক পড়েছি। প্রতিটি রাস্তাতেই তার প্রমাণ স্পষ্ট, কিন্তু গির্জাগুলো এসব দৃশ্য থেকে লক্ষণীয়ভাবে আলাদা। যে কোনো মানুষ গির্জাতে প্রবেশ করার সাথে সাথেই বাইরের কোলাহল ভুলে যাবে এবং যখন সে কুমারী মাতার সামনে নতজানু ধর্মপ্রাণ ভক্তদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে তখন তার আচরণ বদলে যাবে এবং সে মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানজনক ব্যবহার করবে। আমার মধ্যে সেই সময়ের অনুভূতি ক্রমশ দৃঢ়তর হচ্ছে যে এসব নতজানু হওয়া ও প্রার্থনা কেবল কুসংস্কার হতে পারে না। কুমারী মাতার সামনে নতজানু ভক্তের আত্মা কেবল মার্বেল পাথরের পুজা করছে তা হতে পারে না। প্রকৃতই তারা ঈশ্বর ভক্তিতে নিবেদিত এবং তারা পাথরের নয় বরং স্বর্গীয় সত্তার প্রতীকের পূজা করছে। আমার ধারণা হলো যে এ

www.pathagar.com

আরাধনার মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের মহিমাকে খর্ব করার পরিবর্তে তা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।

আইফেল টাওয়ার সম্পর্কে আমার কিছু বলার আছে। জানি না বর্তমানে এটা কি উদ্দেশ্য সাধন করছে। আমি তখন এটার বিরূপ সমালোচনা যেমন শুনেছিলাম, তেমনি এর প্রশংসাও শুনেছিলাম। মনে পড়ে, যারা এর বিরূপ সমালোচনা করতেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন টলস্টয়। তিনি বলেছিলেন আইফেল টাওয়ার হচ্ছে মানুষের নির্বুদ্ধিতার স্মৃতিস্তম্ভ, প্রজ্ঞার নয়। তাঁর যুক্তি ছিল এরকম—ক্ষতিকর নেশার মধ্যে তামাক সবচেয়ে ক্ষতিকর কারণ তা আসক্ত ব্যক্তিকে এমন সব অপরাধ করতে উদ্বুদ্ধ করে যা মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তি করতে সাহস করে না। মদ্যপান মানুষকে পাগল করতে পারে, কিন্তু তামাক মানুষের বুদ্ধিকে ধোঁয়াচ্ছন্ন করে এবং শূন্যে প্রাসাদ নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করে। এরকম নেশায় আসক্তির প্রভাবেই আইফেল টাওয়ার নির্মিত হয়েছিল। আইফেল টাওয়ারে শিল্পের কোনো ছোঁয়া নেই। এটা প্রদর্শনীর প্রকৃত সৌন্দর্য বর্ধন করেছে তা কোনোভাবেই বলা যায় না। মানুষ এটা দেখতে ভীড় করেছে, এতে আরোহণ করেছে.তার কারণ এটার নতুনত্ব ও বিশাল আকৃতি। এটা ছিল প্রদর্শনীর খেলনা। আমরা যতদিন শিশু থাকি ততদিন খেলনার প্রতি আকৃষ্ট হই, আর আমরা সকলেই যে তুচ্ছ খেলনার দ্বারা আকৃষ্ট শিশু, আইফেল টাওয়ার তার উৎকৃষ্ট ও বাস্তব প্রমাণ। বলা যেতে পারে, আইফেল টাওয়ার এ উদ্দেশ্যই সাধন করে চলেছে।

চব্বিশ
বার-এ যোগদানের আহ্বান, কিন্তু তারপর?

আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইংল্যান্ডে গিয়েছি অর্থাৎ আইনজীবীদের বার-এ যোগদান, সে সম্পর্কে এযাবৎ কিছুই বলিনি। এখন এ বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলব।

আনুষ্ঠানিকভাবে বার এর সদস্যপদ লাভ করতে হলে দুটি শর্ত পূরণ করতে হয়—একটি হলো টার্ম পুরা করা, ১২ টার্ম প্রায় তিন বছরের সমান, এবং অপরটি পরীক্ষায় পাশ করা। টার্ম পুরা করার অর্থ হলো "টার্ম খেয়ে ফেলা" অর্থাৎ এক টার্মের ২৪টি ডিনারের মধ্যে অন্তত ৬টি ডিনারে হাজির থাকা। খাওয়ার অর্থ প্রকৃতপক্ষে ডিনারে অংশগ্রহণ করে খাওয়া নয়, বরং সঠিক সময়ে ডিনারে উপস্থিত হওয়া এবং ডিনার শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাজির থাকা। সাধারণত প্রত্যেকেই ডিনারে সরবরাহকৃত উৎকৃষ্ট খাবার খেতো ও মদ পান করত। জনপ্রতি ডিনারের ব্যয় ছিল ২ শিলিং ৬ পেন্স থেকে ৩ শিলিং ৬ পেন্স অর্থাৎ দুই হতে তিন রুপী। এ ব্যয় মধ্যম মানের বিবেচনা করা হতো, কারণ যে কেউ হোটেলে খেলে কেবল মদের দামই ঐ টাকা দিতে হতো। মদের দাম খাবারের দামকে ছাড়িয়ে যায়, ভারতে আমাদের জন্য তা আশ্চর্যের ব্যাপার। বিষয়টি প্রথম জানার পরে

www.pathagar.com

আমি স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। ভেবে অবাক লাগে, মদ্যপানের জন্য মানুষ কি করে এত টাকা অপব্যয় করতে পারে। পরে আমি ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছিলাম। এসব ডিনারে প্রায় সবদিনই আমি প্রায় কিছুই খেতাম না। পরবর্তীতে এগুলোর স্বাদ আবিষ্কার করলাম এবং ইচ্ছেমতো অন্যান্য খাবার চেয়ে নেয়ার সাহসও অর্জন করলাম।

কোর্ট সদস্যদের খাবার ছাত্রদের খাবারের চেয়ে উন্নত ছিল। নিরামিষ ভোজী একজন পার্সী ছাত্র ও আমি দু'জনে মিলে নিরামিষ ভোজী মতবাদের স্বার্থে কোর্ট সদস্যদের জন্য নিরামিষ খাবার পরিবেশনের আবেদন করেছিলাম। আবেদনটি মঞ্জুর হয়েছিল এবং আমরা কোর্ট সদস্যদের টেবিল থেকে নিরামিষ খাবার নিয়ে খাওয়া শুরু করেছিলাম।

চার জনের প্রতি গ্রুপের জন্য দু বোতল করে মদ দেয়া হতো। যেহেতু আমি মদ স্পর্শ করতাম না, সেহেতু চার জনের দল গঠনে চতুর্থ জন হিসেবে আমার চাহিদা ছিল বেশি, যাতে করে দলের অন্য তিনজনেই দু বোতল সাবাড় করতে পারে। আর প্রতি টার্মে একটা করে "গ্র্যান্ড নাইট" হতো যখন পোর্ট ও শেরি মদের সাথে শ্যাম্পেনের মতো দামী মদ অতিরিক্ত পরিবেশন করা হতো। সুতরাং গ্র্যাণ্ড নাইটে হাজির থাকতে আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হতো এবং প্রতি দলের কাছেই আমার বিরাট চাহিদা ছিল।

এসব ডিনার কিভাবে ছাত্রদেরকে আইনজীবী সমিতি বা বারে যোগদানের জন্য যোগ্যতর করে তোলে তা আমি তখন যেমন বুঝতে পারিনি, এখনো বুঝি না। একটা সময় ছিল যখন অল্প ক'জন ছাত্র এসব ডিনারে যোগ দিত। তখন তাদের নিজেদের মধ্যে এবং কোর্ট সদস্যদের সাথে আলাপচারিতার সুযোগ হতো এবং বক্তৃতাও করা হতো। এ অনুষ্ঠানগুলো তাদেরকে পৃথিবী সম্পর্কে মার্জিত ও পরিশীলিত জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করত এবং তাদের বাচন ক্ষমতাও বৃদ্ধি করত। আমার সময়ে এ ধরনের কিছু করা সম্ভব ছিল না, কারণ কোর্ট সদস্যরা নিজেরাই পুরো একটা টেবিল দখল করে রাখতেন। প্রতিষ্ঠানটি ক্রমান্বয়ে তার লক্ষ্য হতে বিচ্যুত হচ্ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও রক্ষণশীল ইংল্যান্ড তা ধরে রেখেছিল।

অধ্যয়নের পাঠ্যসূচী ছিল সহজ। ব্যারিস্টারদেরকে রসিকতা করে "ডিনার ব্যারিস্টার" বলা হতো। প্রত্যেকেই জানত যে পরীক্ষার বাস্তবিক কোনো মূল্য ছিল না। আমার সময়ে দুটো পরীক্ষা ছিল—একটা রোমান আইনের, অন্যটা সাধারণ আইনের। এসব পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তক ছিল যা বাসায় নেয়া যেত, কিন্তু ওগুলো কেউ প্রায় পড়তই না। আমি অনেকের কথাই জানি যারা রোমান ল' এর পরীক্ষা পাশ করেছে সপ্তাহ দুই রোমান ল' এর নোট নাড়াচাড়া করে, আর কমন ল' এর পরীক্ষা পাশ করেছে দুই কি তিন মাস ধরে নোট পড়ে। প্রশ্নপত্র হতো সহজ আর পরীক্ষকরা ছিলেন উদার। রোমান ল'এর পরীক্ষাতে পাশের শতকরা হার ছিল ৯৫ থেকে

www.pathagar.com

৯৯, আর ফাইনাল পরীক্ষায় শতকরা ৭৫ বা তারও বেশি। সুতরাং অকৃতকার্য হওয়ার ভয় প্রায় ছিলই না, আর পরীক্ষাও হতো একবার নয়, বছরে চারবার। পরীক্ষা কঠিন বলে মনেই হতো না।

কিন্তু আমি নিজের জন্য পরীক্ষা কঠিন করে ফেলতে সমর্থ হয়েছিলাম। আমার ধারণা হলো যে সবগুলো টেক্সট বই আমার পড়া উচিত। ভাবলাম বইগুলো না পড়লে নিজের সাথে প্রতারণা করা হবে। এগুলোর পিছনে আমি অনেক টাকাও ব্যয় করেছিলাম। আমি ল্যাটিন ভাষায় রোমান ল' পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। লন্ডন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য শেখা ল্যাটিন আমার ভালোই কাজে লাগল। আর এসব বিদ্যা পরবর্তীতে কাজে লেগেছিল দক্ষিণ আফ্রিকাতে যেখানে সাধারণ আইন ছিল রোমান-ডাচ আইন। সুতরাং জাস্টিনিয়ানের বই পড়া দক্ষিণ আফ্রিকার আইন বুঝতে বিরাট সহায়ক হয়েছিল।

ইংল্যান্ডের সাধারণ আইন ভালো করে পড়তে আমাকে নয় মাস ধরে মোটামুটি কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। বড় একটা সময় লেগে গিয়েছিল ব্রুমের লেখা "সাধারণ আইন" পড়তে, যা ছিল বেশ বড় কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক। স্নেল এর লেখা "ইকুইটি" ছিল খুবই আকর্ষণীয়, কিন্তু বুঝতে একটু শক্ত। হোয়াইট ও টিউডোরের লেখা "লিডিং কেইসেস" যা থেকে কয়েকটি কেইস পাঠ্য তালিকায় ছিল, সেগুলো ছিল আকর্ষণীয় ও নির্দেশনায় ভরপুর। উইলিয়াম ও এডওয়ার্ডের "রিয়েল প্রোপার্টি" এবং গুডিভ এর "পার্সোনাল প্রোপার্টি" বইগুলোও বেশ আগ্রহের সাথে পড়েছি। উইলিয়ামের বই পড়তে উপন্যাসের মতো লাগত। মনে পড়ে, ভারতে ফিরে এসেও যে বইটি আমি অসীম আগ্রহ নিয়ে পড়েছি তা হলো মেইন এর লেখা "হিন্দু আইন"। কিন্তু ভারতীয় আইনের বই সম্পর্কে এখানে বলাটা অপ্রাসঙ্গিক।

আমি পরীক্ষায় পাশ করলাম। বার-এ যোগদানের আহবান পেলাম ১০ই জুন, ১৮৯১। হাইকোর্টের সদস্য হলাম ১১ই জুন তারিখে। ১২ই জুন আমি বাড়ির পথে সমুদ্রযাত্রা করলাম।

এতো বিদ্যা অর্জন সত্ত্বেও আমার অসহায়ত্ব আর ভয়ের অন্ত ছিল না। আমার নিজেকে আইন ব্যবসায়ের জন্য যোগ্য বলে মনে হতো না। কিন্তু আমার এ অসহায়ত্বের বর্ণনা দিতে আরো একটা অধ্যায়ের প্রয়োজন।

পঁচিশ

আমার অসহায়ত্ব

আইনজীবী সমিতি তথা বার-এর সদস্য হওয়া সহজ কিন্তু ওকালতি করা কঠিন। আমি আইন পড়েছি, কিন্তু কিভাবে আইন ব্যবসা করতে হয় তা শিখিনি। আমি "আইনের প্রবচন" (Legal Maxims) পড়েছি, কিন্তু ওগুলো কিভাবে আমার পেশায় প্রয়োগ করতে হবে তা জানি না। ওগুলোর একটি ছিল

www.pathagar.com

"নিজের অধিকার এমনভাবে প্রয়োগ করো যাতে অন্যের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।" কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না এ প্রবচনটি আমার মক্কেলের উপকারে কিভাবে ব্যবহার করব। এ প্রবচনের ওপর যতগুলি কেইস আছে তার সবগুলিই পড়েছি, কিন্তু আইন ব্যবসায়ে এটা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তা আমাকে আত্মবিশ্বাস যোগাতে পারেনি।

তাছাড়া ভারতীয় আইন সম্পর্কে আমি কিছুই শিখিনি। হিন্দু আইন ও মুসলিম আইন সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না। একটা আর্জির মুসাবিদা কিভাবে করতে হয় সেটা পর্যন্ত শিখিনি। আমার অবস্থা একেবারে সমুদ্রে পড়ার মতো। আমি স্যার ফিরোজশাহ মেহতার কথা শুনেছি। তিনি নাকি আদালতে সিংহের মতো গর্জন করতেন। ভেবে অবাক হতাম, ইংল্যান্ডে ঐ কৌশল তিনি কিভাবে শিখলেন? আইন ব্যবসায়ে আমার পক্ষে তাঁর মতো বিচক্ষণতা অর্জনের তো প্রশ্নই আসে না, বরং আমার গভীর সংশয় ছিল যে এ পেশায় আমি আমার জীবিকা উপার্জন করতেও সক্ষম হব কি না।

আইন পড়া অবস্থাতেই এসব সন্দেহ ও দুর্ভাবনা আমাকে বিদ্ধ করত। আমার এ অসুবিধার কথা গোপনে কয়েকজন বন্ধুকে বলেছি। তাদের একজন আমাকে দাদাভাই নওরোজির উপদেশ গ্রহণের পরামর্শ দিল। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে ইংল্যান্ড যাবার সময়ে আমি দাদাভাই নওরোজির কাছে একটি পরিচিতি পত্র নিয়ে গিয়েছিলাম। অনেক দেরীতে হলেও আমি ওটার সদ্ব্যবহার করলাম। আমি ভেবেছিলাম, আমার এমন কি অধিকার আছে সাক্ষাৎকার.চেয়ে তাঁর মতো একজন মহৎ ব্যক্তিকে বিরক্ত করার। যখনই তাঁর বক্তৃতা অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হতো আমি সেখানে হাজির হতাম, হলরুমের এক কোনায় বসে দু'চোখ আর দু'কান ভরা তৃপ্তি নিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনতাম, তারপর চলে যেতাম। ভারতীয় ছাত্রদের নিবিড় সান্নিধ্যে আসার জন্য তিনি একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমি সমিতির সভাগুলোতে উপস্থিত থাকতাম এবং ছাত্রদের জন্য দাদাভাই এর উৎকণ্ঠা এবং তাঁর জন্য ছাত্রদের ভক্তি দেখে আনন্দ লাগত। এক সময়ে সাহস সঞ্চয় করে পরিচিতি পত্রটি তাঁকে দিলাম। তিনি বললেন, "যখন খুশী তখনই তুমি আমার পরামর্শের জন্য আসতে পার।" কিন্তু আমি কখনোই এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিনি। আমি ভেবেছি একেবারে চূড়ান্ত প্রয়োজন ছাড়া তাঁকে বিরক্ত করতে যাওয়াটা ঠিক হবে না। সুতরাং সে সময়ে বন্ধুর পরামর্শ মোতাবেক আমার অসুবিধার কথা দাদাভাইকে বলা হলো না। এখন আমার সঠিক মনে পড়ছে না, এই বন্ধুটিই অথবা অন্য কেউ, আমাকে মি. ফ্রেডারিক পিনকাট এর সাথে দেখা করতে বলেছিল। তিনি রক্ষণশীল দলের সদস্য ছিলেন, কিন্তু ভারতীয় ছাত্রদের জন্য তাঁর অকৃত্রিম ও নিঃস্বার্থ স্নেহ ছিল। অনেক ছাত্রই তাঁর উপদেশ নিত। আমিও সাক্ষাতের আবেদন পেশ করলাম এবং তিনি তা মঞ্জুর

www.pathagar.com

করলেন। সে সাক্ষাতের কথা আমি কখনোই ভুলতে পারি না। তিনি আমাকে বন্ধুর মতো স্বাগত জানালেন। আমার নৈরাশ্যকে তিনি হেসেই উড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন, "তুমি কি ভাব যে প্রত্যেকেই ফিরোজশাহ মেহতা হতে পারবে? ফিরোজশাহ আর বদরুদ্দিনরা বেশি জন্মায় না। নিশ্চিত থাক যে সাধারণ একজন আইনজীবী হতে গেলে অসাধারণ মেধার প্রয়োজন পড়ে না। সাধারণ সততা ও পরিশ্রমই তার জীবিকা উপার্জন করতে পারার জন্য যথেষ্ট। তাছাড়া সকল কেসও জটিল নয়। ভালো কথা, তোমার পড়াশুনার ব্যাপ্তি সম্পর্কে আমাকে বলো।"

আমি যখন তাঁকে আমার পড়ার ক্ষুদ্র পরিসর সম্পর্কে বললাম, লক্ষ্য করলাম, তিনি হতাশ হলেন। কিন্তু তা কেবল মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই তাঁর মুখ প্রশান্তির হাসিতে উজ্জ্বল হলো এবং তিনি বললেন, "আমি তোমার অসুবিধা বুঝতে পারছি। তোমার সাধারণ পড়াশুনা খুব কম। দুনিয়াদারী সম্পর্কেও তোমার জ্ঞান খুবই কম, অথচ ওটাই একজন উকিলের পাঠশালা। তুমি দেখছি ভারতের ইতিহাসও পড়নি। একজন উকিলকে মানব চরিত্র সম্পর্কে জানতে হয়। মানুষের চেহারা দেখে তার চরিত্র পড়ে নিতে হয়। আর প্রত্যেক ভারতীয়ের উচিত ভারতের ইতিহাস জানা। আইন ব্যবসায়ের সাথে যদিও এর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, তবুও এ বিষয়ে তোমার জানা থাকা উচিত। দেখতে পাচ্ছি তুমি কেই ও ম্যালিসনের লেখা "১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত" বইটিও পড়নি। এক্ষুনি ওটা সংগ্রহ করো এবং সেই সাথে মানব চরিত্রের ওপরে আরো দুটি বই পড়ো।" বই দুটো ছিল ল্যাভেটর ও শেমেলপেনিক এর চেহারা দেখে চরিত্র বিচার সম্পর্কে লেখা বই।

এই শ্রদ্ধেয় বন্ধুটির প্রতি আমি যারপরনাই কৃতজ্ঞ। তাঁর সাহচর্যে আমার সকল ভীতি দূর হলো। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার পরই আমার দুশ্চিন্তা আবার শুরু হলো। বাড়ি ফেরার পথে যখন বই দুটোর কথা ভাবলাম তখন "চেহারা দেখে চরিত্র চেনা" এ প্রশ্নটি আমাকে তাড়া করে ফিরতে লাগল। পরের দিনই আমি ল্যাভেটরের বইটি কিনলাম। শেমেলপেনিকের বইটি দোকানে ছিল না। ল্যাভেটরের বইটি পড়লাম এবং এটা স্নেল এর লেখা "ইকুইটি"র চেয়েও দুর্বোধ্য এবং প্রায় আকর্ষণহীন বলে মনে হলো। আমি শেক্সপীয়রের চেহারা দেখে চরিত্র বিচার শাস্ত্র পড়েছি, কিন্তু লন্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাফেরায় শেক্সপীয়রের মতো দক্ষতা অর্জন করতে পারিনি।

ল্যাভেটরের বই আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারেনি। মি. পিনকাটের উপদেশ সরাসরি তেমন একটা কাজে লাগেনি, কিন্তু তাঁর দয়াপরবশতা আমার উপকারে এসেছে। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখ আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। আমি তাঁর এ উপদেশ বিশ্বাস করেছিলাম যে, সফল আইনজীবী হতে হলে ফিরোজশাহ মেহতার দক্ষতা, স্মৃতিশক্তি ও সামর্থ্য অত্যাবশ্যক নয়। সততা ও পরিশ্রমই এর জন্য

www.pathagar.com

যথেষ্ট। আর শেষোক্ত দুটি গুণ যেহেতু আমার মধ্যে মোটামুটি ভালোই আছে, সেহেতু কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলাম।

ইংল্যান্ডে আমি কেই ও ম্যালিসনের বই পড়তে পারিনি, তবে দক্ষিণ আফ্রিকাতে পড়েছিলাম, কারণ সুযোগ পেলেই আমি বইগুলো পড়ব বলে স্থির করে রেখেছিলাম।

এভাবেই আশা-নিরাশার মিশ্র অনুভূতি নিয়ে এস এস আসাম নামের জাহাজ থেকে আমি বোম্বে বন্দরে অবতরণ করলাম। নোঙরের স্থানে সমুদ্র উত্তাল ছিল। তাই লঞ্চে করে জেটিতে পৌঁছলাম।

www.pathagar.com

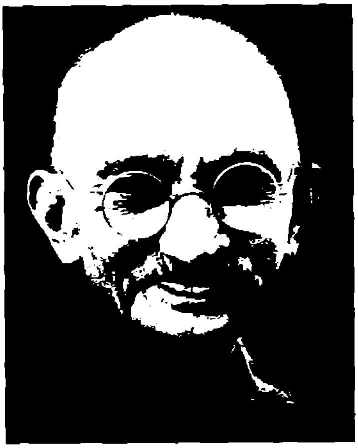

আমার আত্মজীবনী

[দ্বিতীয় পর্ব]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক
রায়চাঁদভাই

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমি উল্লেখ করেছি যে বোম্বে বন্দরে সমুদ্র উত্তাল ছিল, জুন-জুলাই মাসে আরব সাগরে যা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এডেন থেকে সারাটা পথেই ছিল এলোপাথাড়ি ঢেউ। প্রায় সকল যাত্রীই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। আমিই কেবল সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে বহাল তবিয়তে ছিলাম, ডেকে অবস্থান নিয়ে ঝড়ো ঢেউ দেখছিলাম এবং জাহাজের গায়ে ঢেউএর আছড়ে পড়া উপভোগ করছিলাম। অনুমান করছিলাম সকালে নাশতার টেবিলে আমি ছাড়া দু'একজন যাত্রী থাকবে, তারা কোলের ওপর রাখা প্লেট থেকে সতর্কভাবে যবের তৈরি পরিজ খাবে, যাতে করে পরিজ কোলের মধ্যে পড়ে না যায়।

বাইরের ঝড় ছিল আমার অন্তরের ঝড়ের প্রতীক। বাইরের ঝড় আমাকে বিচলিত করতে পারেনি, আমার মনে হয় অন্তরের ঝড়ও না। আমার গোত্রের সাথে সমস্যা ছিল, এখন আমাকে সেটার মোকাবেলা করতে হবে। ইতিপূর্বেই আমি আইন পেশায় আমার অসহায়ত্বের কথা প্রকাশ করেছি। তার ওপর আমি যেহেতু একজন সংস্কারক, কিভাবে ছোটখাটো সংস্কার কাজ শুরু করা যাবে তা নিয়ে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললাম। কিন্তু আমি যতটা জানতাম তার চেয়েও বেশি দুর্ভোগ আমার জন্য জমা ছিল।

আমার দাদা বন্দরে এসেছিলেন আমাকে নিয়ে যেতে। ইতিমধ্যেই তিনি ডা. মেহতা ও তাঁর বড় ভাই এর সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। ডা. মেহতার বাড়িতে থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করায় আমরা তাঁর বাড়িতে গেলাম। এভাবে ইংল্যান্ডে যে পরিচয়ের সূত্রপাত তা ভারতে এসেও বহাল রইল এবং তা আরো পরিণত হয়ে দুই পরিবারের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে তুলল।

আমি মাকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। আমি জানতাম না যে আমাকে তার বুকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য তিনি আর ইহজগতে নেই। আমাকে তখন দুঃসংবাদটি দেয়া হলো এবং আমি প্রচলিত নিয়মে প্রায়শ্চিত্ত শুরু করলাম। আমি ইংল্যান্ডে থাকতেই মা মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু দাদা তাঁর মৃত্যু সংবাদ আমাকে জানাননি। তিনি চেয়েছিলেন আমি যেন বিদেশের মাটিতে আঘাতটা না পাই। তথাপি ঐ সংবাদে আঘাতের তীব্রতা আমার জন্য মোটেই কম ছিল না। কিন্তু আমাকে ভেঙে পড়লে চলবে না। বাবার মৃত্যুর চেয়েও আমার এ শোক

www.pathagar.com

বেশি ছিল। চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। যাহোক, পুনরায় এমনভাবে জীবনের পথ ধরলাম, যেন কিছুই ঘটেনি।

ডা. মেহ্‌তা আমাকে কয়েকজন বন্ধুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন তাঁর ভাই শ্রী রেভাশংকর জগজীবন, যাঁর সাথে সারা জীবনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। কিন্তু যাঁর সাথে পরিচয়ের কথা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই তিনি হলেন কবি রায়চাঁদ বা রায়চন্দ্র, ডা. মেহ্‌তার এক বড় ভাই এর জামাতা এবং রেভাশংকর জগজীবনের নামে পরিচালিত জুয়েলারী ফার্মের অংশীদার। তাঁর বয়স তখন পঁচিশের বেশি নয়, কিন্তু তাঁর সাথে আমার প্রথম সাক্ষাতেই বুঝতে পারলাম তিনি একজন মহৎ চরিত্রের জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব। তিনি "শতবোধিনী" (যিনি একই সময়ে শত বিষয় মনে রাখতে বা শত বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন) নামেও পরিচিত ছিলেন। ডা. মেহ্‌তা আমাকে বলেছিলেন তাঁর স্মৃতিশক্তির কৃতিত্ব কিছুটা পরীক্ষা করে দেখতে। ইউরোপীয়ান ভাষায় আমার জানা পুরো শব্দভাণ্ডার বলে শেষ করার পর আমি তাকে পুনরায় বলতে বললাম। আমি যেভাবে বলে গিয়েছি তিনি সেভাবেই তার পুনরাবৃত্তি করলেন। তাঁর ঈশ্বর প্রদত্ত এ ক্ষমতার জন্য আমার ঈর্ষা বোধ হলো, কিন্তু তার দ্বারা সম্মোহিত হলাম না। আমাকে যা মুগ্ধ করেছিল সে সম্পর্কে পরে বুঝতে পেরেছিলাম। তা ছিল ধর্মগ্রন্থে তাঁর বিপুল জ্ঞান, নির্মল চরিত্র এবং আত্মোউপলব্ধির জন্য অদম্য বাসনা। পরে দেখেছি শেষোক্তটি অর্জনই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। সাধক মুক্তানন্দের নিম্নোক্ত চরণগুলো সর্বদাই তাঁর মুখে ছিল এবং তাঁর হৃদয়পটেও খোদিত হয়ে গিয়েছিল :

আমার সকল কাজের মাঝে পাব যখন হাজির তাঁকে
বুঝব আমি হয়েছি তাঁর কৃপাধন্যি,
বিনি সুতোর সুতা তিনি মুক্তানন্দের জীবন-মাল্যে।

রায়চাঁদভাই এর ব্যবসায়িক লেনদেন ছিল লক্ষ লক্ষ টাকার। তিনি হীরা-মুক্তার সমঝদার ছিলেন। ব্যবসা সংক্রান্ত কোনো সমস্যাই তাঁর কাছে কঠিন নয়। কিন্তু ব্যবসাকে কেন্দ্র করেই তাঁর জীবন আবর্তিত নয়। তাঁর জীবনের কেন্দ্রে ছিল সামনা সামনি ঈশ্বর দর্শনের প্রবল বাসনা। তাঁর ব্যবসার টেবিলে অন্যান্য জিনিসের সাথে অবশ্যই থাকত কিছু ধর্মীয় বই আর তাঁর ডাইরী। ব্যবসার কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তিনি ধর্মপুস্তক বা ডাইরী খুলে বসতেন। তাঁর প্রকাশিত অনেক লেখাই এ ডাইরীর পুনরাবৃত্তি। যে ব্যক্তি গুরুগম্ভীর ব্যবসায়িক লেনদেন শেষ হবার সাথে সাথেই আত্মার গুপ্ত বিষয় নিয়ে লেখা শুরু করতে পারেন স্পষ্টতই তিনি কোনো ব্যবসায়ী হতে পারেন না, তিনি প্রকৃতপক্ষে সত্য সন্ধানী। আর ব্যবসার মাঝেও তাঁকে আমি ঈশ্বরের আরাধনায় মগ্ন হতে দেখেছি, একবার দু'বার নয়, বহুবার। আমি কখনো তাঁকে সাম্য অবস্থা থেকে বিচ্যুত হতে দেখিনি। তাঁর সাথে আমার ব্যবসায়িক বা অন্য কোনো বন্ধন ছিল না তবুও আমি তাঁর

www.pathagar.com

ঘনিষ্ঠ সাহচর্য উপভোগ করেছি। আমি তখন ছিলাম মক্কেলবিহীন ব্যারিস্টার। তা সত্ত্বেও যখনই তাঁর সাথে দেখা হতো তখনই আমার সাথে সারগর্ভ ধর্মীয় আলোচনা শুরু করে দিতেন। যদিও তখন পর্যন্ত আমি বিশ্বাসহীনতায় ভুগছিলাম এবং গুরুগম্ভীর ধর্মীয় আলোচনায় তেমন আগ্রহ ছিল না, তবুও তাঁর আলোচনা আমাকে মুগ্ধ করত। সেই থেকে আমি অনেক ধর্মীয় নেতা বা ধর্মগুরুর সাক্ষাৎ পেয়েছি। চেষ্টা করেছি বিভিন্ন ধর্মের প্রধানদের সাথে সাক্ষাৎ করতে এবং আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, এ ব্যাপারে আমার ওপর রায়চাঁদভাই এর মতো আর কেউ প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাঁর কথাগুলো সোজা আমার হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করত। যেমন তাঁর বুদ্ধিমত্তা, তেমনই নৈতিক একাগ্রতা তাঁর প্রতি সম্মান জানাতে আমাকে বাধ্য করত এবং আমার মনের গভীরে এ বিশ্বাস ছিল যে তিনি কখনোই সজ্ঞানে আমাকে বিপথে পরিচালিত করবেন না; বরং তাঁর অন্তরের গোপন চিন্তার কথা আমাকে বলবেন। সুতরাং আমার আত্মিক সংকটের মুহূর্তে তিনি ছিলেন আমার আশ্রয়স্থল।

তাঁর প্রতি আমার এহেন ভক্তি থাকা সত্ত্বেও আমার অন্তরে তাঁকে গুরুর আসনে বরণ করতে পারিনি। গুরুর সিংহাসন শূন্যই রয়ে গেছে এবং আমার অনুসন্ধান এখনো চলছে।

আমি হিন্দু ধর্মমতে গুরু এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অর্জনে গুরুর প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করি। আমার ধারণা, গুরু ছাড়া প্রকৃত জ্ঞান অর্জন সম্ভব নয়—এ মতবাদের মধ্যে বিরাট সত্যতা লুকিয়ে আছে। জাগতিক বিষয়ে শিক্ষকের ত্রুটি মেনে নেয়া যেতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে তা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র পরিপূর্ণ "জ্ঞানী"কেই গুরুর সিংহাসনে বসানো যেতে পারে। সুতরাং নৈতিক উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য অন্তহীন প্রচেষ্টা চালাতেই হবে। গুরুকে পেতে হলে পাওয়ার যোগ্যতাও অর্জন করতে হবে। নৈতিক উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেকের অধিকার। প্রচেষ্টা নিজেই তার পুরস্কার, বাকীটা ঈশ্বরের হাতে।

যদিও আমি রায়চাঁদভাইকে আমার হৃদয়ে গুরুর আসনে বসাতে পারিনি, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন আমার পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারী। আধুনিক কালের তিনজন ব্যক্তি আমার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছে এবং আমাকে মুগ্ধ করেছে—রায়চাঁদভাই তাঁর জীবন্ত সাহচর্য দিয়ে, টলস্টয় তাঁর "তোমার অন্তরেই ঈশ্বরের রাজ্য" (The Kingdom of God is Within You) বই এর মাধ্যমে এবং রাশকিন তাঁর বই "শেষ পর্যন্ত" (Unto This Last) এর মাধ্যমে। কিন্তু এগুলোর সম্পর্কে বিস্তারিত যথাস্থানে বলা যাবে।

দুই
যেভাবে জীবন শুরু করলাম

আমার দাদা আমাকে নিয়ে অনেক উচ্চাশা পোষণ করেছিলেন। তাঁর অন্তরে ধন-মান-খ্যাতি অর্জনের বিরাট বাসনা ছিল। তাঁর হৃদয় ছিল অনেক বড়, বদান্যতা

www.pathagar.com

ছিল দোষণীয় মাত্রায় বেশি। এর সাথে তার সরলতা যুক্ত হওয়ায় অনেক বন্ধু জুটে গিয়েছিল এবং তাদের মাধ্যমে তিনি আমার জন্য মক্কেল পাওয়ার আশা করেছিলেন। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন যে আইন ব্যবসায়ে আমার খুব পসার হবে এবং সেই আশাতে সংসারের ব্যয় অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমার ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরি করতে তিনি সাধ্যমতো সব কিছুই করেছিলেন।

সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশ যাত্রা নিয়ে আমার সমাজের মধ্যে অসন্তোষ তখনো থামেনি। এ ব্যাপারে সমাজে দুটো দল হয়ে গিয়েছিল। এক দল আমাকে সাথে সাথেই পুনরায় গ্রহণ করল। কিন্তু অন্য দল আমাকে সমাজের বাইরে রাখার পক্ষপাতী ছিল। প্রথম দলকে খুশী করতে দাদা রাজকোট যাবার আগে আমাকে নিয়ে নাসিকে গেলেন, পবিত্র নদীর জলে স্নান করালেন এবং রাজকোট পৌঁছে গোত্রের লোকদের জন্য ভোজ দিলেন। এসব করা আমার পছন্দ ছিল না। কিন্তু আমার প্রতি দাদার ভালোবাসা ছিল অসীম, আর তাঁর প্রতি আমার ভক্তিও ছিল গভীর। সে কারণে তাঁর ইচ্ছা ও আদেশ মেনে নিয়ে যন্ত্রের মতো কাজ করে গেলাম। এভাবে সমাজে পুনর্বাসনের যে সমস্যাটা ছিল, বাস্তবে তা আর রইল না।

সমাজের যে অংশ আমার পুনর্বাসনের বিরোধীতা করেছিল আমি কখনো তাদের কাছে গিয়ে পুনর্বাসিত হওয়ার চেষ্টা করিনি। সেই অংশের সমাজপতির প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষও ছিল না। তাদের কেউ কেউ আমাকে পছন্দ করত না, কিন্তু আমি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেছি, যাতে তারা মনে আঘাত না পায়। সমাজচ্যুতকরণের নীতির প্রতি আমি পূর্ণ সম্মান দেখিয়েছি। এসব নিয়মানুযায়ী আমার শ্বশুর-শাশুড়ীসহ অন্য কোনো আত্মীয়-স্বজন, এমন কি বোন-ভগ্নিপতি বা শ্যালক-শ্যালিকাও আমাকে আপ্যায়ন করতে পারে না; আমিও তাদের গৃহে জল গ্রহণ পর্যন্ত করতে পারি না। তারা গোপনে নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু আমি যা প্রকাশ্যে করতে পারব না, তা গোপনে করতে যাওয়া আমার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল।

আমার সুবিবেচনা প্রসূত ভালো ব্যবহারের ফল হয়েছিল এই যে সমাজের পক্ষ থেকে আমার কখনো কোনো সমস্যা হয়নি। বরং সমাজের যে অংশ আমাকে আজো সমাজচ্যুত বলে মনে করে তাদের পক্ষ থেকেও আমি ভালোবাসা ও বদান্যতা ছাড়া অন্য কিছু পাইনি। এমনকি তারা আমাকে আমার কাজে সাহায্য করেছে, বিনিময়ে আমি সমাজের জন্য কিছু করব এরকম আশাও তারা করেনি। আমার বিশ্বাস এসব সম্ভব হয়েছে আমি তাদের সাথে সংঘর্ষে যাইনি বলে। যদি আমি সমাজে পুনর্বাসনের জন্য আন্দোলন শুরু করতাম, সমাজকে যদি আরো দল-উপদলে বিভক্ত করতাম, সমাজের লোকদের যদি উস্কানি দিতাম, তাহলে নিশ্চয়ই বিরোধী পক্ষ প্রত্যাঘাত করত এবং সেক্ষেত্রে আমি ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পরে সমস্যা কাটিয়ে ওঠার পরিবর্তে আন্দোলনের আবর্তে পড়ে যেতাম এবং নিজেও দলাদলিতে জড়িয়ে পড়তাম।

www.pathagar.com

স্ত্রীর সাথে আমার সম্পর্ক এখনো আশানুরূপ নয়। ইংল্যান্ডে অবস্থানের পরেও আমি ঈর্ষামুক্ত হতে পারিনি। প্রতিটি ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তার প্রতি সন্দেহ আর খুঁতখুঁতে ভাব চলতেই থাকল। আর সে কারণে আমার লালিত সকল প্রত্যাশা অপূর্ণই রয়ে গেল। সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার স্ত্রীর লেখাপড়া শেখা উচিত এবং আমার উচিত তাকে লেখাপড়ায় সাহায্য করা, কিন্তু আমার যৌন লালসা এতে বাধা হয়ে দাঁড়াল এবং আমার দোষে পরবর্তীতে তাকে ভুগতে হয়েছে। একবার আমি তাকে বাপের বাড়ি পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম এবং তার চরম দুর্ভোগের পরই কেবল ফিরিয়ে আনতে রাজি হয়েছিলাম। পরবর্তীকালে বুঝতে পেরেছি এসব ভুলের দায় সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের।

শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য আমার পরিকল্পনা ছিল। আমার দাদার ছেলে-মেয়ে ছিল এবং আমার নিজের ছেলে, যাকে রেখে ইংল্যান্ড গিয়েছিলাম, সে এখন চার বছরের বালক। আমার ইচ্ছা ছিল এসব শিশুকে শরীর চর্চা শিক্ষা দেয়া এবং আমার ব্যক্তিগত নির্দেশনার মাধ্যমে তাদেরকে বলিষ্ঠ করে গড়ে তোলা। এতে আমার দাদার সমর্থন ছিল এবং আমার প্রচেষ্টা মোটামুটি ফলপ্রসূ হয়েছিল। বাচ্চাদের সঙ্গ আমি খুব পছন্দ করতাম এবং তাদের সাথে খেলাধুলা ও তামাশা করার অভ্যাস আমার এখনো আছে। সেই সময় থেকে আমার ইচ্ছা, আমি বাচ্চাদের জন্য একজন ভালো শিক্ষক হব।

খাদ্যাভ্যাস সংস্কারের প্রয়োজন ছিল অনস্বীকার্য। চা ও কফি ইতিপূর্বেই আমাদের ঘরে জায়গা করে নিয়েছিল। দাদা ভেবেছিলেন যেহেতু আমি ইংল্যান্ড থেকে ফিরছি তাই বাড়িতে কিছুটা ইংরেজসুলভ পরিবেশ থাকা প্রয়োজন। সে উদ্দেশে যে সকল বাসন-কোসন আগে বিশেষ অনুষ্ঠানাদিতে ব্যবহার হতো এখন সেগুলোর নিত্য ব্যবহার হতে থাকল। আমার তথাকথিত সংস্কার একে পূর্ণতা দান করল। আমি ওটমিল পরিজের প্রবর্তন করলাম, আর চা ও কফির পরিবর্তে কোকো চালু হলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোকোর ব্যবহার হতে থাকল চা ও কফির অতিরিক্ত হিসেবে। বুট-জুতোর ব্যবহার আগে থেকেই ছিল। ইউরোপীয়ান পোষাক আমদানী করে আমি ইউরোপীয়করণে পূর্ণতা দান করলাম।

এভাবে ব্যয় বেড়ে গেল। সংসারে প্রতিদিন নিত্য নতুন জিনিস যোগ হতে থাকল। আমার বাড়িতে যেন সাদা হাতী পোষার বন্দোবস্ত করে ফেললাম। কিন্তু খরচটা আসবে কোত্থেকে? রাজকোটে ওকালতি শুরু করার অর্থ নিশ্চিতভাবেই উপহাসের পাত্র হওয়া। একজন যোগ্য উকিলের জ্ঞান আমার প্রায় ছিল না, অথচ আমি তার দশগুণ ফি পাওয়ার আশা করছিলাম! আমাকে উকিল নিয়োগ করবে এরকম বোকা মক্কেল কে আছে? আর মক্কেল যদি বা পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে আমার কি উচিত হবে অজ্ঞতার সাথে প্রতারণা ও একগুঁয়েমি যোগ করা এবং দুনিয়াতে আমার ঋণের বোঝা বাড়িয়ে তোলা?

বন্ধুরা উপদেশ দিলেন কিছু দিনের জন্য বোম্বে গিয়ে হাইকোর্টের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে, ভারতীয় আইনে পড়াশুনা করতে এবং মক্কেল পাওয়ার চেষ্টা করতে। তাদের উপদেশ মেনে আমি সেখানে গেলাম।

www.pathagar.com

আমার মতোই অযোগ্য একজন পাচককে নিয়ে বোম্বেতে আমার সংসার শুরু করলাম। সে ছিল জাতে ব্রাহ্মণ। আমি তার সাথে চাকরের মতো ব্যবহার করতাম না, বরং পরিবারের সদস্য মনে করতাম। সে স্নানের সময় গায়ে পানি ঢালত বটে কিন্তু ঘষে-মেজে স্নান করত না। তার ধুতি-পৈতা ছিল ময়লা এবং ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে সে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু আমি তার চেয়ে ভালো পাচক পাব কোথায়?

আমি তাকে জিজ্ঞেস করতাম, "আচ্ছা রবিশংকর (ওটাই তার নাম), তুমি রান্না না জানতে পার, কিন্তু সান্ধ্য প্রার্থনা তো অবশ্যই জান?"

তার জবাব ছিল, "মশাই, সান্ধ্য প্রার্থনার কথা বলছেন? লাঙ্গল হচ্ছে আমাদের সান্ধ্য পূজা, আর কোদাল হচ্ছে নিত্য দিনের ধর্মাচার। আমি সেই ব্রাহ্মণ। আপনার দয়ার ওপর আমাকে বাঁচতে হবে। নইলে আমার ভাগ্যে আছে ঐ চাষাবাদ।"

সুতরাং আমাকে রবিশংকরের শিক্ষক হতে হলো। হাতে পর্যাপ্ত সময় ছিল। রান্নার অর্ধেকটা আমি নিজেই করতে শুরু করলাম এবং ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতার আলোকে নিরামিষ রান্নার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল। চুলা কেনা হলো এবং রবিশংকরকে নিয়ে রান্নাঘর চালাতে শুরু করলাম। অন্য জাতের সাথে খাওয়ার ব্যাপারে আমার আপত্তি ছিল না। রবিশংকরেরও তাই। সুতরাং দু'জনে মিলে আনন্দেই চলতে থাকল। একটা বাধা অবশ্য ছিল। তা হলো রবিশংকর যেন নিজে অপরিষ্কার থাকতে আর খাবার নোংরা রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল।

কিন্তু আমার পক্ষে চার বা পাঁচ মাসের বেশি বোম্বেতে থাকা সম্ভব হলো না। কারণ ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সাথে পাল্লা দেবার মতো কোনো আয়ই আমার ছিল না।

এই হলো আমার জীবনের শুরু। ব্যারিস্টারের পেশা আমার কাছে বাজে বলে মনে হলো—এ যেন অল্প জ্ঞান নিয়ে অধিক আড়ম্বর। নিজের মধ্যে কর্তব্যবোধের তাগিদ অনুভব করতে থাকলাম।

তিন
প্রথম মামলা

বোম্বেতে থাকাকালে আমি একদিকে ভারতীয় আইন বিষয়ে পড়াশুনা শুরু করলাম, অপর দিকে বন্ধু বীরচাঁদ গান্ধীকে নিয়ে পথ্যবিদ্যার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলাম। দাদা তাঁর মতো চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন আমাকে মক্কেল পাইয়ে দিতে।

ভারতীয় আইন অধ্যয়ন খুব একঘেঁয়ে কাজ ছিল। দেওয়ানী কার্যবিধি আমি কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারছিলাম না। সাক্ষ্য আইনের বেলায় অবশ্য তা হয়নি। বীরচাঁদ গান্ধী ওকালতি পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করছিলেন। তিনি আমাকে উকিল-ব্যারিস্টারদের সম্পর্কে যত গল্প আছে সব বলতেন। তিনি বলেছিলেন, "স্যার ফিরোজশাহর দক্ষতার মূলে ছিল আইনে তাঁর অগাধ জ্ঞান। সাক্ষ্য আইন পুরোটাই

www.pathagar.com

তাঁর মুখস্ত এবং এর ৩২ ধারার যত কেস সবই তাঁর জানা। বদরুদ্দিন তৈয়বজীর যুক্তি-তর্কের আশ্চর্য ক্ষমতা বিচারকদের মনে বিস্ময় জাগায়।" এসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাহিনী আমাকে মানসিকভাবে আরো দুর্বল করত।

তিনি আরো বলতেন, "একজন ব্যারিস্টারের জন্য পাঁচ-সাত বছর নীরসভাবে কাটানো অস্বাভাবিক কিছু নয়। সে কারণেই আমি আইন উপদেষ্টার (Solicitorship) জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। আপনি তিন বছরের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতে পারেন।"

প্রতি মাসেই খরচ বেড়ে যাচ্ছিল। বাড়ির বাইরে ব্যারিস্টারের সাইনবোর্ড ঝুলানো, আর ভেতরে বসে ব্যারিস্টারী পেশার প্রস্তুতি গ্রহণ—এ বৈপরীত্যের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। সে কারণে পড়াশুনায় অখণ্ড মনোযোগও দিতে পারছিলাম না। সাক্ষ্য আইনের প্রতি আমার আগ্রহ কিছুটা বাড়ল এবং মেইন এর লেখা "হিন্দু আইন" গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। কিন্তু মামলা পরিচালনার সাহস অর্জন করতে পারলাম না। তখন আমার অসহায়ত্ব ছিল বর্ণনার অতীত। প্রথম যাত্রায় শ্বশুর বাড়িতে নববধূর যে অবস্থা হয়, আমার অবস্থাও ছিল তাই।

প্রায় এ সময়ে আমি মেমিবাই নামে একজনের মামলা নিলাম। এটা ছিল একটা "ছোট মামলা"। আমাকে বলা হলো, "টাউটদেরকে আপনি কিছু কমিশন দিয়ে দেবেন।" আমি কমিশন দিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করলাম।

"মি. অমুক, মি. তমুক বড় বড় ফৌজদারী উকিল, যারা মাসে তিন-চার হাজার টাকা আয় করেন, তারাও কমিশন দেন।"

এ কথার প্রতিবাদে আমি বললাম, "তাদের সমতুল্য হবার আমার প্রয়োজন নেই। আমি মাসে ৩০০ টাকা পেলেই সন্তুষ্ট। আমার বাবাও এর বেশি আয় করতেন না।"

"কিন্তু সে দিন গত হয়েছে। বোম্বেতে জীবনযাত্রার ব্যয় ভয়ানক বেড়ে গেছে। আপনাকে ব্যবসায়ীমনা হতে হবে।"

আমি অটল থাকলাম। আমি কোনো কমিশন দেইনি। তা সত্ত্বেও মেমিবাই এর কেসটি পেলাম। এটা একটা সহজ কেস ছিল। আমি ৩০ টাকা ফি চাইলাম। কেসটা এক দিনের বেশি টেকার কথা নয়, কিন্তু....

নিম্ন আদালতে এটাই ছিল আমার প্রথম কেস। আমি বিবাদীর পক্ষে হাজির হলাম বাদী পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করতে। আমি উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু আমার সাহস নামতে নামতে পায়ের তলায় ডুবে গেল। আমার মাথা ঘুরছিল এবং মনে হচ্ছিল পুরো আদালতটাই ঘুরছে। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কথা ভাবতেই পারলাম না। বিচারক নিশ্চয়ই হেসেছেন, আর উকিলরা নিঃসন্দেহে দৃশ্যটা উপভোগ করেছেন। কিন্তু তা দেখার মতো অবস্থা আমার ছিল না। আমি বসে পড়লাম এবং এজেন্টকে বলে দিলাম আমি কেসটা চালাতে পারব না। প্যাটেলকে নিযুক্ত করলে ভালো হয়। আমি ফি এর টাকা ফেরৎ দিয়ে দেব। পরে মি.

www.pathagar.com

প্যাটেলকে নিযুক্ত করা হয়েছিল ৫১ টাকা ফি-তে। তার জন্য অবশ্য এ কেসটি ছিল ছেলেখেলার তুল্য।

আমার মক্কেল জিতল কি হারল, তা জানার জন্য অপেক্ষা না করেই তাড়াতাড়ি কোর্ট থেকে বেরিয়ে গেলাম। নিজের কাছেই ভীষণ লজ্জিত হলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম, কেস পরিচালনার সাহস অর্জন না করা পর্যন্ত আর কোনো কেস নেব না। সত্যি সত্যি দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার আগে পর্যন্ত আমি আর কোর্টে যাইনি। আমার এ সিদ্ধান্তে সদগুণ কিছু ছিল না। আমি কেবল আবশ্যকতাকে সদগুণ বলে জাহির করেছিলাম। জানতাম, আর কোনো বোকা মক্কেল হেরে যাবার জন্য কেস নিয়ে আমার কাছে আসবে না।

কিন্তু বোম্বেতে আমার জন্য আরো একটি কেস ছিল। তা ছিল একটা স্মারকলিপির মুসাবিদা। পোরবন্দরের এক গরিব মুসলমানের জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। আমি বরেণ্য পিতার বরেণ্য সন্তান ভেবে সে আমার কাছে এসেছিল। তার কেসটি দুর্বল বলে মনে হলো, কিন্তু আমি স্মারকলিপির মুসাবিদা করে দিতে রাজি হলাম। শর্ত ছিল এর মুদ্রণব্যয় তাকেই বহন করতে হবে। আমি মুসাবিদা লিখে বন্ধুদেরকে তা পড়ে শোনালাম। তারা এটা অনুমোদন করল। এতে আমি কিছুটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম এই ভেবে যে আর কিছু না হোক, স্মারকলিপির মুসাবিদা করার যোগ্যতা আমার আছে।

আমার ব্যবসা রমরমা হতো যদি আমি ফি ছাড়া স্মারকলিপির মুসাবিদা করতাম। কিন্তু তাতে পেটের ভাত জুটত না। সুতরাং ভাবলাম যে আমি শিক্ষকের কাজ নেব। ইংরেজি ভাষাজ্ঞান আমার যথেষ্টই ছিল এবং কোনো একটা স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশনের ছাত্রদের ইংরেজি পড়াতে আমার ভালোই লাগবে। এতে আমি সংসারের আংশিক ব্যয় সংকুলানও করতে পারব। পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম, "ইংরেজির শিক্ষক চাই, প্রতিদিন এক ঘন্টা পড়াতে হবে, বেতন ৭৫ টাকা।" একটা বিখ্যাত হাই স্কুল থেকে বিজ্ঞাপনটা দেয়া হয়েছিল। আমি ঐ পদের জন্য আবেদন করলাম এবং সাক্ষাৎকারের জন্য আমাকে ডাকা হলো। আমি সেখানে উচ্চ মনোবল নিয়ে গেলাম, কিন্তু অধ্যক্ষ যখন দেখলেন যে আমি গ্রাজুয়েট নই, তখন তিনি দুঃখের সাথে আমাকে নিয়োগ দিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন।

"কিন্তু আমি তো লন্ডন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছি, দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ল্যাটিন নিয়ে।"

"তা সত্যি, কিন্তু আমরা একজন গ্রাজুয়েট চাই।"

এ ব্যাপারে আর কিছু করার ছিল না। হতাশায় হাত কচলাতে থাকলাম। দাদাও খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। আমরা দু'জনেই সিদ্ধান্তে এলাম যে বোম্বেতে থেকে সময়ের আরো অপচয় করে কোনো লাভ নেই। রাজকোটেই আমার অবস্থান করা উচিত। দাদা সেখানকার একজন পাতি উকিল। আমার জন্য তিনি

www.pathagar.com

আবেদন লেখা ও স্মারকলিপি মুসাবিদা করার কিছু কাজ জুটিয়ে দিতে পারবেন। আর রাজকোটে যেহেতু আমাদের বাড়ি আছে, বোম্বের বাস তুলে দিলে ব্যয়েরও উল্লেখযোগ্য সাশ্রয় হবে। পরামর্শটা আমার পছন্দ হলো। ছয় মাস অবস্থানের পর এভাবেই বোম্বেতে আমার ছোট্ট সংসারের পাট চুকে গেল।

বোম্বেতে থাকতে আমি প্রতিদিন হাইকোর্টে যেতাম। কিন্তু সেখানে কিছু শিখেছি এমনটা বলতে পারব না। বেশি শেখার মতো যথেষ্ট জ্ঞানও আমার ছিল না। কেসের শুনানী আমি প্রায়ই বুঝতাম না এবং ঘুমিয়ে পড়তাম। এ কাজে আমার আরো সহযোগী ছিল। তাই লজ্জার বোঝাটাও হালকা হয়ে যেত। কিছুকাল পরে আমার লজ্জার অনুভূতিও চলে গেল, কারণ আমি ভাবতে শিখলাম যে হাইকোর্টে ঝিমানো একটা ফ্যাশন।

বর্তমান প্রজন্মেও যদি বোম্বেতে আমার মতো মক্কেলবিহীন ব্যারিস্টার থাকে, তাদের জীবন যাপন সম্পর্কে আমি বাস্তব কিছু হিতোপদেশ দিতে চাই। যদিও আমি গিরগাঁওয়ে থাকতাম, আমি কোনোদিন ঘোড়া গাড়ি বা ট্রামকারে চড়িনি। হাইকোর্টে হেঁটে যাবার নিয়ম করে নিয়েছিলাম। এতে আমার পুরো ৪৫ মিনিট লাগত এবং ফেরার পথেও আমি অবশ্যই পায়ে হেঁটে ফিরতাম। সূর্যের তাপে নিজেকে অভ্যস্ত করে নিয়েছিলাম। কোর্ট পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাওয়া আসাতে বেশ ব্যয় সাশ্রয় হতো। বোম্বেতে আমার বন্ধুরা অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন, কিন্তু আমার মনে পড়ে না যে আমি কখনো অসুস্থ হয়েছি। পরে যখন আমি অর্থ উপার্জন করতে শুরু করেছি তখনো আমি পায়ে হেঁটে অফিসে যাওয়া আসার অভ্যাস ধরে রেখেছি এবং সে অভ্যাসের সুফল আমি এখনো পাচ্ছি।

চার
প্রথম আঘাত

হতাশা নিয়ে বোম্বে ত্যাগ করে রাজকোট গেলাম এবং নিজের অফিস স্থাপন করলাম। এখানে আমার মোটামুটি চলতে লাগল। আর্জি ও স্মারকলিপি মুসাবিদা করে মাসে গড়ে ৩০০ টাকা উপার্জন হতে থাকল। এর জন্য ধন্যবাদ দিতে হয় আমার নিজের যোগ্যতার চেয়ে আইন ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত দাদার পার্টনারকে। যেসব কেসের আর্জি তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হতো তার সবই তিনি বড় ব্যারিস্টারের নিকট পাঠাতেন। আমার ওপর পড়ত তার দরিদ্র মক্কেলদের আর্জি মুসাবিদার ভার। স্বীকার করছি, বোম্বেতে আমি কমিশন না দেয়ার নীতি নিষ্ঠার সাথে মেনে চললেও এখানে এসে সে বিষয়ে আমাকে আপোস করতে হলো। আমাকে বলা হলো যে বোম্বের সাথে এখানকার পার্থক্য রয়েছে। বোম্বেতে কমিশন দিতে হতো টাউটদেরকে, আর এখানে দিতে হয় যে উকিল কেস জুটিয়ে দেয় তাকে। বোম্বের মতো এখানেও সব ব্যারিস্টারকেই তাদের ফি থেকে শতকরা হারে কমিশন দিতে হয়। আমার ব্যাপারে দাদার যুক্তি ছিল অকাট্য। তিনি বললেন, "দেখ, আরেকজন উকিলের সাথে আমার অংশীদারিত্ব। আমার

www.pathagar.com

সর্বদা চেষ্টা থাকবে যেসব কেস তোমার পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভব সেগুলো তোমার কাছে পাঠানোর। তুমি যদি আমার পার্টনারকে কমিশন দিতে অস্বীকার কর তাহলে নিশ্চয়ই তুমি আমাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলবে। আমাদের যেহেতু একই পরিবার, তোমার আয় আমাদের যৌথ তহবিলে আসে এবং আমি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তার একটা অংশ পাই। কিন্তু আমার অংশীদার কিছু পায় কি? ধর, একই কেস যদি তিনি অন্য ব্যারিস্টারকে দেন, তাহলে তার কাছ থেকে তিনি নিশ্চয়ই কমিশন পাবেন।" আমি তার যুক্তি মেনে নিলাম। বুঝলাম যে ব্যারিস্টার হিসেবে প্র্যাকটিস করতে গিয়ে কমিশন সম্পর্কে আমার নীতি সকল ক্ষেত্রে চাপিয়ে দিতে পারব না। এভাবে আমি নিজেকে বোঝালাম, সোজা কথায় বললে, আত্ম-প্রবঞ্চণা করলাম। এ প্রসঙ্গে আরো বলতে চাই, যতদূর মনে পড়ে, অন্যদের কেসে আমি কোনো কমিশন দেইনি।

এভাবে কোনোমতে আমার পেটে-ভাতে চলছিল। এ সময়েই আমি আমার জীবনের প্রথম আঘাতটা পেলাম। একজন বৃটিশ অফিসার কেমন তা কেবল শুনেছি, কিন্তু এ যাবত কখনো তার মুখোমুখি হইনি।

পোরবন্দরের প্রয়াত রানা সাহেব গদীনসীন হওয়ার পূর্বে আমার দাদা তাঁর সচিব ও উপদেষ্টা ছিলেন। ঐ পদে দায়িত্ব পালনকালে দাদা তাঁকে ভুল পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, যা এখনো তার মাথার ওপর ঝুলে আছে। বিষয়টি রাজনৈতিক কৌসুলীর নিকট উত্থাপন করা হয়েছিল যিনি পূর্ব থেকেই দাদার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন। আমি ইংল্যান্ডে থাকতে এই অফিসারকে চিনতাম, এবং বলা যেতে পারে, তিনি আমার প্রতি মোটামুটি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। দাদা মনে করলেন আমি এই বন্ধুত্বের সুবাদে তার সম্পর্কে ভালো ধারণা ব্যক্ত করে রাজনৈতিক কৌসুলীর ভুল ধারণা ভাঙানোর চেষ্টা করতে পারি। প্রস্তাবটা আমার মোটেই পছন্দ হলো না। ভাবলাম, ইংল্যান্ডের ছোট একটা পরিচয়ের সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করা উচিত হবে না। প্রকৃতই যদি দাদার দোষ থেকে থাকে তাহলে আমার সুপারিশে কি ফল হবে? আর যদি তিনি নির্দোষ হন, তাহলে তার উচিত যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন পেশ করা এবং নির্দোষীতার বিষয়ে আত্মবিশ্বাস নিয়ে বিষয়টি মোকাবিলা করা। এ পরামর্শ দাদার পছন্দ হলো না। তিনি বললেন, "তুমি কাঁথিয়াওয়াড় সম্পর্কে জান না। দুনিয়ার হালচাল সম্পর্কেও তোমার জানা বাকী আছে। প্রভাব-প্রতিপত্তি ছাড়া এখানে কিছুই হয় না। ভাই হিসেবে আমার প্রতি তোমার দায়িত্ব আছে, সেটা এড়িয়ে যাওয়া তোমার ঠিক হচ্ছে না। তোমার পরিচিত একজন অফিসারকে আমার সম্পর্কে কিছু ভালো কথা বলবে এতে অসুবিধা কোথায়?"

আমি তাকে নিরাশ করতে পারলাম না। সুতরাং প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি ঐ অফিসারের নিকট গেলাম। জানতাম, তাকে অনুরোধ করার কোনো অধিকার আমার নেই এবং আমি পূর্ণ সচেতন ছিলাম যে এ কাজে আমার আত্মসম্মান বিসর্জন দিচ্ছি। তবুও আমি একটা সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করলাম এবং তা পেয়ে

www.pathagar.com

গেলাম। আমি তাকে পূর্ব পরিচয়ের কথা বললাম, কিন্তু সাথে সাথেই বুঝতে পারলাম কাঁথিয়াওয়াড় আর ইংল্যান্ড এক নয় এবং একজন অফিসারের ছুটিকালীন ব্যবহার আর ডিউটিতে থাকাকালীন ব্যবহার এক নয়। রাজনৈতিক কৌসুলী পূর্ব পরিচয়টাকে স্বীকার করলেন বটে, কিন্তু এতে তার মনোভাব আরো কঠোর হলো। "আশা করি, তুমি সেই পরিচয়ের সুযোগ নিতে আসনি, ঠিক কিনা?"–এ প্রশ্ন আর কোঁচকানো কপাল তার কঠোর মনোভাবই প্রকাশ করল। তা সত্ত্বেও আমি বিষয়টি উত্থাপন করলাম। সাহেব অধৈর্য হয়ে উঠলেন। "তোমার দাদা একজন ষড়যন্ত্রকারী। তোমার কাছ থেকে তার ব্যাপারে আর কিছু শুনতে চাই না। আমার সময়ও নেই। তোমার দাদার কিছু বলার থাকলে তাকে যথাযথ মাধ্যমে আবেদন করতে বলো।" উত্তরটা যথেষ্ট ছিল, হয়তো পাওনাও ছিল। কিন্তু স্বার্থপরতা অন্ধ। আমি আমার কথা বলতেই থাকলাম। সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এক্ষুনি বেরিয়ে যাও।"

আমি বললাম, "কিন্তু আমার কথাগুলো একটু শুনুন।" এতে তিনি আরো রেগে গেলেন। তিনি আর্দালীকে ডেকে আমাকে বের করে দিতে বললেন। আর্দালী আসার পরেও আমি ইতস্তত করছিলাম। সে আমার কাঁধে হাত রেখে ধাক্কা দিয়ে আমাকে ঘর থেকে বের করে দিল।

সাহেব ও তার আর্দালী চলে গেল। আমিও রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে চলে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা নোট লিখে পাঠালাম, "আপনি আমাকে অপমান করেছেন। আপনার আর্দালী দিয়ে আমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। এর জন্য ক্ষমা না চাইলে আপনার বিরুদ্ধে মামলা করব।"

তার সহিসের মাধ্যমে দ্রুত জবাব পেলাম, "তুমি আমার সাথে রূঢ় আচরণ করেছ। আমি তোমাকে বের হয়ে যেতে বলেছি, তুমি যাওনি। পিয়ন দিয়ে তোমাকে বের করে দেয়া ছাড়া আমার উপায় ছিল না। সে তোমাকে বের হয়ে যেতে বলার পরেও তুমি যাওনি। সুতরাং তোমাকে বের করে দেয়ার জন্য যতটা বল প্রয়োগ করা প্রয়োজন সে ততটাই করেছে। ইচ্ছে হলে তুমি মামলা করতে পার।"

উত্তরটা পকেটে নিয়ে আর পরাজয়ের গ্লানি মেখে বাড়ি ফিরলাম। যা ঘটেছে দাদাকে সব বললাম। তিনি মর্মাহত হলেন। বুঝে উঠতে পারলেন না কি বলে আমাকে সান্ত্বনা দেবেন। তিনি তার উকিল বন্ধুদের সাথে কথা বললেন। আমি জানতাম না কিভাবে একজন সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা করতে হয়। এ সময় ঘটনাচক্রে স্যার ফিরোজশাহ মেহতা বোম্বে থেকে রাজকোট এসেছিলেন কোনো একটা কেস পরিচালনার জন্য। কিন্তু আমার মতো একজন জুনিয়র ব্যারিস্টার কোন সাহসে তার সাথে দেখা করবে? সুতরাং যে উকিল তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন তার মাধ্যমে আমার কাগজপত্র পাঠালাম এবং তাঁর পরামর্শ প্রার্থনা করলাম। তিনি বললেন, "গান্ধীকে বলো, এ ধরনের ঘটনা উকিল-ব্যারিস্টারদের জন্য অতি সাধারণ ব্যাপার। সে ইংল্যান্ড থেকে সবেমাত্র ফিরেছে। এখনো রক্ত গরম আছে।

www.pathagar.com

বৃটিশ অফিসারদের সে চেনে না। সে যদি এখানে স্বচ্ছন্দে থাকতে এবং উপার্জন করতে চায়, তাহলে অপমানটা হজম করে নোটটা ছিঁড়ে ফেলে দিক। সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা করে কোনো লাভ হবে না। উল্টো আরো নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবে। তাকে বলো, জীবনে এখনো অনেক কিছু শেখার আছে।"

উপদেশটা আমার কাছে ছিল বিষের মতো তেতো, কিন্তু আমাকে তা হজম করতেই হলো। অপমানটা সহ্য করলাম, কিন্তু এর দ্বারা আমার উপকারও হলো। নিজে নিজে শপথ করলাম, "ইচ্ছে করে আর কখনো এরকম অবস্থায় পড়ব না, এভাবে আর কখনো বন্ধুত্বের সুযোগ নেবার চেষ্টা করব না।" এ শপথ জীবনে আর কখনো ভঙ্গ করিনি। এ আঘাত আমার জীবনের গতিপথ বদলে দিয়েছিল।

পাঁচ
দক্ষিণ আফ্রিকা গমনের প্রস্তুতি

সন্দেহ নেই ঐ অফিসারের নিকট যাওয়াটা আমার দোষের হয়েছিল। কিন্তু আমার ভুলের তুলনায় তার অসহিষ্ণুতা, রাগের বাড়াবাড়ি ও স্বেচ্ছাচারিতা ছিল সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন। আমাকে বের করে দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। আমি বড়জোর তার মিনিট পাঁচেক সময় নিতাম। তিনি ভদ্রভাবে আমাকে বের হয়ে যেতে বলতে পারতেন, কিন্তু ক্ষমতা তাকে অযৌক্তিক মাত্রায় মোহগ্রস্ত করেছে। পরে জেনেছিলাম, ধৈর্য নামের গুণটি এ অফিসারের মধ্যে ছিল না। বিন্দুমাত্র অসুবিধার কারণেও সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটত।

অবস্থা এই দাঁড়াল যে, আমার প্রায় সব কাজই তার আদালতে। তাকে তুষ্ট করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোষামোদ করে তার অনুগ্রহ লাভের ইচ্ছেও আমার ছিল না। আসলে তার বিরুদ্ধে মামলা করব এটা বলার পরে চুপচাপ বসে থাকতে মন চাইছিল না।

ইত্যবসরে দেশের রাজনীতির ছোটখাটো বিষয় জানতে শুরু করলাম। কাঁথিয়াওয়াড় ছোট ছোট রাজ্য নিয়ে গঠিত হওয়ায় তা ছিল রাজনীতির উর্বর ক্ষেত্র। রাজ্যগুলোর মধ্যে ছোট খাটো ষড়যন্ত্র এবং অফিসারদের মধ্যে ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতা লেগেই ছিল। যুবরাজরা ছিলেন অন্যের দয়ার পাত্র এবং মোসাহেবদের কানকথা শুনতে সদা প্রস্তুত। এমনকি সাহেবের পিয়নকেও তোষামোদ করতে হতো। আর সাহেবের সেরেস্তাদার তো ছিল তার মনিবেরও বড়, কারণ সেই ছিল সাহেবের চোখ, কান ও দোভাষী। সেরেস্তাদারের ইচ্ছাই ছিল আইন এবং তার আয় সাহেবের চেয়েও বেশি ছিল বলে জনশ্রুতি ছিল। এতে অতিকথন থাকতে পারে, কিন্তু তার জীবন যাপনের মান যে বেতনের চাইতে বেশি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না।

এখানকার পরিবেশ আমার কাছে বিষাক্ত মনে হচ্ছিল। কিভাবে নিজের সততা বজায় রাখব তা আমার জন্য একটা চিরস্থায়ী সমস্যা হয়ে দেখা দিল। আমি পুরোপুরি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। দাদা এটা স্পষ্টই বুঝতে পারছিলেন।

www.pathagar.com

আমরা দু'জনেই অনুভব করছিলাম যে আমি কোনো একটা কাজ ধরতে পারলে এ কুচক্রান্তপূর্ণ পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে পারতাম। কিন্তু এখানে ষড়যন্ত্র না করে সরকারী চাকুরী বা বিচারকের পদ পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। আর সাহেবের সাথে ঝগড়া আমার আইন ব্যবসায়ের পথেও বাধা হয়ে দাঁড়াল।

পোরবন্দর তখন প্রশাসনের অধীন ছিল এবং সেখানে যুবরাজের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত আমার কিছু কাজ ছিল। মেড়দের কাছ থেকে বেশি খাজনা আদায়ের বিষয় নিয়ে প্রশাসকের সাথেও আমার দেখা করার প্রয়োজন ছিল । এই অফিসারটি যদিও ভারতীয়, কিন্তু দেখলাম গোঁয়ার্তুমিতে ঐ সাহেবের চাইতেও সরেস। তিনি কাজে দক্ষ ছিলেন, তার দক্ষতার ফলেই প্রজাদের কোনো উন্নতি হয়নি বলে মনে হলো। রানা সাহেবের জন্য আমি কিছু বিষয়ে আরো ক্ষমতা আদায় করতে সমর্থ হলাম, কিন্তু মেড়দের জন্য তেমন কিছু করতে পারলাম না। আমার ধারণা হলো যে তাদের বিষয়গুলো ভালো করে খতিয়ে দেখা হয়নি।

সুতরাং এ মিশনেও আমি তুলনামূলকভাবে হতাশ হলাম। মনে হলো আমার মক্কেলদের প্রতি সুবিচার করা হয়নি, কিন্তু তা আদায়ের উপায়ও আমার হাতে ছিল না। খুব বেশি হলে আমি রাজনৈতিক এজেন্ট বা গভর্নরের নিকট আবেদন করতে পারতাম, যারা "আমরা হস্তক্ষেপ করতে চাই না" বলে তা নাকচ করে দিতেন। এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়ন্ত্রণকারী কোনো আইন যদি থাকত তাহলে কিছু একটা করা যেত। কিন্তু এখানে সাহেবের ইচ্ছাই আইন। আমি অসহিষ্ণু হয়ে পড়লাম।

এমন পরিস্থিতিতে পোরবন্দরের একটি মেমন প্রতিষ্ঠান থেকে দাদার কাছে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসহ পত্র এলো : "দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমাদের ব্যবসা আছে। আমাদের ফার্মটি বড়। সেখানে কোর্টে আমাদের বড় একটি মামলা আছে। ৪০,০০০ পাউন্ডের দাবির মামলা। অনেকদিন ধরেই মামলা চলছে। আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল ও ব্যারিস্টারদের নিয়োজিত করেছি। আপনি যদি আপনার ভাইকে সেখানে পাঠান তাহলে আমাদের উপকার হবে, তার নিজেরও মঙ্গল হবে। আমাদের উপদেষ্টাকে আমাদের চেয়ে তিনি ভালো নির্দেশনা দিতে পারবেন। আর পৃথিবীর নতুন একটা অংশ দেখার এবং নতুন পরিচিতি গড়ে তোলারও সুযোগ পাবেন তিনি।"

দাদা আমার সাথে প্রস্তাবটা নিয়ে আলোচনা করলেন। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না যে আমাকে শুধু উপদেষ্টাকে নির্দেশ দিতে হবে, নাকি কোর্টেও হাজির হতে হবে। কিন্তু আমার যাওয়ার ইচ্ছে হলো।

দাদা আমাকে আলোচ্য ফার্ম দাদা আব্দুল্লাহ অ্যান্ড কোং এর পার্টনার শেঠ আব্দুল করিম জাভেরীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শেঠজী আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "কাজটা কঠিন নয়। আমাদের বড় বড় ইউরোপীয়ান বন্ধু আছে। আপনি তাদের সাথে পরিচয় করে নেবেন। আমাদের দোকানেও আপনার কাজ আছে। আমাদের পত্র লেখালেখি বেশির ভাগ ইংরেজিতে হয়, সেক্ষেত্রে আপনি

www.pathagar.com

সাহায্য করতে পারবেন। আপনি অবশ্য আমাদের অতিথি হিসেবে থাকবেন। সে কারণে আপনাকে কোনো রকম খরচ করতে হবে না।"

"কত দিনের জন্য আমাকে আপনাদের প্রয়োজন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "আর আমার বেতন কত হবে?"

"এক বছরের বেশি নয়। আমরা আপনাকে প্রথম শ্রেণীতে যাওয়া-আসার স্টীমার ভাড়া এবং সর্বসাকুল্যে ১০৫ পাউন্ড দেব।"

এ যাওয়া ব্যারিস্টার হিসেবে নয়, বরং ঐ ফার্মের চাকর হিসেবে যাওয়া। কিন্তু আমি যেকোনো মূল্যে ভারত ছাড়তে চাচ্ছিলাম। একটা নতুন দেশ দেখতে পাব সে সুযোগের এবং নতুন অভিজ্ঞতা লাভের আকর্ষণও ছিল। আর দাদাকে ১০৫ পাউন্ড পাঠাতে পারব যা দিয়ে সংসারের ব্যয় নির্বাহে সাহায্য হবে। কোনোরকম দর কষাকষি না করে আমি প্রস্তাবটা মেনে নিলাম।

ছয়
নাটালে উপস্থিতি

দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রাকালে ইংল্যান্ডে যাবার মতো বিচ্ছেদ বেদনা অনুভব করিনি। এবারে আমার মা বেঁচে নেই। পৃথিবী সম্পর্কে ও বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কে আমার জ্ঞান বেড়েছে। রাজকোট থেকে বোম্বে যাওয়া এখন আর অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার নয়।

এবারে কেবল স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ বেদনা অনুভব করলাম। ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর আমাদের আরো একটি সন্তানের জন্ম হয়েছে। আমাদের ভালোবাসা বলা যেতে পারে এখনো কাম বিবর্জিত নয়। তবে তা ক্রমশ বিশুদ্ধতার দিকে যাচ্ছিল। ইউরোপ থেকে ফেরার পর আমরা খুব কম সময়ই একত্রে থাকতে পেরেছি। আর এখন যেহেতু আমি তার শিক্ষক, যতই উদাসীন হই না কেন, কিছু ব্যাপারে তার সংশোধনে সাহায্য করেছি। আমরা দু'জনেই একমত যে তার সংশোধন অব্যাহত রাখার জন্য আরো কিছুদিন আমাদের একত্রে থাকা প্রয়োজন। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার আকর্ষণ বিচ্ছেদটাকে কিছুটা সহনীয় করে তুলল। সান্ত্বনা দেবার জন্য তাকে বললাম, "এক বছরের মধ্যে আমাদের আবার দেখা হবে"। তারপর বোম্বের উদ্দেশে রাজকোট ত্যাগ করলাম।

এখানে দাদা আব্দুল্লাহ অ্যান্ড কোং এর এজেন্টের মাধ্যমে জাহাজের টিকেট পাওয়ার কথা। কিন্তু জাহাজে কোনো বার্থ খালি ছিল না। আর তখন যদি আমি না যাই তাহলে বোম্বেতে থেকে যেতে হবে। এজেন্ট বলল, "প্রথম শ্রেণীর একটা টিকেট কিনতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি। আপনি ডেকে ভ্রমণ করতে চাইলে টিকেট পাওয়া যেতে পারে। তবে খাওয়ার ব্যবস্থা সেলুনে করা যাবে।" সে সময়ে আমার প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করার কথা। একজন ব্যারিস্টার হয়ে কি করে ডেক যাত্রী হিসেবে ভ্রমণ করব? তাই প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করলাম। এজেন্টের সততা সম্পর্কে সন্দেহ হলো। প্রথম শ্রেণীর বার্থ পাওয়া যাচ্ছে না

www.pathagar.com

কথাটা বিশ্বাস হলো না। এজেন্টের সম্মতি নিয়ে আমি নিজেই গেলাম। জাহাজে উঠে আমি চীফ অফিসারের সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাকে সোজাসুজি বললেন," সাধারণত আমাদের এ রকম ভীড় থাকে না। কিন্তু যেহেতু মোজাম্বিকের গভর্নর জেনারেল এই জাহাজে যাচ্ছেন তাই সবগুলো বার্থ বুক হয়ে গেছে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "চাপাচাপি করে আমার জন্য কি একটা জায়গা করা সম্ভব?" তিনি আমাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পরখ করে দেখলেন এবং হাসলেন। বললেন, "একটা মাত্র উপায় আছে। আমার কেবিনে একটা অতিরিক্ত বার্থ আছে, যেটা সাধারণত যাত্রীদেরকে দেয়া হয় না। কিন্তু ওটা আমি তোমাকে দিতে পারি।" আমি তাকে ধন্যবাদ জানালাম এবং এজেন্টকে বললাম টিকেট কিনতে। ১৮৯৩ সালের এপ্রিলে পূর্ণ আনন্দের সাথে ভাগ্যান্বেষণে যাত্রা করলাম দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশ্যে।

তের দিন পরে প্রথম বিরতির বন্দর লামুতে পৌছলাম। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন ও আমি ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়েছি। তার প্রিয় খেলা ছিল দাবা, কিন্তু তিনি যেহেতু এ খেলায় একেবারে নতুন, তিনি চাইতেন তার চেয়েও নতুন কেউ পার্টনার হোক। সুতরাং তিনি আমাকে খেলতে আমন্ত্রণ জানালেন। দাবা খেলোয়াড়রা বলেন এটা এমন এক খেলা যাতে বুদ্ধির ব্যায়ামের প্রচুর সুযোগ আছে। ক্যাপ্টেন আমাকে শেখাতে চাইলেন এবং তিনি আমাকে সুবোধ ছাত্রের মতো পেলেন, যেহেতু আমার অসীম ধৈর্য ছিল। প্রতিবারেই আমি হেরে যেতাম এবং এতে তিনি আমাকে আরো বেশি করে শেখাতে আগ্রহ দেখাতেন। খেলাটা আমি পছন্দ করতাম। কিন্তু আমার পছন্দকে কখনো সীমা অতিক্রম করতে বা আমার বিদ্যাকে চাল দেয়ার বেশি বাড়তে দেইনি।

লামুতে জাহাজ তিন থেকে চার ঘন্টা নোঙরে থাকল। বন্দরটা ঘুরে দেখতে আমি জাহাজ থেকে নামলাম। ক্যাপ্টেনও নেমেছিলেন, কিন্তু আমাকে সাবধান করেছিলেন যে এ বন্দরকে বিশ্বাস নেই, তুমি সময় থাকতেই ফিরে এসো।

এটা ছিল একটা ছোট জায়গা। আমি পোস্ট অফিসে গেলাম। সেখানে ভারতীয় কেরানী দেখে ভালো লাগল এবং তার সাথে আলাপ করলাম। আফ্রিকানদেরকেও দেখলাম এবং তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করলাম যা আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় লাগল। এতে বেশ কিছু সময় কেটে গেল।

কিছু ডেকযাত্রীর সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল যারা রান্না করবে এবং পেট ভরে খাবে বলে তীরে নেমেছিল। আমি তাদেরকে জাহাজে ফেরার প্রস্তুতি নিতে দেখলাম। সুতরাং আমিও তাদের সাথে একই নৌকায় উঠলাম। তখন সমুদ্রে ভরা জোয়ার চলছিল। আর আমাদের নৌকার বোঝাই ছিল বহন ক্ষমতার বেশি। পানির স্রোত এত জোরালো ছিল যে জাহাজের মই এর সাথে নৌকাটা আটকানো সম্ভব হচ্ছিল না। নৌকা মই ছুঁই ছুঁই করতেই স্রোতের টানে আবার দূরে সরে যাচ্ছিল। জাহাজ ছেড়ে যাবার প্রথম বাঁশী আগেই বাজানো হয়ে গেছে। আমি

www.pathagar.com

শংকিত হলাম। ক্যাপ্টেন জাহাজের ব্রীজ থেকে আমাদের অবস্থা দেখছিলেন। তিনি আরো পাঁচ মিনিট দেরী করে জাহাজ ছাড়ার আদেশ দিলেন। জাহাজের নিকট আর একটা নৌকা ছিল যেটা এক বন্ধু আমার জন্য ১০ টাকায় ভাড়া করল। এই নৌকাটা আমাকে অতিরিক্ত বোঝাই নৌকা থেকে তুলে নিল। ইতিমধ্যেই মই তুলে নেয়া হয়েছিল। সুতরাং আমাকে একটা দড়ি দিয়ে টেনে তুলতে হলো এবং সাথে সাথেই জাহাজ ছেড়ে দিল। অন্য যাত্রীরা পেছনে পড়ে রইল। এতক্ষণে আমি ক্যাপ্টেনের সতর্কবাণীর মর্ম বুঝতে পারলাম।

লামুর পরের বন্দর ছিল মোমবাসা এবং তারপর জানজিবার। এখানে লম্বা বিরতি ছিল—আট কি দশ দিন এবং তখন আমরা নৌকা বদলে নিয়েছিলাম।

ক্যাপ্টেন আমাকে খুব পছন্দ করতেন। কিন্তু পছন্দটা একটা অনাকাঙ্ক্ষিত মোড় নিল। তিনি আমাকে ও এক ইংরেজ বন্ধুকে তার সাথে আউটিং-এ যাবার আমন্ত্রণ করলেন এবং আমরা একই নৌকাতে তীরে পৌছালাম। আউটিং এর অর্থ কি সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। আর ক্যাপ্টেনও জানতেন না যে এসব ব্যাপারে আমি কতটা অজ্ঞ। একজন টাউট আমাদেরকে কতগুলো নিগ্রো মহিলার ঘরে নিয়ে গেল। আমাদের এক এক জনকে একটা করে ঘর দেখিয়ে দেয়া হলো। আমি সেখানে লজ্জায় স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঐ মহিলা আমার সম্পর্কে কি ভাবল তা কেবল ঈশ্বরই জানেন। ক্যাপ্টেন যখন আমাকে ডাকলেন আমি যে অবস্থায় ভেতরে ঢুকেছিলাম ঠিক সে অবস্থাতেই বেরিয়ে এলাম। তিনি আমার সরলতা দেখলেন। প্রথমে আমি খুব লজ্জিত বোধ করলাম, কিন্তু যখন দেখলাম ওকথা ভাবতেই ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছি তখন আমার লজ্জা দূর হতে থাকল এবং আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম যে ঐ মহিলাকে দেখে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ জাগেনি। ঘরের ভেতর প্রবেশ করতে অস্বীকার করার সাহস হয়নি—এ দুর্বলতার জন্য আমার নিজের প্রতি ঘৃণা ও করুণা হলো।

আমার জীবনে এটা ছিল এ ধরনের তৃতীয় পরীক্ষা। অনেক যুবক প্রথমে নিষ্পাপ থাকলেও মিথ্যা লজ্জাবোধের কারণে পাপ পথে ধাবিত হয়। নিষ্পাপ অবস্থায় বেরিয়ে আসার জন্য আমি প্রশংসা দাবি করছি না। আমি যদি ঐ ঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করতাম তাহলে প্রশংসা দাবি করতে পারতাম। আমাকে রক্ষা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই সম্পূর্ণরূপে সেই পরম দয়াময়কে। এ ঘটনা ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস বৃদ্ধি করেছে এবং কিছুটা হলেও মিথ্যা লজ্জাবোধ ত্যাগ করার শিক্ষা দিয়েছে।

আমাদেরকে যেহেতু এ বন্দরে এক সপ্তাহ থাকতে হয়েছিল, আমি শহরে ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম এবং আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়ে বেশ খানিকটা এলাকা দেখে নিয়েছিলাম। জানজিবারের বৃক্ষ শোভার তুলনা হতে পারে কেবল মালাবারের সাথে। আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম বিশাল বৃক্ষ ও ফলের আকার দেখে।

পরবর্তী বিরতি ছিল মোজাম্বিকে এবং তারপর আমরা নাটালে পৌছালাম মে মাসের শেষ দিকে।

www.pathagar.com

সাত

কতিপয় অভিজ্ঞতা

নাটালের বন্দরের নাম ডারবান। নাটাল বন্দর নামেও পরিচিত। আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে আব্দুল্লাহ শেঠ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জাহাজ যখন জেটিতে ভিড়ল আমি দেখলাম লোকজন তাদের বন্ধুদেরকে দেখার জন্য জাহাজে উঠে পড়ছে। লক্ষ করলাম ভারতীয়দেরকে সম্মানের চোখে দেখা হচ্ছে না। যারা আব্দুল্লাহ শেঠকে চিনত তারা তার সাথে অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার করছে, এটা আমার নজর এড়াল না এবং তা আমাকে পীড়া দিল। আব্দুল্লাহ শেঠ এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। যারা আমার দিকে তাকাচ্ছিল তারা কিছুটা কৌতূহল নিয়েই তাকাচ্ছিল। আমার পোষাক ছিল অন্য ভারতীয়দের থেকে আলাদা। আমার পরনে ছিল ফ্রককোট এবং বাংলা পাগড়ীর অনুকরণে তৈরি পাগড়ী।

আমাকে ফার্মের বাসায় নিয়ে যাওয়া হলো এবং আমার জন্য নির্ধারিত আব্দুল্লাহ শেঠের পাশের রুম দেখিয়ে দেওয়া হলো। তিনি আমার কথা বুঝতে পারছিলেন না, আমিও তার কথা বুঝতে পারছিলাম না। তার ভাই আমার মাধ্যমে যে কাগজপত্র পাঠিয়েছেন তা পড়ে তিনি আরো বিভ্রান্ত বোধ করলেন। ভাবলেন তার ভাই একটি শ্বেতহস্তী তার নিকট পাঠিয়েছেন। আমার পোষাক ও চালচলনে ধরে নিলেন আমার জন্য ইউরোপীয়ানদের মতো ব্যয় করতে হবে। আমাকে দিয়ে করাতে হবে এমন বিশেষ কাজও তখন ছিল না। তাদের মামলা চলছিল ট্রান্সভালে। এক্ষুনি আমাকে সেখানে পাঠানোর প্রয়োজন নেই। আর আমার যোগ্যতা ও সততার ওপর তিনি কতটাই বা আস্থা রাখতে পারেন? আমার ওপর নজরদারীর জন্য তিনি প্রিটোরিয়ায় থাকতে পারবেন না। বিবাদীরা রয়েছে প্রিটোরিয়াতে। তিনি যতটা জানেন তারা আমার ওপর অন্যায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে। মামলা সংক্রান্ত দায়িত্ব যদি আমার ওপর ন্যস্ত করা না যায় তাহলে আমার আর কাজ কি? কারণ অন্যান্য কাজগুলো তার কেরানীরাই আমার চেয়ে ভালোভাবে করতে পারে। কেরানীরা ভুল করলে তাদেরকে শাস্তি দেয়া যায়। আমি ভুল করলে কি আমাকে শাস্তি দেয়া যাবে? সুতরাং মামলা সংক্রান্ত কোনো কাজ যদি আমাকে না দেয়া যায় তাহলে বিনা কাজে আমাকে পুষতে হবে।

আব্দুল্লাহ শেঠ আসলে লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিল সমৃদ্ধ। তার বুদ্ধি ছিল প্রখর এবং এ বিষয়ে তিনি বেশ সজাগ ছিলেন। চর্চার মাধ্যমে তিনি কথোপকথন চালিয়ে যাওয়ার মতো ইংরেজি রপ্ত করেছিলেন যা দ্বারা তিনি ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ও ইউরোপীয়ান বণিকদের সাথে লেনদেন বা উকিলকে মামলা সংক্রান্ত ব্যাখ্যা দেয়া থেকে শুরু করে সকল কাজই করতে পারতেন। ভারতীয়রা তাকে খুব সম্মানের চোখে দেখত। তার ফার্ম ছিল তখন সবচেয়ে বড়, অথবা যে কোনো বিচারে বৃহত্তম ভারতীয় ফার্ম। এতসব ভালোর মধ্যেও তার একটা বিষয় খারাপ ছিল—তা হলো তার সন্দেহপরায়ণ স্বভাব।

www.pathagar.com

ইসলামের জন্য তিনি গর্ববোধ করতেন এবং ইসলামী দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করতেন। যদিও তিনি আরবী জানতেন না তবুও পবিত্র কোরান ও ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে তার মোটামুটি ভালো জ্ঞান ছিল। যখন তখন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারতেন। তার সাহচর্যে ইসলাম সম্পর্কে আমি মোটামুটি বাস্তব জ্ঞান লাভ করলাম। আমরা পরস্পরের আরো ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর ধর্মীয় বিষয়ে লম্বা আলোচনা করতাম।

আমি আসার দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিনে তিনি আমাকে ডারবান কোর্টে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি আমাকে কয়েকজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং তার এটর্নির পাশে বসালেন। ম্যাজিস্ট্রেট আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং শেষে আমার পাগড়ী খুলে ফেলতে বললেন। আমি তা করতে অস্বীকার করলাম এবং কোর্ট থেকে চলে গেলাম। সুতরাং বুঝলাম এখানেও আমার ভাগ্যে সংগ্রামই আছে।

আব্দুল্লাহ শেঠ আমাকে বুঝিয়ে বললেন, কেন কিছু ভারতীয় লোককে পাগড়ী খুলতে হয়। তিনি বললেন, মুসলমান পোষাকধারী ভারতীয়রা পাগড়ী পরতে পারেন, কিন্তু অন্য ভারতীয়রা কোর্টে প্রবেশের সময় পাগড়ী খুলে ফেলবেন এটাই নিয়ম।

এ অদ্ভুত বৈষম্যের কারণ বোঝানোর জন্য আরো ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন। গত দু'তিন দিনে আমি দেখলাম ভারতীয়রা বিভিন্ন দলে বিভক্ত। একটা দল ছিল মুসলমান বণিক যারা নিজেদেরকে "আরব" বলে দাবি করত। আরেক দল ছিল হিন্দু, আরো একদল পার্সী কেরানী। "আরব"দের সাথে না মিশলে হিন্দু কেরানীদের অবস্থা ছিল না ঘরকা, না ঘাটকা। পার্সী কেরানীরা নিজেদেরকে পার্সীয়ান বলে পরিচয় দিত। এই তিন দলের মধ্যে একে অপরের সাথে একটা সামাজিক সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় দল গঠিত হয়েছিল তামিল, তেলেগু আর উত্তর ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ ও মুক্ত শ্রমিকদের নিয়ে। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হলো তারা, যারা পাঁচ বছর কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে নাটালে গিয়েছিল যাদের বলা হতো "গিরমিটিয়া" বা "গিরমিট"। এটা ছিল ইংরেজি "এগ্রিমেন্ট" শব্দের অপভ্রংশ। এ দলের সাথে অন্য তিন দলের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক ছিল না। ইংরেজরা এদেরকে বলত "কুলি"। আর অধিকাংশ ভারতীয় যেহেতু শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত ছিল, তাই সকল ভারতীয়কেই "কুলি" বা "স্বামী" বলা হতো। তামিল ভাষায় অনেক নামের শেষেই "স্বামী" যোগ করা হয়, যা সংস্কৃত "স্বামী" ছাড়া আর কিছু নয় এবং এর অর্থ "প্রভু" বা "মনিব"। সুতরাং "স্বামী" সম্বোধন কারো অপছন্দ হলে এবং তার বুদ্ধি থাকলে সে এভাবে বলত, "তুমি আমাকে "স্বামী" বলতে পার কিন্তু ভুলে যাও যে স্বামী অর্থ মনিব। আমি কিন্তু তোমার মনিব নই।" কিছু ইংরেজ এতে অপমান বোধ করত, অনেকে আবার রেগে যেত, ভারতীয়দের গালাগালি করত, এমনকি সুযোগ পেলে মারধোর করত, কারণ স্বামী শব্দটিও তার

www.pathagar.com

কাছে ঘৃণাবাচক শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়। এর অর্থ মনিব বলা তাদের কাছে অপমানের শামিল।

এখন থেকে আমার পরিচয় হলো "কুলি ব্যারিস্টার"। বণিকদেরকে বলা হতো "কুলি বণিক"। এভাবে "কুলি" শব্দের আসল অর্থ বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং তা ভারতীয়দের সাধারণ নামে পরিণত হলো। মুসলমান বণিকেরা প্রতিবাদ করে বলত, "আমি কুলি নই, আমি আরব" অথবা "আমি বণিক" এবং ইংরেজটি ভদ্র সন্তান হলে ক্ষমা প্রার্থনা করত।

এরকম অবস্থায় পাগড়ী পরিধানের প্রশ্নটি বিরাট গুরুত্ববহ ছিল। একজন ভারতীয় হিসেবে পাগড়ী খুলতে বাধ্য হওয়ার অর্থ অপমান হজম করা। সুতরাং আমি ভাবলাম আমার জন্য ভারতীয় পাগড়ীকে বিদায় জানিয়ে ইংরেজের সাহেবী টুপী পরাই ভালো। এতে অপমান হওয়া থেকে বাঁচা যাবে, আর অপ্রিয় বিতর্কেরও অবসান হবে।

কিন্তু আব্দুল্লাহ শেঠ প্রস্তাবটা নাকচ করে দিলেন। তিনি বললেন, "ওরকম কিছু করলে তার ফল খুব খারাপ হবে। যারা ভারতীয় পাগড়ী পরতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাদের মান সম্মান তুমি বিসর্জন দেবে। ভারতীয় পাগড়ী তোমার মাথায় বেশ মানিয়েছে। ইংরেজের সাহেবী টুপি পরলে তোমাকে হোটেলের ওয়েটারের মতো লাগবে।"

এ উপদেশের মধ্যে বাস্তব প্রজ্ঞা, দেশপ্রেম এবং কিছুটা সংকীর্ণতা ছিল। প্রজ্ঞা স্পষ্ট প্রতীয়মান, আর দেশপ্রেম না থাকলে তিনি ভারতীয় পাগড়ীর জন্য চাপাচাপি করতেন না। তবে ওয়েটারের সাথে তাচ্ছিল্যপূর্ণ তুলনা সংকীর্ণতা প্রকাশ করেছে। চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের তিনটি শ্রেণী ছিল—হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান। শেষোক্ত শ্রেণীতে ছিল খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত ভারতীয় শ্রমিকদের সন্তানেরা। ১৮৯৩ সালেও তাদের দল বেশ বড় ছিল। তারা ইংরেজদের পোষাক পরত এবং তাদের অধিকাংশই জীবিকার জন্য হোটেলে ওয়েটারের চাকরী করত। ইংরেজের সাহেবী টুপি সম্পর্কে আব্দুল্লাহ শেঠের সমালোচনা ছিল এই শ্রেণীকে লক্ষ্য করে। হোটেলে ওয়েটারের চাকরী ছিল অসম্মানজনক। এ বিশ্বাস অনেকের মধ্যে আজও বিরাজমান।

মোটের ওপর আমি আব্দুল্লাহ শেঠের উপদেশ পছন্দ করেছিলাম। এ ঘটনা সম্পর্কে আমি সংবাদপত্রে লিখলাম এবং কোর্টে আমার পাগড়ী পরার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরলাম। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে আলোচনার ঝড় উঠল যাতে আমাকে "অবাঞ্ছিত আগন্তুক" আখ্যা দেয়া হলো। এ ঘটনার মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছানোর কয়েক দিনের মধ্যেই আমার নাম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলো। অনেকেই আমাকে সমর্থন করল, আর অন্যেরা আমার হঠকারিতার তীব্র সমালোচনা করল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানের পুরো সময় জুড়েই পাগড়ী পরা অব্যাহত রইল। দক্ষিণ আফ্রিকাতে কখন এবং কেন পাগড়ী পরা ছেড়ে দিয়েছিলাম তা পরে বর্ণনা করব।

www.pathagar.com

আট
প্রিটোরিয়ার পথে

ডারবানের ভারতীয় খৃষ্টানদের সাথে আমার শিগগিরই পরিচয় হলো। কোর্টের দোভাষী মি. পল ছিল রোমান ক্যাথলিক। আমি তার সাথে পরিচয় করে নিলাম। প্রয়াত মি. সুবহান গডফ্রে, যিনি তখন প্রোটেস্টান্ট মিশনের শিক্ষক ছিলেন, তাঁর সাথেও পরিচিত হলাম। তাঁর ছেলে জেমস গডফ্রে দক্ষিণ আফ্রিকান প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে ১৯২৪ সালে ভারত সফর করেছিলেন। অনুরূপভাবে আমি প্রয়াত পার্সী রুস্তমজী ও আদমজী মিয়াখানের সাথেও পরিচিত হলাম। এসব বন্ধুরা, যারা ব্যবসায়িক প্রয়োজন ছাড়া একে অপরের সংস্পর্শে আসত না, তারা ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিল যার বিবরণ পরে আসছে।

যখন আমি এভাবে আমার পরিচিতির গণ্ডি বিস্তৃত করছিলাম তখন ফার্মের নিকট তাদের উকিলের পত্র এলো, যা থেকে জানা গেল মামলার প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন এবং আব্দুল্লাহ শেঠ নিজে অথবা তার একজন প্রতিনিধির প্রিটোরিয়া যাওয়া আবশ্যক।

আবদুল্লাহ শেঠ পত্রটা আমাকে পড়তে দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন আমি প্রিটোরিয়া যেতে রাজি আছি কি না। আমি বললাম, "কেসের বিষয়ে আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত জানার পরেই কেবল বলতে পারি আমি যাব কি না। এ মুহূর্তে আমি জানি না সেখানে গিয়ে আমাকে কি করতে হবে।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি কেরানীকে বললেন কেসটির বিষয়ে আমাকে বিস্তারিত জানাতে।

আমি কেসটি একেবারে গোড়া থেকে পড়তে শুরু করলাম। জানজিবারে অল্প যে ক'দিন ছিলাম তখন কোর্টে গিয়ে সেখানকার কাজ দেখেছি। একজন পার্সী উকিল এক সাক্ষীকে জেরা করছিলেন এবং তাকে হিসাবের খাতায় ডেবিট-ক্রেডিট এন্ট্রি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। সেসব আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল। বুক কিপিং সম্পর্কে আমার পড়া ছিল না—না স্কুলে, না ইংল্যান্ডে থাকাকালে। আর যে কেসের জন্য আমার দক্ষিণ আফ্রিকায় আসা তা মূলত হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত। যার হিসাব বিজ্ঞানের জ্ঞান আছে সেই কেবল এর ব্যাখ্যা দিতে পারে। কেরানী যতই ডেবিট-ক্রেডিট সম্পর্কে বলে যাচ্ছিলেন, আমি ততই গুলিয়ে ফেলছিলাম। পি. নোট এর অর্থ আমি জানতাম না। ডিকশনারিতেও শব্দটি খুঁজে পেলাম না। কেরানীর নিকট আমার অজ্ঞতা প্রকাশ করে ফেললাম এবং তার কাছ থেকে জানলাম, পি.নোট মানে প্রমিজরি নোট। আমি বুক কিপিং এর একখানা বই কিনে পড়লাম। এতে আমি কিছুটা আত্মবিশ্বাস অর্জন করলাম। কেসটিও আমি বুঝতে পারলাম। আমি দেখলাম, হিসাব-নিকাশ কিভাবে রাখতে হয় আব্দুল্লাহ শেঠ তা না জানলেও তার বাস্তব অভিজ্ঞতা এত বেশি যে বুক কিপিং এর যে কোনো জটিল সমস্যা তিনি খুব দ্রুত সমাধান করতে পারতেন। তাঁকে জানিয়ে দিলাম যে আমি প্রিটোরিয়া যেতে প্রস্তুত।

www.pathagar.com

শেঠ জিজ্ঞেস করলেন, "উঠবেন কোথায়?"

আমি বললাম, "আপনি যেখানে উঠতে বলবেন, সেখানেই।"

"তাহলে আমাদের আইনজীবীকে লিখে দিচ্ছি। তিনি আপনার থাকার ব্যবস্থা করবেন। সেখানকার মেমন বন্ধুদেরকেও পত্র পাঠাব, কিন্তু আমি চাই না আপনি তাদের সাথে থাকুন। আমাদের বিপক্ষ প্রিটোরিয়াতে খুব প্রভাবশালী। আমাদের গোপন পত্রালাপ তাদের কেউ কোনোভাবে পড়তে পারলে তা আমাদের জন্য বড় ক্ষতির কারণ হবে। আপনি তাদের সাথে পরিচয় যত কম রাখবেন আমাদের জন্য ততই মঙ্গল।"

"আপনার আইনজীবী আমাকে যেখানে রাখবেন আমি সেখানেই থাকব। তা না হলে আলাদাভাবে নিজের ব্যবস্থা করে নেব। এ নিয়ে আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। আমাদের গোপন বিষয়ে কেউ কিছু জানতে পারবে না। কিন্তু বিপক্ষের সাথেও আমি পরিচিতি গড়ে তুলতে চাই। আমি তাদের বন্ধুত্ব চাই। সম্ভব হলে আমি কেসটি কোর্টের বাইরে আপোসে মিটিয়ে ফেলতে চাই। এ যাবৎ যা কিছুই ঘটে থাক, তৈয়ব শেঠ তো আপনাদের আত্মীয়"।

শেঠ তৈয়ব হাজী খান মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ শেঠের একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। লক্ষ্য করলাম, আপোসে মিটিয়ে ফেলার কথায় শেঠজী কিছুটা চমকে উঠলেন। ইতিমধ্যে ডারবানে আমি ৬/৭ দিন পার করেছি এবং এ কয়দিনে আমরা একে অপরকে চিনতে ও বুঝতে পেরেছি। আমি আর তার কাছে "শ্বেত হস্তী" নই। তাই তিনি বললেন, "হ্যাঁ, দেখা যাক। কোর্টের বাইরে আপোস-রফার চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। কিন্তু আমরা সবাই আত্মীয় এবং একে অপরকে ভালো করেই চিনি। তৈয়ব শেঠ আপোস রফায় সহজে রাজি হবার লোক নন। আমাদের পক্ষে সামান্যতম অসতর্কতার সুযোগে আমাদের কাছ থেকে সকল সুবিধা আদায় করে নেবেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন।"

আমি বললাম, "সে বিষয়ে আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। মামলার বিষয়ে আমি তৈয়ব শেঠ বা অন্য কারো সাথে আলাপ করব না। আমি শুধু তার নিকট প্রস্তাব পাঠাব একটা সমঝোতায় আসতে, যার মাধ্যমে বহু অপ্রয়োজনীয় মামলা-মোকদ্দমা এড়ানো সম্ভব।"

এখানে পৌঁছার সপ্তম কি অষ্টম দিনে ডারবান ত্যাগ করলাম। আমার জন্য ট্রেনে প্রথম শ্রেণীর সীট বুক করা হয়েছিল। কেউ বেডিং নিতে চাইলে তার জন্য আরো পাঁচ শিলিং অতিরিক্ত দিতে হতো। আব্দুল্লাহ শেঠ আমাকে বেডিং নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। কিন্তু আমার একগুঁয়েমি এবং পাঁচ শিলিং সাশ্রয়ের জন্য আমি বেডিং নিতে অস্বীকার করলাম। আব্দুল্লাহ শেঠ আমাকে সতর্ক করলেন। বললেন, "দেখুন মশাই, এটা ভারত থেকে আলাদা দেশ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, প্রয়োজন মতো ব্যয়ের সামর্থ্য আমাদের আছে। আপনার প্রয়োজনমতো জিনিসপত্র নিতে কোনো কার্পণ্য করবেন না।"

www.pathagar.com

আমি তাকে ধন্যবাদ দিলাম এবং চিন্তা করতে নিষেধ করলাম। রাত প্রায় ন'টায় ট্রেন নাটালের রাজধানী মেরিৎসবাগে পৌছাল। এই স্টেশন থেকেই বেডিং দেয়া হতো। একজন রেল কর্মচারী এসে জিজ্ঞেস করলেন আমার বেডিং চাই কি না। আমি বললাম, "না, আমার সাথে বেডিং আছে।" তিনি চলে গেলেন। এরপর একজন যাত্রী এসে আমার আপাদমস্তক দেখলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, আমি একজন কালো আদমী। এতে তিনি বিরক্ত বোধ করলেন। তিনি বের হয়ে গেলেন এবং দু'জন কর্মচারীসহ পুনরায় ফিরে এলেন। তারা চুপ করে থাকলেন, অপর একজন কর্মচারী আমার নিকট এসে বললেন, "চলে এসো, তোমাকে ভ্যান কামরায় যেতে হবে।"

আমি বললাম, "কিন্তু আমার তো প্রথম শ্রেণীর টিকেট আছে।"

অন্য একজন বললেন, "তাতে কিছু যায় আসে না। আমি বলছি, তোমাকে অবশ্যই ভ্যান কামরায় যেতে হবে।"

"আমি বলছি, ডারবানে আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে এ কামরায় ভ্রমণ করতে, আমি এখানেই থাকতে চাই।"

কর্মচারীটি বললেন, "না, তুমি এখানে থাকবে না। তোমাকে এ কামরা ত্যাগ করতেই হবে, না হলে আমাকে পুলিশ কনস্টেবল ডাকতে হবে তোমাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে।"

"হ্যাঁ, তাই করুন। নিজে থেকে আমি বের হয়ে যেতে রাজি নই।"

পুলিশ কনস্টেবল এলো। সে আমার হাত ধরে টেনে তুলে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল। আমার লাগেজও বের করে দেয়া হলো। আমি অন্য কামরায় যেতে অস্বীকৃতি জানালাম। ট্রেন ছেড়ে চলে গেল। হাত ব্যাগটা সাথে নিয়ে আমি ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসলাম। অন্য লাগেজগুলো যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে রইল। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ওগুলোর দায়িত্ব নিল।

তখন ছিল শীতকাল। আর দক্ষিণ আফ্রিকার উঁচু ভূমিতে এ সময়ে প্রচণ্ড শীত পড়ে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মেরিৎসবাগের উচ্চতা অনেক বেশি হওয়ায় শীতের তীব্রতা ছিল খুবই বেশি। আমার ওভারকোটটি ছিল লাগেজের মধ্যে, কিন্তু আবার অপমানিত হবার ভয়ে আমি ওটা চাইতে সাহস পেলাম না। সুতরাং বসে বসে শীতে কাঁপতে থাকলাম। ঘরে কোনো বাতিও ছিল না। প্রায় মধ্যরাতে একজন যাত্রী এলেন এবং সম্ভবত আমার সাথে কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু আমার তখন কথা বলার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না।

আমি আমার করণীয় সম্পর্কে ভাবতে শুরু করলাম। আমার এখন কি করা উচিৎ নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করব, ভারতে ফেরৎ চলে যাব, নাকি অপমানটা হজম করে প্রিটোরিয়া যাব এবং মামলা শেষ করে ভারতে ফিরে যাব? আমার দায়িত্ব পালন না করে ভারতে ফিরে যাওয়াটা হবে ভীতুর কাজ। আমাকে যে কষ্ট দেয়া হলো তা তো গভীর প্রোথিত বর্ণ-বিদ্বেষ ব্যাধির বাহ্যিক লক্ষণ মাত্র। সম্ভব হলে এ ব্যাধির মূলোৎপাটন করার চেষ্টা করা উচিত, তাতে আমার যত

www.pathagar.com

কষ্টই স্বীকার করতে হোক। আমার প্রতি অন্যায়ের প্রতিকার করতে বর্ণ-বিদ্বেষ দূর করার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন তার সবই করতে হবে। সুতরাং আমি পরবর্তী ট্রেন ধরে প্রিটোরিয়া যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

পরদিন সকালে আমি রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারকে একটা লম্বা টেলিগ্রাম পাঠালাম এবং আব্দুল্লাহ শেঠকেও জানালাম, যিনি অবিলম্বে জেনারেল ম্যানেজারের সাথে দেখা করলেন। জেনারেল ম্যানেজার রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপ সমর্থন করলেন, কিন্তু তাকে এটাও বললেন যে, তিনি ইতিমধ্যেই স্টেশন মাস্টারকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন প্রিটোরিয়া পর্যন্ত আমার নিরাপদ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়।

আব্দুল্লাহ শেঠ মেরিৎসবার্গের ভারতীয় ব্যবসায়ী ও অন্যান্য বন্ধুদেরকে টেলিগ্রাম করে আমার সাথে দেখা করতে বললেন। ব্যবসায়ীরা স্টেশনে আমার সাথে দেখা করতে এলেন এবং তাদের নিজেদের প্রতি অবিচারের কাহিনী বর্ণনা করে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, আমাকে যে ধরনের কষ্ট দেয়া হয়েছে তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তারা বললেন যে, ট্রেনের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণরত ভারতীয় যাত্রী রেলওয়ে কর্মচারী ও সাদা চামড়ার যাত্রীদের নিকট হতে দুর্ব্যবহার পাবেন এটাই কাঙ্ক্ষিত। এসব দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতেই দিনটা চলে গেল। বিকেলের ট্রেন এলো। এ ট্রেনে আমার জন্য বার্থ রিজার্ভ করা ছিল। মেরিৎসবার্গে আজ আমি বেডিং টিকেট নিলাম, যা আগের বার ডারবানে নেইনি। ট্রেনটি আমাকে চার্লসটাউন পর্যন্ত পৌঁছে দিল।

নয়
আরো কষ্ট

চার্লসটাউনে ট্রেন পৌঁছাল সকাল বেলায়। সে সময়ে চার্লসটাউন ও জোহান্সবার্গের মধ্যে রেলপথ ছিল না। তবে ঘোড়ায় টানা কোচ ছিল যা রাতের বেলায় স্ট্যান্ডারটনে যাত্রাবিরতি করত। আমার একটা কোচের টিকেট ছিল যা মেরিৎসবার্গে একদিন যাত্রাবিরতি হওয়া সত্ত্বেও বাতিল হয়নি। তা ছাড়া আব্দুল্লাহ শেঠ চার্লসটাউনের কোচ এজেন্টের নিকট একটি তারবার্তাও করেছিলেন।

কিন্তু কোচ এজেন্ট আমাকে না নেয়ার জন্য শুধু অজুহাত খুঁজছিলেন। সুতরাং তিনি যখন দেখলেন আমি এখানে নবাগত, তখন বললেন, "তোমার টিকেট বাতিল হয়ে গেছে।" আমি তাকে সঠিক জবাবই দিয়েছিলাম। আমাকে নিতে অস্বীকার করার পিছনে কারণ কোচে স্থান সংকুলানের অভাব নয়, অন্য কিছু। যাত্রীদেরকে কোচের ভিতরে বসানো হতো, কিন্তু "লিডার" বলে কথিত কোচের সাদা চামড়া পরিচালক ভাবল, আমি যেহেতু নবাগত "কুলি" সেহেতু আমাকে ভেতরের সাদা যাত্রীদের সাথে বসানো ঠিক হবে না। কোচ বাক্সের দুই পাশে আসন ছিল। নিয়ম মোতাবেক এগুলোর একটাতে লিডার বসতেন। আজ তিনি

www.pathagar.com

ভেতরে বসলেন আর তার সীটে আমাকে বসতে দিলেন। আমি জানতাম যে এটা পুরোপুরি অন্যায় এবং অপমানজনক, কিন্তু তা হজম করাই উত্তম বলে ভাবলাম। জোর করে আমি ভেতরে বসতে পারব না, আর প্রতিবাদ করলে আমাকে ফেলে রেখেই কোচ চলে যাবে, যার মানে আরো একদিন বিলম্ব এবং ঈশ্বরই কেবল জানেন পরদিন আবার কোন বিপত্তি ঘটবে। সুতরাং নিজের মনে তড়পালেও কোচোওয়ানের পাশেই বসলাম।

বেলা প্রায় তিনটায় কোচ পারদেকফ পৌঁছাল। এখন লিডারের ইচ্ছে হলো আমার সীটে বসার, কারণ তার ধূমপানের এবং সম্ভবত কিঞ্চিৎ মুক্ত বায়ু সেবনের ইচ্ছে জেগেছিল।

সুতরাং তিনি চালকের নিকট থেকে একটা নোংরা কাপড় নিয়ে তা পা-দানীর ওপর বিছালেন এবং আমাকে সম্বোধন করে বললেন, "স্বামী, তুমি এটার ওপর বসো, আমি চালকের পাশে বসতে চাই।" অপমানটা আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। আমি ভয় ও রাগে কাঁপতে কাঁপতে তাকে বললাম, "আপনিই মশাই এখানে আমাকে বসিয়েছেন, যদিও আমার ভেতরে বসার কথা। সে অপমান আমি সহ্য করেছি। এখন আপনি আবার বাইরে বসতে চান ধূমপানের জন্য, আর আমাকে বলছেন আপনার পদতলে বসতে। কিন্তু আমি ওখানে বসব না। তবে আমি ভেতরে বসতে রাজি আছি।"

আমি যখন কষ্ট করে এ কথাগুলো বলছিলাম তখন লোকটি নেমে আমার ওপর চড়াও হলো এবং আমার কানে সজোরে ঘুষি মারতে লাগল। সে আমার হাত ধরে টেনে নামাতে চেষ্টা করল। আমি কোচ বাক্সের পিতলের রেলিং ধরে ঝুলে থাকলাম এবং কব্জির হাড় ভেঙে গেলেও তা ধরে থাকব বলে স্থির করলাম। যাত্রীরা এ দৃশ্য দেখছিল। লোকটি আমাকে গালিগালাজ করছিল, আমাকে টানছিল, মারধোর করছিল আর আমি চুপ করে সহ্য করছিলাম। সে শক্তিশালী ছিল আর আমি ছিলাম দুর্বল। এ অবস্থা দেখে কয়েকজন যাত্রীর করুণা হলো। তারা বললেন, "মশাই, ওকে ছেড়ে দিন। ওকে আর মারবেন না। ওর তো কোনো দোষ নেই। ও কোনো অন্যায়ও করেনি। ওকে ওখানে বসতে না দিলে ভেতরে আমাদের সাথে বসতে দিন।" লোকটা চীৎকার করে বলল, "ভয় নেই তোর?" কিন্তু তাকে কিছুটা অপ্রতিভ দেখাচ্ছিল এবং আমাকে মারা বন্ধ করল। আমার হাত ছেড়ে দিল, আরো কিছু গালাগালি করল। এরপর কোচ বাক্সের অপর পাশে বসা আদিবাসী হটেনটট চাকরকে পা-দানীর ওপর বসতে বলে খালি হওয়া সীটে নিজে বসল।

যাত্রীরা তাদের সীটে বসলেন, বাঁশী বাজানো হলো এবং কোচ টগবগিয়ে চলতে লাগল। আমার বুকের ভিতর হৃদস্পন্দন দ্রুতগতিতে চলছিল এবং ভেবে অবাক লাগছিল যে আমি গন্তব্যে জ্যান্ত পৌঁছতে পারব কি না। মাঝে মাঝেই লোকটা আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছিল এবং আমার দিকে আঙ্গুল তুলে শাসাচ্ছিল, "শুনে রাখ, স্ট্যান্ডারটনে আগে পৌঁছাই, তারপর

www.pathagar.com

দেখবি কি করি!" আমি নির্বাক বসে রইলাম এবং ঈশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগলাম।

স্ট্যান্ডারটন পৌছতে অন্ধকার হয়ে গেল এবং সেখানে কয়েকটি ভারতীয় মুখ দেখে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। আমি কোচ থেকে নামার সাথে সাথেই এসব বন্ধুরা বললেন, "আমরা এখানে এসেছি আপনাকে স্বাগত জানাতে এবং আপনাকে ঈশা শেঠের দোকানে নিয়ে যেতে। আমরা দাদা আব্দুল্লাহর টেলিফোন পেয়েছিলাম।" আমি খুব খুশী হলাম এবং আমরা শেঠ ঈশা হাজী সুমারের দোকানে গেলাম। শেঠজী ও তার কেরানীরা আমাকে ঘিরে ধরল। পথে যা যা ঘটেছিল সেসব তাদেরকে বললাম। শুনে তারা দুঃখিত হলো এবং আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাল।

কোচ কোম্পানীর এজেন্টকে আমি পুরো ঘটনাটি জানাতে চাইলাম। পথে যা কিছু ঘটেছে তার পুরো বর্ণনা দিয়ে তাকে একটা চিঠি লিখলাম এবং লোকটা যে আমাকে হুমকি দিয়েছে সে বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। পরদিন সকালে যখন আমি আবার যাত্রা শুরু করব তখন আমাকে যেন অন্য যাত্রীদের সাথে ভেতরে বসানো হয় সে বিষয়ে নিশ্চয়তা চাইলাম। এর জবাবে এজেন্ট যা লিখল তা ছিল—"স্ট্যান্ডারটন থেকে অন্য পরিচালকের দায়িত্বে আরো বড় একটা কোচ যাবে। যার বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগ সে আগামীকাল যাবে না এবং আপনি অন্য যাত্রীদের সাথে সীট পাবেন।" এতে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। যে লোকটি আমাকে লাঞ্ছিত করেছিল তার বিরুদ্ধে অবশ্য আমার মামলা করার কোনো ইচ্ছে ছিল না। সুতরাং এ অধ্যায়ের এখানেই সমাপ্তি ঘটল।

পরদিন ঈশা শেঠের লোক আমাকে কোচ পর্যন্ত এগিয়ে দিল। আমি একটা ভালো সীট পেলাম এবং ঐ দিন রাতে নিরাপদে জোহান্সবার্গ পৌছলাম।

স্ট্যান্ডারটন একটা ছোট গ্রাম আর জোহান্সবার্গ হলো বড় শহর। আব্দুল্লাহ শেঠ জোহান্সবার্গেও তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন এবং সেখানকার মুহাম্মদ কাশেম কামরুদ্দিনের ফার্মের নাম-ঠিকানা দিয়েছিলেন। তাদের লোক আমাকে নিতে কোচ স্টেশনে এসেছিল, কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাইনি, আর সেও আমাকে চিনতে পারেনি। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিলাম একটা হোটেলে যাবার। কয়েকটি হোটেলের নাম জানতাম। একটা গাড়ি নিয়ে গ্র্যান্ড ন্যাশনাল হোটেলে যেতে বললাম। ম্যানেজারের সাথে দেখা করে একটা রুম চাইলাম। তিনি আমাকে এক নজর দেখলেন এবং ভদ্রভাবে "দুঃখিত, আমাদের সকল রুম ভর্তি" বলে আমাকে বিদায় জানালেন। অতএব আমি গাড়িচালককে কাশেম কামরুদ্দিনের দোকানে যেতে বললাম। এখানে আব্দুল গনি শেঠ আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং তিনি আমাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন। হোটেলে আমার অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনে তিনি প্রাণখুলে হাসলেন। বললেন, "কি করে আশা করলেন যে হোটেলে ঢুকতে পারবেন?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?"

www.pathagar.com

তিনি বললেন, "এখানে কয়েক দিন থাকলেই বুঝতে পারবেন। এদেশে আমরা বলেই বাস করতে পারছি, কারণ অর্থ উপার্জনের জন্য আমরা সব রকম অপমান সহ্য করছি এবং আমাদের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন।" এ প্রসঙ্গে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতীয়দের দুর্দশার কাহিনী বর্ণনা করলেন।

শেঠ আব্দুল গনি সম্পর্কে আমরা পরে আরো জানতে পারব।

তিনি বললেন, "আপনার মতো লোকের জন্য এদেশ নয়। আপনাকে কালই প্রিটোরিয়া যেতে হবে। আপনাকে ট্রেনে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে হবে। নাটালের চেয়ে ট্রান্সভালের অবস্থা আরো খারাপ। ভারতীয়দেরকে কখনো প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট দেয়া হয় না।"

"আপনারা কি এ ব্যাপারে লেগে থেকে চেষ্টা চালাতে পারেন না?"

"আমরা আবেদন পাঠিয়েছি। কিন্তু স্বীকার করছি যে আমাদের লোকেরাও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে চায় না।"

আমি রেলওয়ের আইন-কানুন আনিয়ে তা পড়লাম। এতে অনেক ফাঁক ছিল। ট্রান্সভালের পুরাতন আইনের ভাষা সঠিক ও সুসংহত ছিল না। রেলওয়ের আইনের অবস্থা ছিল আরো খারাপ।

শেঠজীকে বললাম, "আমি প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে চাই। যদি তা না পারি, তাহলে ঘোড়ার গাড়িতে প্রিটোরিয়া যাব। পথ তো মাত্র সাঁইত্রিশ মাইল।"

শেঠ আব্দুল গনি অতিরিক্ত সময় ও অর্থ ব্যয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, তবে আমার প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। সে অনুযায়ী আমরা স্টেশন মাস্টারকে একটা নোট পাঠালাম। নোটে উল্লেখ করলাম যে আমি একজন ব্যারিস্টার এবং প্রথম শ্রেণী ছাড়া কখনো ভ্রমণ করি না। এটাও উল্লেখ করলাম যে যত দ্রুত সম্ভব আমি প্রিটোরিয়া পৌঁছতে চাই এবং যেহেতু ফেরৎ জবাবের জন্য আমার অপেক্ষা করার সময় নেই, আমি স্বয়ং স্টেশনে উপস্থিত হয়ে জবাব চাই এবং আশা করছি, আমি একটা প্রথম শ্রেণীর টিকেট পাব। সশরীরে জবাব গ্রহণের পিছনে অবশ্য একটা উদ্দেশ্য ছিল। ভেবেছিলাম, স্টেশন মাস্টার যদি লিখিত জবাব দেন, তাহলে তিনি অবশ্যই "না" বলবেন, বিশেষত "কুলি ব্যারিস্টার" সম্পর্কে তার নিজের ধারণা থেকেই। সুতরাং আমি নিজে তার সামনে হাজির হব নিখুঁত ইংরেজের পোষাকে, তার সাথে কথা বলব, সম্ভব হলে প্রথম শ্রেণীর টিকেট ইস্যু করতে তাকে রাজি করাব। তাই আমি ফ্রককোট পরে, নেকটাই লাগিয়ে স্টেশনে গেলাম এবং কাউন্টারে একটা স্বর্ণমুদ্রা রেখে প্রথম শ্রেণীর টিকেট চাইলাম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিই কি আমাকে নোট পাঠিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, আমিই। আমি বাধিত হব যদি আমাকে একটা প্রথম শ্রেণীর টিকেট দেন। আমাকে আজই প্রিটোরিয়া পৌঁছতে হবে।"

তিনি হাসলেন এবং পরে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, "আমি ট্রান্সভালের লোক নই। আমি হল্যান্ডের লোক। আমি আপনার অবস্থা বুঝতে পারছি এবং

www.pathagar.com

সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি আপনাকে একটা টিকেট দিতে পারি, তবে একটা শর্তে যে যদি গার্ড আপনাকে তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে বলে তাহলে আপনি এ বিষয়ে আমাকে জড়াবেন না। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনি রেলওয়ে কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা করবেন না। আপনার নিরাপদ ভ্রমণ কামনা করছি। দেখতে পাচ্ছি আপনি একজন ভদ্রলোক।"

এ কথাগুলো বলে তিনি টিকেট ইস্যু করলেন। আমি তাকে ধন্যবাদ জানালাম এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আশ্বাস দিলাম।

শেঠ আব্দুল গনি স্টেশনে এসেছিলেন আমাকে বিদায় জানাতে। এ ঘটনা তাকে বিস্মিত করল। তবে তিনি আমাকে সতর্ক করে বললেন, "আপনি নিরাপদে প্রিটোরিয়া পৌঁছালে আমি ওদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। আমার ভয় হচ্ছে ট্রেনের গার্ড আপনাকে প্রথম শ্রেণীতে শান্তিতে থাকতে দেবে না, আর সে যদিও বা দেয়, সাদা চামড়ার যাত্রীরা দেবে না।"

আমি প্রথম শ্রেণীর কামরায় আসন গ্রহণ করলাম এবং ট্রেন ছেড়ে দিল। গারমিস্টনে গার্ড এলো টিকেট পরীক্ষা করতে। তিনি আমাকে এখানে দেখে রেগে গেলেন এবং আঙ্গুল উঁচিয়ে আমাকে তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে বললেন। আমি তাকে আমার প্রথম শ্রেণীর টিকেট দেখালাম। তিনি বললেন, "ওতে কিছু যায় আসে না। এখান থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে যাও।"

এই কামরায় মাত্র একজন ইংরেজ যাত্রী ছিলেন। তিনি গার্ডকে তিরস্কার করলেন। তিনি বললেন, "এ ভদ্রলোককে বিরক্ত করার অর্থ কি? দেখছেন না যে তার প্রথম শ্রেণীর টিকেট আছে? তার সাথে ভ্রমণ করতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।" আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আপনি যেখানে আছেন, সেখানেই আরামে থাকুন।"

গার্ড মিনমিনে গলায় বললেন, "কুলির সাথে ভ্রমণে আপনার আপত্তি না থাকলে আমার কি?" এটা বলে গার্ড চলে গেলেন।

রাত প্রায় আটটায় ট্রেন প্রিটোরিয়া পৌঁছাল।

দশ
প্রিটোরিয়ায় প্রথম দিন

আমি আশা করেছিলাম দাদা আব্দুল্লাহর এটর্নির পক্ষ থেকে আমাকে নিয়ে যেতে প্রিটোরিয়া স্টেশনে কেউ আসবে। জানতাম কোনো ভারতীয় আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসবে না, কারণ আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে কোনো ভারতীয়ের বাড়িতে আমি উঠব না। কিন্তু এটর্নি কাউকে পাঠাননি। পরে জানতে পেরেছিলাম, যেহেতু আমি রোববারে পৌঁছেছিলাম, ছুটির দিনের অসুবিধাহেতু তিনি কাউকে পাঠাতে পারেননি। আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না কোথায় যাব, কারণ আমার ভয় হচ্ছিল যে কোনো হোটেল আমাকে জায়গা দেবে না।

www.pathagar.com

১৮৯৩ সালের প্রিটোরিয়া স্টেশন ছিল ১৯১৪ সালের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বাতিগুলো জ্বলছিল টিম টিম করে। যাত্রী সংখ্যা ছিল মাত্র গুটিকয়েক। আমি অন্য যাত্রীদেরকে আগে যেতে দিলাম। ভাবলাম, টিকেট কালেক্টর একটু অবসর হলেই তার হাতে টিকেট তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করব তিনি আমাকে কোনো ছোট হোটেলের ঠিকানা বা অন্য কোথাও যাবার পরামর্শ দিতে পারেন কি না। অন্যথায় আমি স্টেশনেই রাতটা কাটাব। স্বীকার করছি যে আমি তাকে এ কথাগুলো জিজ্ঞেস করতে ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছিলাম যাতে আবার অপমানিত হতে না হয়।

স্টেশন থেকে সব যাত্রী চলে গেল। আমার টিকেটটি টিকেট কালেক্টরকে দিলাম এবং আমার অসুবিধার কথা বললাম। সে আমাকে ভদ্রভাবেই জবাব দিল, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম যে সে আমাকে তেমন কোনো সাহায্য করতে পারবে না। কিন্তু পাশে দাঁড়ানো একজন আমেরিকান নিগ্রো আমাদের কথার মাঝে যোগ দিল। সে বলল, "তুমি দেখছি এখানে একেবারেই নতুন এবং বন্ধুহীন। আমার সাথে যেতে যদি রাজি থাক তাহলে আমি তোমাকে একটি ছোট হোটেলে নিয়ে যাব, যার মালিক একজন আমেরিকান এবং আমার খুব পরিচিত। আমার মনে হয় তিনি তোমাকে জায়গা দেবেন।"

তার প্রস্তাব মতো জায়গা পাব কি না তাতে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তবুও তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার পরামর্শ গ্রহণ করলাম। সে আমাকে জনস্টন'স ফ্যামিলি হোটেলে নিয়ে গেল। সে মি. জনস্টনকে টেনে এক পাশে নিয়ে গেল আমার ব্যাপারে কথা বলতে এবং তিনি আমাকে ঐ রাতের জন্য থাকতে দিতে রাজি হলেন। তবে শর্ত যে আমাকে রাতের খাবার আমার রুমে খেতে হবে। তিনি বললেন, "আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে আমি বর্ণ-বিদ্বেষী নই। কিন্তু এখানে শুধুমাত্র ইউরোপীয়ান রীতি মানা হয়। আমি যদি তোমাকে ডাইনিং রুমে খাওয়ার অনুমতি দেই, তাহলে অন্য অতিথিরা অসন্তুষ্ট হতে পারে, এমনকি তারা চলেও যেতে পারে।"

আমি বললাম, "আপনাকে ধন্যবাদ। এক রাতের জন্য হলেও আপনি আমাকে জায়গা দিয়েছেন। এখানকার অবস্থা সম্পর্কে আমি কম-বেশি অবহিত হয়েছি এবং আমি আপনার অসুবিধাও বুঝতে পারছি। আমার খাবার রুমে পরিবেশন করা হলে তাতে আমার আপত্তি নেই। আশা করি আগামীকাল আমি অন্য কোথাও একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারব।"

আমাকে একটা রুম দেখিয়ে দেয়া হলো। সেখানে খাবারের অপেক্ষায় বসে বসে ভাবছিলাম, কারণ আমি ছিলাম সম্পূর্ণ একা। হোটেলে অতিথি বেশি ছিল না। আশা করছিলাম ওয়েটার শীঘ্রই খাবার নিয়ে ঢুকবে। তার পরিবর্তে মি. জনস্টন আবির্ভূত হলেন। তিনি বললেন, "আমি তোমাকে রুমে খাবার খেতে হবে বলেছিলাম এজন্য লজ্জিত। অন্য অতিথিদেরকে তোমার কথা বলেছি এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছি ডাইনিং রুমে তোমাকে খেতে দেওয়ায় তাদের আপত্তি আছে কি না। তারা বলেছেন তাদের আপত্তি নেই এবং তোমার যতদিন খুশী

www.pathagar.com

এখানে থাকতে পার, এতেও তাদের আপত্তি নেই। সুতরাং দয়া করে ডাইনিং রুমে এসো এবং যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকো।"

আমি তাকে আবার ধন্যবাদ দিলাম। এর পর ডাইনিং রুমে গিয়ে পেট ভরে খেলাম।

পরদিন সকালে আমি এটর্নি মি. এ. ডবিউ বেকারের সাথে দেখা করলাম। আব্দুল্লাহ শেঠ আমাকে আগেই তার সম্পর্কে কিছুটা বলেছিলেন। সুতরাং তার আন্তরিক অভ্যর্থনা আমাকে অবাক করেনি। তিনি আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। আমি আমার সব কথাই তাকে বললাম। শুনে তিনি বললেন, "ব্যারিস্টার হিসেবে এখানে আপনার কোন কাজ নেই, কারণ এখানে আমরা সবচেয়ে ভালো আইনজীবীকে নিয়োগ করেছি। মামলাটা দীর্ঘ দিনের এবং জটিল। সুতরাং কেবলমাত্র সঠিক তথ্য জানার বিষয়ে আমি আপনার সাহায্য নেব। আর আমার মক্কেলের সাথে আপনার মাধ্যমে যোগাযোগ করাটাও আমার জন্য সহজ হবে, কারণ তার কাছ থেকে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো আমি আপনার মাধ্যমেই চাইব। সেটা নিশ্চয়ই একটা বড় সুবিধা। এখনো আমি আপনার বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারিনি। ভেবেছিলাম, আপনি এখানে পৌঁছার পরে ব্যবস্থা করাটাই ভালো হবে। এখানে ভয়ঙ্কর রকমের বর্ণ-বিদ্বেষ চালু আছে। অতএব আপনার মতো লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করাটা সহজ নয়। কিন্তু আমি একজন দরিদ্র মহিলাকে চিনি। তিনি একজন রুটিওয়ালার (বেকার) স্ত্রী। আমার মনে হয় তিনি আপনাকে রাখবেন এবং এতে তার আয়ও কিছুটা বাড়বে। চলুন, তার ওখানে যাই।"

সুতরাং তিনি আমাকে ঐ মহিলার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এরপর মহিলার সাথে আলাদাভাবে আমার ব্যাপারে কথা বললেন এবং মহিলাটি আমাকে সপ্তাহে ৩৫ শিলিং ভাড়ায় থাকতে দিতে রাজি হলেন।

মি. বেকার একজন এটর্নি। তা ছাড়াও তিনি একজন অপেশাদার গোঁড়া ধর্ম প্রচারক। তিনি এখনো জীবিত আছেন এবং আইন পেশা বাদ দিয়ে এখন পুরোপুরি মিশনারী কাজের সহিত জড়িত আছেন। তিনি প্রচুর ধনসম্পদের মালিক। এখনো তিনি আমাকে চিঠি লেখেন। তাঁর পত্রগুলোতে একটা বিষয় প্রতিবারেই লিখেন। খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরেন এবং বলেন যে যীশুখৃষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র ও মানবজাতির ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার না করলে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

প্রথম পরিচয়েই মি. বেকার আমার ধর্মমত সম্পর্কে জেনে নিলেন। আমি তাকে বললাম, "জন্মসূত্রে আমি একজন হিন্দু। তথাপি আমি হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না। আর অন্য ধর্ম সম্পর্কে আরো কম জানি। আসলে আমি জানি না আমি কোথায় আছি, আমার ধর্ম বিশ্বাস কি আছে এবং কি হওয়া উচিত। আমি আমার নিজ ধর্ম সম্পর্কে গভীর পড়াশুনা করতে চাই এবং সেই সাথে যতটা সম্ভব অন্য ধর্ম সম্পর্কেও।"

www.pathagar.com

এসব কথা শুনে মি. বেকার খুশী হলেন এবং বললেন, "আমি সাউথ আফ্রিকা জেনারেল মিশন এর অন্যতম পরিচালক। নিজ খরচে আমি একটা গীর্জা তৈরি করেছি এবং সেখানে নিয়মিত যীশুখৃষ্টের বাণী প্রচার করি। আমার মধ্যে কোনো বর্ণ-বিদ্বেষ নেই। আমার কিছু সহকর্মী আছে এবং আমরা প্রতিদিন বেলা একটায় অল্পক্ষণের জন্য মিলিত হই এবং শান্তি ও আলোর জন্য প্রার্থনা করি। আমি খুশী হব যদি আপনি তাতে যোগ দেন। আমার সহকর্মীদের সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব। তারা আপনাকে পেয়ে খুশী হবে এবং এটা বলতে পারি যে তাদের সাহচর্য আপনারও পছন্দ হবে। এ ছাড়া আমি আপনাকে কিছু ধর্মীয় বই পড়তে দেব। আর আমি বিশেষভাবে সুপারিশ করছি সকল বইয়ের সেরা বই বাইবেল আপনি পড়বেন।"

আমি মি. বেকারকে ধন্যবাদ জানালাম এবং বেলা একটার প্রার্থনাতে যতদূর সম্ভব নিয়মিত হাজির হতে রাজি হলাম। মি. বেকার আরো বললেন, "তাহলে আশা করি আগামীকাল বেলা একটায় আপনি এখানে আসবেন এবং আমরা একসাথে প্রার্থনার জন্য যাব।" এরপর আমরা বিদায় নিলাম।

তখন পর্যন্ত আমার ধর্ম-চিন্তার খুব একটা সময় ছিল না।

আমি মি. জনস্টনের নিকট গেলাম, বিল মিটিয়ে দিলাম এবং নতুন বাসস্থানে গিয়ে দুপুরের খাবার খেলাম। বাড়িওয়ালী একজন ভালো মহিলা ছিলেন। তিনি আমার জন্য নিরামিষ খাবার রেঁধেছিলেন। খুব শিগগীরই আমি এ পরিবারের সাথে মানিয়ে নিলাম।

এরপর আমি এক বন্ধুর সাথে দেখা করতে গেলাম যার কাছে দাদা আব্দুল্লাহ একটা পত্র দিয়েছিলেন। তার কাছ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের দুর্দশা সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানলাম। তিনি আমাকে তার সাথে থাকার জন্য বিশেষ করে বললেন। আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম যে আমার থাকার ব্যবস্থা করে ফেলেছি। তিনি অনুরোধ করলেন, যে কোনো প্রয়োজনের কথা তাকে বলতে যেন সংকোচ না করি।

তখন অন্ধকার হয়ে এসেছিল। বাড়ি ফিরলাম, খাবার খেলাম এবং নিজের ঘরে গিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলাম। আমার জন্য জরুরি কোনো কাজ ছিল না। আব্দুল্লাহ শেঠকে আমি তা জানালাম। ভাবলাম, আমার প্রতি মি. বেকারের এতো আগ্রহের কারণ কি? তার ধর্মসঙ্গীদের কাছ থেকে আমার কি ফায়দা হবে? খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে কতটা পড়াশুনা করব? হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বইপত্র কোথায় পাব? আর আমার নিজ ধর্ম সম্পর্কে ভালো করে না জেনে খৃষ্টধর্ম সঠিক অর্থে কতটা বুঝতে পারব? অবশেষে একটা সিদ্ধান্তে এলাম, সামনে যা কিছু পাই তা নিরপেক্ষভাবে পড়ব এবং ঈশ্বরের ওপর ভরসা করে মি. বেকারের দলকে মোকাবেলা করব। নিজ ধর্মকে ভালোভাবে বুঝার আগে অন্য ধর্ম গ্রহণের চিন্তা করা আমার উচিত হবে না।

এসব চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

www.pathagar.com

এগার

খৃষ্টান সাহচর্যে

পরদিন বেলা একটায় আমি বেকারের প্রার্থনা সভায় যোগ দিলাম। সেখানে আমাকে মিস হ্যারিস, মিস গ্যাব, মি. কোটস এবং অন্যান্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। প্রত্যেকেই প্রার্থনার জন্য হাঁটু গেড়ে বসল। আমিও তাদের অনুসরণ করলাম। প্রার্থনাটা ছিল ঈশ্বরের নিকট আত্মনিবেদন করে নিজ নিজ ইচ্ছে অনুযায়ী কিছু চাওয়া। নিত্য দিনের প্রার্থনায় আরো থাকত দিনটা যেন শান্তিপূর্ণভাবে কেটে যায় অথবা ঈশ্বর যেন হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার খুলে দেন—এ আকুতি।

এখন এ প্রার্থনায় আমার কল্যাণের জন্য যোগ করা হলো, "হে প্রভু, আমাদের মাঝে নবাগত ভ্রাতাকে পথ দেখাও। প্রভু, আমাদেরকে যে শান্তি দিয়েছ, তাকেও সে শান্তি দাও। প্রভু যীশু, যিনি আমাদেরকে রক্ষা করেছেন, তাকেও তিনি রক্ষা করুন। যীশুর নিকট আমাদের এই প্রার্থনা।" এ সভাগুলোতে ধর্মীয় গীত বা অন্য গান-বাজনা ছিল না। প্রত্যেক দিন বিশেষ কিছু চেয়ে প্রার্থনা করা হতো এবং তারপর খাবার সময় হয়ে যাওয়ায় আমরা চলে যেতাম খাবার খেতে। এ প্রার্থনায় পাঁচ মিনিটের বেশি লাগত না।

মিস হ্যারিস ও মিস গ্যাব উভয়েই ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ কুমারী। দুই মহিলা একত্রে বাস করতেন এবং তারা আমাকে প্রতি রোববারে তাদের বাড়িতে বিকেল ৪ টায় চা পানের স্থায়ী নিমন্ত্রণ দিয়ে রেখেছিলেন।

মি. কোটস ছিলেন একজন কোয়েকার (Quaker—একটি খৃষ্টান গোষ্ঠীর সদস্য যারা গীর্জায় আনুষ্ঠানিক উপাসনার পরিবর্তে ঘরোয়াভাবে মিলিত হয় এবং এরা যে কোনো পরিস্থিতিতেই যুদ্ধ বিরোধী–অনুবাদক)। তিনি ছিলেন গোঁড়া বিশ্বাসের দিলখোলা যুবক। আমরা দু'জন একসাথে হাঁটতে যেতাম। তিনি আমাকে অন্য খৃষ্টান বন্ধুদের কাছেও নিয়ে যেতেন। আমরা যতই ঘনিষ্ঠ হতে লাগলাম, তিনি আমাকে তার নিজের পছন্দের বই দিতে লাগলেন যতক্ষণ না আমার তাক ভর্তি হয়ে যায়। তিনি যেন আমার ওপর বই এর বোঝা চাপিয়ে দিলেন। শুদ্ধ বিশ্বাসে আমি বইগুলো পড়তে রাজি হলাম এবং পড়তে পড়তে আমরা সেগুলোর ওপর আলোচনাও করতাম।

১৮৯৩ সালে আমি এ জাতীয় অনেকগুলো বই পড়েছিলাম। সবগুলোর নাম আমার মনে নেই। তবে তার মধ্যে ছিল "সিটি টেম্পল" এর লেখক ড. পার্কার এর "কমেন্ট্রি", পিয়ার্সনের "মেনি ইনফ্যালিবল প্রুফস" এবং বাটলারের "এনালজি"। এগুলোর অংশবিশেষ আমার নিকট দুর্বোধ্য ছিল। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু আমার পছন্দ হতো, কিছু পছন্দ হতো না। "মেনি ইনফ্যালিবল প্রুফস" বইতে লেখক "অসংখ্য অকাট্য প্রমাণ" বলতে বাইবেলে বর্ণিত ধর্মের সমর্থনে বিভিন্ন প্রমাণ বুঝিয়েছেন। বইটি আমাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। পার্কারের "কমেন্ট্রি" ছিল নৈতিকতা উদ্দীপক কিন্তু খৃষ্টধর্মে যার বিশ্বাস নেই তার জন্য এটা

www.pathagar.com

কোনো কাজেই আসবে না। বাটলারের "এনালজি" আমার নিকট জ্ঞানগর্ভ ও কঠিন মনে হয়েছে যা বুঝতে হলে চার পাঁচবার পড়া প্রয়োজন। আমার মনে হয়েছে নাস্তিকদেরকে আস্তিকতায় ধর্মান্তরিত করার জন্য লেখক বইটি লিখেছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে সমস্ত যুক্তি দেখানো হয়েছে আমার জন্য তা অপ্রয়োজনীয়, কারণ আমি ততদিনে অবিশ্বাসের পর্যায় অতিক্রম করে এসেছি। কিন্তু যীশুই ঈশ্বরের একমাত্র অবতার, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থতাকারী-এর প্রমাণ স্বরূপ উত্থাপিত যুক্তিগুলো আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।

কিন্তু মি. কোটস সহজে পরাজয় মেনে নেয়ার লোক ছিলেন না। আমার জন্য তার গভীর স্নেহ ছিল। তিনি দেখতে পেলেন আমার গলায় রয়েছে তুলসী দানার বৈষ্ণবমালা। এটাকে তিনি কুসংস্কার ভেবে ব্যথিত হলেন। "এ কুসংস্কার তোমাকে মানায় না। এসো তোমার মালাটা ছিঁড়ে ফেলি।"

"না, আপনি তা করবেন না। এটা আমার মায়ের দেয়া পবিত্র মালা।"

"কিন্তু তুমি এতে বিশ্বাস কর?"

"এটার রহস্যময় গুরুত্ব আমি জানি না। এটা না পরলে আমার ক্ষতি হবে তা মনে করি না। কিন্তু এটা না পরে আমি থাকতে পারি না, কারণ আমার মা আমাকে ভালোবেসে, আমার কল্যাণ হবে এ বিশ্বাস নিয়ে যা আমার গলায় পরিয়েছেন, যথাযোগ্য কারণ ছাড়া তা আমি ত্যাগ করতে পারি না। কালক্রমে এটা যদি ক্ষয় হয়ে এমনিতে ভেঙে যায় তাহলে নতুন আরেকটা নেয়ার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু এ মালাটা ছেঁড়া যাবে না।"

মি. কোটস আমার যুক্তি মেনে নিতে পারলেন না, কারণ আমার ধর্মে তার কোনো ভক্তি ছিল না। তিনি আমাকে অজ্ঞতার অতল গহ্বর থেকে উদ্ধার করবেন বলে আশা করেছিলেন। তিনি আমাকে বোঝাতে চাইলেন যে অন্য ধর্মে কিছু সত্য থাক বা না থাক তাতে কিছু যায় আসে না। খৃষ্টধর্ম, যা একমাত্র সত্য, গ্রহণ না করলে আমার আত্মার মুক্তি অসম্ভব, যীশুর মধ্যস্থতা ছাড়া আমার পাপ মোচন হবে না এবং আমার সকল সৎকর্ম বৃথা যাবে।

তিনি আমাকে যেমন কয়েকটি বই পড়তে দিয়েছিলেন, তেমনি কয়েকজন বন্ধুর সাথেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, যাদেরকে তিনি গোঁড়া খৃষ্টান বলে মনে করতেন। এসব পরিচিতের মধ্যে প্লিমাউথ ব্রিদ্রেন (Plymouth Brethren) নামে খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত একটি পরিবারও ছিল।

মি. কোটস এর মাধ্যমে যাদের সাথে পরিচয় হয়েছিল তাদের অনেকেই ভালো মানুষ ছিলেন। তাদের প্রায় সবাইকে ঈশ্বরভীরু বলে মনে হয়েছে। কিন্তু এই পরিবারটির সাথে যোগাযোগকালে প্লিমাউথ ব্রিদ্রেন এর একজন সদস্য আমাকে নিম্নোক্ত যুক্তি তর্কে আক্রমণ করল যার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না—

"তুমি আমাদের ধর্মের সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারছ না। কারণ তুমি যা বলো তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জীবনের প্রতি মুহূর্তে তুমি তোমার অতীত

www.pathagar.com

নীতিভ্রষ্টতা নিয়ে চিন্তা করছ, সব সময় সেগুলোর সংশোধন ও প্রায়শ্চিত্ত করছ। এ অন্তহীন কর্মচক্রের মাধ্যমে কিভাবে তুমি পরিত্রাণ পাবে? তুমি কখনো শান্তি পাবে না। তুমি স্বীকার করছ যে আমরা সবাই পাপী। তাহলে আমাদের বিশ্বাসের পরিপূর্ণতার দিকে তাকাও। আমাদের উন্নতি ও প্রায়শ্চিত্তের প্রচেষ্টা যদিও ব্যর্থ হয়, তা সত্ত্বেও আমরা অবশ্যই পরিত্রাণ পাব। পাপের বোঝা আমরা কিভাবে বহন করব? যীশুর ওপর তা চাপিয়ে দেয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই। তিনিই একমাত্র নিষ্পাপ, ঈশ্বরের পুত্র। তিনি বলেছেন যারা তাঁকে বিশ্বাস করবে তারা পরকালে চিরস্থায়ী জীবন লাভ করবে, এর মধ্যেই রয়েছে ঈশ্বরের অসীম করুণা। আর যেহেতু আমরা যীশুর প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করি, পাপের বন্ধন আমাদেরকে আবদ্ধ করে না। পাপ তো আমরা করবই। এ পৃথিবীতে নিষ্পাপ জীবন যাপন অসম্ভব। সুতরাং যীশু মানব জাতির সকল পাপের জন্য কষ্ট ভোগ ও প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন। তাঁর এ মহৎ পরিত্রাণকে যে মেনে নেবে, সেই কেবল চির শান্তি লাভ করবে। ভেবে দেখ, তোমার জীবনটা কি অশান্তির, আর আমাদের জীবনে রয়েছে শান্তির কি প্রতিশ্রুতি!"

এ যুক্তি আমাকে বোঝাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। আমি বিনীতভাবে জবাব দিলাম—

"এটাই যদি সেই খৃষ্টধর্ম হয় যা সকল খৃষ্টানরা মেনে চলেন তাহলে আমি তা গ্রহণ করতে পারি না। আমার পাপের পরিণতি থেকে আমি পরিত্রাণ চাই না। আমি পাপ থেকেই পরিত্রাণ চাই। বরং বলতে পারেন পাপের চিন্তা থেকেই পরিত্রাণ চাই। সে লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমি অশান্তিতেই থাকতে চাই।"

এর জবাবে প্লিমাউথ ব্রাদার বললেন, "তুমি নিশ্চিত থাকো যে তোমার চেষ্টা নিষ্ফল হবে। আমি যা বললাম তা আবার ভেবে দেখো।"

এবং ঐ ব্রাদার কাজের মাধ্যমে তার কথার প্রমাণ দিয়েছিলেন। তিনি জেনেশুনেই পাপ কাজ করতেন এবং আমাকে দেখাতেন যে পাপের চিন্তা তাকে বিচলিত করতে পারেনি।

কিন্তু এসব বন্ধুর সাথে পরিচয়ের আগেই আমি জেনেছি যে, সব খৃষ্টান প্রায়শ্চিত্তের এ নীতিতে বিশ্বাস করে না। মি. কোটস নিজেও ঈশ্বরকে ভয় করে চলতেন। তার হৃদয় ছিল বিশুদ্ধ এবং তিনি আত্মশুদ্ধিতে বিশ্বাস করতেন। ঐ দুই ভদ্রমহিলাও এ বিশ্বাস পোষণ করতেন। আমার হাতে যে বইগুলো এসেছে তার কয়েকটি ছিল ভক্তিতে পূর্ণ। সুতরাং যদিও আমার সর্বশেষ এ অভিজ্ঞতা মি. কোটসকে খুবই বিব্রত করেছিল, আমি তাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলাম যে একজন প্লিমাউথ ব্রাদারের বিকৃত বিশ্বাস খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে আমার ধারণাকে পক্ষপাতদুষ্ট করবে না।

আমার অসুবিধা ছিল অন্যখানে। তা ছিল খোদ বাইবেল ও তার স্বীকৃত ভাষ্য সম্পর্কিত।

www.pathagar.com

বার

ভারতীয়দের সঙ্গ লাভের প্রয়াস

খৃষ্টান সাহচর্য সম্পর্কে আরো লেখার আগে ঐ সময়ের অন্যান্য অভিজ্ঞতার কথা লেখা প্রয়োজন।

নাটালে দাদা আব্দুল্লাহর যে অবস্থান, প্রিটোরিয়াতে শেঠ তৈয়ব হাজী খান মুহাম্মদের অবস্থান ছিল একই রকম। তাঁকে ছাড়া কোনো গণ-আন্দোলন করা সম্ভব ছিল না। আমি প্রথম সপ্তাহেই তার সাথে পরিচয় করে নিলাম এবং প্রিটোরিয়ায় প্রতিটি ভারতীয়ের সাথে যোগাযোগের আমার ইচ্ছার কথা তাকে বললাম। আমি সেখানে ভারতীয়দের অবস্থা খতিয়ে দেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করলাম এবং আমার কাজে তার সাহায্য চাইলাম। এতে তিনি সানন্দে রাজি হলেন।

আমার প্রথম পদক্ষেপ ছিল প্রিটোরিয়ার সকল ভারতীয়দের একটি সভা আহ্বান করা এবং তাদের কাছে ট্রান্সভালে ভারতীয়দের অবস্থার চিত্র তুলে ধরা। আমি শেঠ হাজী মুহাম্মদ হাজী জুসাব এর নিকট একটি পরিচিতি পত্র নিয়ে গিয়েছিলাম। তার বাড়িতেই সভা অনুষ্ঠিত হলো। সভায় মূলত মেমন ব্যবসায়ীরা উপস্থিত হলেন। অল্প কিছু হিন্দুও ছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রিটোরিয়াতে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল খুবই কম।

এ সভাতে আমার বক্তৃতা ছিল আমার জীবনে জনসভায় প্রথম বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ব্যবসায়ে সততা পালন করা এবং আমি বক্তৃতার বিষয়ে মোটামুটি প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। আমি ব্যবসায়ীদেরকে সর্বদা বলতে শুনেছি যে ব্যবসায়ে সততা রক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি তা মনে করতাম না, এখনো করি না। এখনো অনেক ব্যবসায়ী বন্ধু যুক্তি দেখান যে ব্যবসার ক্ষেত্রে সত্য বেমানান। তারা বলেন, ব্যবসা হলো বাস্তব লেনদেনের ব্যাপার, আর সত্য হলো ধর্মের বিষয়। তারা যুক্তি দেখান যে বাস্তবতা এক জিনিস আর ধর্ম হলো সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। তাদের মতে ব্যবসায়ে বিশুদ্ধ সত্যের প্রশ্নই আসে না। সুবিধাজনক ক্ষেত্রেই কেবল সত্য বলা যেতে পারে। আমার বক্তৃতায় আমি দৃঢ়ভাবে এর প্রতিবাদ করেছিলাম এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে দ্বিমুখী কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তুলেছিলাম। বিদেশের মাটিতে সৎ থাকার দায়িত্বটা আরো বেশি, কারণ অল্প ক'জন ভারতীয়ের কার্যকলাপের মানদণ্ডে তাদের স্বদেশের কোটি কোটি মানুষের বিচার করা হবে।

আমি লক্ষ্য করলাম, চারপাশে ইংরেজদের তুলনায় আমাদের লোকদের অভ্যাসগুলো অস্বাস্থ্যকর এবং এ বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। আমি হিন্দু-মুসলমান, পার্সী-খৃষ্টান, গুজরাটী-মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী-সিন্ধী, কাচ্ছী-সুরাটী— এসব ভেদাভেদ ভুলে যাওয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলাম।

উপসংহারে আমি সুপারিশ রেখেছিলাম যে একটি সমিতি গঠন করা হবে যার মাধ্যমে ভারতীয় অভিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশার বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবরে

www.pathagar.com

আবেদন করতে হবে এবং প্রস্তাব করলাম যে এর জন্য সাধ্যমতো আমার সময় ও শ্রম ব্যয় করব।

লক্ষ্য করলাম, সভায় উপস্থিত লোকদের মধ্যে আমার বক্তৃতার উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েছে। আমার বক্তৃতা শেষে আলোচনা হলো। অনেকেই আমাকে বাস্তব তথ্য দেয়ার প্রস্তাব করল। আমি উৎসাহিত বোধ করলাম। লক্ষ করলাম আমার শ্রোতাদের মধ্যে খুব কম লোকই ইংরেজি জানে। আমি যেহেতু বুঝলাম যে এ দেশে ইংরেজির জ্ঞান কাজে লাগবে, আমি পরামর্শ দিলাম যাদের সময় আছে তারা ইংরেজি শিখবে। তাদেরকে বললাম যে বয়স বেশি হলেও ভাষা শেখা সম্ভব এবং যারা এরকম শিখেছেন তাদের উদাহরণ দিলাম। এ ছাড়া যদি ইংরেজি শেখার ক্লাশ শুরু করা হয় সেখানে আমি শিক্ষকতা করার প্রস্তাব করলাম, অথবা কেউ ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজি ভাষা শিখতে চাইলে তাকে শেখানোর আগ্রহ প্রকাশ করলাম।

ক্লাশ শুরু হলো না, কিন্তু তিনজন যুবক ইংরেজি শিক্ষার ইচ্ছা ব্যক্ত করল এই শর্তে যে আমাকে তাদের কাছে গিয়ে পড়াতে হবে। এদের দু'জন ছিল মুসলমান—পেশায় একজন নাপিত, আরেকজন কেরানী। তৃতীয়জন ছিল হিন্দু—ছোট মুদি দোকানী। আমি তাদের সকলের প্রস্তাবে রাজি হলাম।

আমার পাঠদানের ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো সংশয় ছিল না। আমার ছাত্ররা ক্লান্ত হতে পারে কিন্তু আমি হব না। কখনো কখনো আমি পড়াতে গিয়েছি কিন্তু তারা তাদের ব্যবসায়ে ব্যস্ত। তবে আমি ধৈর্য হারাইনি। ঐ তিনজনের কেউই ইংরেজি ভাষায় গভীর জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী ছিল না। কিন্তু দু'জন প্রায় আটমাসে বেশ ভালো অগ্রগতি অর্জন করল। তারা দু'জন হিসাব রক্ষণ ও সাধারণ ব্যবসায়িক পত্র লিখন শিখে ফেলল। নাপিতের আকাঙ্ক্ষা ছিল তার খদ্দেরদের সাথে কথাবার্তা বলতে যতটা প্রয়োজন ততটা শেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। পড়ালেখার ফলে দু'জন ছাত্র পরবর্তীতে ভালো আয়-রোজগারের যোগ্যতা অর্জন করেছিল।

সভার ফলাফলে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে এ রকম সভা প্রতি সপ্তাহে, বা প্রতি মাসে একবার অনুষ্ঠিত হবে। এসব সভা মোটামুটি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতো এবং সভায় খোলাখুলি ভাব বিনিময় হতো। এর ফল দাঁড়াল এই যে এখন প্রিটোরিয়াতে এমন কোনো ভারতীয় নেই যাকে আমি চিনি না বা যার অবস্থা সম্পর্কে আমি জানি না। এর পর পর্যায়ক্রমে আমি আগ্রহী হলাম প্রিটোরিয়ায় বৃটিশ এজেন্ট মি. জ্যাকোবাস ডি ওয়েট এর সাথে পরিচয় করতে। ভারতীয়দের প্রতি তার সহানুভূতি ছিল কিন্তু তার প্রভাব ছিল খুবই কম। যাহোক, তিনি আমাদেরকে সাধ্যমতো সাহায্য করতে রাজি হলেন এবং যখন খুশী আমাকে দেখা করার অনুমতি দিলেন।

এবারে আমি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করলাম এবং তাদেরকে বললাম, তাদের নিজেদের আইনের অধীনেই ভারতীয়দের ট্রেনে ভ্রমণের ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

বৈষম্য অযৌক্তিক। এর জবাবে এই মর্মে একটা পত্র পেলাম যে যথাযথ পোষাক পরিহিত থাকলে ভারতীয়দের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট দেয়া হবে। এতে আসলে কোনো প্রতিকার হলো না, কারণ "যথাযথ পোষাক পরিহিত" কি না তা নির্ধারণের দায়িত্ব থাকল স্টেশন মাস্টারের ওপর।

বৃটিশ এজেন্ট ভারতীয়দের বিষয়াদি সম্পর্কে কিছু কাগজপত্র আমাকে দেখালেন। তৈয়ব শেঠও আমাকে অনুরূপ কাগজপত্র দিয়েছিলেন। এগুলো থেকে আমি জানলাম কি নিষ্ঠুরভাবে ভারতীয়দেরকে কুকুর লেলিয়ে দিয়ে অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল।

সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রিটোরিয়াতে অবস্থানকালে আমি ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে ভারতীয়দের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হলাম। আমার কোনো ধারণাই ছিল না যে এই পর্যবেক্ষণ ভবিষ্যতে আমার অমূল্য কাজে লাগবে। কারণ বছর শেষ হওয়ার আগেই যদি কেসটি মিটে যায় তাহলে সে বছরের শেষে বা তারও আগে আমি দেশে ফেরার চিন্তা করছিলাম। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল অন্য রকম।

তের
"কুলি" বলতে কি বোঝায়?

ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে ভারতীয়দের অবস্থার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেয়া এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে। যারা এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী তাদেরকে আমি আমার "দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের ইতিহাস" বইটি পড়ার পরামর্শ দিচ্ছি। তবে এখানে এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা প্রয়োজন।

১৮৮৮ বা তারও আগে পাশ করা এক বিশেষ আইনের বলে অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে ভারতীয়দেরকে সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। তারা সেখানে থাকতে পারত কেবল হোটেলের ওয়েটার বা এ জাতীয় চাকর বাকরের কাজ করার জন্য। ব্যবসায়ীদেরকে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। তারা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন নিবেদন করেছে কিন্তু সবই অরণ্যে রোদন!

ট্রান্সভালে ১৮৮৫ সালে একটি কঠোর আইন পাশ হয়। ১৮৮৬ সালে তা সামান্য সংশোধন করা হয়। সংশোধিত এ আইনে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক ভারতীয়কে ট্রান্সভালে প্রবেশের ফি হিসেবে ৩ পাউন্ড করে পোল ট্যাক্স (মাথাপিছু কর) দিতে হবে। তাদের জন্য পৃথক করে রাখা এলাকা ব্যতীত অন্য এলাকায় তারা জমির মালিক হতে পারবে না এবং প্রকৃতপক্ষে তারা জমির মালিকানা পাবে না। তাদের ভোটাধিকার থাকবে না। এসবই ছিল এশিয়ানদের জন্য বিশেষ আইনের বিধান। তাদের ওপর কালো আদমীদের আইনও প্রয়োগ করা হতো। কালোদের আইনের অধীনে ভারতীয়রা সরকারী রাস্তায় ফুটপাথে হাঁটতে পারবে না, এবং অনুমতি পত্র ছাড়া রাত ৯ টার পরে ঘরের বাইরে যেতে পারবে না। ভারতীয়দের ক্ষেত্রে শেষোক্ত আইনের কার্যকারিতা কিছুটা নমনীয় ছিল। যারা

www.pathagar.com

নিজেদেরকে "আরব" বলে পরিচয় দিত, তাদেরকে খাতির করে রেহাই দেয়া হতো। স্বাভাবিকভাবেই কাউকে আইনের বাধ্যবাধকতা থেকে রেহাই দেয়াটা পুলিশের মর্জির ওপর নির্ভরশীল ছিল।

উপর্যুক্ত দুটি আইনের ফলাফলই আমাকে ভোগ করতে হয়েছে। আমি প্রায়ই মি. কোটস এর সাথে হাঁটতে বের হতাম এবং রাত দশটার আগে বাড়ি ফিরতাম না। পুলিশ যদি আমাকে গ্রেপ্তার করে তাহলে কি হবে? এ প্রশ্নে মি. কোটস আমার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি তার নিগ্রো চাকরদের জন্য পাশ ইস্যু করতেন। কিন্তু আমাকে ঐ পাশের একটা কি করে দেবেন? কেবল মনিবই তার চাকরের জন্য পারমিট দিতে পারেন। আমি চাইলে এবং মি. কোটস এর ইচ্ছা থাকলেও এ রকম পারমিট আমাকে দিতে পারতেন না, কারণ তাহলে এটা হতো জালিয়াতী।

সুতরাং মি. কোটস বা তার কোনো বন্ধু আমাকে স্টেট এটর্নি ড. ক্রাউজ এর কাছে নিয়ে গেলেন। দেখা গেল মি. ক্রাউজ ও আমি একই ইন থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করেছি। রাত ন'টার পরে ঘরের বাইরে যাবার জন্য আমার একটা পাশ প্রয়োজন এটা তিনি মেনে নিতে চাইছিলেন না। তিনি আমার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। আমাকে পাশ দেয়ার পরিবর্তে একটা পত্র দিলেন যাতে পুলিশের হস্তক্ষেপ ছাড়া ২৪ ঘন্টার যে কোনো সময়ে আমি ঘরের বাইরে যাবার অধিকার পেলাম। যখনই বাইরে যেতাম ঐ পত্রটা সর্বদা সাথে রাখতাম। কিন্তু দৈবক্রমে পত্রটি আমাকে কখনো দেখাতে হয়নি।

ড. ক্রাউজ আমাকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন এবং বলতে গেলে, আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম। আমি মাঝে মধ্যে তার ওখানে যেতাম এবং তার মাধ্যমেই তার খ্যাতিমান ভাই, যিনি তখন জোহান্সবার্গের পাবলিক প্রসিকিউটর, তার সাথে পরিচিত হলাম। বোয়ার যুদ্ধের সময় একজন ইংরেজ অফিসারকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার জন্য তার কোর্ট মার্শাল হয়েছিল এবং তাকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। আইনজীবী সমিতিও তাকে বহিষ্কার করেছিল। যুদ্ধ থেমে গেলে তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন এবং সসম্মানে পুনরায় ট্রান্সভাল বারের সদস্য হয়ে আইন ব্যবসা শুরু করেছিলেন।

এসব যোগাযোগ আমার পরবর্তী জীবনে খুব কাজে লেগেছিল এবং আমার কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছিল।

ফুটপাথ ব্যবহারের আইনের ফল স্বরূপ আমাকে ভয়াবহ অবস্থায় পড়তে হয়েছিল। হাঁটাহাঁটি করার জন্য আমি সর্বদা প্রেসিডেন্ট স্ট্রীট হয়ে খোলা মাঠে যেতাম। এই রাস্তাতেই ছিল প্রেসিডেন্ট ক্রুগারের বাড়ি—একটা সাদাসিধা, অনাড়ম্বর দালান, বাগান বিহীন এবং এর পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দালানগুলো থেকে আলাদা কিছু নয়। প্রিটোরিয়াতে কোটিপতি ব্যবসায়ীদের বাড়িগুলো ছিল অনেক বেশি জাঁকজমকপূর্ণ ও বাগান ঘেরা। প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডেন্ট ক্রুগারের সরলতা ছিল প্রবাদতুল্য। শুধুমাত্র বাড়ির সামনে পাহারাদার পুলিশের উপস্থিতি বলে দিত

www.pathagar.com

যে এটা কোনো পদস্থ কর্মকর্তার বাড়ি। আমি প্রায় সর্বদাই এ রাস্তার ফুটপাথ ধরে প্রহরী পুলিশের পাশ দিয়ে বিনা বাধায় নির্ঝঞ্ঝাটে চলে গিয়েছি।

কর্তব্যরত পুলিশ সময় সময় বদলী হতো। একদিন এদের একজন আমাকে বিন্দুমাত্র সতর্ক না করে, এমনকি ফুটপাথ ত্যাগ করতে না বলেই হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে এবং লাথি মেরে রাস্তার মধ্যে নামিয়ে দিল। আমি মর্মাহত হলাম। আমি তাকে তার ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার আগেই ঘটনাচক্রে মি. কোটস ঘোড়ার পিঠে সেখানে হাজির হলেন এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "গান্ধী, আমি সব দেখেছি। এই লোকের বিরুদ্ধে যদি মামলা কর তাহলে কোর্টে আমি সানন্দে তোমার পক্ষে সাক্ষী দেব। তোমাকে এভাবে লাঞ্ছিত করেছে এতে আমি খুব দুঃখিত।"

আমি বললাম, "আপনার দুঃখিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এ বেচারা কি জানে? সব কালো আদমীই তার কাছে সমান। সন্দেহ নেই নিগ্রোদের সাথে সে যে ব্যবহার করে, আমার সাথে সেই একই ব্যবহার করেছে। নীতিগতভাবে ব্যক্তিগত লাঞ্ছনার জন্য আমি কোর্টে মামলা করব না। তাই আমি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে চাই না।"

মি. কোটস বললেন, "তোমার জন্য এটাই মানানসই। কিন্তু আমার কথাটা ভেবে দেখো। এসব লোককে আমাদের শিক্ষা দিতে হবে।" তিনি তখন ঐ পুলিশের সাথে কথা বললেন এবং তাকে তিরস্কার করলেন। আমি তাদের কথাবার্তা বুঝতে পারলাম না, কারণ পুলিশটি ছিল বোয়ার এবং ডাচ ভাষায় কথা বলছিল। কিন্তু সে আমার কাছে ক্ষমা চাইল, যার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমি তাকে আগেই ক্ষমা করে দিয়েছিলাম।

এর পর আমি এ রাস্তা দিয়ে আর কখনো যাইনি। এই পুলিশের স্থলে আবার অন্য পুলিশ আসবে এবং এ ঘটনা সম্পর্কে না জেনে তারাও একই রকম ব্যবহার করবে। বিনা প্রয়োজনে যেচে কেন লাথি-গুতো খেতে যাব? অতএব হাঁটার জন্য অন্য পথ বেছে নিলাম।

এ ঘটনায় ভারতীয় অভিবাসীদের জন্য আমার অনুভূতি আরো গভীর হলো। বৃটিশ এজেন্টের সাথে দেখা করে এ সংক্রান্ত আইন নিয়ে আলোচনা এবং প্রয়োজনে আমার এ ঘটনাকে একটা পরীক্ষামূলক মামলা হিসেবে দাঁড় করানো যায় কি না তা নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করলাম।

এভাবে আমি ভারতীয় অভিবাসীদের করুণ অবস্থা সম্পর্কে গভীর সমীক্ষা চালালাম, শুধু বই পড়ে আর শুনে শুনে নয়, বরং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। দেখতে পেলাম, আত্মসম্মান বোধ সম্পন্ন ভারতীয়দের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা উপযুক্ত দেশ নয় এবং কিভাবে এ অবস্থার উন্নতি করা যায়–এ প্রশ্নই আমার মনকে সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখল।

কিন্তু এ মুহূর্তে আমার প্রধান কর্তব্য হলো দাদা আব্দুল্লাহর মামলা পরিচালনা করা।

www.pathagar.com

চৌদ্দ

মামলার প্রস্তুতি

প্রিটোরিয়াতে প্রায় এক বছরকাল অবস্থান ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। এখানেই আমি জনসেবার সুযোগ পাই এবং এর জন্য কিছুটা যোগ্যতাও অর্জন করি। এখানেই আমার ভেতর ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত শক্তিতে পরিণত হয় এবং এখানেই আমি আইন ব্যবসায়ে সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করি। একজন জুনিয়র ব্যারিস্টার সিনিয়র ব্যারিস্টারের নিকট থেকে যা কিছু শিখতে পারে এখানে আমি তাই শিখেছি এবং এখানেই আমি এ আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছি যে আইনজীবী হিসেবে আমি অকৃতকার্য হব না।

দাদা আব্দুল্লাহর মামলাটি ছোট নয়। ৪০,০০০ পাউন্ডের মামলা। ব্যবসায়িক লেনদেন থেকে এর উৎপত্তি এবং হিসাব-নিকাশের জটিলতায় পূর্ণ। দাবিগুলোর আংশিক ছিল প্রমিসরী নোট সংক্রান্ত এবং আংশিক প্রমিসরী নোট হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি পালনের সুনির্দিষ্ট অবস্থা সংক্রান্ত। বিবাদীর কৈফিয়ত ছিল যে প্রমিসরী নোটগুলো জালিয়াতির মাধ্যমে নেয়া হয়েছিল এবং সেগুলো বিবেচনার যোগ্য ছিল না। এ জটিল মামলায় আইনের অসংখ্য যুক্তি ও তথ্য ছিল।

উভয় পক্ষই শ্রেষ্ঠ এটর্নি ও উকিলদের নিয়োগ করেছিল। এতে আমার জন্য তাদের কর্মপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে দেখার উত্তম সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। বাদী পক্ষের এটর্নির জন্য মামলার কাগজপত্র তৈরি এবং মামলার সমর্থনে তথ্য-প্রমাণ বাছাই এর দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। আমার তৈরি করা তথ্যের কতটা এটর্নি গ্রহণ করেন আর কতটা বাতিল করেন তা আমার জন্য শিক্ষণীয় ছিল। এটর্নির তৈরি করা আর্জির কতটুকু আইনজীবী কাজে লাগান তা পর্যবেক্ষণও আমার জন্য লক্ষ্যণীয় ছিল। আমি দেখলাম, এই মামলার প্রস্তুতি আমার মামলা বোঝার এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ বিন্যস্ত করার ক্ষমতা যাচাই এর একটা সুযোগ এনে দিয়েছে।

আমি এ মামলায় সর্বোচ্চ আগ্রহ দেখিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে আমি এর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। লেনদেন সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র আমি পড়েছি। আমার মক্কেল ছিলেন অত্যন্ত সামর্থ্যবান এবং তিনি পূর্ণ আস্থা রেখেছিলেন আমার ওপর। এতে আমার কাজ সহজ হয়ে গিয়েছিল। হিসাবরক্ষণ সম্পর্কে আমি মোটামুটি পড়াশুনা করেছিলাম। মামলা সংশ্লিষ্ট গুজরাটী ভাষার চিঠিপত্র ইংরেজিতে অনুবাদ করতে গিয়ে আমার অনুবাদ করার ক্ষমতারও উন্নতি হয়েছিল।

পূর্বেই উলেখ করেছি, যদিও ধর্মীয় বিষয় ও জনসেবায় আমি খুবই আগ্রহী ছিলাম এবং সর্বদা এ ব্যাপারে সময় দিয়েছি, কিন্তু এ সময়ে ওগুলো আমার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল না। মামলার প্রস্তুতি গ্রহণই ছিল আমার মুখ্য কাজ। আইনের বই পড়া এবং প্রয়োজনে বিশেষ মামলা সম্পর্কে পড়াশুনা করা তখন আমার নিকট সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ছিল। ফলে মামলার তথ্য-প্রমাণের ওপর আমার এতটা দখল এলো যা সম্ভবত বাদী বিবাদী কারো ছিল না, কারণ আমার কাছে উভয় পক্ষের কাগজপত্রই ছিল।

www.pathagar.com

আমি প্রয়াত মি. পিনকাটের উপদেশ স্মরণ করলাম—মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণ আইনের তিন-চতুর্থাংশ। পরবর্তী কোনো এক তারিখে এর উপযুক্ত প্রমাণ দিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত ব্যারিস্টার প্রয়াত মি. লিওনার্ড। আমার কোনো একটি কেসে ন্যায় বিচার আমার মক্কেলের পক্ষে থাকলেও আইন তার বিপক্ষে বলে মনে হচ্ছিল। হতাশ হয়ে আমি মি. লিওনার্ডের শরণাপন্ন হলাম। তিনিও বুঝলেন যে মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণ খুবই জোরালো। তিনি বললেন, "গান্ধী, আমি একটা জিনিস শিখেছি, আর তা হলো—যদি আমরা মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণ ঠিক রাখতে পারি, তাহলে আইন আপনা আপনি আমাদের পক্ষে আসবে। চলো, আমরা তথ্য-প্রমাণগুলো আরো গভীরভাবে খতিয়ে দেখি।" এ কথাগুলো বলে আমাকে তথ্য-প্রমাণগুলো আবার পড়তে এবং তারপর তার সাথে দেখা করতে বললেন। তথ্য-প্রমাণগুলো পুনঃ পরীক্ষা করতে গিয়ে সেগুলোকে আমি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে দেখতে পেলাম এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পুরনো এক মামলার বিবরণে এ মামলার জন্য পয়েন্ট খুঁজে পেলাম। আমি আনন্দিত হয়ে মি. লিওনার্ডের নিকট গেলাম এবং তাকে সবকিছু বললাম। তিনি বললেন, "ঠিক বলেছ, আমরা এ মামলায় জিতব। শুধু মনে রাখতে হবে কোন বিচারক মামলাটা নিচ্ছেন।"

আমি যখন দাদা আব্দুল্লাহর কেসের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তখন প্রকৃত ঘটনা বা fact এর এত গুরুত্ব আমি বুঝতে পারিনি। fact মানে সত্য, আর সত্যের প্রতি আমরা দৃঢ় থাকলে আইন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পক্ষে আসবে। আমি দেখলাম, দাদা আব্দুল্লাহর কেসের ফ্যাক্ট কেসটিকে জোরালো করেছিল এবং আইন তার পক্ষে আসতে বাধ্য ছিল। কিন্তু আমি এও দেখেছি যে জিদ ধরে মামলা চালাতে থাকলে তা বাদী-বিবাদী উভয়কেই ধ্বংস করে দিতে পারে, যদিও তারা পরস্পরের আত্মীয় ও একই শহরের বাসিন্দা। মামলা কতদিন চলবে তা কেউই বলতে পারে না। আদালতে এ লড়াই চলতে দেয়া হলে তা অনির্দিষ্ট কাল ধরে চলতেই থাকবে এবং এতে কোনো পক্ষেরই লাভ হবে না। সুতরাং উভয় পক্ষই সম্ভব হলে মামলাটির আশু নিষ্পত্তি কামনা করছিল।

আমি তৈয়ব শেঠের সাথে দেখা করে তাকে অনুরোধ করলাম সালিশ-নিষ্পত্তি করতে এবং তার ব্যারিস্টারের সাথে পরামর্শ করতে। তাকে পরামর্শ দিলাম উভয় পক্ষের বিশ্বস্ত সালিশ নিযুক্ত করা গেলে মামলাটির দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। উকিলের ফি এত দ্রুত বাড়ছিল যে তা ধনী মক্কেলদের সকল সম্পত্তি গ্রাস করার উপক্রম করেছিল। মামলার প্রতি তাদের মনোযোগ এতটাই নিবদ্ধ ছিল যে তাদের অন্য কোনো কাজ করার সময় ছিল না। ইত্যবসরে পারস্পরিক বিদ্বেষ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই পেশার প্রতি আমার ঘৃণা ধরে গেল। আইনজীবী হিসেবে উভয় পক্ষের ব্যারিস্টাররা তাদের নিজ নিজ মক্কেলদের পক্ষে আইনের পয়েন্ট তুলে ধরতে বাধ্য ছিল। প্রথমবারের মতো আমিও দেখলাম, বিজেতা পক্ষ কখনোই তার ব্যয় উসুল করতে পারে না। কোর্ট ফি রেগুলেশনে

www.pathagar.com

বিভিন্ন পক্ষের মধ্যকার ব্যয় নির্ধারিত ছিল। কিন্তু এটর্নি ও মক্কেলের মধ্যকার প্রকৃত ব্যয় ছিল তদপেক্ষা অনেক বেশি। এটা আমার কাছে অসহনীয় ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার কর্তব্য হচ্ছে উভয় পক্ষকে একত্র করে বন্ধুত্ব করিয়ে দেয়া। একটা আপোস-রফা করতে আমি প্রাণান্ত চেষ্টা করলাম। অবশেষে তৈয়ব শেঠ রাজি হলেন। একজন সালিশ নিযুক্ত হলেন, তার সামনে যুক্তি-তর্ক পেশ করা হলো এবং এতে দাদা আব্দুল্লাহর জিত হলো।

কিন্তু আমি এতে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। আমার মক্কেল যদি তাৎক্ষণিকভাবে তার সম্পূর্ণ প্রাপ্য দাবি করত তাহলে তৈয়ব শেঠের পক্ষে তা দেয়া অসম্ভব হতো। আর পোরবন্দরের মেমন বলে খ্যাত আফ্রিকা প্রবাসী ধনীদের মধ্যে অলিখিত আইন প্রচলিত আছে যে নিঃসম্বল হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। তৈয়ব শেঠের পক্ষে সম্পূর্ণ অর্থ ৩৭০০০ পাউন্ড এবং তৎসহ মামলার ব্যয় এককালীন পরিশোধ করা সম্ভব ছিল না। তার ইচ্ছা পুরো টাকাই পরিশোধ করবেন, এক পাইও কম নয়। আবার দেউলিয়া ঘোষিত হতেও চাচ্ছিলেন না। একটা মাত্র উপায় ছিল। দাদা আব্দুল্লাহ তাকে সহনীয় কিস্তিতে টাকা পরিশোধের অনুমতি দিতে পারেন। তিনি তাই করলেন। তিনি তৈয়ব শেঠকে দীর্ঘ সময় ধরে কিস্তিতে টাকা পরিশোধের সুযোগ দিলেন। উভয় পক্ষকে সালিশে রাজি করানোর চেয়ে কিস্তিতে টাকা পরিশোধের সুযোগ আদায় করে দিতে আমাকে বেশি বেগ পেতে হয়েছে। কিন্তু ফলাফল যা দাঁড়াল তাতে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হলেন এবং জনসাধারণের মাঝে তাদের ইজ্জতও বাড়ল। আমার আনন্দের সীমা রইল না। আমি আইনের সঠিক প্রয়োগ শিখলাম। আমি শিখলাম, কি করে মানব চরিত্রের ভালো দিকগুলো খুঁজে বের করতে হয় এবং কি করে মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করতে হয়। বুঝতে পারলাম, আইনের সত্যিকার কাজ হলো কলহ বিবাদে বিচ্ছিন্ন দুই পক্ষকে পুনরায় একত্র করে দেয়া। এ শিক্ষা আমার মধ্যে এমন বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, আমার বিশ বছরের ব্যারিস্টারী জীবনের বড় অংশ ব্যয় করেছি শত শত কেস আপোসে নিষ্পত্তি করতে। এতে আমি কিছুই হারাইনি—অর্থ তো নয়ই, নিশ্চিতভাবে আমার আত্মাও নয়।

পনের
ধর্মীয় অস্থিরতা

এবারে খৃষ্টান বন্ধুদের সাথে আমার অভিজ্ঞতার বর্ণনায় ফিরে যাচ্ছি।

মি. বেকার আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে শংকিত হচ্ছিলেন। তিনি আমাকে ওয়েলিংটন সম্মেলনে নিয়ে গেলেন। প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টানরা দু'এক বছর পর পর এরূপ সম্মেলনের আয়োজন করেন ধর্ম শিক্ষার জন্য, অন্য কথায় বলতে গেলে, আত্মশুদ্ধির জন্য। এটাকে বলা যেতে পারে ধর্ম বিশ্বাসের পুনঃনবায়ন বা পুনর্জাগরণ। ওয়েলিংটন সম্মেলন ছিল এ ধরনের উদ্যোগ। এর সভাপতি ছিলেন সেখানকার পুণ্যাত্মা রেভারেন্ড এন্ড্রু মারে। মি. বেকার আশা

www.pathagar.com

করেছিলেন যে সম্মেলন স্থলের ধর্মীয় উদ্দীপনার পরিবেশ, সম্মেলনে যোগদানকারী ভক্তদের ধর্মের প্রতি অনুরাগ ও আগ্রহ অবশ্যই আমাকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করবে।

কিন্তু তার সর্বশেষ আশা ছিল প্রার্থনার সাফল্যের ওপর। প্রার্থনায় ছিল তার অটল বিশ্বাস। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করলে ঈশ্বর তা না শুনে পারেন না। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বৃস্টলের জর্জ মুলারের কথা উল্লেখ করতেন, যিনি নাকি সম্পূর্ণরূপে প্রার্থনার ওপর নির্ভর করতেন, এমনকি তার জাগতিক নিত্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও। প্রার্থনার কার্যকারিতার ওপর তার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা আমি পক্ষপাতহীন মনোযোগের সাথে শুনতাম এবং তাকে আশ্বস্ত করতাম যে ঈশ্বরের ডাক পেলেই আমি খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হব, কেউ তা ঠেকাতে পারবে না। তাকে এরকম আশ্বাস দিতে আমার কোনো দ্বিধা ছিল না, কারণ দীর্ঘদিন থেকেই আমি নিজেকে অন্তরস্থ নির্দেশ পালনের শিক্ষা দিয়েছি। আর এতে আত্মসমর্পণও আমার জন্য ছিল আনন্দের। এর বিরোধীতা করাই বরং আমার জন্য ছিল কঠিন ও বেদনাদায়ক।

অতএব আমরা ওয়েলিংটনে গেলাম। মি. বেকারকে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হলো আমার মতো "কালো আদমী"কে সাথী হিসেবে বেছে নেয়ার কারণে। শুধুমাত্র আমার কারণে তাকে অনেকবার ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। পথে আমাদের যাত্রা বিরতি করতে হয়েছে, কারণ ভ্রমণ কালের একটা দিন ছিল রোববার এবং মি. বেকার ও তার দল বিশ্রাম দিবসে (Sabbath) ভ্রমণ করবেন না। বিরতি স্টেশনে হোটেলের ম্যানেজার অনেক বাক-বিতণ্ডার পরে যদিও আমাকে জায়গা দিতে রাজি হলো, কিন্তু ডাইনিং রুমে আমাকে প্রবেশ করতে দিতে সরাসরি অস্বীকার করল। মি. বেকারও সহজে ছাড়বার পাত্র নন। তিনি হোটেলে অতিথিদের অধিকার নিয়ে কথা তুললেন। আমি তার অসুবিধাগুলো লক্ষ্য করছিলাম। ওয়েলিংটনেও আমি মি. বেকারের সাথে থাকলাম। আমার কারণে তার যেসব অসুবিধা হচ্ছিল তা তিনি লুকাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলেন, তা সত্ত্বেও আমি তার সবটাই দেখতে পাচ্ছিলাম।

এ সম্মেলন ছিল খৃষ্টান ভক্তদের একটা মিলন কেন্দ্র। তাদের ধর্ম বিশ্বাস দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। রেভারেন্ড মারের সাথে আমি দেখা করেছিলাম। আমি দেখলাম যে, অনেকেই আমার জন্য প্রার্থনা করছিল। তাদের গাওয়া কয়েকটি ভক্তিগীত আমার ভালো লেগেছিল। ওগুলোর সুর ছিল খুব মধুর।

সম্মেলন তিন দিন ধরে চলল। যারা এতে যোগদান করেছিল ধর্মের প্রতি তাদের গভীর অনুরাগ আমি বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি আমার বিশ্বাস ও ধর্ম পরিবর্তনের কোনো যুক্তি খুঁজে পেলাম না। আমার জন্য এটা বিশ্বাস করা অসম্ভব ছিল যে শুধুমাত্র খৃষ্টান হলেই আমি পরকালে স্বর্গে যাব বা পরিত্রাণ পাব। এ কথা যখন আমি কয়েকজন খৃষ্টান বন্ধুকে খোলাখুলি বললাম তারা মর্মাহত হলো। কিন্তু এ ছাড়া আমার কোনো উপায়ও ছিল না।

www.pathagar.com

আমার সমস্যা ছিল আরো গভীরে। যীশু ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র এবং যে তাঁকে বিশ্বাস করবে সেই কেবল অনন্ত জীবন লাভ করবে—এ ধারণার চেয়ে আমার বিশ্বাস আরো ব্যাপক। ঈশ্বরের যদি সন্তান থাকতে পারে তাহলে আমরা সবাই তাঁর সন্তান। যীশু যদি ঈশ্বরের মতো হন অথবা নিজেই ঈশ্বর হন, তাহলে সকল মানুষই ঈশ্বরের মতো বা একেকজন ঈশ্বর। আমার যুক্তি দিয়ে আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, যীশু তাঁর মৃত্যু বা রক্ত দিয়ে সারা পৃথিবীর পাপ স্খলন করে গেছেন। রূপক অর্থে এতে কিছু সত্য থাকতে পারে। আবার, খৃষ্টধর্মমতে শুধুমাত্র মানুষের আত্মা আছে, অন্য জীবিত প্রাণীদের নেই। তাদের জন্য মৃত্যুর অর্থ হলো সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। অথচ আমার বিশ্বাস এ ধারণার বিপরীত। আমি যীশুকে একজন শহীদ, আত্মোউৎসর্গের মূর্ত প্রতীক ও ধর্মীয় শিক্ষক বলে মানতে রাজি, কিন্তু পৃথিবীতে জন্ম নেয়া সবচেয়ে পরিপূর্ণ আদর্শ মানব বলে মনে করি না। ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যুবরণ সারা পৃথিবীর জন্য একটি মহৎ নিদর্শন, কিন্তু এর মধ্যে রহস্যময় বা দৈবগুণের কিছু আছে বলে আমার মন সায় দেয় না। খৃষ্টানদের ধার্মিক জীবন যাপন আমাকে এমন কিছু দেয়নি যা অন্য ধর্মে বিশ্বাসী লোকেরা দিতে পারেনি। খৃষ্টানদের মধ্যে যেসব সংস্কারের কথা আমি শুনেছি, তা অন্য ধর্মের লোকদের জীবন যাত্রায়ও দেখেছি। দার্শনিকভাবে খৃষ্টধর্মের নীতিমালায় অসাধারণ কিছু নেই। আত্মবলিদানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে খৃষ্টানদের তুলনায় হিন্দুরা এ ব্যাপারে অনেক বেশি এগিয়ে আছে। খৃষ্টধর্মকে একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম বা সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম বলে মেনে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

যখনই সুযোগ পেতাম আমার মনের এরূপ তোলপাড় অবস্থা নিয়ে খৃষ্টান বন্ধুদের সাথে আলাপ করতাম। কিন্তু তাদের জবাব আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

এভাবে আমি খৃষ্টধর্মকে যেমন পূর্ণাঙ্গ বা সর্বোৎকৃষ্ট বলে মেনে নিতে পারছিলাম না, আবার হিন্দু ধর্ম সম্পর্কেও আমার এমন বিশ্বাস ছিল না। হিন্দু ধর্মের ত্রুটিগুলো আমার কাছে অতি স্পষ্ট ছিল। অস্পৃশ্যতা যদি হিন্দু ধর্মের একটি অংশ হয় তাহলে তা পচে যাওয়া পরগাছা ছাড়া আর কিছু নয়। এত বেশি জাত-পাতের অস্তিত্বের কোনো কারণ আমি খুঁজে পাই না। বেদ ঈশ্বরের প্রেরিত বাণী—এ কথার অর্থ কি? এগুলো যদি প্রেরিত বাণী হয় তাহলে বাইবেল বা কোরান প্রেরিত নয় কেন?

যেহেতু খৃষ্টান বন্ধুরা আমাকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছিলেন, তেমনি মুসলমান বন্ধুরাও চেষ্টা করেছিলেন। আব্দুল্লাহ শেঠ আমাকে ইসলাম সম্পর্কে পড়তে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং সর্বদাই তিনি ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে কিছু না কিছু বলতেন।

আমি আমার সমস্যার কথা রায়চাঁদভাইকে চিঠি লিখে জানালাম। ভারতের অন্যান্য ধর্মবেত্তাদের সাথেও পত্র যোগাযোগ করলাম এবং তাদের কাছ থেকে

www.pathagar.com

জবাবও পেলাম। রায়চাঁদভাইএর পত্র পেয়ে কিছুটা মানসিক শান্তি পেলাম। তিনি আমাকে ধৈর্য ধারণ করতে এবং হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে আরো গভীরভাবে পড়াশুনা করতে বললেন। তার একটা বাক্য ছিল এরকম—"এ প্রসঙ্গে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে হিন্দু ধর্মে যে সূক্ষ্ম ও গভীর চিন্তা ধারা, আত্মা সম্পর্কে এর দর্শন বা দানশীলতা- এরকম অন্য কোনো ধর্মে নেই।"

আমি সেল এর অনূদিত কোরান কিনে পড়তে লাগলাম। ইসলামের ওপর অন্যান্য বইও সংগ্রহ করলাম। ইংল্যান্ডের খৃষ্টান বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করলাম। তাদের একজন আমাকে এডওয়ার্ড মেইটল্যান্ডের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল, যার সাথে আমি পত্র যোগাযোগ শুরু করলাম। তিনি আমাকে "সঠিক পথ" (The Perfect Way) বইটি পাঠালেন, যা তিনি অ্যানা কিংসফোর্ডের সাথে যৌথভাবে লিখেছিলেন। বইটির বিষয়বস্তু ছিল চলমান খৃষ্টান বিশ্বাসের খণ্ডন। তিনি আরো একটা বই পাঠিয়েছিলেন—"বাইবেলের নতুন ভাষ্য (The New Interpretation of the Bible)"। দুটি বইই আমার পছন্দ হয়েছিল। মনে হয়েছে ওগুলো হিন্দু ধর্মকেই সমর্থন করে। টলস্টয়ের "ঈশ্বরের রাজ্য তোমার নিজের মধ্যে" (The Kingdom of God is Within You) আমাকে মোহাবিষ্ট করেছিল। আমার মনে এটা স্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। এ বইএর স্বাধীন চিন্তা, গভীর নৈতিকতা ও সত্যবাদিতার সামনে মি. কোটস এর দেয়া বইগুলো ম্লান ও তুচ্ছ বলে মনে হলো।

এভাবে আমার পড়াশুনা আমাকে কোন পথে নিয়ে গেল খৃষ্টান বন্ধুরা তা চিন্তাও করতে পারলেন না। এডওয়ার্ড মেইটল্যান্ডের সাথে আমার পত্র যোগাযোগ দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল এবং রায়চাঁদভাইএর সাথে যোগাযোগ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাঁর পাঠানো কিছু বই পড়েছিলাম। এর মধ্যে ছিল "পঞ্চীকারণ", "মণিরত্নমালা", যোগবশিষ্ঠের "মুমুক্ষু প্রকারণ", হরিভদ্র সুরীর "সাদ্দর্শন সমুচ্ছায়া" ইত্যাদি।

যদিও আমি খৃষ্টান বন্ধুদের ইচ্ছাবিরুদ্ধ পথে চলেছিলাম, তবু আমি তাদের কাছে চির ঋণী, তারা আমার মধ্যে যে ধর্ম জিজ্ঞাসা জাগ্রত করেছেন তার জন্য। তাদের সাহচর্যের স্মৃতি আমার হৃদয়ে সর্বদা অম্লান হয়ে থাকবে। পরবর্তী বছরগুলোতে আরো বেশি মধুর ও পবিত্র সাহচর্য আমার ভাগ্যে জুটেছে।

ষোল
মানুষ ভাবে এক, বিধাতা করেন অন্য

মামলা শেষ হয়ে যাবার পর আমার প্রিটোরিয়াতে থাকার কোনো যুক্তি ছিল না। সুতরাং ডারবানে ফিরে গেলাম এবং দেশে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিতে থাকলাম। কিন্তু আব্দুল্লাহ শেঠ বিদায় অনুষ্ঠান না করে আমাকে যেতে দেয়ার পাত্র নন। তিনি আমার সম্মানে সিডেনহ্যামে একটা বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন।

www.pathagar.com

সেখানে সারাদিন কাটানোর কর্মসূচী ছিল। আমি তখন ওখানে কয়েকটা খবরের কাগজ পেলাম যার পাতা ওল্টাতে গিয়ে একটা পাতার এক কোনে একটা সংবাদ নজরে পড়ল যার শিরোনাম ছিল "ভারতীয়দের ভোটাধিকার"। এটা ছিল তখনকার আইনসভায় উত্থাপিত একটি বিল সম্পর্কিত যার মাধ্যমে নাটাল আইন সভার প্রার্থী নির্বাচনে ভারতীয়দের ভোটাধিকার খর্ব করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। এ বিল সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না, এবং উপস্থিত অতিথিদের মধ্যেও কেউ কিছু জানতেন না।

এ ব্যাপারে আমি আব্দুল্লাহ শেঠকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, "এসব ব্যাপারে আমরা কি বুঝি? আমরা শুধু ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলো বুঝি। তুমি তো জান অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট হতে আমাদের সব ব্যবসায়ীকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আমরা এর প্রতিবাদে আন্দোলন করেছিলাম। কিন্তু সবই বৃথা। আমরা অশিক্ষিত খোঁড়া লোক। আমরা সাধারণত খবরের কাগজ রাখি শুধু দৈনিক বাজারদর দেখার জন্য। আইন সভা সম্পর্কে আমরা কি জানি? এখানকার ইউরোপীয়ান এটর্নিরাই হলেন আমাদের চোখ-কান।"

আমি বললাম, "কিন্তু অনেক ভারতীয় যুবক আছে যারা এখানেই জন্ম নিয়ে লেখাপড়া শিখেছে। তারা আপনাদের সাহায্য করে না?"

আব্দুল্লাহ শেঠ বিস্ময়মাখা হতাশা নিয়ে বললেন, "তারা! তারা কখনো আমাদের কাছে আসে না এবং সত্যি বলতে কি, আমরাও তাদেরকে স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করি। খৃষ্টান হয়ে তারা সাদা চামড়ার পাদ্রীদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। আর তার বিনিময়ে তারা হয়েছে সরকারের প্রজা।"

এতে আমার চোখ খুলে গেল। অনুভব করলাম যে এই শ্রেণীকে আমাদের আপন করে নিতে হবে। খৃষ্টধর্মের মানে কি তাহলে এই? শুধুমাত্র খৃষ্টান হয়েছে বলেই কি তারা আর ভারতীয় নয়?"

কিন্তু আমি তখন দেশে ফেরার সব প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছি এবং এ বিষয়ে আমার মনের ভাব প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করছিলাম। আমি আব্দুল্লাহ শেঠকে শুধু এটুকু বললাম, "এই বিল পাশ হয়ে আইনে পরিণত হলে আমাদের কপালে চরম দুর্ভোগ নেমে আসবে। এটা আমাদের কফিনে প্রথম পেরেক। এটা আমাদের আত্মসম্মানের মূলে আঘাত করবে।"

আব্দুল্লাহ শেঠ সায় দিয়ে বললেন, "তা হতে পারে। আমি আপনাকে এই ভোটাধিকারের জন্মকাহিনী বলব। এ ব্যাপারে আমরা কিছুই জানতাম না। কিন্তু মি. এসকম্ব আমাদের সেরা এটর্নিদের একজন যাকে আপনিও চেনেন, তিনি ব্যাপারটা আমাদের মাথায় ঢোকালেন। ব্যাপারটা এভাবে ঘটেছিল—তিনি ছিলেন বিরাট লড়াকু। বন্দরের ইঞ্জিনিয়ারের সাথে তার সম্পর্ক ভালো ছিল না বলে তিনি আশংকা করছিলেন যে ইঞ্জিনিয়ার তাকে ভোট বঞ্চিত করে নির্বাচনে পরাজিত করবেন। সুতরাং তিনি আমাদেরকে আমাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করলেন এবং তার উৎসাহে আমরা সবাই ভোটার হিসেবে নাম রেজিস্ট্রি করলাম এবং

www.pathagar.com

তাকে ভোট দিলাম। এখন দেখতেই পাচ্ছেন, যে ভোটাধিকারকে আপনি এতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন, আমাদের জন্য তা কিভাবে মূল্যহীন হয়ে পড়ছে। কিন্তু আপনি যা বলছেন আমরা তা বুঝি। যা হোক, এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কি?"

অন্য অতিথিরা মনোযোগ দিয়ে এ বাক্যালাপ শুনছিলেন। তাদের একজন বললেন, "আমি কি বলব কি করতে হবে? আপনি আপনার যাত্রা বাতিল করুন, অন্তত আরো একমাস এখানে থাকুন, এবং আপনি যেভাবে নির্দেশ দেবেন আমরা সেভাবে সংগ্রাম করব।"

সকলেই একসুরে বলে উঠলেন, "ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন। আব্দুল্লাহ শেঠ, আপনি গান্ধী ভাইকে যেতে দিবেন না।"

শেঠজী ছিলেন খুব চতুর লোক। তিনি বললেন, "এখন আমি তাকে আটকাতে পারি না। তাকে আটকাতে হলে আমি যতটা করতে পারি আপনাদেরও তা করার অধিকার আছে। কিন্তু আপনারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আসুন, সবাই মিলে তাকে থাকার জন্য রাজি করাই। কিন্তু আপনাদের মনে রাখা উচিত যে তিনি একজন ব্যারিস্টার। তার ফিস কে দেবে?"

ফিস এর কথা বলাতে আমি ব্যথিত হলাম এবং তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, "আব্দুল্লাহ শেঠ, ফিসের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। জনগণের কাজের জন্য ফিসের প্রশ্ন আসতে পারে না। যদি থাকতেই হয় তাহলে একজন সেবক হিসেবে থাকতে পারি। আপনারা জানেন এখানে উপস্থিত সব বন্ধুদের সাথে আমার পরিচয় নেই। আপনারা যদি বিশ্বাস করেন যে এ ব্যাপারে সবাই আমাকে সহযোগিতা করবেন তাহলে আমি আরো একমাস থেকে যেতে রাজি আছি। কিন্তু একটা কথা বলার আছে। যদিও আমাকে আপনাদের টাকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই, আমরা যে কাজে হাত দিতে যাচ্ছি তা শুরু করতে কিছু তহবিল ছাড়া হবে না। আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় টেলিগ্রাম পাঠাতে হতে পারে, কিছু লেখা ছাপাতে হতে পারে, কোথাও ভ্রমণে যাওয়া লাগতে পারে, স্থানীয় এটর্নির সাথে পরামর্শ করা লাগতে পারে এবং আমি যেহেতু আপনাদের আইন জানি না সেহেতু রেফারেন্সের জন্য আমার কিছু আইনের বই প্রয়োজন হবে। এসব কাজ টাকা ছাড়া হবে না। এবং এটাও স্পষ্ট যে একজনের পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব নয়। তাকে সাহায্য করার জন্য অনেককে এগিয়ে আসতে হবে।"

এবং সম্মিলিত কণ্ঠের কোরাস শোনা গেল, "আল্লাহ মহান এবং দয়ালু। টাকা এসে যাবে। লোক তৈরি আছে যতজন আপনার প্রয়োজন। দয়া করে কথা দিন আপনি থাকবেন। আশা করি সবকিছু ভালোভাবে হয়ে যাবে।"

এভাবে বিদায় অভ্যর্থনার অনুষ্ঠান ওয়ার্কিং কমিটিতে পরিণত হলো। আমি পরামর্শ দিলাম তাড়াতাড়ি ডিনার শেষ করে সবাইকে বাড়ি ফিরতে। মনে মনে প্রচার কার্যের একটা রূপরেখা তৈরি করে ফেললাম। ভোটার তালিকায় যাদের

www.pathagar.com

নাম আছে তাদেরকে চিহ্নিত করলাম এবং আরো একমাস থেকে যাবার জন্য মন স্থির করে ফেললাম ।

ঈশ্বর এভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার জীবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন এবং জাতীয় আত্মসম্মানের জন্য ভবিষ্যৎ সংগ্রামের বীজ বপন করলেন।

সতের
নাটালে বসতি

১৮৯৩ সালে নাটালে শেঠ হাজী মুহাম্মাদ হাজী দাদা ছিলেন ভারতীয় সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য নেতা। আর্থিক বিষয়ে তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হাজী আদম, কিন্তু জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি এবং অন্যান্যরাও শেঠ হাজী মুহাম্মাদকে প্রথমে স্থান দিতেন। সুতরাং তাঁর সভাপতিত্বে আব্দুল্লাহ শেঠের বাড়িতে একটা সভা অনুষ্ঠিত হলো এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হলো ভোটাধিকার বিলের বিরোধিতা করা হবে। ভলান্টিয়ারদের তালিকা তৈরি হলো। নাটালে জন্ম গ্রহণকারী ভারতীয়, যাদের অধিকাংশ ভারতীয় খৃষ্টান যুবক, তাদেরকে সভায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ করা হলো। ডারবান কোর্টের দোভাষী মি. পল, মিশন স্কুলের হেডমাস্টার মি. সুবহান গডফ্রে—এঁরা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের সাথে অনেক খৃষ্টান যুবককে নিয়ে এসেছিলেন। তাদের সবাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে নাম লিখিয়েছিল।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অনেকেই নাম লিখিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন—শেঠ দাউদ মুহাম্মদ, শেঠ মুহাম্মদ কাসেম কামরুদ্দিন, আদমজী মিয়াখান, এ. কোলান্ডা ভেলুপিল্লাই, সি. লাচ্ছিরাম, রাঙ্গাস্বামী পাদিয়াচি ও আমোদ জীবা। পারসী রুস্তমজীও অবশ্যই এঁদের মধ্যে ছিলেন। কেরানীদের মধ্যে ছিলেন মানেকজী, যোশী, নরসিংহরাম ও অন্যান্য, দাদা আব্দুল্লাহ অ্যান্ড কোং ও অন্যান্য বড় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীবৃন্দ। তারা সকলেই নিজেদেরকে সম্মিলিতভাবে জনগণের কাজে অংশগ্রহণকারীরূপে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন। এভাবে জনসেবায় অংশগ্রহণ আমন্ত্রিতদের জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা। ভারতীয় সম্প্রদায়ের সামনে যে দুর্যোগ দেখা দিয়েছে তার মোকাবেলায় সবাই সকল ভেদাভেদ যেমন, উঁচু-নিচু, ছোট-বড়, মনিব-চাকর, হিন্দু, মুসলমান, পার্সী, খৃষ্টান, গুজরাটী, মাদ্রাজী, সিন্ধী ইত্যাদি ভুলে গেল। সবাই সমানভাবে দেশ মাতৃকার সন্তান ও সেবক বনে গেল।

ইতিমধ্যে বিলটি পাশ হয়ে গেছে বা হবে হবে করছে। বিলের সমর্থনে বক্তৃতায় এই কঠোর বিলের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়নি, তাই তারা ভোটাধিকার পাবার যোগ্য নয় বলে যুক্তি দেখানো হয়েছিল।

আমি সভায় পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলাম। প্রথম কাজ আমরা যা করলাম তা হলো সংসদের স্পীকারের নিকট ঐ বিলের ওপর আর কোনো আলোচনা না করার অনুরোধ জানিয়ে টেলিগ্রাম প্রেরণ। একই ধরনের টেলিগ্রাম করা হলো

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী স্যার জন রবিনসনকে, এবং দাদা আব্দুল্লাহর বন্ধু হিসেবে মি. এসকম্বকে। স্পীকার দ্রুত জবাব পাঠালেন যে বিলের ওপর আলোচনা দু'দিনের জন্য স্থগিত রাখা হলো। এতে আমরা উৎসাহিত হলাম।

আইন সভায় উপস্থাপনের জন্য আবেদনের মুসাবিদা তৈরি হলো। আবেদনের তিন কপি করতে হবে, আরেকটি অতিরিক্ত লাগবে সংবাদপত্রের জন্য। প্রস্তাব করা হলো যে আবেদনে যত বেশি সম্ভব স্বাক্ষর নিতে হবে এবং তা করতে হবে এক রাতের মধ্যেই। ইংরেজি জানা স্বেচ্ছাসেবীসহ আরো কয়েকজন সারা রাত জেগে রইলেন। মূল কপিটি লিখলেন ক্যালিগ্রাফি লেখায় সিদ্ধহস্ত বৃদ্ধ মি. আর্থার। বাকীগুলো একজন বলে দিল, অন্যেরা লিখে নিল। এভাবে একসঙ্গে পাঁচ কপি তৈরি হয়ে গেল। ব্যবসায়ী স্বেচ্ছাসেবীরা তাদের নিজের গাড়িতে অথবা তাদের টাকায় ভাড়া করা গাড়িতে বেরিয়ে পড়লেন আবেদনে স্বাক্ষর সংগ্রহের জন্য। অতি অল্প সময়ে কাজটি সম্পন্ন হলো এবং আবেদন পাঠিয়ে দেয়া হলো। সংবাদপত্রগুলো আমাদের সমর্থনে মন্তব্যসহ তা ছাপাল। সংসদের ওপরেও তার প্রভাব পড়ল। এ নিয়ে হাউজে (সংসদে) আলোচনা হলো। আবেদনে উল্লিখিত যুক্তির জবাবে বিল আনয়নকারী স্বার্থান্বেষীরা আত্মপক্ষ সমর্থন করল, কিন্তু তাদের যুক্তি ছিল স্পষ্টতই খোঁড়া যুক্তি। তা সত্ত্বেও বিলটি পাশ হয়ে গেল।

আমরা জানতাম এ সিদ্ধান্ত আগেই নেয়া হয়েছে। কিন্তু এ আন্দোলন ভারতীয়দের মধ্যে নতুন জীবনের সঞ্চার করল এবং তাদের মধ্যে এ বিশ্বাসের জন্ম দিল যে তারা এক ও অবিভক্ত এবং তাদের কর্তব্য হচ্ছে রাজনৈতিক অধিকার ও ব্যবসায়ের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

ঐ সময়ে কলোনীসমূহের জন্য সেক্রেটারী অব স্টেট ছিলেন লর্ড রিপন। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো তার কাছে একটা বড় আবেদন পাঠানো হবে। আবেদনটি তৈরি করা একটি বড় কাজ এবং একদিনে সম্ভব নয়। স্বেচ্ছাসেবীদের লাগানো হলো এবং তারা তাদের নির্ধারিত কাজ করে ফেলল।

এ আবেদন তৈরি করতে আমি যথেষ্ট খাটাখাটুনি করলাম। এ বিষয়ে যত লেখা পাওয়া গেল তার সবই পড়লাম। একটা মূল নীতিকে ঘিরে সুবিধাজনক যুক্তি দাঁড় করালাম। যুক্তি দেখালাম যে ভারতে যেমন আমাদের ভোটাধিকার আছে তেমনি নাটালেও আমাদের ভোটাধিকার আছে। নাটালে এ ভোটাধিকার অক্ষুণ্ন রাখা সুবিধাজনক, কারণ এখানে ভোটাধিকার প্রয়োগে সক্ষম ভারতীয় জনগোষ্ঠী সংখ্যায় খুবই কম।

এক পক্ষকালের মধ্যে দশ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হলো। পুরো প্রদেশ থেকে এ সংখ্যক স্বাক্ষর সংগ্রহ চাট্টিখানি কথা নয়, বিশেষত যাদের এ কাজের একেবারেই অভিজ্ঞতা নেই তাদের দ্বারা। এ কাজের জন্য বিশেষভাবে যোগ্য স্বেচ্ছাসেবীদের বাছাই করা হয়েছিল, যেহেতু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে স্বাক্ষরকারী আবেদন পুরোপুরি না বুঝা পর্যন্ত তার স্বাক্ষর নেয়া হবে না। অনেকেই প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করত। যদি একদল

www.pathagar.com

আত্মনিবেদিত কর্মী আপ্রাণ চেষ্টা করে তাহলেই কেবল এটা সম্ভব। আর তারা তাই করেছে। অতি উৎসাহ নিয়ে তারা তাদের নির্ধারিত কাজ করেছে। কিন্তু আমি যখন এ কথাগুলো লিখছি আমার মানসপটে স্পষ্ট ভেসে উঠছে শেঠ দাউদ মুহাম্মদ, রুস্তমজী, আদমজী মিয়াখান প্রমুখের মুখ। তারা সবচেয়ে বেশি স্বাক্ষর এনে দিয়েছিলেন। দাউদ শেঠ তার ঘোড়াগাড়িতে সারা দিন ধরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এ শ্রমের সবটাই ছিল ভালোবাসার খাতিরে, তাদের কেউ পকেট খরচের একটি পয়সাও চাননি। দাদা আব্দুল্লাহর বাড়ি হয়ে গেল একটা সরাইখানা এবং গণদপ্তর। বেশ কয়েকজন শিক্ষিত বন্ধু যারা আমাকে সাহায্য করত তারাসহ আরো অনেকে সেখানেই খাবার খেয়েছে। এভাবে প্রত্যেক সাহায্যকারীকেই উল্লেখযোগ্য ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছে।

অবশেষে আবেদন পেশ করা হলো। এক হাজার কপি ছাপানো হলো প্রচার ও বিতরণের জন্য। নাটালে ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে মানুষ এই প্রথম জানতে পারল। আমার চেনা সকল সংবাদপত্র ও প্রকাশকের নিকট এর কপি পাঠানো হলো।

দি টাইমস অব ইন্ডিয়া আবেদনের ওপর মূল প্রবন্ধ লিখে ভারতীয়দের দাবির প্রতি জোর সমর্থন জানাল। ইংল্যান্ডের বিভিন্ন পত্রিকা, প্রকাশক ও পার্টির প্রতিনিধিদের নিকটও এর কপি পাঠানো হলো। দি লন্ডন টাইমস আমাদের দাবি সমর্থন করল এবং আমরা আশান্বিত হলাম যে এ বিলে ভেটো দেয়া হতে পারে।

এ অবস্থায় নাটাল ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ভারতীয় বন্ধুরা আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে রাখল এবং নাছোড়বান্দার মতো অনুরোধ করতে থাকল স্থায়ীভাবে সেখানে থেকে যেতে। আমি আমার অসুবিধার কথা বললাম। মনস্থির করে ফেললাম জনগণের টাকা ব্যয় করে এখানে থাকব না। আলাদা একটা বাড়ি নেয়ার প্রয়োজন অনুভব করলাম। বাড়িটা হওয়া চাই ভালো এবং ভালো এলাকায়। ভাবলাম একজন ব্যারিস্টারের উপযুক্ত স্টাইলে জীবন যাপন করে আমার সম্প্রদায়ের নিকট ঋণের বোঝা বাড়াতে পারি না। মনে হলো আমার সংসার চালাতে কমপক্ষে বছরে ৩০০ পাউন্ড ব্যয় করতে হবে। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিলাম, যদি আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমার জন্য ঐ অংকের মামলা সংক্রান্ত কাজ জুটিয়ে দেয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারে তাহলে আমি থাকতে পারি এবং আমার এ সিদ্ধান্ত তাদেরকে জানিয়ে দিলাম।

তারা বলল, "কিন্তু আমরা চাই আপনি গণকাজের তহবিল থেকে ঐ টাকা নেবেন। আমরা তা সংগ্রহ করে দেব। আর ব্যক্তিগতভাবে ওকালতি করে আপনি যা আয় করবেন তা অবশ্যই আপনার থাকবে।"

আমি বললাম, "না, জনগণের কাজের জন্য আমি এভাবে টাকা নিতে পারি না। এ কাজের জন্য ব্যারিস্টার হিসেবে আমার তেমন মেধা খরচ করতে হবে না। আমার কাজ হবে আপনাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়া। আর এর জন্য আপনাদের নিকট থেকে কিভাবে টাকা নিতে পারি? তাছাড়া তখন কাজের জন্য আপনাদের

www.pathagar.com

কাছে ঘন ঘন টাকা চাইতে হবে এবং আমার নিজের খরচের টাকাও যদি আপনাদের কাছ থেকে নিই তাহলে যখন বড় অংকের টাকার প্রয়োজন হবে তখন তা চাইতে আমি অসুবিধায় পড়ে যাব এবং পরিশেষে আমাদের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়বে। তা ছাড়া আমি চাই যে আপনারা গণকাজের জন্য বছরে ৩০০ পাউন্ডের বেশি সংগ্রহ করবেন।"

"কিন্তু আমরা আপনাকে অনেকদিন ধরে চিনি এবং আমরা নিশ্চিত যে আপনার প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা আপনি নেবেন না। আর আমরা যদি চাই যে আপনি এখানে থাকুন, তাহলে কি আপনার ব্যয়ভার আমরা বহন করব না?"

"আমার প্রতি আপনাদের ভালোবাসা এবং অতি উৎসাহ থেকে আপনারা এ কথা বলছেন। এ ভালোবাসা ও উৎসাহ চিরদিন থাকবে তার নিশ্চয়তা কি? আর আপনাদের বন্ধু ও সেবক হিসেবে আমি হয়তো মাঝে মধ্যে কটু কথাও বলব। তখন আমার প্রতি আপনাদের ভালোবাসা থাকবে কিনা তা কেবল ঈশ্বরই জানেন। তবে মূল কথা হলো আমি জনগণের কাজের জন্য কোনো বেতন নিতে পারব না। আপনারা আমার ওপর আস্থা রেখে যদি আপনাদের মামলা সংক্রান্ত কাজ আমাকে দিতে রাজি হন তাহলে সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট হবে। সেটাও আপনাদের জন্য কঠিন হবে কারণ আমি তো সাদা চামড়া ব্যারিস্টার নই। কোর্ট সব সময় আমার কথা শুনবে তারই বা নিশ্চয়তা কি? ব্যারিস্টার হিসেবে আমি কতটা সফল হব তাও নিশ্চিত করে বলতে পারি না। সুতরাং আমাকে আইনী সেবার বিনিময়ে অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে আপনারাও কিছুটা ঝুঁকি নিচ্ছেন। আমাকে এভাবে প্রদত্ত টাকা গণকাজের জন্য আমার পুরস্কার বলে মনে করব।"

এ আলোচনার ফল দাঁড়াল যে প্রায় কুড়িজন ব্যবসায়ী এক বছরের জন্য আমাকে আইনী সেবার অগ্রিম ফি দিয়ে দিলেন। তা ছাড়া দাদা আব্দুল্লাহ আমার বিদায় বেলায় দেবেন বলে যে টাকা রেখেছিলেন তা থেকে আমার আসবাবপত্র কিনে দিলেন। এভাবে আমি নাটালে বসতি স্থাপন করলাম।

আঠার
বর্ণ নিষেধাজ্ঞা

ন্যায় বিচারিক আদালতের প্রতীক হলো ভারসাম্য অবস্থায় তুলাদণ্ডধারী এক অন্ধ বিচক্ষণ মহিলার মূর্তি। ভাগ্য দেবতা তাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অন্ধ করেছেন যাতে করে তিনি কোনো ব্যক্তির বাহ্যিক দিক না দেখে অভ্যন্তরীণ প্রকৃত অবস্থার ভিত্তিতে ন্যায় বিচার করেন। কিন্তু নাটালের আইনজীবী সমিতি চেষ্টা করছে সুপ্রীম কোর্টকে এ নীতির বিরুদ্ধে কাজ করতে রাজি করাতে এবং এর মাধ্যমে আদালতের প্রতীককে মিথ্যা প্রমাণ করতে।

আমি এডভোকেট হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করলাম। বোম্বে হাইকোর্টে অন্তর্ভুক্তির একটা সার্টিফিকেট আমার ছিল। বোম্বে হাইকোর্টে তালিকাভুক্তির সময় সেখানে আমার ইংরেজি সার্টিফিকেট জমা দিতে হয়েছিল।

www.pathagar.com

নাটালে সুপ্রীম কোর্টে অন্তর্ভুক্তির আবেদনের সাথে দুটো চারিত্রিক সনদ যুক্ত করার আবশ্যকতা ছিল। ইউরোপীয়ানদের দেয়া সার্টিফিকেটের গুরুত্ব বেশি হবে মনে করে শেঠ আব্দুল্লাহর মাধ্যমে পরিচিত খ্যাতনামা দু'জন ইউরোপীয়ান ব্যবসায়ীর নিকট হতে নেয়া সার্টিফিকেট সংযুক্ত করেছিলাম। আবেদন জমা দিতে হতো বারের একজন সদস্যের মাধ্যমে এবং নিয়মানুযায়ী এটর্নি জেনারেল ফি ছাড়াই এসব আবেদন উপস্থাপন করতেন। মি. এসকম্ব, যিনি দাদা আব্দুল্লাহ অ্যান্ড কোং এর আইনী পরামর্শক এবং যার কথা আগেই উল্লেখ করেছি, তিনিই হলেন এটর্নি জেনারেল। আমি তার সাথে দেখা করলাম এবং তিনি আমার আবেদন উপস্থাপন করতে সানন্দে রাজি হলেন।

আইনজীবী সমিতি হঠাৎ করে লাফিয়ে উঠে আমার অন্তর্ভুক্তির আবেদনের বিরোধীতা করে আমার ওপর নোটিশ জারী করল। তাদের আপত্তির মধ্যে একটি হলো আমার আবেদনের সাথে ইংরেজি সার্টিফিকেট সংযুক্ত করা হয়নি। কিন্তু মূল আপত্তি হলো যখন আইনজীবীদের অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত বিধি তৈরি করা হয় তখন কোনো কালো আদমী আবেদন করতে পারে এটা ভাবা হয়নি। নাটালের সমৃদ্ধি ইউরোপীয়ানদের অবদান। সুতরাং ইউরোপীয়ানদেরই বার-এ প্রাধান্য পাওয়া উচিত। কালো আদমীদেরকে বার-এ প্রবেশ করতে দিলে ক্রমে তাদের সংখ্যা ইউরোপীয়ানদের ছাড়িয়ে যাবে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দেয়াল ধ্বসে পড়বে।

আইনজীবী সমিতি তাদের বিরোধীতার স্বপক্ষে একজন খ্যাতনামা আইনজীবী নিয়োগ করল। তিনিও যেহেতু দাদা আব্দুল্লাহ অ্যান্ড কোং এর সাথে যুক্ত ছিলেন, শেঠ আব্দুল্লাহর মাধ্যমে আমাকে খবর পাঠালেন তার সাথে দেখা করতে। তিনি আমার সাথে খোলাখুলি কথা বললেন এবং আমার পূর্ব অবস্থা (antecedents) জানতে চাইলেন। আমি তাকে এ সংক্রান্ত সনদ দিলাম। তখন তিনি বললেন, "তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই। আমার শুধু ভয় ছিল যে তুমি হয়তো উপনিবেশে জন্মগ্রহণকারী দুঃসাহসী যুবক। এবং তোমার আবেদনের সাথে মূল সার্টিফিকেট না থাকায় আমার সন্দেহ আরো দৃঢ় হয়। অতীতে এমন লোকও দেখা গেছে যে ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট ব্যবহার করেছে কিন্তু আসলে সে ডিপ্লোমাধারী নয়। ইউরোপীয়ান ব্যবসায়ীদের থেকে নেয়া যে চারিত্রিক সনদ দাখিল করেছ আমার কাছে তা মূল্যহীন। তারা তোমার সম্পর্কে কি জানে? আর তোমার সাথে তাদের পরিচয়ই বা কত দিনের?"

আমি বললাম, " কিন্তু এখানে আমার কাছে সবাই অপরিচিত। এমনকি শেঠ আব্দুল্লাহও আমি এখানে আসার পর থেকে আমাকে চেনেন।"

"কিন্তু তুমি বলেছ যে তোমরা একই স্থানের বাসিন্দা? তোমার পিতা যদি সেখানকার প্রধানমন্ত্রী হন তাহলে শেঠ আব্দুল্লাহ তোমার পরিবারকে চিনতে বাধ্য। তুমি যদি তার এফিডেভিট দিতে তাহলে আমার কোনোই আপত্তি থাকত

www.pathagar.com

না। আমি তখন আইনজীবী সমিতিকে আনন্দের সাথে জানাতাম যে তোমার আবেদনের বিরোধীতা করতে আমি অপারগ।"

এই বাক্যালাপে আমি রাগান্বিত হলাম, কিন্তু আমার অনুভূতি চেপে গেলাম। নিজে নিজে বললাম, "আমি যদি দাদা আব্দুল্লাহর সার্টিফিকেট সংযুক্ত করতাম তাহলে তা বাতিল করা হতো এবং তারা ইউরোপীয়ানদের সার্টিফিকেট দাবি করত। এডভোকেট হিসেবে আমার অন্তর্ভুক্তির সাথে আমার জন্ম ও প্রাক পরিচিতির কি সম্পর্ক? আমার জন্ম, তা সাধারণ না আপত্তিকর, সে তথ্য আমার বিরুদ্ধে কিভাবে ব্যবহার করবে?" কিন্তু আমি আত্মসংবরণ করে শান্তভাবে জবাব দিলাম, "যদিও আমি মানি না যে আইনজীবী সমিতির এসব তথ্য চাওয়ার অধিকার আছে, তবুও আপনার ইচ্ছানুযায়ী আমি এফিডেভিট দাখিল করতে রাজি আছি।"

শেঠ আব্দুল্লাহর এফিডেভিট তৈরি করে যথারীতি আইনজীবী সমিতির ব্যারিস্টারের নিকট দাখিল করা হলো। তিনি বললেন, তিনি সন্তুষ্ট। কিন্তু আইনজীবী সমিতি বেঁকে বসল। সুপ্রীম কোর্টে তারা আমার আবেদনের বিরোধীতা করল। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট মি. এসকম্ব এর জবাব তলব না করেই তাদের বিরোধীতা নাকচ করে দিল। প্রধান বিচারপতি এই মর্মে বললেন, "আবেদনের সাথে মূল সার্টিফিকেট সংযুক্ত করা হয়নি এ আপত্তি গুরুত্বহীন। যদি সে মিথ্যা এফিডেভিট দিয়ে থাকে তবে তার বিরুদ্ধে মামলা হবে এবং দোষী প্রমাণিত হলে তখন তালিকা থেকে তার নাম কাটা যাবে। আইন সাদা-কালোর মধ্যে বৈষম্য করে না। সুতরাং মি. গান্ধীকে এডভোকেট হিসেবে তালিকাভুক্ত করা থেকে বিরত রাখার এখতিয়ার আদালতের নেই। তার আবেদন গৃহীত হলো। মি. গান্ধী, আপনি শপথ নিতে পারেন।"

আমি উঠে দাঁড়িয়ে তখনই রেজিস্ট্রারের সামনে শপথ নিলাম। আমি শপথ নেয়ার সাথে সাথেই প্রধান বিচারপতি আমাকে বললেন, "মি. গান্ধী, এখন আপনাকে অবশ্যই পাগড়ী খুলে ফেলতে হবে। প্র্যাকটিসকারী ব্যারিস্টারদের জন্য পোষাক সংক্রান্ত যে বিধি আছে তা আপনাকে মানতেই হবে।"

আমি আমার সীমাবদ্ধতা বুঝলাম। যে পাগড়ী পরে থাকব বলে আমি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে জিদ করেছিলাম, সুপ্রীম কোর্টের আদেশ মান্য করে তা খুলে ফেললাম। এ আদেশের বিরোধীতা করতে চাইলে তা যুক্তিসংগত হতো না তা নয়। কিন্তু আমি ছোটখাটো বিষয়ে শক্তি ক্ষয় না করে বৃহত্তর যুদ্ধের জন্য তা জমা রাখছিলাম। পাগড়ী পরে থাকার জন্য যুদ্ধ করে আমার মেধা শেষ করতে চাইনি। আরো ভালো কাজের জন্য তা জমা রইল।

শেঠ আব্দুল্লাহ ও অন্য বন্ধুরা আমার এ আত্মসমর্পণ দুর্বলতা ভেবে পছন্দ করলেন না। তারা অনুভব করলেন যে কোর্টে প্র্যাকটিস করার সময় আমার পাগড়ী পরার অধিকার অক্ষুণ্ন রাখা উচিত। আমি তাদেরকে বোঝাতে চাইলাম। আমি তাদেরকে এ প্রবাদের সত্যতা উপলব্ধি করাতে চাইলাম—"যস্মিন দেশে

www.pathagar.com

যদাচার।" বললাম, "আদেশ মানতে অস্বীকার করা সঠিক হতো যদি ভারতে কোনো ইংরেজ অফিসার বা বিচারক পাগড়ী খোলার আদেশ দিতেন। কিন্তু নাটালের কোর্টে এখানকার রীতি মানার জন্য কোর্টের দেয়া আদেশ অমান্য করা রীতি বিরুদ্ধ কাজ হতো।"

এরকম যুক্তি দিয়ে বন্ধুদেরকে কিছুটা শান্ত করলাম, কিন্তু তারা পুরোপুরি মেনে নিল বলে মনে হলো না। এ ক্ষেত্রে আমি একই বিষয়কে বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার নীতি প্রয়োগ করেছিলাম। কিন্তু সারা জীবন ধরে সত্যের ওপর অটল থাকা আমাকে শিখিয়েছে, আপোস-রফার চেয়ে ভালো আর কিছু নেই। পরবর্তী জীবনে আমি দেখেছি এই মনোভাব সত্যাগ্রহের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর ফলে প্রায়ই আমার জীবন বিপন্ন হয়েছে এবং বন্ধুদের বিরক্তি উৎপাদন করেছে। কিন্তু সত্য পাথরের মতো শক্ত আবার কুসুমের মতো কোমল।

আইনজীবী সমিতির বিরোধীতা দক্ষিণ আফ্রিকাতে আবারো আমার নাম ছড়িয়ে দিল। বেশিরভাগ সংবাদপত্র বিরোধীতার সমালোচনা করল এবং আইনজীবী সমিতিকে ঈর্ষাকাতর বলে অভিযুক্ত করল। এ প্রচার কিছু পরিমাণে হলেও আমার কাজ সহজ করে দিল।

উনিশ
নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস

আইনজীবীর প্র্যাকটিস আমার কাছে পেশা হিসেবে ছিল গৌণ। নাটালে আমার অবস্থান যুক্তিযুক্ত করতে জনগণের কাজে মনোনিবেশ করা আবশ্যক ছিল। ভোটাধিকার হরণ সংক্রান্ত বিলের বিরুদ্ধে কেবল আবেদন প্রেরণ করাটাই যথেষ্ট ছিল না। কলোনীসমূহের জন্য সেক্রেটারী অব স্টেট এর ওপর প্রভাব সৃষ্টির জন্য লাগাতার আন্দোলন ছিল অত্যাবশ্যক। এ উদ্দেশে একটি স্থায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। সুতরাং আমি শেঠ আব্দুলাহ ও অন্য বন্ধুদের সাথে আলোচনা করলাম এবং সকলে মিলে একটি স্থায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিলাম।

নতুন সংগঠনের নাম কি দেব তা ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। অন্য কোনো পার্টির পরিচয়ে এটা পরিচিত হবে না। "কংগ্রেস" নামটির সাথে ইংল্যান্ডে রক্ষণশীলদের দুর্গন্ধ মাখানো ছিল, কিন্তু ভারতে কংগ্রেসই ছিল ভারতের প্রাণ। আমি কংগ্রেস নামটাকে নাটালে জনপ্রিয় করে তুলতে চাইলাম। এ নাম গ্রহণে দ্বিধা করার মধ্যে কাপুরুষতার ছোঁয়া ছিল। অতএব পরিপূর্ণ যুক্তি ও ব্যাখ্যাসহ আমি সুপারিশ করলাম—এ সংগঠনের নাম হবে "নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস" এবং ২২শে মে নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস এর জন্ম হলো।

দাদা আব্দুল্লাহর সুপরিসর ঘরটি সেদিন ছিল লোকে লোকারণ্য। "কংগ্রেস" উপস্থিত সকলের উৎসাহী অনুমোদন লাভ করল। এর শাসনতন্ত্র ছিল সহজ

www.pathagar.com

কিন্তু চাঁদা ছিল বেশি। যারা মাসে পাঁচ শিলিং চাঁদা দিতে পারবে তারাই কেবল এর সদস্য হতে পারবে। ধনীদেরকে অনুরোধ করা হলো তাদের সাধ্যমতো বেশি চাঁদা দিতে। মাসে দুই পাউন্ড চাঁদা দিয়ে আব্দুল্লাহ শেঠ তালিকার শীর্ষে থাকলেন। আরো দু'বন্ধু একই অংকের চাঁদা দিলেন। ভাবলাম আমার চাঁদা কম হওয়া উচিত নয়। তাই মাসে এক পাউন্ড দিলাম। অংকটা আমার জন্য কম নয়। চিন্তা করলাম দেয়ার সদিচ্ছা থাকলে এটা আমার জন্য কঠিন হবে না। এবং ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করলেন। এভাবে আমরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য পেলাম যারা মাসিক এক পাউন্ড করে চাঁদা দিলেন। যারা ১০ শিলিং করে দিলেন তাদের সংখ্যা আরো বেশি। এ ছাড়া কেউ অনুদান দিতে চাইলে তা কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ করা হলো।

চাঁদা আদায়ের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেল কেউই চাওয়া মাত্রই চাঁদা দিচ্ছে না। ডারবানের বাইরের সদস্যদের কাছে বার বার যাওয়াও সম্ভব ছিল না। মনে হচ্ছিল এক মুহূর্তের অতি উৎসাহ পর মুহূর্তেই উবে গেছে। এমনকি ডারবানের সদস্যদেরকেও চাঁদার জন্য বার বার তাগাদা দিতে হয়েছে।

আমি সেক্রেটারী হওয়াতে চাঁদা আদায়ের ভার ছিল আমার ওপর। এক সময় অবস্থা এমন হলো যে আমার কেরানীকে সারাদিনই লেগে থাকতে হতো চাঁদা সংগ্রহের কাজে। লোকটা একাজে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আমি অনুভব করলাম এ অবস্থার উন্নতি করতে হলে মাসিকের পরিবর্তে বার্ষিক ভিত্তিতে চাঁদা দিতে হবে এবং তাও অবশ্যই অগ্রিম দিতে হবে। সুতরাং আমি কংগ্রেসের একটা সভা আহ্বান করলাম। সকলেই মাসিকের পরিবর্তে বার্ষিক চাঁদা দেয়ার প্রস্তাবকে স্বাগত জানাল এবং ন্যূনতম চাঁদার পরিমাণ নির্ধারিত হলো ৩ পাউন্ড। এভাবে চাঁদা আদায়ের কাজটা মোটামুটি সহজ হয়ে এলো।

শুরুতেই আমার শিক্ষা হয়েছিল যে ধারের টাকায় গণকাজ করতে নেই। প্রায় সব ব্যাপারেই মানুষের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু টাকার ব্যাপারে নয়। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক চাঁদার টাকা তাড়াতাড়ি দিয়ে দিতে আমি কখনো দেখিনি। নাটালের ভারতীয়রাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। সুতরাং যেহেতু টাকা হাতে না আসা পর্যন্ত কোনো কাজ করা হতো না সেহেতু নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস কখনো ঋণগ্রস্ত হয়নি।

আমার সহকর্মীরা অসাধারণ উৎসাহ দেখিয়েছে দ্বারে দ্বারে ঘুরে সদস্য সংগ্রহের জন্য। একাজে তাদের খুব আগ্রহ ছিল এবং একই সাথে এর অভিজ্ঞতাও ছিল অমূল্য। দলে দলে লোক এগিয়ে এলো নগদ চাঁদা নিয়ে। সুদূর গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কাজ করাটা বরং কঠিন ছিল। সেখানকার লোকেরা গণকাজের ধরন সম্পর্কে জানত না। তবুও আমরা দূর-দূরান্তের স্থানগুলোতে যাবার আমন্ত্রণ পেতে লাগলাম। নেতৃস্থানীয় ব্যবসায়ীরা আতিথেয়তা দেখালেন।

এরকম ভ্রমণের সময় একবার কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হলো। আমরা আশা করেছিলাম আমাদের আমন্ত্রণকারী ৬ পাউন্ড চাঁদা দেবেন।

www.pathagar.com

কিন্তু তিনি ৩ পাউন্ডের অতিরিক্ত কিছুতেই দিতে চাইলেন না। আমরা তা গ্রহণ করলে অন্যেরাও একই পথ অনুসরণ করবে এবং আমাদের চাঁদা সংগ্রহের কার্যক্রম ব্যর্থ হবে। রাত গভীর হয়েছিল এবং আমরা সবাই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু প্রত্যাশিত চাঁদা না পেলে কিভাবে খাই? সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। আমন্ত্রণকারী অটল রইলেন। শহরের অন্য ব্যবসায়ীরা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন এবং আমরা সারা রাত বসে রইলাম। তিনিও আমাদের সাথে বসে রইলেন। কেউই এক ইঞ্চি ছাড় দেব না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমার সহকর্মীদের প্রায় সবাই রাগে জ্বলছিল কিন্তু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। অবশেষে দিনের আলো ফুটল, তিনি আত্মসমর্পণ করলেন, ৬ পাউন্ড জমা দিলেন এবং আমাদেরকে খাওয়ালেন। ঘটনাটা ঘটেছিল টনগাট-এ কিন্তু এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল সুদূর নর্থ কোস্টের স্ট্যানগার এবং মফস্বলের চার্লসটাউন পর্যন্ত। এতে আমাদের চাঁদা সংগ্রহের কাজের গতিও বেড়ে গেল।

কিন্তু তহবিল সংগ্রহই একমাত্র কাজ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমি শিখেছি যে কারো হাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ জমা থাকা উচিত নয়।

মাসে একবার, প্রয়োজনে সপ্তাহেও একবার মিটিং হতো। পূর্ববর্তী মিটিং এর কার্যবিবরণী পাঠ করা হতো এবং সব ধরনের প্রশ্নই আলোচিত হতো। গণ আলোচনায় অংশ নেয়া বা সংক্ষেপে গুছিয়ে কথা বলার অভিজ্ঞতা কারো ছিল না। প্রত্যেকেই সংকোচ বোধ করত দাঁড়িয়ে কথা বলতে। আমি তাদেরকে মিটিং এর নিয়ম-কানুন ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলাম এবং তারা তা মেনে চলল। তারা বুঝলো যে এটা তাদের শিক্ষার বিষয়। এবং যাদের কখনো শ্রোতাদের সামনে কথা বলার অভ্যাস ছিল না তারা শীঘ্রই জনগণের সামনে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চিন্তা করা ও কথা বলার অভ্যাস রপ্ত করে ফেলল।

আমি জানতাম যে গণকাজে অনেক সময় ছোট ছোট কাজের জন্য বড় অংকের টাকা ব্যয় হয়। তাই ছোট খাটো ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রথম দিকে রশিদ বই পর্যন্ত না ছাপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমার অফিসে একটি সাইক্লোস্টাইল মেশিন ছিল যা দিয়ে রশিদ ও রিপোর্ট ছাপিয়ে নিতাম। যখন কংগ্রেসের তহবিল ভারী হলো তখন এসব জিনিস বাইরে থেকে ছাপানো শুরু করলাম এবং সদস্য সংখ্যা বাড়ল। এরকম মিতব্যয়িতা প্রত্যেক সংগঠনের জন্য অত্যাবশ্যক। এতদসত্ত্বেও আমি জানি তা বাস্তবে সর্বদা মানা হয় না। সে কারণেই আমি ছোট কিন্তু বর্ধিষ্ণু এই সংগঠনটির ক্ষুদ্র বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা সঠিক বলে মনে করেছিলাম।

লোকে চাঁদা দিয়ে কখনো রশিদ নিতে আগ্রহী ছিল না, কিন্তু আমরা সর্বদা রশিদ দেওয়ার ওপর জোর দিতাম। এভাবে প্রতিটি পাই-পয়সারও স্বচ্ছ হিসাব রাখা হতো এবং আমি এটা গর্বের সাথে বলতে পারি যে নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের রেকর্ডপত্র খুঁজলে আজো ১৮৯৪ সালের হিসাবের বই পাওয়া যাবে। সযত্ন হিসাব সংরক্ষণ যে কোনো সংগঠনের অপরিহার্য গুণ। এটা না হলে

www.pathagar.com

সংগঠনের বদনাম হয়। সঠিক পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ ছাড়া এর সততা ও আদি বিশুদ্ধতা বজায় রাখা সম্ভব নয়।

কংগ্রেসের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল কলোনীতে জন্ম নেয়া শিক্ষিত ভারতীয়দের সেবামূলক কার্যক্রম। কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল "কলোনীতে জন্মগ্রহণকারী ভারতীয় শিক্ষা সংঘ (The Colonial-born Indian Educational Association)।" এর সদস্যরা অধিকাংশই ছিলেন এসব শিক্ষিত যুবক। তাদের নাম মাত্র একটা চাঁদা দিতে হতো। এ সংঘ চেষ্টা করত তাদের প্রয়োজন ও দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরতে, চিন্তার প্রসার ঘটাতে, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সাথে তাদের যোগাযোগ স্থাপন করতে এবং তাদেরকে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সেবা করার সুযোগ করে দিতে। এটা ছিল অনেকটা বিতর্ক সমিতির মতো। সদস্যরা নিয়মিত সভায় মিলিত হতেন, আলোচনা করতেন বা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সংবাদপত্র পড়তেন। সংঘের জন্য একটি ছোট পাঠাগারও স্থাপন করা হয়েছিল। কংগ্রেসের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল প্রচারণা। এর উদ্দেশ্য ছিল নাটালের প্রকৃত অবস্থা দক্ষিণ আফ্রিকায় ও ইংল্যান্ডে ইংরেজদের কাছে এবং ভারতীয় জনগণের কাছে তুলে ধরা। সে উদ্দেশ্য নিয়ে আমি দুটি পুস্তিকা লিখলাম। প্রথমটি "দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী প্রত্যেক বৃটেনবাসীর নিকট আবেদন"। এতে ছিল নাটালে ভারতীয়দের সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে প্রমাণসহ একটি বিবৃতি। অন্যটির শিরোনাম ছিল "ভারতীয়দের ভোটাধিকার—একটি আবেদন"। এতে ছিল তথ্য প্রমাণসহ নাটালে ভারতীয়দের ভোটাধিকারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এ পুস্তিকাগুলো তৈরি করতে আমাকে যথেষ্ট পরিশ্রম ও পড়াশুনা করতে হয়েছে এবং এর ফলাফলও হয়েছিল যথোপযুক্ত। এগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছিল।

এতসব কর্মকাণ্ডের ফলে ভারতীয়রা লাভ করল দক্ষিণ আফ্রিকাতে অগণিত বন্ধুত্ব এবং ভারতে সর্বদলীয় সক্রিয় সমর্থন। এতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সামনে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থার দুয়ার খুলে গেল।

বিশ
বালাসুন্দরম

হৃদয়ের ঐকান্তিক ও বিশুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা সর্বদাই পূরণ হয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় এটা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। আমার অন্তরের ইচ্ছা ছিল দরিদ্রদের সেবা করা। এ ইচ্ছা আমাকে বার বার দরিদ্রদের মাঝে ঠেলে দিয়েছে এবং আমি নিজে তাদের সাথে একাত্মবোধ করতে সমর্থ হয়েছি।

যদিও নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের মধ্যে কলোনীতে জন্মগ্রহণকারী ভারতীয় ও কেরানী শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু অদক্ষ বেতনভুক কর্মচারী ও চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা তখনো এর গণ্ডীর বাইরে ছিল। কংগ্রেস তখনো তাদের হয়ে ওঠেনি। এর সদস্য পদ লাভের জন্য নির্ধারিত চাঁদা দেয়ার সামর্থ্য তাদের ছিল না। তাদের সেবা

www.pathagar.com

করার মাধ্যমেই কেবল কংগ্রেস তাদের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। এরকম একটা সুযোগও এসে গেল। কিন্তু তখন না কংগ্রেস না আমি নিজে এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম। আমার ওকালতি প্র্যাকটিস সবেমাত্র তিন কি চার মাস হয়েছে এবং কংগ্রেসও তখন শিশু অবস্থায়। এমন সময়ে একজন তামিল ছিন্ন বস্ত্রে, মাথার কাপড় হাতে নিয়ে, সামনের দুটি দাঁত ভাঙ্গা এবং মুখ দিয়ে রক্ত পড়া অবস্থায় কাঁপতে কাঁপতে আমার সামনে এসে দাঁড়াল এবং কান্নায় ভেঙে পড়ল। তার মনিব তাকে প্রচণ্ড মার মেরেছে। আমার তামিল কেরানীর কাছ থেকে তার সম্পর্কে সবকিছু জানলাম। আগন্তুকের নাম বালাসুন্দরম। সে ডারবানের সুপরিচিত এক ইউরোপীয়ান বাসিন্দার অধীনে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিল। তিনি তার ওপর রেগে গিয়ে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং বালাসুন্দরমকে বেদম প্রহার করেন যার ফলে তার দুটো দাঁত ভেঙে যায়।

আমি তাকে একজন ডাক্তারের নিকট নিয়ে গেলাম। তখনকার দিনে কেবল সাদা চামড়ার ডাক্তার পাওয়া যেত। ডাক্তারের নিকট থেকে বালাসুন্দরম কি ধরনের আঘাত পেয়েছে সে সম্পর্কে একটি সার্টিফিকেট চাইলাম। আমি সার্টিফিকেট নিলাম এবং আহত ব্যক্তিকে সোজা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নিয়ে গেলাম এবং তার হলফনামা (এফিডেভিট) পেশ করলাম। ম্যাজিস্ট্রেট তা পড়লেন এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও বালাসুন্দরমের নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে সমন জারী করলেন।

বালাসুন্দরমের নিয়োগকর্তার শাস্তি হোক আমি তা মোটেই চাইনি। আমি শুধু চেয়েছিলাম বালাসুন্দরম তার চুক্তি থেকে মুক্ত হোক। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের বিষয়ে আইনগুলো আমি পড়লাম। একজন সাধারণ শ্রমিক যদি বিনা নোটিশে চাকরি ত্যাগ করে তাহলে তার মনিব তার বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মামলা করতে পারে। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের আইন ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। অনুরূপ কেইসে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে মামলা করা যাবে এবং দোষী প্রমাণিত হলে তাকে জেলে দেয়া যেতে পারে। এ কারণেই স্যার উইলিয়াম হান্টার শ্রমিকদের চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে দাস প্রথার মতো খারাপ বলে অভিহিত করেছিলেন। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দাসের মতোই তার মনিবের সম্পত্তি বলে গণ্য হতো।

বালাসুন্দরমকে মুক্ত করার দুটিমাত্র উপায় ছিল—একটি হলো চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের রক্ষক (Protector of Indentured Labourers) কে দিয়ে তার চুক্তি বাতিল করানো অথবা অন্য কারো নিকট বদলী করা, অপরটি হলো বালাসুন্দরমের মনিবকে দিয়ে তাকে মুক্তি দেয়া। আমি তার মনিবের সাথে দেখা করে বললাম, "আমি আপনার বিরুদ্ধে মামলা চালাতে এবং আপনাকে শাস্তি দিতে চাই না। আমার ধারণা, আপনি বুঝতে পেরেছেন যে লোকটাকে আপনি বেদম প্রহার করেছেন। আপনি যদি তাকে অন্য কারো নিকট বদলী করে দেন তাতেই

www.pathagar.com

আমি খুশী হব।" এ প্রস্তাবে তিনি সাথে সাথেই রাজি হলেন। এর পর আমি প্রটেক্টর এর সাথে দেখা করলাম। তিনিও রাজি হলেন এ শর্তে যে আমাকে তার জন্য আরেকজন মনিব খুঁজে বের করতে হবে।

সুতরাং আমি আরেকজন মনিবের খোঁজে বের হলাম। একজন ইউরোপীয়ান মনিব পেতে হবে, কারণ কোনো ভারতীয় মনিব চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে না। ঐ সময়ে খুব কম সংখ্যক ইউরোপীয়ানের সাথে আমার জানাশোনা ছিল। তাদেরই একজনের সাথে আমি দেখা করলাম। তিনি অতি দয়াপরবশ হয়ে বালাসুন্দরমকে নিতে রাজি হলেন। আমি তার দয়ার স্বীকৃতি স্বরূপ কৃতজ্ঞতা জানালাম। ম্যাজিস্ট্রেট বালাসুন্দরমের মনিবকে দোষী সাব্যস্ত করলেন এবং রায় দিলেন যে বালাসুন্দরমের সাথে তার চুক্তি অন্য কারো কাছে বদলী করা হোক।

বালাসুন্দরমের এ মামলার কথা প্রতিটি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের কানে পৌঁছে গেল এবং আমি তাদের বন্ধু বলে পরিচিত হলাম। এ সম্পর্ককে আমি আনন্দের সাথে স্বাগত জানালাম। আমার অফিসে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের নিয়মিত আসা-যাওয়া শুরু হলো এবং তাদের সুখ-দুঃখ জানার জন্য আমি সর্বোত্তম সুযোগ পেলাম।

বালাসুন্দরমের কেসের কথা সুদূর মাদ্রাজেও পৌঁছে গেল। প্রদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে যে সব শ্রমিক চুক্তিবদ্ধ হয়ে নাটালে গিয়েছিল চুক্তিবদ্ধ অন্য শ্রমিক ভাইদের কাছ থেকে তারা এ সম্পর্কে জানতে পারল।

এ কেসটিতে অসাধারণ কিছুই ছিল না, কিন্তু তাদের পক্ষ সমর্থন করার এবং প্রকাশ্যে তাদের হয়ে কাজ করার জন্য নাটালে কেউ একজন আছে এ সত্যটাই চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের আনন্দে অভিভূত করেছিল এবং তাদেরকে নতুন আশায় উদ্দীপিত করেছিল।

আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি, বালাসুন্দরম তার মাথার বস্ত্র হাতে নিয়ে আমার অফিসে প্রবেশ করেছিল। ঐ অবস্থার মধ্যে বিশেষ দুঃখের ও অপমানের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। আমাকে এক সময় পাগড়ী খুলে ফেলতে বলা হয়েছিল সে কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। একটা নিয়ম চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, প্রত্যেক চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ও ভারতীয় আগন্তুককে ইউরোপীয়ানদের সাথে দেখা করতে হলে তার শিরবস্ত্র—সেটা টুপি, পাগড়ী বা মাথায় জড়ানো রুমাল যাই হোক না কেন, তা খুলে ফেলতে হবে। দুই হাত তুলে কুর্ণিশ করাও যথেষ্ট ছিল না। বালাসুন্দরম ভেবেছিল আমার সাথে দেখা করার বেলায়ও ঐ নিয়ম মানতে হবে। এ ধরনের কেসের অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। আমি অপমানিত বোধ করে তাকে মাথায় রুমাল বাঁধতে বললাম। যদিও সে সংকোচের সাথে কাজটা করল, কিন্তু আমি তার মুখে আনন্দের চিহ্ন দেখতে পেলাম।

অন্যের অপমানে মানুষ কিভাবে নিজেকে সম্মানিত বোধ করতে পারে আমার নিকট তা চিরকালই দুর্বোধ্য।

www.pathagar.com

একুশ
তিন পাউন্ড ট্যাক্স

বালাসুন্দরমের কেস আমাকে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের সান্নিধ্যে নিয়ে এলো। তবে তাদের অবস্থা সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান চালাতে আমাকে যা প্ররোচিত করেছে তা হলো তাদের ওপর আরোপিত অত্যধিক বিশেষ কর।

একই বছরে অর্থাৎ ১৮৯৪ সালে নাটাল গভর্নমেন্ট চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের ওপর বার্ষিক ২৫ পাউন্ড কর আরোপের উদ্যোগ নিল। প্রস্তাবটি আমাকে অবাক করল। আমি বিষয়টি কংগ্রেসে আলোচনার জন্য উত্থাপন করলাম এবং এর বিরোধীতা করার জন্য ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

শুরুতেই আমি ঐ করের উৎপত্তির বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। ১৮৬০ সালের দিকে নাটালের ইউরোপীয়ানরা দেখলেন যে, এখানে ইক্ষু চাষের ভালো সম্ভাবনা আছে এবং এর জন্য শ্রমিকের প্রয়োজন। যেহেতু নাটালের জুলুরা এ কাজের জন্য উপযুক্ত নয়, বাইরের শ্রমিক আমদানী ছাড়া ইক্ষু চাষ ও চিনি উৎপাদন অসম্ভব হয়ে পড়ল। সুতরাং নাটাল গভর্নমেন্ট ভারতীয় গভর্নমেন্টের সাথে যোগাযোগ করে ভারতীয় শ্রমিক নিয়োগের অনুমতি লাভ করল। এভাবে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত শ্রমিকদেরকে নাটালে কাজ করার জন্য পাঁচ বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে হতো এবং এই মেয়াদ শেষে তারা স্বাধীনভাবে সেখানে বসতি স্থাপন ও জমির মালিকানা লাভের অধিকার পেত। চুক্তির মেয়াদ শেষে ভারতীয় শ্রমিকদের এ প্রলোভন দেখিয়ে সাদা চামড়ার লোকগুলো তাদের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করত।

কিন্তু ভারতীয়রা চাওয়ার অনেক বেশি দিয়েছিল তাদেরকে। তারা প্রচুর শাক-সবজি উৎপাদন করেছিল। তারা ভারতীয় জাতের ফসল উৎপাদন শুরু করেছিল এবং স্থানীয় জাতের ফসল অধিক উৎপাদন করে দাম কমিয়ে এনেছিল। তারা আম চাষের প্রবর্তন করেছিল। তাদের উদ্যোগ শুধু কৃষিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তারা ব্যবসাও শুরু করেছিল। তারা দালানকোঠা নির্মাণের জন্য জমি কিনেছিল এবং অনেকেই শ্রমিক থেকে নিজেদেরকে জমি ও ঘর-বাড়ির মালিকে উন্নীত করেছিল। তাদের দেখাদেখি ভারতীয় বণিকেরা ব্যবসার জন্য সেখানে বসতি স্থাপন করল। প্রয়াত শেঠ আবু বকর আমোদ এঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। তিনি অতি দ্রুত ব্যাপক ব্যবসা গড়ে তুলেছিলেন।

সাদা চামড়ার ব্যবসায়ীরা এতে প্রমাদ গুণল। তারা যখন ভারতীয় শ্রমিকদের স্বাগত জানিয়েছিল তখন তাদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বিবেচনায় আনেনি। স্বাধীন কৃষক হিসেবে তাদেরকে মেনে নেয়া যেতে পারে, কিন্তু ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তাদেরকে সহ্য করা যায় না।

এ থেকেই ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষের বীজ রোপিত হলো। আরো অনেক কারণে এ বিদ্বেষ বেড়ে উঠল। আমাদের আলাদা জীবন যাত্রা, আমাদের সরলতা, অল্প লাভে সন্তুষ্টি, স্বাস্থ্য ও পয় ব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতার

www.pathagar.com

বিষয়ে অনীহা, বাড়িঘর মেরামতে কৃপণতা—এগুলোর সাথে আলাদা ধর্মবিশ্বাস যুক্ত হয়ে বিদ্বেষের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছিল। এ বিদ্বেষের নগ্ন প্রকাশ ঘটেছিল আইন সভায় ভোটধিকার হরণ বিল এবং চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের ওপর কর আরোপের বিল উত্থাপনের মাধ্যমে। আইন প্রণয়ন ছাড়াও ইতিমধ্যে অনেক বিদ্বেষমূলক আচরণ শুরু করা হয়েছিল।

প্রথমে প্রস্তাব করা হলো, ভারতীয় শ্রমিকদেরকে জোর করে ভারতে ফেরত পাঠানো হোক যাতে ভারতে গিয়েই তাদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়। সম্ভবত ভারতীয় গভর্নমেন্ট এ প্রস্তাবে সম্মত হয়নি। সুতরাং অন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হলো যা এরকম—

১। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকেরা চুক্তির মেয়াদ শেষে ভারতে ফিরে যাবে, অথবা
২। তারা মেয়াদ শেষে দু'বছরের জন্য পুনরায় চুক্তিবদ্ধ হবে এবং প্রতিবার চুক্তি নবায়নে একবার করে তাদের বেতন বৃদ্ধি পাবে, এবং
৩। যদি কেউ ভারতে ফেরত যেতে বা চুক্তি নবায়নে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাকে বার্ষিক ২৫ পাউন্ড করে কর দিতে হবে।

এ প্রস্তাব অনুমোদন করাতে স্যার হেনরী বিনস ও মি. ম্যাসনের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দলকে ভারতীয় গভর্নমেন্টের নিকট প্রেরণ করা হলো। লর্ড এলগিন তখন ভারতের ভাইসরয়। তিনি ২৫ পাউন্ড ট্যাক্সের প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন, কিন্তু ৩ পাউন্ড ট্যাক্স আরোপে সম্মত হলেন। আমার তখন মনে হয়েছিল এবং এখনো মনে হয়, এটা ভাইসরয় এর জন্য একটা মারাত্মক ভুল ছিল। এ প্রস্তাব অনুমোদনকালে তিনি কোনোভাবেই ভারতীয়দের স্বার্থের কথা ভাবেননি। নাটালের ইউরোপীয়ানদেরকে এভাবে সুবিধা প্রদান তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তিন/চার বছরের মধ্যে একজন ভারতীয় শ্রমিক তার স্ত্রী, ১৬ বছরের অধিক বয়স্ক পুত্র ও ১৩ বছরের অধিক বয়স্কা কন্যাদের নিয়ে এ প্রতারণার ফাঁদে পড়ে গেল। স্বামী-স্ত্রী ও দু'সন্তানসহ চার জনের পরিবার যার কর্তার মাসিক আয় ছিল ১৪ শিলিং তাদের ওপর বার্ষিক ১২ পাউন্ড কর ধার্য করা ছিল নৃশংসতা এবং সারা দুনিয়ায় নজিরবিহীন।

আমরা এ করারোপের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ গড়ে তুললাম। নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস যদি এ বিষয়ে নীরব থাকত তাহলে ভাইসরয় হয়তো ২৫ পাউন্ড ট্যাক্সের প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়ে দিতেন। সম্ভবত শুধু কংগ্রেসের আন্দোলনের মুখেই করের পরিমাণ ২৫ পাউন্ড থেকে কমিয়ে ৩ পাউন্ড করা হয়েছিল।

এটা মনে করা আমার ভুলও হতে পারে। অবশ্য এও হতে পারে যে ভারতীয় গভর্নমেন্ট কংগ্রেসের আন্দোলনের তোয়াক্কা না করেই ২৫ পাউন্ড করের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে ৩ পাউন্ডের অনুমোদন দিয়েছিল। সে যাই হোক না কেন, ভারতীয় গভর্নমেন্টের জন্য তা ছিল চুক্তি ভঙ্গের সামিল। ভারতীয়দের কল্যাণের

www.pathagar.com

ট্রাস্টি হিসেবে ভাইসরয়ের কোনোভাবেই উচিত হয়নি এ অমানবিক করের অনুমোদন দেয়া।

করের পরিমাণ ২৫ পাউন্ড থেকে ৩ পাউন্ড নামিয়ে আনাকে কংগ্রেস বড় সাফল্য বলে গণ্য করতে পারল না। চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের পরিপূর্ণ স্বার্থ রক্ষা না করতে পারার দুঃখ রয়েই গেল। এ কর মওকুফ করানোর বিষয়ে কংগ্রেস সর্বদা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল, কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা পূরণে ২০ বছর লেগেছিল। আর যখন কর মওকুফ হলো তা কেবল নাটালের ভারতীয় শ্রমিকদের নয়, বরং দক্ষিণ আফ্রিকার সকল ভারতীয়দের সম্মিলিত আন্দোলনের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। মি. গোখলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গের ফলে আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল, যে আন্দোলনে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকেরা পূর্ণ অংশ নিয়েছিল, গুলিবিদ্ধ হয়ে অনেকে প্রাণ দিয়েছিল এবং দশ সহস্রাধিক ভারতীয় কারাবরণ করেছিল।

অবশেষ সত্যেরই জয় হলো। ভারতীয়দের দুর্ভোগ ছিল সেই সত্যের প্রকাশ। তবুও অটল বিশ্বাস, মহান ধৈর্য ও লাগাতার চেষ্টা ব্যতীত এ বিজয় সম্ভব হতো না। যদি ভারতীয় সম্প্রদায় আন্দোলনে ক্ষান্ত দিত, যদি কংগ্রেস প্রচারণা পরিত্যাগ করত এবং করারোপকে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিত তাহলে এ ঘৃণিত করের বোঝা ভারতীয়দের ওপর আজো চেপে থাকত যা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের জন্য এবং সমগ্র ভারতবাসীর জন্য চিরস্থায়ী লজ্জার বিষয় হতো।

বাইশ
তুলনামূলক ধর্মচর্চা

আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সেবায় নিয়োজিত করলাম। এর পেছনে কারণ ছিল আমার আত্মোউপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা। সেবা-ধর্মকে আমি নিজের ধর্ম করে নিয়েছিলাম, কারণ আমি অনুভব করছিলাম যে ঈশ্বরকে জানতে হলে শুধু সেবার মাধ্যমেই তা সম্ভব। আর আমার জন্য সেবার অর্থ ছিল ভারতীয়দের সেবা। আমার মধ্যে এ সেবার ইচ্ছা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং এর প্রতি আমার ঝোঁকও ছিল প্রবল। আমি দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছিলাম ভ্রমণ করতে, কাঁথিয়াওয়াড়ের ষড়যন্ত্র থেকে দূরে থাকতে এবং নিজের জীবিকা উপার্জন করতে। কিন্তু আগেই যেমন বলেছি, আমি নিজেকে ঈশ্বরের অন্বেষণ ও আত্মোউপলব্ধির প্রচেষ্টায় নিয়োজিতরূপে আবিষ্কার করেছি ।

খৃষ্টান বন্ধুরা আমার জ্ঞানস্পৃহাকে শানিত করেছিল যা তৃপ্ত করা ছিল প্রায় অসম্ভব। আমি এড়িয়ে চলতে চাইলেও তারা আমাকে শান্তিতে থাকতে দেননি। ডারবানে সাউথ আফ্রিকা জেনারেল মিশনের প্রধান মি. স্পেনসার ওয়ালটন আমাকে খুঁজে বের করলেন। আমি তাঁর পরিবারের একজনের মতো হয়ে গেলাম। প্রিটোরিয়াতে খৃষ্টানদের সাথে যোগাযোগের সূত্র ধরেই অবশ্য এ পরিচিতি গড়ে উঠেছিল। মি. ওয়ালটনের আচার ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ তার নিজস্ব। আমার মনে পড়ে না তিনি আমাকে কখনো খৃষ্টধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর

www.pathagar.com

জীবনটাকেই তিনি আমার সামনে বই এর পাতার মতো খুলে ধরেছেন এবং তাঁর সকল চলাফেরা প্রত্যক্ষ করতে দিয়েছেন। মিসেস ওয়ালটন একজন অতি ভদ্র ও প্রতিভাধারী মহিলা ছিলেন। এ পরিবারের ব্যবহার আমার ভালো লাগত। আমাদের মধ্যকার মৌলিক মতপার্থক্য সম্পর্কে আমরা জানতাম। আলোচনা যতই হোক না কেন আমাদের মতপার্থক্য কখনো মুছে যায়নি। যেখানে সহনশীলতা, বদান্যতা ও সত্য আছে, সেখানে মতপার্থক্য থাকলেও তার ভালো দিক আছে। মি. ও মিসেস ওয়ালটনের বিনয়, ধৈর্য ও কর্মের প্রতি অনুরাগ আমার পছন্দ হতো এবং আমি প্রায়ই তাদের সাথে দেখা করতাম।

এ বন্ধুত্ব ধর্মের প্রতি আমার আগ্রহকে জাগিয়ে রেখেছিল। প্রিটোরিয়াতে ধর্মীয় বিষয়ে পড়াশুনার জন্য যে সময় পেতাম এখানে সে অবসর পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু যেটুকু সময় পেতাম তার সবটুকুই ভালো কাজে লাগাতাম। ধর্ম বিষয়ে আমার পত্রালাপ অব্যাহত ছিল। রায়চাঁদভাই আমাকে দিক নির্দেশনা দিতেন। কোনো এক বন্ধু আমাকে নর্মদাশংকরের লেখা "ধর্ম বিচার" বইটি পাঠিয়েছিলেন। এর মুখবন্ধটা আমার জন্য খুব সহায়ক হয়েছিল। আমি কবির ছন্নছাড়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের কাহিনী শুনেছিলাম। ধর্ম বিষয়ে পড়াশুনার ফলে তার জীবনে কিভাবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল মুখবন্ধে তার বর্ণনা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। বইটি আমার ভালো লেগেছিল এবং প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। ম্যাক্স মুলারের বই "ভারত আমাদেরকে কি শিক্ষা দিতে পারে" আমি আগ্রহ সহকারে পড়েছি। থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রকাশিত উপনিষদের অনুবাদও পড়েছি। এসব বই হিন্দু ধর্মের প্রতি আমার ভক্তি বৃদ্ধি করেছে এবং এর সৌন্দর্য আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে। এতে অবশ্য অন্য ধর্মের প্রতি আমার বিদ্বেষ জন্মায়নি। আমি ওয়াশিংটন আয়ারভিং এর লেখা "মুহাম্মদ ও তার উত্তরসূরীদের জীবনী" বইটি পড়েছি এবং কার্লাইলের লেখা "পয়গাম্বরের প্রশস্তি গাঁথা"ও পড়েছি। এসব বই মুহাম্মদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বাড়িয়েছে। "জরাথুস্ত্র যা বললেন" নামে একটা বইও পড়েছি।

এভাবে আমি বিভিন্ন ধর্মের ওপর আরো জ্ঞান অর্জন করি। এই পড়াশুনা আমার অন্তর্দর্শনকে জাগ্রত করেছিল এবং পড়াশুনার মাধ্যমে যা ভালো বলে মনে হয়েছে তা কার্যে পরিণত করার অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। হিন্দু ধর্মীয় পুস্তক থেকে এভাবে আমি যোগ সাধনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি এবং কিছু কিছু যোগ সাধনা শুরু করি। কিন্তু আমি বেশিদূর এগোতে পারিনি এবং ভারতে ফেরত যাবার পরে একজন বিশেষজ্ঞের সহায়তায় পুনরায় যোগ সাধনা শুরু করব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু আমার এ আশা কখনো পূর্ণ হয়নি।

আমি টলস্টয়ের বইগুলোও নিবিড়ভাবে পড়লাম। তাঁর লেখা "সংক্ষেপে সুসংবাদ, আমাদের করণীয় কি?" ও অন্যান্য বইগুলো আমার ওপর গভীর ছাপ ফেলেছিল। বিশ্ব প্রেমের অসীম সম্ভাবনা সম্পর্কে আমি আরো বেশি করে বুঝতে শুরু করলাম।

www.pathagar.com

প্রায় একই সময়ে আমি অন্য একটি খৃষ্টান পরিবারের সংস্পর্শে এলাম। তাদের পরামর্শে আমি প্রতি রোববারে ওয়েসলিয়ান চার্চে যোগদান করলাম। এসব দিনে তাদের সাথে ডিনারে যোগদানের জন্য আমার স্থায়ী আমন্ত্রণ ছিল। গির্জায় গমন আমার ওপর তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। পাদ্রীর বক্তৃতা (সারমন) আমার কাছে অনুপ্রেরণাহীন মনে হয়েছে। চার্চে উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে তেমন ধর্মভীরু বলে মনে হয়নি। তাদের এই সমাবেশকে ধর্মপ্রাণ আত্মার মিলনের পরিবর্তে একদল বৈষয়িকমনা লোকের সমাবেশ বলে মনে হয়েছে যারা গির্জায় যাচ্ছে আমোদ করা এবং গতানুগতিক নিয়ম রক্ষার জন্য। এখানে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে আমি ঝিমাতাম। আমি খুব লজ্জা পেতাম, কিন্তু যখন দেখতাম আমার পাশের ব্যক্তির অবস্থাও আমার চেয়ে ভালো নয়, তখন লজ্জার ভার কিছুটা লাঘব হতো। এভাবে দীর্ঘদিন চালানো সম্ভব ছিল না এবং আমি শীগগিরই চার্চে যাওয়া ছেড়ে দিলাম।

প্রতি রোববারে আমি যে পরিবারে যাতায়াত করতাম তাদের সাথে হঠাৎ করে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। আসলে বলা যায় যে সেখানে না যাবার জন্য আমি সতর্ক সংকেত পেলাম। ঘটনাটি বলছি। আমার আতিথ্যকর্ত্রী ছিলেন একজন সরলমনা ভদ্রমহিলা, কিন্তু কিছুটা সংকীর্ণমনা। আমরা সর্বদা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। আমি এই সময়ে আরনল্ডের লেখা "এশিয়ার আলো" বইটি পুনরায় পড়ছিলাম। একদিন আমরা যীশুখৃষ্টের জীবনের সাথে গৌতম বুদ্ধের তুলনা করছিলাম। আমি বললাম, "গৌতমের দয়ার কথা বিবেচনা করুন। তাঁর দয়া শুধু মানুষের প্রতি নয়, সকল প্রাণীর প্রতি বিস্তৃত ছিল। তাঁর কাঁধের ওপর মেষশাবকের সানন্দ অধিষ্ঠানের কথা চিন্তা করলে কি সকলের হৃদয় ভালোবাসার আনন্দে আপ্লুত হয়ে ওঠে না? যীশুখৃষ্টের জীবনে কিন্তু সকল জীবের প্রতি এরকম ভালোবাসা দেখা যায় না।"

এই তুলনাতে ভদ্রমহিলা ব্যথিত হলেন। আমি তার অনুভূতি বুঝতে পারলাম। আমরা আলোচনা সংক্ষিপ্ত করে খাবার ঘরে গেলাম। প্রায় পাঁচ বছর বয়সী দেবদূততুল্য তার পুত্রটিও আমাদের সাথে ছিল। বাচ্চাদের সান্নিধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই এবং এ শিশুটির সাথে আমার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। আমি তার প্লেটের মাংসের নিন্দা এবং আমার প্লেটের আপেলের প্রশংসা করলাম। অবোধ শিশুটি আমার কথায় সায় দিয়ে ফলের প্রশংসা করল। কিন্তু তার মা? তিনি বিষণ্ন হয়ে রইলেন।

আমি সতর্ক সংকেত পেয়ে গেলাম। নিজেকে সামলে নিয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলাম। পরের সপ্তাহেও আমি বরাবরের মতো তাদের ওখানে গেলাম, কিন্তু নিঃশঙ্কচিত্তে নয়। আমার সেখানে আর যাওয়া উচিত নয় তা বুঝতে পারিনি। হঠাৎ করে সেখানে যাওয়া বন্ধ করাটাও ঠিক হবে বলে মনে হয়নি। কিন্তু ভদ্রমহিলা আমার পথ বাতলে দিলেন।

www.pathagar.com

তিনি বললেন, "মি. গান্ধী, আমি যদি বলতে বাধ্য হই যে, আমার পুত্র আপনার জন্য উপযুক্ত সঙ্গী নয় তাহলে আপনি দয়া করে বিষয়টি খারাপভাবে নেবেন না। আপনার যুক্তির কথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রতিদিন সে মাংস খেতে দ্বিধা করে আর ফলের জন্য বায়না ধরে। এটা বাড়াবাড়ি। মাংস না খেলে সে অসুস্থ হয়ে না পড়লেও দুর্বল তো হবেই। এটা আমি কিভাবে সহ্য করব? এখন থেকে আমাদের আলোচনা বড়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই উচিত। এসব আলোচনা বাচ্চাদের ওপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে।"

আমি জবাব দিলাম, "ভদ্র মহোদয়, আমি দুঃখিত। মা হিসেবে আপনার অনুভূতি আমি বুঝতে পারছি, কারণ আমারও সন্তান আছে। আমরা খুব সহজেই এ অবস্থার ইতি টানতে পারি। আমি কি বলি তার চেয়ে আমি কি খাই বা না খাই তার প্রভাব বাচ্চাদের ওপর বেশি। সুতরাং সর্বোত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে আমার এখানে আসা বন্ধ করে দেয়া। অবশ্যই এতে আমাদের বন্ধুত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।"

চেহারায় স্পষ্ট স্বস্তির ছাপ নিয়ে তিনি বললেন, "আপনাকে ধন্যবাদ।"

তেইশ
গৃহকর্তার ভূমিকায়

সংসার গড়ে তোলার অভিজ্ঞতা আমার জন্য নতুন নয়। কিন্তু নাটালের অভিজ্ঞতা ছিল বোম্বে বা লন্ডনের থেকে আলাদা। এখানে আমার ব্যয়ের একটা বড় অংশ ছিল নেহায়েত সম্মান রক্ষার জন্য। নাটালে একজন ভারতীয় ব্যারিস্টার ও ভারতের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আমার মর্যাদার সাথে সংগতি রেখে এ ব্যয়ভার বহন করা প্রয়োজন বলে মনে হয়েছিল। সুতরাং অভিজাত এলাকায় আমি ছোট একটি সুন্দর বাড়ি নিলাম। এটা উপযুক্ত আসবাবপত্রে সজ্জিত ছিল। খাবার ছিল সাধারণ, কিন্তু যখন ইংরেজ বন্ধু ও ভারতীয় সহকর্মীদের নিমন্ত্রণ করতাম তখন খাবারের ব্যয় বেশ বেশি হতো।

প্রত্যেক সংসারে একজন ভাল চাকর থাকা আবশ্যক। কিন্তু একজন মানুষকে কি করে চাকর বানিয়ে রাখতে হয় আমি তা কোনোদিন শিখিনি।

আমার একজন বন্ধু ছিল। সে ছিল আমার সঙ্গী, সাহায্যকারী ও পাচক। সে আমার পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিল। আমার অফিসের একাধিক কেরানীও ছিল যাদের থাকা ও খাওয়া ছিল আমার সাথেই।

আমার ধারণা, আমার এ গৃহস্থালীর পরীক্ষায় মোটামুটি সফলকাম হয়েছিলাম। তবে এতে জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কিঞ্চিৎ মিশ্রণও ছিল।

আমার সঙ্গীটি ছিল অতিশয় চালাক এবং মনে হয়েছিল, আমার প্রতি বিশ্বস্তও। কিন্তু তার সম্পর্কে আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। আমার সাথে বসবাসকারী একজন অফিস কেরানীর প্রতি সে ঈর্ষান্বিত ছিল এবং এমন ষড়যন্ত্রের জাল বুনল যে আমি কেরানীটিকে সন্দেহ করতে থাকলাম। কেরানী বন্ধুটি ছিল রাগী স্বভাবের। আমি তাকে সন্দেহ করছি জানতে পারার সাথে সাথে

www.pathagar.com

সে আমার বাসা ও অফিস ত্যাগ করল। এতে আমি ব্যথিত হলাম। আমার মনে হলো হয়তো আমি তার প্রতি অন্যায় করেছি এবং বিবেক আমাকে দংশন করতে থাকল।

ইত্যবসরে আমার পাচক ছুটি নিয়ে বা অন্য কোনো কারণে কয়েকদিন বাইরে থাকল। তার অনুপস্থিতিতে আরেকজন পাচককে নিতে হলো। এই নতুন পাচকের সম্পর্কে পরে জানতে পারলাম যে সে ছিল পাক্কা বদমাশ। কিন্তু আমার জন্য সে ছিল ঈশ্বরের আশীর্বাদ। তার আগমনের দুই-তিন দিনের মধ্যে সে আবিষ্কার করল যে আমার ঘরের মধ্যে এমন সব অনাচার ঘটছে যার কিছুই আমি জানি না এবং সে আমাকে সতর্ক করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সরল-সোজা ও বিশ্বাসপ্রবণ বলে আমার খ্যাতি ছিল। সে যে অনিয়ম আবিষ্কার করেছিল তা তাকেও স্তম্ভিত করেছিল। প্রতিদিন বেলা একটায় আমি অফিস থেকে বাসায় ফিরতাম দুপুরের খাবার জন্য। নতুন পাচক একদিন বেলা প্রায় ১২ টায় আমার অফিসে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "দয়া করে শিগগীর বাসায় আসুন। আশ্চর্য ঘটনা দেখতে পাবেন।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ঘটনাটা কি? তোমাকে অবশ্যই বলতে হবে কি হয়েছে। এমন কি ঘটেছে যে আমাকে এ অসময়ে অফিস ছেড়ে গিয়ে তা দেখতে হবে?"

"আপনি যদি না আসেন তাহলে পরে পস্তাবেন। এর বেশি আর কিছু আমি বলব না।"

তার পীড়াপীড়ির মধ্যে কিছুটা অনুনয় ছিল। একজন কেরানীকে সাথে নিয়ে আমি বাসায় গেলাম। পাচকটি আমাদের আগে আগে চলল। সে আমাকে সোজা উপরতলায় নিয়ে গেল। আমার সঙ্গীর রুমের দরজা দেখিয়ে বলল, "এ দরজাটা খুলুন, নিজেই দেখতে পাবেন।"

আমি সবই দেখলাম। দরজায় ধাক্কা দিলাম। কোনো সাড়া নেই! আমি দরজায় আরো জোরে জোরে ধাক্কা লাগালাম যাতে দেওয়ালও কেঁপে উঠল। শেষে দরজা খুলল। ভিতরে দেখলাম একজন বেশ্যা। আমি তাকে বললাম বেরিয়ে যেতে এবং আর কখনো এখানে না আসতে।

সঙ্গীটিকে বললাম, "এ মুহূর্ত থেকে তোমার সাথে আমার সম্পর্ক শেষ। তুমি আমাকে আগাগোড়া ধোঁকা দিয়েছ এবং আমিও নিজেকে বোকা বানিয়েছি। তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, এভাবেই তুমি সে বিশ্বাসের প্রতিদান দিলে।"

তার শুভ বুদ্ধির উদয় তো হলোই না, উল্টো আমাকে ভয় দেখাল আমার সব ব্যাপার ফাঁস করে দেবে বলে। আমি বললাম, "আমার তো গোপন কিছুই নেই। আমি কিছু করে থাকলে সবাইকে তা বলে দাও। কিন্তু এই মুহূর্তেই তোমাকে চলে যেতে হবে।"

এতে সে আরো উগ্রমূর্তি ধারণ করল। তাকে থামাবার কোনো উপায় ছিল না। সুতরাং নিচের তলায় দাঁড়ানো কেরানীকে ডেকে বললাম, "দয়া করে পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে গিয়ে আমার নমস্কার জানিয়ে বলো আমার সাথে

www.pathagar.com

বসবাসকারী একজন খুব দুর্ব্যবহার করেছে। আমি তাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছি, কিন্তু সে যাচ্ছে না। আমাকে সাহায্য করতে পুলিশ পাঠালে আমি কৃতার্থ হব।"

এবার সে বুঝতে পারল আমি ভণিতা করছি না। অপরাধ বোধ তার স্নায়ুকে দুর্বল করে দিল। আমার কাছে ক্ষমা চাইল এবং পুলিশকে না জানানোর জন্য অনুরোধ করল। সে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে রাজি হলো এবং তৎক্ষণাৎ চলে গেল।

এ ঘটনাটি ছিল আমার জন্য সময়োচিত সতর্ক সংকেত। এতদিনে আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম কিভাবে এ দুষ্ট প্রতিভা আমাকে পুরোপুরি ধোঁকা দিয়েছে। তাকে আশ্রয় দেয়ার মাধ্যমে আমি সৎ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে অসৎ লোককে বেছে নিয়েছি। আমি বুনো কাঁটা গাছ থেকে সুস্বাদু ফলের প্রত্যাশা করেছিলাম। আমি তার বদ চরিত্র সম্পর্কে জানার পরেও আমার প্রতি তার বিশ্বস্ততায় বিশ্বাস করেছিলাম। তাকে শোধরাতে গিয়ে আমি নিজেকেই প্রায় ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি সহৃদয় বন্ধুদের সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করিনি। তার প্রতি মোহ আমাকে পুরোপুরি অন্ধ করে ফেলেছিল।

নতুন পাচকটি না এলে সত্য ঘটনা আমি কখনোই জানতে পারতাম না এবং আমি তখন যে নিরাসক্ত জীবন যাপন শুরু করেছিলাম ঐ সঙ্গীটির প্রভাবে হয়তো তা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। তার পেছনে শুধু শুধু সময় নষ্ট করা হতো। আমাকে অন্ধকারে রাখার এবং বিপথে চালানোর ক্ষমতা তার ছিল। কিন্তু আগের মতোই ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার করলেন। আমার উদ্দেশ্য ছিল সৎ, তাই আমার ভ্রান্তি সত্ত্বেও রক্ষা পেলাম এবং জীবনের প্রথম দিককার এ অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে আমার জন্য সতর্ককারী হয়ে রইল।

পাচকটি যেন আমার নিকট স্বর্গ থেকে প্রেরিত দেবদূত স্বরূপ। সে রান্না জানত না এবং পাচক হিসেবে আমার বাড়িতে থাকতে পারত না। কিন্তু সে ছাড়া আর কেউ আমার চোখ খুলে দিতে পারত না। পরে জেনেছিলাম, আমার ঘরে মেয়েমানুষ নিয়ে আসার ঘটনা এটাই প্রথম ছিল না। সে প্রায়ই আসত, কিন্তু তা বলে দেয়ার ব্যাপারে নতুন পাচকের মতো সাহস কারো ছিল না। কারণ প্রত্যেকেই জানত যে আমি আমার সঙ্গীটিকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করি। নতুন পাচকটিকে শুধুমাত্র এ কাজটি করার জন্যই যেন পাঠানো হয়েছিল, কারণ সে মুহূর্তেই সে চলে যাবার অনুমতি চেয়েছিল। সে বলল, "আমি আপনার বাসায় থাকতে পারব না, আপনাকে অতি সহজে বিপথে চালানো যায়। আমার জন্য এটা উপযুক্ত স্থান নয়।" আমি তাকে যাবার অনুমতি দিলাম।

শীগগীরই বুঝতে পারলাম আমার অফিসের কেরানীর বিরুদ্ধে এই সঙ্গীটিই আমার কান ভারী করেছিল। অফিসের কেরানীর প্রতি যে অন্যায় করেছিলাম তার প্রতিকার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাকে আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারিনি, এটা আমার চিরদিনের দুঃখ হয়ে রইল। যেভাবেই মেরামত করা হোক না কেন, ভাঙা কাঁচ ভাঙাই থেকে যায়।

www.pathagar.com

চব্বিশ

স্বদেশের পথে

দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার অবস্থান তিন বছর হয়ে এলো। এখানকার লোকদের সম্পর্কে আমি জেনেছি, তারাও আমার সম্পর্কে জেনেছে। ১৮৯৬ সালে ছয় মাসের জন্য আমি দেশে যাবার অনুমতি চাইলাম। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘদিন থাকার অভিপ্রায় ছিল। আমার আইন ব্যবসায়ে মোটামুটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলাম এবং সেখানকার লোকজনও আমার উপস্থিতির প্রয়োজন বোধ করছিল। সুতরাং আমি স্থির করলাম দেশে যাব, স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ফিরে আসব এবং এখানেই বসতি স্থাপন করব। আমি আরো ভাবলাম যে, দেশে গেলে সেখানেও দক্ষিণ আফ্রিকাতে অবস্থানকারী ভারতীয়দের সম্পর্কে জনমত গঠন ও তাদের সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির মাধ্যমে আমার জনসেবার কাজ চালিয়ে যেতে পারব। তিন পাউন্ড ট্যাক্স একটা কাটা ঘা এর মতো হয়ে রয়েছে। এটা বাতিল না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না।

কিন্তু আমার অনুপস্থিতিতে কংগ্রেসের কাজের এবং শিক্ষা সমিতির দায়িত্ব কে নেবে? আমি দু'জনের কথা ভাবলাম—আদমজী মিয়াখান ও পার্সী রুস্তমজী। বণিক শ্রেণীর মধ্য থেকে এখন অনেক কর্মী পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তাদের মধ্যে এ দু'জনই এমন ব্যক্তি যারা সেক্রেটারীর নিয়মিত কাজের দায়িত্ব নিতে পারে এবং যাদের প্রতি ভারতীয় সম্প্রদায়ের আস্থাও আছে। সেক্রেটারীর অবশ্যই কাজ চালিয়ে নেয়ার মতো ইংরেজি ভাষাজ্ঞান থাকতে হবে। আমি কংগ্রেসে প্রয়াত আদমজী মিয়াখানের নাম সুপারিশ করলাম এবং সেক্রেটারী হিসেবে কংগ্রেস তার নিয়োগ অনুমোদন করল। পরবর্তী অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হলো যে আমার বাছাই অত্যন্ত সঠিক ছিল। আদমজী মিয়াখান তার অধ্যবসায়, উদারতা, অমায়িক ব্যবহার ও শিষ্টাচার দ্বারা সবাইকে সন্তুষ্ট করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যারিস্টারের ডিগ্রীধারী বা ইংরেজিতে উচ্চ শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন হয় না।

১৮৯৬ এর মাঝামাঝি কোলকাতাগামী এস. এস. পংগোলা জাহাজে আমি স্বদেশ যাত্রা করলাম। জাহাজের যাত্রীসংখ্যা ছিল খুবই কম। তাদের মধ্যে দু'জন ইংরেজ অফিসার ছিলেন যাদের সাথে আমার সখ্যতা গড়ে উঠল। তাদের একজনের সাথে আমি প্রতিদিন এক ঘন্টা করে দাবা খেলতাম। জাহাজের ডাক্তার আমাকে "নিজে নিজে তামিল শিক্ষা" নামে একটা বই দিলেন যেটা আমি পড়া শুরু করে দিলাম। নাটালে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলাম যে, মুসলমানদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে গেলে আমাকে উর্দু ভাষা আয়ত্ত করতে হবে এবং মাদ্রাজী ভারতীয়দের নিবিড় সান্নিধ্য লাভের জন্য তামিল ভাষা শিখতে হবে।

ইংরেজ বন্ধুটিও আমার সাথে উর্দু শিখত। তার অনুরোধে ডেক যাত্রীদের মধ্যে থেকে একজন ভালো উর্দুজানা মুন্সীকে খুঁজে বের করলাম এবং আমাদের

www.pathagar.com

পড়ায় চমৎকার অগ্রগতি হলো। ঐ অফিসারের স্মৃতিশক্তি আমার চেয়ে ভালো ছিল। একটা শব্দ একবার দেখার পরে তিনি তা কখনো ভুলতেন না। উর্দু অক্ষর মনে রাখা আমার পক্ষে কঠিন হতো। আমি আরো চেষ্টা করতে থাকলাম, কিন্তু ঐ অফিসারকে কখনো ছাড়িয়ে যেতে পারিনি।

তামিল ভাষায় আমি মোটামুটি ভালো করলাম। সাহায্য করার কেউ ছিল না, কিন্তু নিজে নিজে তামিল শিক্ষা বইটি ভালো করে লেখা এবং বাইরের সাহায্যের তেমন প্রয়োজনবোধ হয়নি।

আশা করেছিলাম ভারতে পৌছার পরেও এ পড়াশুনা চালিয়ে যাব, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। ১৮৮৩ সাল থেকে আমার অধিকাংশ পড়াশুনা হয়েছে কারাগারে বসে। কারাগারে বসেই আমি কিছুটা তামিল ও উর্দু শিখেছিলাম—দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে তামিল আর ইয়েরাভদা জেলে উর্দু। কিন্তু তামিল ভাষায় কথা বলা শিখতে পারিনি এবং পড়ে পড়ে যেটুকু শিখেছিলাম চর্চার অভাবে তাও মরচে ধরে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

তামিল বা তেলেগু ভাষায় অজ্ঞতা যে কত বড় বাধা আমি আজো তা অনুভব করি। দক্ষিণ আফ্রিকার দ্রাবিড়েরা আমার প্রতি যে স্নেহ বর্ষণ করেছে তা আমার সুখস্মৃতি হয়ে রয়েছে। যখনই কোনো তামিল বা তেলেগুকে দেখি তখনই মনে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের স্বদেশীদের অনেকেই কি বিশ্বস্ততা, অধ্যবসায় আর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তারা সবাই প্রায় অশিক্ষিত। দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রাম ছিল এদের জন্যেই এবং অশিক্ষিত সৈনিকেরাই সে সংগ্রাম করেছে। এ সংগ্রাম ছিল দরিদ্রদের জন্য এবং তারাই এতে পূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিল। এসব সহজ সরল স্বদেশীদের হৃদয় জয় করতে তাদের ভাষার অজ্ঞতা আমার জন্য বাধা হয়নি। তারা ভাঙা ভাঙা ইংরেজি বা হিন্দি বলত এবং তাতে আমাদের কাজ এগিয়ে নিতে কোনো অসুবিধা হয়নি। আমি তাদের ভালোবাসার প্রতিদান দেয়ার জন্য তামিল বা তেলেগু শিখতে চেয়েছিলাম। আগেই উল্লেখ করেছি তামিল ভাষা কিছুটা রপ্ত করতে পেরেছিলাম, কিন্তু ভারতে আসার পরে তেলেগু শেখার চেষ্টা অক্ষর চেনার বেশি এগোয়নি। আমার আশংকা হচ্ছে যে এসব ভাষা আমি কখনো শিখতে পারব না। এজন্য আশা করছি যে দ্রাবিড়রা হিন্দী শিখবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের মধ্যে যারা ইংরেজি বলতে পারে না তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হিন্দী বা হিন্দুস্থানী বলে। যারা ইংরেজি বলতে পারে তারাই কেবল হিন্দী শিখতে চায় না। ইংরেজি জানাটা যেন আমাদের নিজ ভাষা শিক্ষার অন্তরায়!

কিন্তু আমি অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছি। আমার যাত্রাপথের বর্ণনা আগে শেষ করি। পাঠকদের সাথে এস. এস. পংগোলা জাহাজের ক্যাপ্টেনের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। আমরা বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম। এই ক্যাপ্টেন ছিলেন একজন প্লিমাউথ ব্রাদার। আমাদের বেশিরভাগ আলোচনা ছিল সামুদ্রিক বিষয়ের চেয়ে আধ্যাত্মিক বিষয়ের ওপর। তিনি নৈতিকতা ও বিশ্বাসের মধ্যে একটা রেখা টেনে দিতেন।

www.pathagar.com

বাইবেলের শিক্ষা তার কাছে ছেলেখেলা মনে হতো। সরলতার মধ্যেই এর সৌন্দর্য নিহিত। তিনি বলতেন, যে সকল নারী-পুরুষ ও শিশুরা যীশুখৃষ্ট ও তাঁর আত্মত্যাগে বিশ্বাস করবে নিশ্চিতভাবেই তাদের পাপ মোচন হবে। এ বন্ধু প্রিটোরিয়াতে আমার প্লিমাউথ ব্রাদারের স্মৃতি মনে করিয়ে দিল। তার মতে যে ধর্ম নৈতিকতার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে তা ভালো হতে পারে না। আমার নিরামিষ ভোজন তার আলোচনার সবটাই জুড়ে থাকত। আমি কেন মাংস বা গোমাংস খাই না? ঈশ্বর কি মানব জাতির ভোগের জন্যই নিম্নজাতের সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ জগত সৃষ্টি করেননি? এসব প্রশ্ন অবধারিতভাবে আমাদেরকে ধর্মীয় আলোচনায় টেনে নিয়ে যেতো।

আমরা একে অন্যকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারতাম না। আমি আমার মতে অনড় থাকতাম যে ধর্ম ও নৈতিকতা সমার্থক। এর বিপরীত বিশ্বাসের নির্ভুলতা সম্পর্কে ক্যাপ্টেনের মনেও কোনো সন্দেহ ছিল না।

২৪ দিনের মাথায় আমাদের আনন্দ ভ্রমণের শেষ হলো এবং হুগলীর সৌন্দর্যের প্রশংসা করে আমি কলকাতা বন্দরে নামলাম। ঐ দিনই আমি বোম্বের উদ্দেশে ট্রেনে চড়লাম।

পঁচিশ
ভারতে

বোম্বের পথে এলাহাবাদে ৪৫ মিনিটের জন্য ট্রেন থামল। এ সময়ে আমি শহরের মধ্যে ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। ওষুধের দোকান থেকে কিছু ওষুধও কেনার ছিল। ওষুধের দোকানী ছিল তন্দ্রাচ্ছন্ন এবং ওষুধ বের করে দিতে অস্বাভাবিক সময় নিল। এর ফলে যখন আমি স্টেশনে এসে পৌঁছলাম, ততক্ষণে ট্রেনটি ছেড়ে দিয়েছে। স্টেশন মাস্টার দয়া করে আমার জন্য ট্রেন এক মিনিট বিলম্ব করিয়েছিলেন, কিন্তু আমাকে না দেখে সতর্কতার সাথে আমার লাগেজ ট্রেন থেকে নামিয়ে রেখেছেন। আমি কেলনার-এ একটা রুম নিলাম এবং তৎক্ষণাৎ সেখানেই কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত "দি পাইওনিয়ার" পত্রিকার কথা অনেক শুনেছি এবং আমার ধারণা হয়েছিল যে এটা ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধী। যতদূর মনে পড়ে ঐ সময়ে মি. চেসনি জুনিয়র এটার সম্পাদক ছিলেন। আমি সকল দলের সাহায্য-সমর্থন আদায় করতে চাই। তাই আমার ট্রেন মিস করার বর্ণনা দিয়ে এবং তার সাথে সাক্ষাতের সময় চেয়ে মি. চেসনিকে একটা নোট পাঠালাম যাতে করে আমি কাজ সেরে আগামীকালই চলে যেতে পারি।

তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে সময় দিলেন যার জন্য আমি খুব খুশী হলাম, বিশেষত যখন দেখলাম যে তিনি আমার কথা ধৈর্য সহকারে শুনছেন। তিনি কথা দিলেন, আমি যদি কিছু লিখি তিনি তার পত্রিকায় তা প্রচার করবেন। কিন্তু এটাও বললেন যে তিনি ভারতীয়দের সকল দাবি সমর্থন করবেন এমন প্রতিশ্রুতি দিতে

www.pathagar.com

পারছেন না, কারণ ঔপনিবেশিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত বোঝার এবং তার ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপের বাধ্যবাধকতা রয়েছে তার।

আমি বললাম, "আপনি বিষয়গুলো পড়ে দেখবেন এবং আপনার পত্রিকায় তার ওপর আলোচনা ছাপাবেন—এটাই যথেষ্ট। আমাদের প্রাপ্য ন্যূনতম ন্যায় বিচার ছাড়া আমার চাওয়ার আর কিছু নেই।"

দিনের বাকি সময় কাটালাম তিন নদীর সংগমস্থল ত্রিবেণী দর্শনে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে।

দি পাইওনিয়ার পত্রিকার সম্পাদকের সাথে এ অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎকার অনেকগুলো ঘটনার ভিত্তি স্থাপন করল যার পরিণামে নাটালে আমাকে বিনা বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল।

বোম্বেতে যাত্রাবিরতি না করে আমি সরাসরি রাজকোট গেলাম এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রচার পুস্তিকা লেখার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। পুস্তিকাটি লিখতে ও ছাপাতে প্রায় এক মাস লাগল। এর মলাট ছিল সবুজ এবং পরবর্তীতে এটা "গ্রীন প্যাম্পলেট" বলে খ্যাতি পেয়েছিল। এতে আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অবস্থা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই কিছুটা রেখে ঢেকে বর্ণনা করলাম। অতীতের আরো দুটো প্যাম্পলেটের চেয়ে এতে আরো নমনীয় ভাষা ব্যবহার করলাম, কারণ আমি জানি দূর থেকে শোনা কথা আসল ঘটনার চেয়ে বড় করে প্রচার করা হয়।

পুস্তিকাটির দশ হাজার কপি ছাপা হলো এবং তা ভারতের সকল পত্রিকা ও দলের নেতাদের কাছে পাঠানো হলো। "দি পাইওনিয়ার" সর্বপ্রথম এর ওপর সম্পাদকীয় প্রকাশ করল। লেখাটির সারাংশ রয়টার টেলিগ্রাম করে ইংল্যান্ডে পাঠাল এবং ঐ সারাংশের সংক্ষিপ্তসার রয়টারের লন্ডন অফিস টেলিগ্রাম করে নাটালে পাঠাল। এ টেলিগ্রামটি ছাপার অক্ষরে তিন লাইনের বেশি ছিল না। নাটালে ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারের যে চিত্র আমি তুলে ধরেছি এটা ছিল তার অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু অতিরঞ্জিত সংস্করণ এবং এর কথাগুলো আমার লেখায় ছিল না। নাটালে এর প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল তা আমরা পরে দেখব। ইত্যবসরে প্রতিটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা এ বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য ছাপাল।

প্যাম্পলেটগুলো ডাকযোগে প্রেরণের জন্য প্রস্তুত করা ছোটখাটো কাজ নয়। এগুলোর মোড়ক (এনভেলাপ) তৈরির জন্য পয়সা দিতে হলেও তা বেশ ব্যয়বহুল হতো। আমি এর চেয়ে অনেক সোজা পথ বের করলাম। আমার এলাকার সব বালকদের একত্র করে যেদিন তাদের স্কুল বন্ধ সেদিন সকাল বেলা দু' থেকে তিন ঘন্টা স্বেচ্ছা শ্রম দিতে বললাম। এতে তারা সানন্দে রাজি হলো। আমি তাদেরকে আশীর্বাদ করব বলে প্রতিশ্রুতি দিলাম এবং পুরস্কার হিসেবে আমার সংগ্রহ থেকে ব্যবহৃত ডাকটিকেট বিতরণ করলাম। তৎক্ষণাৎ তারা কাজ শেষ করে ফেলল। শিশুদেরকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজে লাগানোর অভিজ্ঞতা আমার এটাই প্রথম। সেদিনের সেই ছোট্ট বন্ধুদের দু'জন আজ আমার সহকর্মী।

www.pathagar.com

এ সময়ে বোম্বেতে প্লেগ দেখা দিল এবং চারিদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। রাজকোটেও মহামারীর আতঙ্ক দেখা দিল। আমি জনস্বাস্থ্য বিভাগের কাজে কিছুটা সাহায্য করতে পারি বলে মনে হলো এবং আমি রাষ্ট্রের সেবা করার প্রস্তাব দিলাম। আমার প্রস্তাব গৃহীত হলো এবং পরিচ্ছন্নতা তদারকির কমিটিতে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। পায়খানাগুলো পরিষ্কার রাখার ওপর আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলাম এবং কমিটি প্রতিটি মহল্লায় পায়খানা পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নিল। দরিদ্র লোকেরা তাদের পায়খানা পরিদর্শন করতে দিতে আপত্তি করল না। তদুপরি তাদেরকে পায়খানা উন্নত করার যে পরামর্শ দেয়া হলো তা তারা পালন করল। কিন্তু যখন আমরা উচ্চ শ্রেণীর লোকদের বাড়িতে পরিদর্শনের জন্য গেলাম, আমাদের পরামর্শ শোনা তো দূরের কথা, তাদের কেউ কেউ আমাদেরকে বাড়ির ভেতর প্রবেশ করতে দিতেও অস্বীকার করল। আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা হলো যে, ধনী লোকদের পায়খানা বেশি অপরিষ্কার। তাদের পায়খানা অন্ধকার, দুর্গন্ধময়, মলমূত্র ও পোকায় ভরপুর। এগুলোর উন্নতির জন্য আমরা যে পরামর্শ দিয়েছিলাম তা অতি সহজ অর্থাৎ পায়খানার নিচে একটা বালতি ব্যবহার করা যাতে মল মাটিতে না পড়ে বালতিতে জমা হয়, প্রস্রাবও মাটিতে না ফেলে বালতিতে জমা করা এবং পায়খানার নিচের অংশের বহির্দেয়াল ভেঙে দেয়া যাতে আলো বাতাস বেশি প্রবেশ করতে পারে এবং মেথর পায়খানা ভালোভাবে পরিষ্কার করতে পারে। দেয়াল ভাঙার পরামর্শে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা অসংখ্য আপত্তি জানাল এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ পালিত হলো না।

কমিটিকে অস্পৃশ্যদের বাসস্থানও পরিদর্শন করতে হয়েছিল। কমিটির মাত্র একজন সদস্য আমার সাথে সেখানে যেতে রাজি হলেন। অন্যদের মতে অস্পৃশ্যদের পায়খানা পরিদর্শন তো দূরের কথা, তাদের কোয়ার্টার পরিদর্শন করাও অযৌক্তিক। কিন্তু আমার মতে তাদের কোয়ার্টারগুলো অবাক করার মতো। এরকম স্থানে গমন আমার জীবনে এই প্রথম। সেখানকার নারী-পুরুষেরা আমাদের দেখে অবাক হলো। তাদের পায়খানা আমাদেরকে পরিদর্শন করতে দিতে বললাম।

তারা অবাক হয়ে বলল, "আমাদের জন্য পায়খানা! আমরা বাইরে গিয়ে খোলা মাঠে আমাদের কাজ সারি। পায়খানা তো আপনাদের মতো বড়লোকদের জন্য।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ঠিক আছে। তাহলে আমরা যদি তোমাদের বাড়িঘর পরিদর্শন করি তাতে তোমাদের আপত্তি আছে?"

"আপনাদেরকে আনন্দের সাথে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের ঘরবাড়ির প্রতিটা আনাচে কানাচে দেখতে পারেন। আমাদের তো বাড়িঘর নয়, খোঁয়াড় মাত্র।"

আমি ভেতরে গেলাম এবং দেখে খুশী হলাম যে ভেতরটা বাইরের মতোই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। প্রবেশপথ ভালো করে ঝাড়ু দেয়া, মেঝে সুন্দর করে গোবর দিয়ে নিকানো এবং অল্প কয়েকটি বাসন কোসন পরিষ্কার ঝকঝকে। এখানে প্লেগ দেখা দেয়ার কোনো ভয় নেই।

www.pathagar.com

উচ্চ শ্রেণীর একজনের বাড়িতে দেখা একটি পায়খানার কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা না দিয়ে পারছি না। প্রতিটা রুমেই পানি নিষ্কাশনের নালা ছিল যা পানি ও পেশাব নির্গমনের জন্য ব্যবহৃত হতো, যার ফলে সারা ঘরই দুর্গন্ধে ভরে যেত। একটা বাড়িতে ওপর তলায় পানি নিষ্কাশনের নালাসহ বেডরুম ছিল। ঐ নালাটি পায়খানা ও প্রশাবখানা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। ঐ নালার সাথে যুক্ত পাইপটি নিচুতলার রুমে নেমে এসেছিল। এ রুমটিতে দুর্গন্ধে ঢোকা যাচ্ছিল না। এ ঘরের বাসিন্দারা কিভাবে এখানে ঘুমাত তা পাঠকরা অনুমান করুন।

কমিটি বৈষ্ণবদের হাভেলীও পরিদর্শন করল। হাভেলীর পরিচালক পুরোহিত আমাদের পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং তিনি সবকিছু দেখার অনুমতি দিলেন এবং আমরা এর উন্নতির পরামর্শ দিলাম। হাভেলীর আঙিনায় একটি অংশ ছিল যা তিনি আগে কখনো দেখেননি। এ স্থানে খাবার প্লেট হিসেবে ব্যবহৃত পাতা ও আবর্জনা দেয়ালের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হতো। এটা ছিল কাক-চিলের বিচরণ ভূমি। পায়খানাগুলো অপরিষ্কার ছিল। পুরোহিত আমাদের পরামর্শ কতটা বাস্তবায়ন করেছিলেন তা দেখতে পারিনি, কারণ আমি রাজকোটে বেশিদিন ছিলাম না।

একটা প্রার্থনাস্থলের এত বেশি অপরিচ্ছন্নতা দেখে আমি ব্যথিত হলাম। যে জায়গাটাকে পবিত্র বলে গণ্য করা হয় সেখানে পয় নিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি সতর্কভাবে পালিত হবে এটাই প্রত্যাশিত। বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ "স্মৃতি"র লেখকগণ আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ছাব্বিশ
দুটি বিষয়ের প্রতি অনুরাগ

বৃটিশ সংবিধানের প্রতি আমার যতটা আনুগত্য ছিল অতটা আর কারো ছিল বলে আমার জানা নেই। এখন আমি বুঝতে পারি যে আমার এ আনুগত্যের মূলে ছিল সত্যের প্রতি ভালোবাসা। আনুগত্য বা অন্য কোনো গুণকে উদ্দীপিত করা আমার পক্ষে কখনো সম্ভব হয়নি। নাটালে আমি যতগুলি সভায় যোগদান করেছি তার সবখানেই জাতীয় সংগীত গাওয়া হতো। আমি অনুভব করতাম আমারও সবার সাথে জাতীয় সংগীত গাওয়া উচিত। বৃটিশ শাসনের ত্রুটি সম্পর্কে আমি অজ্ঞ ছিলাম তা নয়। তবে মোটের ওপর তা গ্রহণযোগ্য ছিল। সেই সময়ে আমি বিশ্বাস করতাম যে মোটের ওপর বৃটিশ শাসন শাসিতদের জন্য উপকারীই ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যে বর্ণবিদ্বেষ দেখেছি তা বৃটিশ ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং আমি বিশ্বাস করতাম যে এটা সাময়িক ও স্থান বিশেষে সীমাবদ্ধ। সুতরাং আমি বৃটিশ সিংহাসনের প্রতি আনুগত্যে ইংরেজদের সাথে প্রতিযোগিতা করতাম। সযত্ন অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আমি জাতীয় সংগীতের সুর রপ্ত করলাম এবং যখনই

www.pathagar.com

এটা গাওয়া হতো আমি তাতে যোগ দিতাম। যখনই কোনো হৈচৈ বা জাঁকজমক ছাড়া আনুগত্য প্রকাশের সুযোগ আসত তৎক্ষণাৎ আমি তাতে অংশ নিতাম।

আমার জীবনে কখনো এ আনুগত্যের বিনিময়ে কোনো সুবিধা নেইনি এবং এর দ্বারা কখনো ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করিনি। আমার জন্য এটা ছিল এক প্রকার বাধ্যবাধকতা এবং কোনো পুরস্কারের আশা না করেই আমি তা পালন করেছি।

আমি যখন ভারতে পৌঁছলাম তখন রানী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তী পালনের প্রস্তুতি চলছিল। এ উদ্দেশে রাজকোটে গঠিত কমিটিতে যোগ দিতে আমাকে আমন্ত্রণ করা হলো। আমি আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম, কিন্তু সন্দেহ হলো যে উৎসবটা হবে মোটামুটি লোক দেখানো। আমি অহেতুক আড়ম্বর দেখে বেশ ব্যথিত হলাম। নিজেকে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম এ কমিটিতে থাকব কিনা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শান্ত থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং নিজের দায়িত্বটুকু কেবল পালন করে গেলাম।

কর্মসূচীর প্রস্তাবগুলোর মধ্যে একটি ছিল বৃক্ষ রোপণ। দেখলাম, অনেকেই এটা করল লোক দেখানো এবং অফিসারদের সন্তুষ্ট করার জন্য। আমি তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে বৃক্ষ রোপণ বাধ্যতামূলক নয় বরং একটা পরামর্শ মাত্র। এটা করলে গুরুত্ব সহকারে করতে হবে, না করলে একেবারেই নয়। আমার ধারণা হলো তারা আমার কথায় হাসাহাসি করল। আমার মনে আছে রোপণ করার জন্য আমাকে যে গাছ দেয়া হয়েছিল আমি তা আন্তরিকভাবে লাগিয়েছি, পানি সেচ দিয়েছি এবং যত্ন নিয়েছি।

একই রকম আন্তরিকতার সাথে আমি আমার পরিবারের শিশুদেরকে জাতীয় সংগীত শিক্ষা দিয়েছি। মনে পড়ে আমি স্থানীয় ট্রেনিং কলেজের ছাত্রদেরকেও জাতীয় সংগীত শিক্ষা দিয়েছি, কিন্তু সেটা রানীর হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে নাকি রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের ভারত সম্রাট হিসেবে অভিষেক উপলক্ষে তা ভুলে গেছি। পরবর্তীতে জাতীয় সংগীতের কথাগুলো আমার কাছে বেমানান মনে হতে লাগল। অহিংসা সম্পর্কে আমার ধারণা পরিপক্ব হওয়ার সাথে সাথে আমার চিন্তা ও বক্তব্যের বিষয়ে আমি আরো সতর্ক হলাম। বিশেষ করে জাতীয় সংগীতের এ লাইনগুলো আমার অহিংস নীতির ভাবাদর্শের সাথে বেমানান মনে হয়েছিল—

শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করে দাও, ওদেরকে পরাজিত কর,
ওদের কূট-কৌশল ব্যর্থ কর, ওদের প্রতারণা ব্যর্থ কর।

আমি ড. বুথের সাথে একমত যে অহিংসায় বিশ্বাসী কারো পক্ষে এ লাইনগুলো গাওয়া মানায় না। আমরা কিভাবে কল্পনা করছি যে আমাদের তথাকথিত শত্রু প্রতারক? আর আমাদের শত্রু বলেই কি তারা ভুল পথে আছে বলে ধরে নিতে হবে? আমরা কেবল ঈশ্বরের কাছে ন্যায় বিচার চাইতে পারি। ড. বুথ আমার এ ভাবাবেগকে পুরোপুরি সমর্থন করলেন এবং তার ভক্তদের জন্য একটি নতুন সংগীত রচনা করলেন। কিন্তু ড. বুথের সম্পর্কে পরে আরো লিখব।

www.pathagar.com

আনুগত্যের মতো সেবা করার প্রবণতাও আমার স্বভাবে গভীরভাবে প্রোথিত ছিল। মানুষের সেবা করা, সে বন্ধুরই হোক বা আগন্তুকেরই হোক, তা ছিল আমার অতি প্রিয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর প্যাম্পলেট নিয়ে ব্যস্ত থাকাকালে বোম্বেতে একবার ঝটিকা সফর করতে হয়েছিল। আমার উদ্দেশ্য ছিল বড় শহরগুলোতে জনসভা অনুষ্ঠান করে জনমত সংগঠিত করা এবং প্রথমেই বোম্বে নগরীকে বেছে নিলাম। সর্বপ্রথম আমি বিচারপতি রানাডের সাথে দেখা করলাম। তিনি আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন এবং স্যার ফিরোজশাহ মেহতার সাথে দেখা করতে বললেন। এর পর আমি বিচারপতি বদরুদ্দিন তৈয়বজীর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনিও একই পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, "বিচারপতি রানাডে ও আমি তোমাকে খুব একটা সাহায্য করতে পারব না, কারণ তুমি আমাদের অবস্থান জান। জনসাধারণের বিষয়ে আমরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারি না। কিন্তু তোমার প্রতি আমার সহানুভূতি রইল। যিনি তোমাকে কার্যকর দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন তিনি হলেন স্যার ফিরোজশাহ মেহতা।"

আমি স্যার ফিরোজশাহর সাথে দেখা করতে চাইলাম। এসব সিনিয়র ব্যক্তিরা তাঁর পরামর্শ মতো কাজ করার জন্য যেভাবে উপদেশ দিলেন তা থেকে বুঝতে পারলাম জনগণের ওপর স্যার ফিরোজশাহর প্রভাব কত প্রবল। যথাসময়ে আমি তাঁর সাথে দেখা করলাম। তাঁর উপস্থিতিতে আতঙ্কিত হবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। তিনি যেসব জনপ্রিয় খেতাব অর্জন করেছিলেন তা আমি শুনেছিলাম এবং আমি জানতাম যে যাঁর সাথে দেখা করতে যাচ্ছি তিনি "বোম্বের সিংহ", "প্রেসিডেন্সির মুকুটহীন রাজা"। কিন্তু রাজা আমাকে পরাজিত করলেন না। একজন স্নেহময় পিতা তার প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের সাথে যেভাবে দেখা করে, তিনি আমার সাথে সেভাবেই দেখা করলেন। তাঁর চেম্বারে আমাদের দেখা হলো। তিনি বন্ধু ও অনুসারী পরিবেষ্টিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মি. ডি. ই. ওয়াচা ও মি. ক্যামার তাঁর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইতিপূর্বেই আমি মি. ওয়াচার কথা শুনেছি। তাঁকে স্যার ফিরোজশাহর ডানহাত বলে গণ্য করা হতো এবং শ্রীযুক্ত বীরচাঁদ গান্ধী আমাকে বলেছিলেন তিনি একজন বড় পরিসংখ্যানবিদ। মি. ওয়াচা বললেন, "মি. গান্ধী, ভবিষ্যতে অবশ্যই আমাদের দেখা হবে।"

পরিচয় পর্ব শেষ হতে দু'মিনিটের বেশি লাগল না। স্যার ফিরোজশাহ সতর্কতার সাথে আমার বক্তব্য শুনলেন। তাঁকে বললাম আমি বিচারপতি রানাডে ও তৈয়বজীর সাথে দেখা করেছি। তিনি বললেন, "গান্ধী, আমি তোমাকে সাহায্য করব। আমি এখানে একটা জনসভা আহ্বান করব।" একথা বলে তিনি তাঁর সেক্রেটারী মি. মুনশীর দিকে তাকালেন এবং তাকে সভার তারিখ নির্ধারণ করতে বললেন। তারিখ নির্ধারণ হলো এবং সভার আগের দিন আবার তাঁর সাথে দেখা করতে বলে আমাকে বিদায় দিলেন। এ সাক্ষাৎকার আমার ভীতি দূর করল এবং আমি সানন্দ চিত্তে বাড়ি ফিরলাম।

www.pathagar.com

বোম্বেতে এ যাত্রায় আমার অবস্থানকালে আমার ভগ্নিপতির সাথে দেখা করলাম। সে অসুস্থ হয়ে এখানে অবস্থান করছিল। তার আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না আর আমার বোন (তার স্ত্রী) তার সঠিক সেবাও করতে পারছিল না। অসুখটা ছিল গুরুতর। আমি তাকে রাজকোটে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলাম। সে রাজি হলো এবং আমি বোন-ভগ্নিপতিকে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। তার অসুস্থতা আমি যতটা ধারণা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘায়িত হলো। ভগ্নিপতিকে আমি আমার রুমে রাখলাম এবং রাত-দিন তার পাশে থাকলাম। বাধ্য হয়ে রাতের একটা অংশ জেগে থাকতাম এবং তার সেবা করার ফাঁকে ফাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকা সংক্রান্ত কিছু কাজ সেরে নিতাম। অবশেষে রুগী মারা গেল। কিন্তু আমার সান্ত্বনা ছিল এই যে তার শেষ দিনগুলোতে আমি তার সেবা করার সুযোগ পেয়েছি।

আমার সেবা করার প্রবণতা ক্রমশ তীব্রতর হলো এবং তা এতটাই বেড়ে গেল যে আমি প্রায়ই কাজে অবহেলা করতে থাকলাম এবং কোনো কোনো সময় আমি আমার স্ত্রীকে শুধু নয়, পুরো পরিবারকেই এ ধরনের কাজে লাগাতাম।

এ ধরনের সেবার মধ্যে মানুষ আনন্দ না পেলে তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। যখন লোক দেখানোর জন্য বা লোকের সমালোচনার ভয়ে সেবা করা হয় তখন সেবাকারী চমক সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু তার আত্মা মরে যায়। যে সেবার মধ্যে আনন্দ থাকে না তা সেবক ও সেবিতের কোনো উপকারে আসে না। আনন্দ-উদ্দীপনা নিয়ে যে সেবা করা হয় তার সামনে অন্য সব আনন্দ ও সম্পদ বিবর্ণ হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়।

সাতাশ
বোম্বের জনসভা

ভগ্নিপতির মৃত্যুর পরদিনই আমাকে বোম্বে যেতে হলো জনসভার জন্য। আমার বক্তৃতার বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার সময়ও ছিল না। উদ্বিগ্ন অবস্থায় রাত দিন জেগে থাকার ফলে ক্লান্তিবোধ করছিলাম এবং আমার গলাও ভেঙে গিয়েছিল। যাহোক, এ অবস্থাতেই কেবল ঈশ্বরের ওপর ভরসা করে বোম্বে গেলাম। বক্তৃতা লিখে নিতে হবে এটা কখনো ভাবিনি।

স্যার ফিরোজশাহর নির্দেশ মতো আমি সভার আগের দিন বিকেল ৫ টায় তাঁর অফিসে হাজির হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "গান্ধী, তোমার বক্তৃতা তৈরি হয়েছে?"

আমি ভয়ে কম্পমান অবস্থায় বললাম, "না স্যার, আমি ভাবছি উপস্থিত বক্তৃতা করব।"

"বোম্বেতে সেটা চলবে না। আমরা যদি এ মিটিং থেকে সুবিধা পেতে চাই তাহলে তোমার বক্তৃতা লিখে ফেলা উচিত এবং আগামীকাল ভোর হওয়ার আগেই তা ছাপা হওয়া চাই। আশা করি তুমি তা করতে পারবে।"

www.pathagar.com

আমি খুব বিচলিত বোধ করলাম, কিন্তু বললাম আমি চেষ্টা করব।

"তাহলে বলো, মুনশী কখন তোমার কাছ থেকে বক্তৃতার খসড়া নিতে যাবে?"

আমি বললাম, "আজ রাত ১১ টায়।"

পরদিন জনসভায় উপস্থিত হয়ে আমি স্যার ফিরোজশাহ্‌র উপদেশের পিছনে তাঁর প্রজ্ঞার প্রমাণ পেলাম। স্যার কাওয়াশজী জাহাঙ্গীর ইনস্টিটিউটের হলঘরে সভা অনুষ্ঠিত হলো। আমি শুনেছিলাম যখন স্যার ফিরোজশাহ কোনো সভায় বক্তৃতা করতেন তখন হলঘর পরিপূর্ণ থাকত, বিশেষত তাঁর বক্তৃতা শুনতে আগ্রহী ছাত্রদের দ্বারা, এক ইঞ্চি জায়গাও খালি থাকত না। এ ধরনের সভায় উপস্থিত হওয়ার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। দেখতে পেলাম আমার কণ্ঠস্বর মাত্র অল্প ক'জন শুনতে পাচ্ছে। আমার বক্তৃতা পড়ার সময় আমি কাঁপছিলাম। স্যার ফিরোজশাহ অনবরত সাহস দিচ্ছিলেন এবং জোরে, আরো জোরে পড়তে বলছিলেন। আমার মনে হলো তাঁর কথায় সাহস পাওয়ার বদলে আমার গলার স্বর আরো নেমে যাচ্ছিল।

আমার পুরনো বন্ধু সার্জেন্ট কেশবরাও দেশপাণ্ডে আমাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলেন। আমার লিখিত বক্তৃতা তাকে দিলাম। তাঁর গলার স্বর ছিল সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কিন্তু শ্রোতারা শুনতে রাজি ছিল না। "ওয়াচা, ওয়াচা" চীৎকারে হলঘর মুখরিত হয়ে উঠল। সুতরাং মি. ওয়াচা উঠে দাঁড়ালেন এবং বক্তৃতাটা পড়লেন। ফলাফল হলো আশ্চর্য রকম ভালো। শ্রোতারা সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা শুনল এবং যেখানে যেমন প্রয়োজন প্রশংসা ধ্বনি বা লজ্জা বলে চীৎকার করল। আমার মন আনন্দে ভরে গেল।

স্যার ফিরোজশাহ বক্তৃতাটা পছন্দ করেছিলেন। আমি যারপরনাই খুশী হলাম। এ মিটিং এর ফলে আমি শ্রীযুক্ত দেশপাণ্ডে ও একজন পার্সী বন্ধুর (যার নাম বলতে আমি দ্বিধাবোধ করছি, কারণ তিনি আজ সরকারের উচ্চ পদে আসীন একজন কর্মকর্তা) সক্রিয় সহানুভূতি অর্জন করলাম। তারা দু'জনেই আমার সাথে দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার সংকল্প ব্যক্ত করলেন। মি. সি. এম. কুরশেটজী, যিনি তখন "স্মল কজেস কোর্ট" এর বিচারপতি ছিলেন, তিনি পার্সী বন্ধুটিকে সংকল্প থেকে বিরত করলেন, কারণ তিনি ঐ সময়ে তার বিয়ের আয়োজন করেছিলেন। তাকে বিয়ে অথবা দক্ষিণ আফ্রিকা গমন—দুটোর একটা বেছে নিতে হবে এবং তিনি প্রথমটা বেছে নিলেন। কিন্তু পার্সী রুস্তমজী এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ক্ষতি পুষিয়ে দিলেন এবং যে ভদ্রমহিলার কারণে এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়েছিল তার পক্ষ থেকে একদল পার্সী সিস্টার খাদি তৈরির কাজে আত্মনিবেদিত হয়ে ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং আমি নব দম্পতিকে সানন্দে ক্ষমা করে দিলাম। শ্রীযুক্ত দেশপাণ্ডের বিয়ে শাদীতে কোনো আগ্রহ ছিল না কিন্তু তিনিও আসতে পারলেন না। তিনি এখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ক্ষতিপূরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ফেরৎ যাবার পথে জাঞ্জিবারে তৈয়বজী পরিবারের একজনের সাথে

www.pathagar.com

দেখা হলো। তিনিও প্রতিজ্ঞা করলেন আমার কাছে আসবেন এবং সাহায্য করবেন, কিন্তু আসেননি। মি. আব্বাস তৈয়বজী তার ঐ অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করছেন। এভাবে ব্যারিস্টারদেরকে দক্ষিণ আফ্রিকা যেতে প্ররোচিত করার জন্য আমার তিন তিনটি উদ্যোগ ব্যর্থ হলো।

এ প্রসঙ্গে মি. পেস্টনজী পাদশাহ'র কথা মনে পড়ছে। ইংল্যান্ডে অবস্থানের সময় থেকে আমার সাথে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল। লন্ডনের এক নিরামিষ রেস্টুরেন্টে তার সাথে আমার প্রথম দেখা। আমি তার ভাই মি. বারযোর্শী পাদশাহ সম্পর্কে জানতাম, 'বাতিকগ্রস্ত' বলে যার খ্যাতি ছিল। আমার সাথে তার কখনো দেখা হয়নি, কিন্তু বন্ধুরা বলতেন তিনি পাগলাটে ছিলেন। ঘোড়ার প্রতি দয়ার কারণে তিনি ঘোড়ায় টানা ট্রামকারে চড়তেন না, আশ্চর্য রকমের স্মৃতিশক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি ডিগ্রী নিতে অস্বীকার করেন, তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা এবং পার্সী হয়েও নিরামিষ ভোজী। পেস্টনজীর এ ধরনের কোনো খ্যাতি ছিল না, কিন্তু খোদ লন্ডনেও বিদ্বান বলে তার খ্যাতি ছিল। আমাদের মধ্যে মিল ছিল নিরামিষ ভোজী হিসেবে, বিদ্বান হিসেবে নয়। বিদ্যার দিক দিয়ে আমি তার ধারে কাছেও না।

বোম্বেতে আমি তাকে আবার খুঁজে পেলাম। তিনি হাইকের্টে নোটারী ছিলেন। আমি যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম তখন তিনি উচ্চতর গুজরাটী অভিধান লিখতে ব্যস্ত। দক্ষিণ আফ্রিকার কাজে এমন কোনো বন্ধু নেই যার কাছে আমি সাহায্য চাইনি। যাহোক, পেস্টনজী পাদশাহ আমাকে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে না যাওয়ার জন্য আমাকে উপদেশও দিলেন।

তিনি বললেন, "তোমাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় তোমার ফিরে যাওয়াও আমার পছন্দ নয়। নিজ দেশে কি আমাদের কাজের অভাব আছে? দেখ এখানে আমাদের ভাষার জন্য কত কি করার আছে। আমি বৈজ্ঞানিক শব্দগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। কিন্তু তা এ বিশাল কাজের একটা শাখা মাত্র। এ দেশের দারিদ্র্যের কথা ভাবো। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের স্বদেশীরা কষ্টে আছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি চাই না তাদের জন্য তোমার মতো লোক জীবন উৎসর্গ করুক। তার চেয়ে এসো, এখানে আমরা স্বশাসন কায়েম করি, তাহলে সেখানে আমাদের লোকদের সহজেই সাহায্য করতে পারব। আমি জানি তুমি আমার কথায় রাজি হবে না, কিন্তু তোমার মতো আর কাউকে তার ভাগ্য তোমার সাথে জড়াতে উৎসাহিত করব না।"

তাঁর উপদেশ আমার পছন্দ হলো না, কিন্তু এতে মি. পেস্টনজী পাদশাহ'র প্রতি আমার ভক্তি বেড়ে গেল। দেশ ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁর ভালোবাসা দেখে আমি অভিভূত হলাম। এ ঘটনায় আমরা একে অন্যের আরো ঘনিষ্ঠ হলাম। আমি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারলাম। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার কাজ বন্ধ করা দূরে থাক, আমার সংকল্প আরো দৃঢ় হলো। কোনো দেশপ্রেমিক ব্যক্তি মাতৃভূমির যে

www.pathagar.com

কোনো শাখার সেবা করা থেকে বিরত থাকতে পারে না। এবং আমার জন্য পবিত্র গীতার নিম্নোক্ত বাণী আরো অর্থবহ ও জোরালো হয়ে উঠল—

সে কাজ না করাই শ্রেয়, যা নিজের নয়,
আপাতদৃষ্টে যদিও তা ভালো মনে হয়।
যার কাজ সেই করুক, সেটাই শ্রেয়তর,
নাহি ধারি সাফল্য বা ব্যর্থতার ধার।
কর্তব্য পালনে মৃত্যু, সেতো নয় অসার,
অন্যথা করিবে যে জন, ভ্রমিবে বেঘোর।

আঠাশ

পুনা ও মাদ্রাজ

স্যার ফিরোজশাহ আমার চলার পথ সহজ করে দিলেন। সুতরাং আমি বোম্বে থেকে পুনায় গেলাম। এখানে দুটো দল ছিল। আমি দল-মত নির্বিশেষে সকলের সাহায্য চাইলাম। প্রথমে আমি লোকমান্য তিলকের সাথে দেখা করলাম। তিনি বললেন—

"তুমি সকল দলের সাহায্য চাইছ, এটা ঠিকই আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রশ্নে কোনো মতভেদ থাকতে পারে না। কিন্তু নির্দলীয় কাউকে তোমার মিটিং-এ প্রেসিডেন্ট হতে হবে। অধ্যাপক ভাণ্ডারকার এর সাথে দেখা কর। সাম্প্রতিক গণআন্দোলনে তিনি কোনো দলেই থাকতে চাচ্ছেন না। তবে এই প্রশ্নে তিনি বের হয়ে আসতে পারেন। তাঁর সাথে দেখা কর এবং তিনি কি বলেন আমাকে জানাও। আমি তোমাকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করতে চাই। যখনই প্রয়োজন হবে আমার সাথে অবশ্যই দেখা করবে। আমি তোমার সাথেই আছি।"

লোকমান্য মহাশয়ের সাথে এটাই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। এ সাক্ষাতে তার অসামান্য জনপ্রিয়তার রহস্য আমার কাছে পরিষ্কার হলো।

এর পর আমি গোখলের সাথে দেখা করলাম। ফারগুসন কলেজের মাঠে আমি তাঁকে পেলাম। তিনি আমাকে সস্নেহে স্বাগত জানালেন এবং তাঁর ব্যবহার নিমেষেই আমার হৃদয় জয় করল। তাঁর সাথেও এটা আমার প্রথম সাক্ষাৎ। তা সত্ত্বেও আমার মনে হলো আমরা পুরনো বন্ধুত্ব ঝালাই করছি। আমার বিবেচনায় স্যার ফিরোজশাহর ব্যক্তিত্ব হিমালয়ের মতো, আর লোকমান্য যেন মহাসাগর। কিন্তু গোখলে গঙ্গার মতো। এ পবিত্র নদীতে স্নান করে যে কেউ পবিত্র হতে পারে। হিমালয়ে আরোহণ দুঃসাধ্য, সমুদ্রে বিচরণও সহজসাধ্য নয়, কিন্তু গঙ্গা সবাইকে তার বুকে টেনে নেয়। গঙ্গার বুকে বৈঠা হাতে নৌকায় বসে অপার আনন্দ লাভ করা যায়। গোখলে আমাকে তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন, যেমন করে স্কুলে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রকে শিক্ষক পরীক্ষা করেন। তিনি আমাকে বলে দিলেন কার কার কাছে যেতে হবে এবং কিভাবে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে

www.pathagar.com

হবে। আমার বক্তৃতাটা আরেকবার দেখে নিতে বললেন। তিনি আমাকে কলেজের ওপারে রাস্তা দেখিয়ে দিলেন, আমার সাথে সর্বদা আছেন বলে আশ্বাস দিলেন, ড. ভাণ্ডারকার এর সাথে সাক্ষাতের ফলাফল তাঁকে জানাতে বললেন এবং উৎফুল চিত্তে উৎসাহ দিয়ে আমাকে পাঠালেন। রাজনীতির অঙ্গনে আমার হৃদয়ে গোখলের স্থান তাঁর জীবৎকালে এবং এখনো সম্পূর্ণ অনন্য।

ড. ভাণ্ডারকার আমাকে পিতৃস্নেহের উষ্ণতায় বরণ করলেন। তাঁর সাথে যখন দেখা করি তখন দুপুর বেলা। এ অসময়ে আমি একের পর এক সবার সাথে দেখা করে যাচ্ছি এতে এই অক্লান্ত পণ্ডিত আমার প্রতি মুগ্ধ হলেন। মিটিং এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্দলীয় ব্যক্তিত্ব বাছাই এর প্রস্তাবে তাঁর তাৎক্ষণিক সম্মতি আছে তা প্রকাশ পেল তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত "এটাই তো চাই, এটাই তো হতে হবে" বলার মাধ্যমে।

আমার বক্তব্য শেষ পর্যন্ত শোনার পরে তিনি বললেন, "যাকেই জিজ্ঞেস কর, বলবে আমি রাজনীতি করি না। কিন্তু তোমাকে আমি ফেরাতে পারছি না। তিলক আর গোখলের সাথে আলোচনা করে তুমি ভালোই করেছ। তাঁদেরকে বলো তাঁদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সভায় আমি সানন্দে সভাপতিত্ব করতে রাজি আছি। সভার জন্য আমার কাছ থেকে সময় নেয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁরা যে সময় নির্ধারণ করবেন, তাতে আমার আপত্তি নেই।" এ কথাগুলো বলে তিনি আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে ও আশীর্বাদ করে বিদায় দিলেন।

কোনোরকম শোরগোল ছাড়াই পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিঃস্বার্থ এ কর্মীদল আড়ম্বরবিহীন একটি সভা করল এবং আমার মিশন সম্পর্কে আরো আত্মবিশ্বাস নিয়ে আনন্দের সাথে আমি ফিরে গেলাম।

এরপর আমি মাদ্রাজ গেলাম। মাদ্রাজ উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত ছিল। বালাসুন্দরমের ঘটনা সভায় প্রচণ্ড প্রভাব ফেলল। আমার বক্তৃতাটি ছিল ছাপানো এবং মোটামুটি দীর্ঘ। কিন্তু শ্রোতারা প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনল। মিটিং শেষে গ্রীন প্যাম্পলেটের চাহিদা তুঙ্গে উঠল। ছাপানো কপিগুলো হট কেকের মতো বিক্রী হয়ে গেল। আমি এর দ্বিতীয় ও সংশোধিত সংস্করণ দশ হাজার কপি বের করলাম। আমি দেখলাম, এত বেশি সংখ্যক ছাপানোর দরকার ছিল না। আমার অতি উৎসাহের কারণে চাহিদাকে বাড়িয়ে হিসেব করে ফেলেছিলাম। আমার বক্তৃতাটি ছিল ইংরেজি জানা লোকদের জন্য। মাদ্রাজে এ শ্রেণীর সব লোক মিলেও দশ হাজার কপির পুরোটা শেষ করতে পারত না।

এখানে আমি সবচেয়ে বড় সাহায্য পেয়েছিলাম "দি মাদ্রাজ স্ট্যান্ডার্ড" পত্রিকার সম্পাদক প্রয়াত শ্রীযুক্ত জি.পরমেশ্বরন পিল্লাই এর কাছ থেকে। তিনি বিষয়টি সতর্কভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। তিনি আমাকে প্রায়ই তাঁর অফিসে ডেকে দিক-নির্দেশনা দিতেন। "দি হিন্দু" পত্রিকার শ্রীযুক্ত জি. সুব্রামনিয়াম ও ড. সুব্রামনিয়াম—এঁরাও আমার প্রতি খুব সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত জি. পরমেশ্বরন পিল্লাই দি মাদ্রাজ স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার কলামগুলো

www.pathagar.com

পুরোপুরি আমার হাতে ছেড়ে দিলেন এবং আমি এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলাম। পাচাইয়াপ্পার হলে যে সভা অনুষ্ঠিত হলো, যতদূর মনে পড়ে, ড. সুব্রামনিয়াম তাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন।

আমি যাদের সাথে দেখা করেছি তারা আমার প্রতি এত বেশি স্নেহ বর্ষণ করেছেন এবং এ প্রশ্নে তাদের উৎসাহ এত প্রবল ছিল যে তাদের সাথে আমার বাক্য বিনিময় ইংরেজি ভাষায় হওয়া সত্ত্বেও আমি সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছি। ভালোবাসা অতিক্রম করতে পারে না এমন কোনো বাধা কোথাও আছে কি?

উনত্রিশ
শীঘ্র ফিরে আসো

মাদ্রাজ থেকে আমি কলকাতা গেলাম এবং এখানে বিভিন্ন সমস্যায় জড়িয়ে গেলাম। এখানে কাউকে আমি চিনি না। সুতরাং গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে একটা রুম নিলাম। এখানে "দি ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকার প্রতিনিধি মি. এলারথ্রোপের সাথে আমার পরিচয় হলো। তিনি আমাকে বেঙ্গল ক্লাবে আমন্ত্রণ জানালেন, যেখানে তিনি থাকতেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে কোনো ভারতীয়কে সঙ্গে করে ক্লাবের ড্রয়িংরুমে নেয়া যাবে না। নিষেধাজ্ঞাটা জানার পর তিনি আমাকে তার রুমে নিয়ে গেলেন। স্থানীয় ইংরেজদের এই বৈষম্যের জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং আমাকে ড্রয়িংরুমে নিতে না পারার জন্য ক্ষমা চাইলেন।

আমার অবশ্য "বাংলার বিগ্রহ" বলে খ্যাত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সাথে দেখা করার কথা। আমি যখন তাঁর সাথে দেখা করলাম তখন তিনি একদল বন্ধু পরিবেষ্টিত ছিলেন। তিনি বললেন, "আমি আশংকা করছি যে এখানকার জনগণ তোমার কাজে আগ্রহী হবে না। তুমি জান এখানে আমরা নানাবিধ সমস্যায় আছি। কিন্তু তুমি তোমার চেষ্টা চালিয়ে যাও। এখানে তোমাকে মহারাজাদের সহানুভূতি পেতে হবে। মনে রেখো, বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সাথে তুমি সাক্ষাৎ করবে। রাজা স্যার পিয়ারী মোহন মুখার্জী ও মহারাজা ঠাকুরের সাথেও দেখা করা উচিত। তাঁরা উভয়েই উদারমনা এবং জনগণের কাজে বেশ অংশ নিয়ে থাকেন।"

আমি উপরোক্ত দুই ভদ্রলোকের সাথে দেখা করলাম, কিন্তু কোনো ফল হলো না। তাঁরা উভয়েই আমাকে সাদরে গ্রহণ করেননি এবং বললেন, কলকাতাতে জনসভা আহ্বান করাটা সহজ ব্যাপার নয়। আর যদি কিছু করতেই হয় তাহলে বাস্তবে তা নির্ভর করে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মহাশয়ের ওপর।

আমি দেখলাম আমার কাজ কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। আমি অমৃতবাজার পত্রিকার অফিসে গেলাম। সেখানে আমি যে ভদ্রলোকের দেখা পেলাম তিনি আমাকে যাযাবর ইহুদী মনে করলেন। বঙ্গবাসী পত্রিকা আরো এক ধাপ সরেস। সম্পাদক মহাশয় আমাকে এক ঘন্টা বসিয়ে রাখলেন। অবশ্য তাঁর সাথে অনেকে

www.pathagar.com

সাক্ষাৎপ্রার্থী ছিল। তাদের সকলের সাথে কথা শেষ করেও তিনি আমার দিকে তাকালেন না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আমি যখন সাহস করে আমার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম, তিনি বললেন, "তুমি কি দেখছ না আমার হাতে কত কাজ? তোমার মতো সাক্ষাৎপ্রার্থীর শেষ নেই। তুমি বরং চলে যাও। তোমার কথা শোনার মতো অবস্থা এখন আমার নেই।" এক মুহূর্তের জন্য আমি অপমানিত বোধ করলাম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সম্পাদক হিসেবে তার অবস্থা আমি বুঝতে পারলাম। বঙ্গবাসী পত্রিকার সুখ্যাতি আমি শুনেছি। দেখলাম, সেখানে নিয়মিত স্রোতের মতো দর্শনার্থী আসছে এবং তারা সবাই সম্পাদকের পরিচিত। তার পত্রিকায় ছাপনোর বিষয়ের কোনো অভাব নেই এবং সে সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিষয়টি এখানে তেমন জানাও ছিল না।

অভিযোগের গুরুত্ব যাই হোক না কেন, অভিযোগের শিকার ব্যক্তি ছুটে আসে সম্পাদকের কাছে। এভাবে প্রত্যেক দিন অসংখ্য লোক আসছে, প্রত্যেকে নিজ নিজ অভিযোগ নিয়ে। সম্পাদক তাদের সকলের সাথে কিভাবে দেখা করবে? সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মনে করে পত্রিকার সম্পাদক দেশের অন্যতম ক্ষমতাধর ব্যক্তি। কিন্তু সম্পাদকই কেবল জানেন যে তার ক্ষমতা অফিসের চৌহদ্দি পেরোতে পারে কি না। তবে আমি হতাশ হলাম না। আমি অন্য পত্রিকার সম্পাদকদের সাথে দেখা করতে থাকলাম। স্বাভাবিকভাবেই আমি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্পাদকদের সাথেও দেখা করলাম। "দি স্টেটসম্যান" ও "দি ইংলিশম্যান" পত্রিকা দুটি দক্ষিণ আফ্রিকা প্রসঙ্গের গুরুত্ব অনুধাবন করল। আমি তাদেরকে লম্বা সাক্ষাৎকার দিলাম এবং তারা সেটা সম্পূর্ণ ছেপে দিল।

দি ইংলিশম্যান এর সম্পাদক মি. সন্ডার্স আমাকে তার নিজের লোক বলে দাবি করলেন। তিনি তার অফিস ও কাগজপত্র আমাকে ছেড়ে দিলেন। এমন কি তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থার ওপর তার লেখা প্রধান শিরোনামের আর্টিকেলের প্রুফ আমার কাছে পাঠালেন এবং তাতে যে কোনো পরিবর্তন করার পূর্ণ স্বাধীনতা আমাকে দিয়ে দিলেন। আমাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল এটা বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। তিনি আমাকে সাধ্যমতো সাহায্য করবেন বলে কথা দিলেন। তার কথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন এবং তিনি গুরুতর অসুস্থ হওয়া পর্যন্ত আমার সাথে পত্র যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছিলেন।

আমার সারা জীবনে এরকম হঠাৎ করে অপ্রত্যাশিত বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার নজির অনেক আছে। মি. সন্ডার্স আমার মধ্যে যা পছন্দ করেছিলেন তা হলো অতিরঞ্জন বর্জন এবং সত্যের প্রতি আমার অনুরাগ। আমার উত্থাপিত বিষয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের পূর্বে তিনি আমার অনুসন্ধানী পরীক্ষা নিয়েছিলেন এবং দেখেছিলেন যে তার কাছে নিরপেক্ষ বর্ণনা দেয়ার ব্যাপারে আমার ইচ্ছা ও চেষ্টা কোনোটারই কমতি ছিল না। এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা আদমীদের ব্যাপারেও আমার বক্তব্য ছিল নিরপেক্ষ এবং তিনি এর প্রশংসা করেছিলেন।

www.pathagar.com

আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে অন্যের প্রতি সুবিচার করার মাধ্যমে সবচেয়ে দ্রুত আমরা নিজেরা সুবিচার পেতে পারি।

মি. সন্ডার্সের অপ্রত্যাশিত সাহায্য প্রাপ্তিতে উৎসাহিত হয়ে ভাবলাম কলকাতায় জনসভা অনুষ্ঠানে হয়তো সফল হতে পারি। এ সময়ে ডারবান থেকে নিম্নোক্ত তার বার্তা পেলাম :

"পার্লামেন্ট বসছে জানুয়ারীতে। শীঘ্র ফিরে আসো।"

সুতরাং আমি হঠাৎ করে কেন কলকাতা ত্যাগ করছি তা ব্যাখ্যা করে পত্রিকায় একটা পত্র পাঠালাম এবং বোম্বে রওনা হয়ে গেলাম। যাত্রার পূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকাগামী প্রথম জাহাজে আমার জন্য টিকেট কিনতে দাদা আব্দুল্লাহ অ্যান্ড কোম্পানীর বোম্বে প্রতিনিধিকে একটা তারবার্তা পাঠালাম। দাদা আব্দুল্লাহ তখন সবেমাত্র কোরল্যান্ড নামের জাহাজটি কিনেছেন এবং ঐ জাহাজে আমার পরিবারসহ বিনা ভাড়ায় ভ্রমণের জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন। আমি প্রস্তাবটা গ্রহণ করলাম এবং ডিসেম্বরের প্রথম দিকে আমি দ্বিতীয়বার দক্ষিণ আফ্রিকার পথে যাত্রা করলাম। এবারে আমার সঙ্গী হলো আমার স্ত্রী, দুই পুত্র এবং আমার বিধবা বোনের একমাত্র পুত্র। একই সময়ে নাদেরী নামে আরো একটি জাহাজ ডারবানের উদ্দেশে যাত্রা করল। ঐ কেম্পানীর এজেন্ট ছিল দাদা আব্দুল্লাহ অ্যান্ড কোম্পানী। দুটি জাহাজের মোট যাত্রী সংখ্যা ছিল আনুমানিক আটশত যাদের অর্ধেকের গন্তব্যস্থল ছিল ট্রান্সভাল।

www.pathagar.com

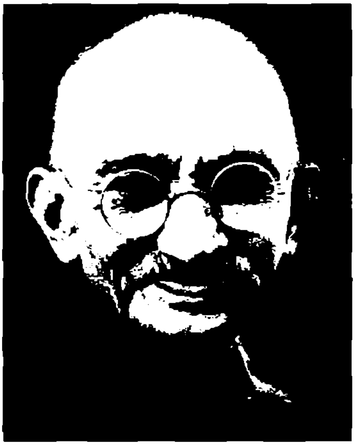

আমার আত্মজীবনী

[তৃতীয় পর্ব]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক

ঝড়ের পূর্বাভাস

স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে এটাই আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রা। এ কাহিনীর বর্ণনায় আমি প্রায়ই উল্লেখ করেছি যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বাল্য বিবাহের কারণে স্বামী শিক্ষিত হয়, কিন্তু স্ত্রী বাস্তবে অশিক্ষিত থাকে। তাদের মধ্যে বিরাট দূরত্ব থাকে এবং স্বামীকে স্ত্রীর শিক্ষকতা করতে হয়। তাই আমাকে ভাবতে হচ্ছিল আমার স্ত্রী ও বাচ্চাদের পোষাক কি হবে, তারা কি খাবে এবং নতুন পরিবেশে তাদের আচরণ কেমন হবে ইত্যাদি। সে দিনগুলোর প্রতি ফিরে তাকালে কিছু কিছু স্মৃতি বেশ হাস্যকর মনে হয়।

একজন হিন্দু স্ত্রী স্বামীর প্রতি অনুগত থাকাটাকে সবচেয়ে বড় ধর্ম বলে মনে করে। হিন্দু স্বামী নিজেকে মনে করে স্ত্রীর প্রভু ও মনিব এবং স্ত্রীকে অবশ্যই তার মোসাহেবী করতে হবে।

যে সময়ের কথা লিখছি ঐ সময়ে আমি বিশ্বাস করতাম যে সভ্য হতে হলে আমাদের পোষাক ও ব্যবহার যতদূর সম্ভব ইউরোপীয়ান মানের কাছাকাছি হতে হবে। কারণ আমি ভেবেছিলাম কেবল এভাবেই আমরা অন্যকে প্রভাবিত করতে পারি। আর প্রভাব বিস্তার ছাড়া দেশবাসীর সেবা করা সম্ভব নয়।

সুতরাং আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানদের পোষাকের স্টাইল নির্ধারণ করে ফেললাম। তাদেরকে কাথিয়াওয়াড়ের বেনিয়া হিসেবে পরিচিত করব, তা কি করে সম্ভব? সে সময়ে ভারতীয়দের মধ্যে পার্সীদেরকে সবচেয়ে সভ্য বলে গণ্য করা হতো। তাই যখন দেখলাম যে পুরোপুরি ইউরোপীয়ান স্টাইলের পোষাক বেমানান বলে মনে হচ্ছে, তখন পার্সী স্টাইল গ্রহণ করলাম। সে অনুযায়ী আমার স্ত্রী পার্সীদের মতো শাড়ি পরল, আর ছেলেরা পার্সী কোট ও ট্রাউজার পরল। জুতা মোজা অবশ্য সকলেই পরত। আমার স্ত্রী ও ছেলেদের এ পোষাকে অভ্যস্ত হতে দীর্ঘ সময় লাগল। জুতা তাদের পা সংকুচিত করে ফেলল, মোজা ঘামের দুর্গন্ধ ছড়াল। পায়ের আগায় ঘা হয়ে যেত। এসব আপত্তির বিপরীতে আমার জবাব তৈরিই থাকত। কিন্তু আমার ধারণা আমার জবাবের চাইতে কর্তৃত্বের ভয়েই তারা আদেশ পালন করত। পোষাকের রদবদল তারা মেনে নিয়েছিল কারণ এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। একই মনোভাব নিয়ে, বরং আরো বেশি অনিচ্ছা সহকারে তারা ছুরি-কাঁটা চামচের ব্যবহার মেনে নিয়েছিল। সভ্যতার ঐসব নিদর্শনের প্রতি যখন আমার মোহ কেটে গেল তখন তারাও ছুরি-কাঁটা

www.pathagar.com

চামচের ব্যবহার ছেড়ে দিল। দীর্ঘদিন ধরে নতুন স্টাইলে অভ্যস্ত হওয়ার পরে আবার পুরনো নিয়মে ফিরে যাওয়াটা আমার জন্য কম বিরক্তিকর ছিল না। কিন্তু আজ আমি দেখতে পাচ্ছি তথাকথিত সভ্যতার চাকচিক্য ঝেড়ে ফেলাতে আমরা মুক্ত ও হালকা বোধ করেছি।

একই জাহাজে আমাদের সাথে কয়েকজন আত্মীয় ও পরিচিতজন ছিলেন। তাদের সাথে এবং অন্য যাত্রীদের সাথেও আমি ঘন ঘন দেখা করতাম, কারণ আমার বন্ধুরা জাহাজের মালিক হওয়ায় আমি যেখানে খুশী বিচরণ করতে পারতাম।

যেহেতু জাহাজটি মধ্যবর্তী বন্দরসমূহে না থেমে সরাসরি নাটাল যাচ্ছিল সেহেতু আমাদের ভ্রমণ কাল ছিল মাত্র আঠারো দিনের। কিন্তু নাটাল থেকে চার দিনের পথ দূরে থাকতে ভীষণ এক ঝড় আমাদেরকে ধরে ফেলল। আগামীতে নাটালের ভূমিতে যে ঝড় মোকাবিলা করতে হবে এটা যেন তারই সতর্ক সংকেত। দক্ষিণ গোলার্ধে ডিসেম্বর হলো গ্রীষ্মের মৌসুমী বায়ুর মাস এবং এ মৌসুমে দক্ষিণের সাগরগুলোতে ছোট-বড় ঝড় ওঠা অতি সাধারণ ঘটনা। আমরা যে ঝড়ে পড়েছিলাম তা এতই প্রচণ্ড ও দীর্ঘস্থায়ী ছিল যে যাত্রীরা ভীত হয়ে পড়ল। ভাবগম্ভীর দৃশ্যের অবতারণা হলো। একই বিপদের মোকাবিলায় সবাই এক হয়ে গেল। মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান সবাই তাদের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একমাত্র ঈশ্বরকে ডাকতে লাগল। অনেকে অনেক রকম মানত করল। ক্যাপ্টেনও যাত্রীদের সাথে প্রার্থনায় যোগ দিলেন। তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন, এ ঝড়টা যদিও বিপজ্জনক কিন্তু তিনি এর চেয়েও খারাপ অনেক ঝড়ে পড়েছেন এবং যাত্রীদের বুঝিয়ে বললেন যে একটি শক্ত সমর্থ জাহাজ যে কোনো আবহাওয়ায় টিকে থাকতে পারে। কিন্তু যাত্রীরা আশ্বস্ত হতে পারল না। মিনিটে মিনিটে ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ জাহাজের খোল ভেঙে যাওয়ার বা ছিদ্র হয়ে যাওয়ার অশুভ ইঙ্গিত দিচ্ছিল। জাহাজ এমনভাবে এদিক ওদিক দোল খেতে লাগল যে, মনে হলো যে কোনো মুহূর্তে তা উল্টে যাবে। এ অবস্থায় ডেকের ওপর কারো থাকার প্রশ্নই ছিল না। প্রত্যেকের ঠোঁটে একই প্রার্থনা, "তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" আমার যতদূর মনে পড়ে এ অবস্থায় আমরা প্রায় চব্বিশ ঘন্টা ছিলাম। অবশেষে আকাশ পরিষ্কার হলো, সূর্যদেব উদয় হলেন এবং ক্যাপ্টেন ঘোষণা করলেন ঝড় শেষ হয়েছে। যাত্রীদের চোখ মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হলো এবং বিপদ দূর হওয়ার সাথে সাথে তাদের ঠোঁট থেকে ঈশ্বরের নামও মিলিয়ে গেল। খানা-পিনা, নাচা-গানা পুনরায় নিত্যদিনের কাজে পরিণত হলো। মৃত্যুভয় চলে যাবার পর ক্ষণিকের আন্তরিক প্রার্থনার স্থান দখল করে নিল "মায়া"। নিয়মিত নামাজ ও অন্যান্য প্রার্থনা অবশ্য চলতে থাকল, কিন্তু তাতে ঐ ভয়ংকর সময়ের প্রার্থনার মতো ভাব গাম্ভীর্য ছিল না।

এ ঝড় আমাকে যাত্রীদের সাথে একাত্ম করল। ঝড়ের ভয় আমার তেমন ছিল না, কারণ এরকম ঝড়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা আমার ছিল। আমি একজন অভিজ্ঞ

www.pathagar.com

নাবিক এবং আমার সমুদ্রপীড়া ছিল না। তাই আমি যাত্রীদের মাঝে অবাধে চলাফেরা করতাম, তাদেরকে সান্ত্বনা ও আনন্দ দিতাম এবং প্রতি ঘন্টায় ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে রিপোর্ট শুনে এসে তাদেরকে বলতাম। এভাবে গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব ছিল দীর্ঘস্থায়ী এবং তা আমার খুব কাজে লেগেছে যার প্রমাণ আমরা পরে দেখতে পাব।

ডারবান বন্দরে জাহাজটি ১৮ কি ১৯ শে ডিসেম্বর নোঙ্গর করল। নাদেরীও একই দিনে পৌঁছাল। কিন্তু আসল ঝড় আসতে তখনো বাকী।

দুই
ঝড়

আমরা দেখেছি দুটো জাহাজ ডারবান বন্দরে ১৮ কি ১৯ শে ডিসেম্বর নোঙর করেছিল। নির্দেশ জারী করা হয়েছিল পূর্ণ ডাক্তারী পরীক্ষা ছাড়া কোনো যাত্রীকে দক্ষিণ আফ্রিকার কোনো বন্দরে নামতে দেয়া হবে না। জাহাজের কোনো যাত্রী যদি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত থাকে তাহলে সে জাহাজকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কোয়ারেনটাইনে থাকতে হবে। যখন আমরা যাত্রা করি তখন যেহেতু বোম্বেতে প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছিল, সেহেতু আমাদেরকে সাময়িক কোয়ারেনটাইনে থাকতে হতে পারে বলে ভয় করছিলাম। নির্দেশে আরো বলা হয়েছিল, ডাক্তারী পরীক্ষার আগে সব জাহাজকেই হলুদ পতাকা ওড়াতে হবে এবং ডাক্তার রোগমুক্ত বলে সনদ প্রদানের পরেই কেবল তা নামিয়ে ফেলা যাবে। আর হলুদ পতাকা নামানোর আগে যাত্রীদের আত্মীয় বন্ধুদেরকেও জাহাজে ওঠার অনুমতি দেয়া হবে না।

তদনুযায়ী আমাদের জাহাজ হলুদ পতাকা ওড়াতে থাকল। ডাক্তার এলেন এবং আমাদেরকে পাঁচ দিনের কোয়ারেনটাইন পালনের আদেশ দিলেন। কারণ তাঁর মতে প্লেগের জীবাণু পূর্ণতা পেতে ২৩ দিন সময় লাগে। সুতরাং আমাদের জাহাজটিকে বোম্বে থেকে ছাড়ার পর ২৩ দিন পার না হওয়া পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে থাকার আদেশ দেয়া হলো। কিন্তু কোয়ারেনটাইনের এ আদেশের পিছনে স্বাস্থ্যগত কারণ ছাড়াও আরো ব্যাপার ছিল।

ডারবানের সাদা আদমীরা আমাদেরকে দেশে ফেরৎ পাঠানোর আন্দোলন করছিল। এ আদেশের সেটাও একটা কারণ। শহরে কি ঘটছে দাদা আব্দুল্লাহ অ্যান্ড কোং আমাদেরকে তা নিয়মিত জানাচ্ছিলেন। সাদা আদমীরা প্রতিদিন বিরাট বিরাট সভা করছিল। তারা সব রকমের ভয় দেখাচ্ছিল। এমনকি দাদা আব্দুল্লাহ অ্যান্ড কোং-কে আক্রমণেরও হুমকি দিচ্ছিল। জাহাজটি ফেরৎ পাঠালে দাদা আব্দুল্লাহ অ্যান্ড কোং-কে দায়মুক্তির ঘোষণা দিতে প্রস্তুত বলেও প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু দাদা আব্দুল্লাহ অ্যান্ড কোং কোনো হুমকিতে ভীত হবার পাত্র ছিল না। শেঠ আব্দুল করিম হাজী আদম তখন কোম্পানীর ম্যানেজিং পার্টনার ছিলেন। যে কোনো মূল্যেই হোক জাহাজটি বন্দরে ভেড়াতে এবং যাত্রীদেরকে খালাস

www.pathagar.com

করাতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। প্রতিদিনের অবস্থা বিস্তারিত জানিয়ে তিনি আমাকে পত্র দিচ্ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে প্রয়াত শ্রী মনসুখলাল নাজার তখন ডারবানে ছিলেন। তিনি সেখানে গিয়েছিলেন আমার সাথে দেখা করতে। তিনি ছিলেন একজন যোগ্য ও নির্ভীক ব্যক্তি এবং ভারতীয় সম্প্রদায়কে তিনি নির্দেশনা দিচ্ছিলেন। তাদের পক্ষের উকিল মি. লাউটনও ছিলেন একই রকম নির্ভীক মানুষ। তিনি সাদা বাসিন্দাদের আচরণের নিন্দা করলেন এবং ভারতীয় সম্প্রদায়কে কেবল বেতনভুক উকিল হিসেবে নয় বরং প্রকৃত বন্ধু হিসেবে যথোপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

এভাবে ডারবান এক অসম যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হলো। এক পক্ষে হাতে গোণা ক'জন ভারতীয় ও তাদের দু'একজন ইংরেজ বন্ধু, আর অন্য পক্ষে সকল সাদা আদমী, তারা অস্ত্র ও সংখ্যায়, শিক্ষা ও সম্পদে বলীয়ান। তাদের পেছনে রয়েছে রাষ্ট্রেরও সমর্থন, কারণ নাটাল গভর্নমেন্ট তখন তাদেরকে প্রকাশ্যে সাহায্য করত। কেবিনেট সদস্যদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী, সেই মি. এসকম্ব প্রকাশ্যেই তাদের সভায় অংশগ্রহণ করতেন।

সুতরাং কোয়ারেনটাইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল জাহাজের যাত্রীদেরকে এবং তাদের এজেন্ট কোম্পানীকে যে কোনো উপায়ে ভয় দেখিয়ে ভারতে ফিরে যেতে বাধ্য করা। কারণ তারা এখন আমাদেরকে সরাসরি এই বলে হুমকি দিতে থাকল, "যদি তোমরা ফিরে যেতে না চাও তবে তোমাদেরকে অবশ্যই সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু যদি তোমরা ফিরে যেতে রাজি হও, তাহলে তোমাদের জাহাজ ভাড়ার টাকাও ফেরৎ পেতে পার।" আমি সারাক্ষণ সহযাত্রীদের মধ্যে ঘোরাফেরা করে তাদেরকে সাহস দিতে থাকলাম। এস. এস. নাদেরী জাহাজের যাত্রীদেরকেও আমি সান্ত্বনার আশ্বাসবাণী পাঠালাম। তারা সবাই সাহসে বুক বেঁধে শান্ত থাকল।

যাত্রীদের মনোরঞ্জনের জন্য আমরা সব ধরনের খেলার আয়োজন করলাম। খৃষ্টীয় বড়দিনে ক্যাপ্টেন সেলুন যাত্রীদেরকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানালেন। অতিথিদের মধ্যে আমি আর আমার পরিবারই ছিল প্রধান। ডিনারের পরে আমি পশ্চিমা সভ্যতার ওপর বক্তৃতা দিলাম। আমি জানতাম এটা গুরুগম্ভীর বক্তৃতার স্থান নয়। কিন্তু আমার বক্তৃতা গুরুগম্ভীর না হয়ে উপায় ছিল না। আমি আনন্দ উচ্ছ্বাসে অংশগ্রহণ করলাম ঠিকই, কিন্তু মনপ্রাণ লিপ্ত থাকল ডারবানের চলমান যুদ্ধে। কারণ আমিই ছিলাম তাদের মূল টার্গেট। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল দুটো :

(১) ভারতে অবস্থানকালে আমি সাদা আদমীদের অসংগত নিন্দায় অংশ নিয়েছি, এবং

(২) নাটালে ভারতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমি দুই জাহাজ ভর্তি করে যাত্রী নিয়ে এসেছি যাতে তারা সেখানে বসতি স্থাপন করতে পারে।

আমি আমার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলাম। আমি জানতাম দাদা আব্দুল্লাহ অ্যান্ড কোং আমার জন্য বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিল। যাত্রীদের জীবন বিপন্ন হয়েছিল

www.pathagar.com

এবং আমার সাথে পরিবার নিয়ে এসে তাদেরকেও আমি বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলাম।

কিন্তু আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলাম। আমি কাউকেই নাটালে যেতে উৎসাহ দেইনি। যাত্রীরা যখন জাহাজে চড়ে তখনো তাদের কাউকে আমি চিনি না এবং কেবল আমার দু'জন আত্মীয় ছাড়া জাহাজের শত শত যাত্রীদের নাম-ঠিকানাও আমি জানতাম না। আর ভারতে অবস্থানকালে আমি নাটালের সাদা আদমীদের সম্পর্কে এমন একটা কথাও বলিনি, যা আগে নাটালে থাকতেই বলিনি। এবং আমি যা কিছু বলেছি তার সমর্থনে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

সুতরাং নাটালের সাদা আদমীরা যে সভ্যতার ফসল, যে সভ্যতার প্রতিনিধি ও রক্ষক, তার জন্য আমার দুঃখ হলো। এ সভ্যতা সম্পর্কে আমি সর্বদাই সচেতন ছিলাম এবং জাহাজের ছোট্ট সভায় এর সম্পর্কে আমার মতামত ব্যক্ত করেছিলাম। ক্যাপ্টেন ও অন্য বন্ধুরা আমার বক্তব্য আমার মতো একই মনোভাব নিয়ে ধৈর্য ধরে শুনেছিল। আমি জানি না তাদের জীবন আচরণে এ সভ্যতার এতটুকু প্রভাব পড়েছে কিনা। পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন ও অন্যান্যদের সাথে পশ্চিমা সভ্যতা নিয়ে আমার অনেক কথা হয়েছে। আমার বক্তৃতায় বলেছিলাম পশ্চিমা সভ্যতা প্রাচ্যের মতো নয়, তা মূলত শক্তিমত্তার ভিতের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রশ্নকারীরা আমার বিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করল। তাদের একজন, যতদূর মনে পড়ে তিনি ক্যাপ্টেন, আমাকে বললেন, "মনে কর, সাদা আদমীরা তাদের হুমকি কার্যে পরিণত করল, তাহলে তুমি তোমার অহিংস নীতি নিয়ে কিভাবে টিকে থাকবে?" এর জবাবে আমি বললাম, "আশা করি ঈশ্বর আমাকে সাহস দেবেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করার সুমতি দেবেন আর তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া থেকে বিরত রাখবেন। তাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো রাগ নেই। তাদের অজ্ঞতা ও সংকীর্ণতা দেখে আমার কেবল দুঃখ হচ্ছে। আমি জানি তারা আজ যা করছে তা সঠিক ও যথাযথ এই আন্তরিক বিশ্বাস নিয়েই করছে। সুতরাং তাদের প্রতি আমার রাগান্বিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।"

প্রশ্নকর্তা মৃদু হাসলেন, এবং সম্ভবত সেটা অবিশ্বাসের হাসি।

এভাবে দিন যেতে থাকল, ক্লান্ত প্রহর গুণে গুণে। কোয়ারেন্টাইন কখন শেষ হবে তা এখনো অনিশ্চিত। কোয়ারেনটাইন অফিসার বললেন বিষয়টি এখন আর তার হাতে নেই। গভর্নমেন্ট অনুমতি দিলেই তিনি আমাদেরকে তীরে নামতে দেবেন।

অবশেষে আমাকে ও যাত্রীদেরকে চরম পত্র দেয়া হলো। আমাদেরকে বলা হলো প্রাণে বাঁচতে চাইলে আত্মসমর্পণ করো। এর জবাবে আমি ও যাত্রীরা সবাই নাটাল বন্দরে আমাদের অবতরণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তে অটল রইলাম এবং যে কোনো ঝুঁকি নিয়ে নাটালে প্রবেশ করতে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা জানিয়ে দিলাম।

২৩ দিনের শেষে জাহাজগুলোকে বন্দরে প্রবেশের এবং যাত্রীদেরকে তীরে নামার অনুমতি দেয়া হলো।

www.pathagar.com

তিন
পরীক্ষা

সুতরাং জাহাজ জেটিতে ভিড়ল, যাত্রীরা তীরে নামতে শুরু করল। কিন্তু মি. এসকম্ব ক্যাপ্টেনকে বার্তা পাঠালেন যে যেহেতু সাদা আদমীরা আমার ওপর চরম ক্ষেপে আছে এবং আমার জীবন বিপন্ন, সেহেতু আমি ও আমার পরিবার যেন সন্ধ্যার পরে নামি এবং তখন পোর্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট মি. টেটাম আমাদেরকে পাহারা দিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেবে। ক্যাপ্টেন বার্তাটি আমাকে জানালেন এবং আমি তাতে রাজি হলাম। কিন্তু এরপর আধঘন্টা না পেরোতেই লাউটন এলেন ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা করতে। তিনি বললেন, "মি. গান্ধীকে আমার সাথে নিয়ে যেতে চাই, যদি তার কোনো আপত্তি না থাকে। এজেন্ট কোম্পানীর আইন উপদেষ্টা হিসেবে আমি জানাচ্ছি যে মি. এসকম্বের কাছ থেকে আপনি যে বার্তা পেয়েছেন তা মানতে আপনি বাধ্য নন।" এরপর তিনি আমার কাছে এসে মোটামুটি এরকম বললেন, "আপনি যদি ভয় না পান তাহলে আমার পরামর্শ হচ্ছে যে মিসেস গান্ধী ও বাচ্চারা একটা গাড়িতে করে মি. রুস্তমজীর বাড়িতে যাক এবং আমি ও আপনি তাদের পিছে পিছে হেঁটে যাই। আপনি রাতের বেলা চোরের মতো লুকিয়ে শহরে প্রবেশ করবেন সেটা আমার মোটেই পছন্দ নয়। আপনাকে কেউ আঘাত করবে এমন আশংকা আছে বলে আমি মনে করি না। এতক্ষণে সব শান্ত হয়ে গেছে। সাদা আদমীরা সব চলে গেছে। আমার অভিমত হলো চুপি চুপি লুকিয়ে শহরে প্রবেশ করা আপনার কিছুতেই উচিত হবে না।" এ প্রস্তাবে আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হলাম। আমার স্ত্রী ও বাচ্চারা নিরাপদে রুস্তমজীর বাড়িতে পৌঁছল। ক্যাপ্টেনের অনুমতি নিয়ে আমি মি. লাউটনের সাথে তীরে নামলাম। বন্দর থেকে মি. রুস্তমজীর বাড়ি ছিল প্রায় দু'মাইল দূরে।

আমরা জাহাজ থেকে নামার সাথে সাথেই কিছু বখাটে যুবক আমাকে চিনতে পারল এবং "গান্ধী, গান্ধী" বলে চীৎকার শুরু করে দিল। আরো আধা ডজন লোক ছুটে এলো এবং ওদের সাথে চীৎকারে যোগ দিল। জনতার দল আরো ভারী হতে পারে এই আশংকায় মি. লাউটন একটা রিকশা আনলেন। রিকশায় চড়ার ব্যাপারটা আমার আদৌ পছন্দ ছিল না। এটাই হতো আমার রিকশায় চড়ার প্রথম অভিজ্ঞতা। কিন্তু যুবকের দল আমাকে রিকশায় উঠতে দিল না। জানে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে রিকশা চালককে ভাগিয়ে দিল এবং সে দৌড়ে পালাল। আমরা যতই এগোতে থাকলাম, জনতাও দলে ভারী হতে থাকল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। তারা প্রথমে মি. লাউটনকে ধরে আমার কাছ থেকে আলাদা করে ফেলল। তারপর আমার ওপর পাথর, ইটের টুকরা ও পচা ডিম ছুঁড়তে লাগল। কেউ একজন আমার পাগড়ী ছিনিয়ে নিল, অন্যেরা আমাকে প্রচণ্ড কিল-ঘুষি ও লাথি মারতে থাকল। আমি জ্ঞান হারাতে হারাতে একটি বাড়ির রেলিং ধরে ফেললাম এবং সেখানে দাঁড়িয়ে একটু শ্বাস নিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে থাকাও সম্ভব হলো না। তারা

www.pathagar.com

সেখানেও আমাকে কিল-ঘুষি ও মারধর করতে থাকল। পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্টের স্ত্রী আমাকে চিনতেন, ঘটনাক্রমে তিনি সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঐ সাহসী ভদ্রমহিলা এগিয়ে এলেন, তার রোদ প্রতিরোধক ছাতাটা খুলে ধরলেন যদিও রোদ ছিল না এবং তিনি জনতা ও আমার মাঝে দাঁড়ালেন। এতে জনতার রোষ বাধাপ্রাপ্ত হলো, কারণ তখন মিসেস আলেকজান্ডারকে আঘাত না করে আমাকে সহজে কিল-ঘুষি মারা আর সম্ভব ছিল না।

ইতিমধ্যে এক ভারতীয় যুবক ঘটনাটি দেখে দৌড়ে থানায় গেল খবর দিতে। পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট মি. আলেকজান্ডার পুলিশের শান্তিরক্ষী দল পাঠিয়ে দিলেন আমাকে ঘিরে পাহারা দিয়ে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে। তারা যথাসময়েই পৌঁছল। থানাটি আমাদের যাত্রাপথেই পড়ে। আমরা সেখানে পৌঁছলে পুলিশ সুপার আমাদেরকে থানায় আশ্রয় নিতে বললেন, কিন্তু আমি কৃতজ্ঞতার সাথে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করলাম। বললাম, "যখন তারা তাদের ভুল বুঝতে পারবে তখন তারা নিশ্চয়ই শান্ত হয়ে যাবে। তাদের ন্যায় বোধের ওপর আমার আস্থা আছে।" পুলিশের পাহারায় আর কোনো ক্ষতির শিকার না হয়ে আমি রুস্তমজীর বাড়িতে পৌঁছলাম। সারা শরীর থেঁতলে গিয়েছিল, কিন্তু এক জায়গায় ছাড়া কোথাও ছিলে যায়নি। জাহাজের ডাক্তার মি. দাদিবারজোর সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি যথাসম্ভব চিকিৎসা দিলেন।

বাড়ির ভেতরে শান্ত ছিল কিন্তু বাইরে সাদা আদমীরা বাড়িটি ঘিরে রেখেছিল। রাত নামছিল এবং সমবেত জনতা চীৎকার করছিল, "আমরা গান্ধীকে চাই"। করিৎকর্মা পুলিশ সুপার ইতিমধ্যেই সেখানে উপস্থিত হয়ে জনতাকে ভয় দেখিয়ে নয়, বরং হাস্যরসের মাধ্যমে শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তিনি পুরোপুরি দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারছিলেন না। তিনি আমাকে একটা বার্তা পাঠালেন যার মর্ম ছিল এরকম : "আমার পরামর্শ হচ্ছে যদি আপনার বন্ধুর বাড়ি ও সম্পদ এবং আপনার পরিবারকে বাঁচাতে চান তাহলে ছদ্মবেশে এ বাড়ি থেকে পালিয়ে যান।"

এভাবে একই দিনে আমাকে দুই বিপরীতমুখী অবস্থার মুখোমুখি হতে হলো। যখন জীবন বিপন্ন হওয়া কাল্পনিক বলে মনে হয়েছিল তখন মি. লাউটন প্রকাশ্যে বের হতে উপদেশ দিয়েছিলেন। সে উপদেশ আমি শুনেছিলাম। আর বিপদ যখন আসলেই আসন্ন তখন অন্য এক বন্ধু তার উল্টো উপদেশ দিচ্ছেন। আমি সেটাও গ্রহণ করলাম। আমি এটা করেছিলাম আমার নিজের জীবন বিপন্ন বলে, নাকি আমার বন্ধুর জান-মাল ও আমার স্ত্রী-পুত্রদের জীবন বিপন্ন হোক তা চাইনি বলে, সেটা কে বলবে? কে নিশ্চিত করে বলবে, যখন আমি সাহসের সাথে জনতার মুখোমুখি হয়েছিলাম এবং যখন জনতার থেকে ছদ্মবেশে পালিয়েছিলাম, উভয় কাজই সঠিক ছিল কিনা।

যে ঘটনা ঘটে গেছে তা সঠিক ছিল না বেঠিক ছিল তার বিচার বিশ্লেষণ এখন অর্থহীন। যা প্রয়োজন তা হলো ঘটনা বুঝা এবং সম্ভব হলে তা থেকে

www.pathagar.com

ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা নেয়া। একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো বিশেষ ব্যক্তি কি ধরনের আচরণ করবে তা নিশ্চিত করে বলা শক্ত। আমরা এও দেখতে পাই যে, কোনো মানুষের বাহ্যিক কর্মকাণ্ড দেখে তার সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তা হবে সন্দেহপূর্ণ অনুমান মাত্র, কারণ তা পর্যাপ্ত তথ্যভিত্তিক নয়।

যা ঘটে ঘটুক। পালানোর প্রস্তুতি নিতে গিয়ে আমি আঘাতের ব্যথা ভুলে গেলাম। পুলিশ সুপারের কথামতো আমি একজন ভারতীয় পুলিশ কনস্টেবলের ইউনিফরম পরলাম, একটা থালার ওপর মাদ্রাজী স্কার্ফ জড়িয়ে মাথার হেলমেট বানালাম। আমার সাথে থাকল দু'জন ডিটেকটিভ, একজন ভারতীয় ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে এবং তার মুখে রং লাগানো যাতে তাকে ভারতীয়দের মতো দেখায়। আরেকজনের ছদ্মবেশ কেমন ছিল তা মনে নেই। একটা গলিপথে আমরা পার্শ্ববর্তী এক দোকানে পৌঁছলাম এবং গুদামে স্তূপ করে রাখা চটের বস্তার আড়াল দিয়ে অগ্রসর হয়ে দোকানের গেট দিয়ে পালিয়ে বের হলাম এবং জনতার ভীড় ঠেলে রাস্তার শেষ মাথায় আমার জন্য রাখা গাড়িতে উঠলাম। এ গাড়িতে করে সেই থানাতে গেলাম যেখানে কিছুক্ষণ আগে মি. আলেকজান্ডার আমাকে আশ্রয় নিতে বলেছিলেন। আমি মি. আলেকজাণ্ডার ও ডিটেকটিভ অফিসারদেরকে ধন্যবাদ দিলাম।

আমি যখন এভাবে পালাচ্ছিলাম, মি. আলেকজান্ডার তখন ছড়া কেটে জনতাকে আনন্দ দিচ্ছিলেন, যার কথাগুলো এরকম—

"গান্ধী ব্যাটা বুড়ো, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারো"।

যখন তিনি আমার নিরাপদে থানায় পৌঁছার কথা জানলেন, তখন তিনি জনতার উদ্দেশে এভাবে খবরটা ফাঁস করলেন, "শুনুন, আপনাদের শিকার পার্শ্ববর্তী দোকানের মধ্য দিয়ে পালিয়ে গেছে। আপনাদের এখন বাড়ি চলে যাওয়াই ভালো।" এটা শুনে তাদের কেউ কেউ রেগে গেল, অনেকে হাসাহাসি করল, আবার অনেকে গল্পটা বিশ্বাস করতে চাইল না।

পুলিশ সুপার বললেন, "বেশ তো, যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় আপনাদের একজন বা দু'জন প্রতিনিধি নির্বাচন করুন যাদেরকে আমি বাড়ির ভেতরে নিয়ে যেতে রাজি আছি। তারা যদি গান্ধীকে খুঁজে বের করতে পারে তাহলে আমি খুশী হয়ে তাকে আপনাদের হাতে তুলে দেব। কিন্তু যদি তারা গান্ধীকে না পায়, তাহলে আপনাদেরকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। আমি নিশ্চিত যে মি. রুস্তমজীর বাড়ি ধ্বংস করার বা মি. গান্ধীর স্ত্রী-পুত্রদের ক্ষতি করার কোনো ইচ্ছে আপনাদের নেই।"

জনতা তাদের প্রতিনিধি পাঠাল বাড়ি তল্লাশীর জন্য। শীঘ্রই তারা হতাশ হয়ে ফিরে এলো। অবশেষে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, তাদের বেশিরভাগ পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য পুলিশ সুপারের কৌশলের প্রশংসা করল, আর অল্প কিছু লোক রাগে ফুঁসতে থাকল।

www.pathagar.com

প্রয়াত মি. চেম্বারলেন তখন "সেক্রেটারী অব স্টেট ফর দি কলোনীজ" পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তারবার্তা পাঠিয়ে নাটাল গভর্নমেন্টকে আদেশ দিলেন আমাকে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে। মি. এসকম্ব আমাকে ডেকে পাঠালেন, আমি যে আঘাত পেয়েছিলাম তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, "বিশ্বাস কর, তোমার শরীরে ন্যূনতম আঘাত লাগলেও আমি খুশী হতে পারি না। মি. লাউটনের উপদেশ শোনার এবং সবচেয়ে খারাপ অবস্থা মোকাবেলা করার অধিকার তোমার অবশ্যই ছিল। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে তুমি যদি আমার পরামর্শ শুনতে তাহলে এসব দুঃখজনক ঘটনা ঘটত না। তুমি যদি আক্রমণকারীদের দেখিয়ে দিতে পার তাহলে আমি তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে এবং শাস্তি দিতে প্রস্তুত আছি। মি. চেম্বারলেনও চাচ্ছেন আমি তা করি।"

এর জবাবে আমি বললাম, "আমি কাউকে শাস্তি দিতে চাই না। সম্ভবত আমি তাদের একজন বা দু'জনকে চিনতে পারব, কিন্তু তাদেরকে শাস্তি দিয়ে কি লাভ হবে? তদুপরি আমি আক্রমণকারীদেরকে দোষী মনে করি না। তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল যে আমি ভারতে গিয়ে নাটালের সাদা আদমীদের বিরুদ্ধে অতিরঞ্জিত বক্তব্য দিয়েছি এবং তাদের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছি। এসব কথা বিশ্বাস করে থাকলে তারা রাগান্বিত হবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যারা এতে নেতৃত্ব দিয়েছে তারা, এবং আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি, আপনি নিজে এর জন্য দায়ী। আপনি জনগণকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারতেন, কিন্তু আপনিও রয়টারের খবরে বিশ্বাস করে ধরে নিয়েছিলেন যে আমি নিশ্চয়ই ঘটনা অতিরঞ্জিত করার কাজে লিপ্ত হয়েছি। আমি কাউকে শাস্তি দিতে চাই না। আমি নিশ্চিত যে সত্য ঘটনা প্রকাশিত হলে তাদের আচরণের জন্য তারা দুঃখ প্রকাশ করবে।"

মি. এসকম্ব বললেন, "তুমি কি তোমার এ বক্তব্য লিখে দিতে পার? কারণ এ বিষয়ে মি. চেম্বারলেনকে আমার তারবার্তা করে জানাতে হবে। তাড়াহুড়ো করে কোনো বক্তব্য দাও তা আমি চাই না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসার আগে যদি ভালো মনে কর, মি. লাউটন ও তোমার অন্যান্য বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে নাও। আমি স্বীকার করছি যে তুমি যদি তোমার আক্রমণকারীদেরকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দাও, তাহলে তোমার নিজের খ্যাতি বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়াও তা আমাকে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে যথেষ্ট সহায়তা করবে।"

আমি বললাম, "আপনাকে ধন্যবাদ। কারো সাথে আলোচনার আমার প্রয়োজন নেই। আপনার এখানে আসার আগেই এ বিষয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আক্রমণকারীদেরকে শাস্তি দেয়া উচিত হবে না। এবং এ মুহূর্তেই আমি আমার সিদ্ধান্ত লিখে দিতে পারি।"

এটুকু বলে আমি আমার প্রয়োজনীয় বক্তব্য লিখে দিলাম।

www.pathagar.com

চার

ঝড়ের পর প্রশান্তি

দু'দিন পর যখন আমাকে মি. এসকম্বের সাথে দেখা করতে নেয়া হলো তখনো আমি থানা ত্যাগ করিনি। আমার নিরাপত্তার জন্য দু'জন কনস্টেবল দেয়া হয়েছিল, যদিও তখন আর এতো সতর্কতার প্রয়োজন ছিল না।

যেদিন জাহাজ থেকে তীরে নামলাম, হলুদ পতাকা নামিয়ে ফেলার সাথে সাথেই দি ন্যাটাল এডভার্টাইজার পত্রিকার একজন প্রতিনিধি আমার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিলেন। তিনি আমাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছিলেন এবং তার জবাবে আমার বিরুদ্ধে আনীত প্রতিটি অভিযোগ আমি খণ্ডন করতে সমর্থ হয়েছিলাম। স্যার ফিরোজশাহ মেহতাকে ধন্যবাদ। ভারতে আমি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেছিলাম, যার সবগুলোর কপি আমার কাছে ছিল, সেই সাথে অন্যান্য লেখার কপিও ছিল। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীকে এসব লেখা দিলাম এবং তাকে দেখালাম যে ভারতে আমি এমন কোনো কথা বলিনি যা ইতিপূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকাতে আরো কঠোর ভাষায় বলিনি। আমি তাকে আরো দেখালাম যে কোরল্যান্ড ও নাদেরী জাহাজে করে দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রী নিয়ে আসার ব্যাপারে আমার কোনো হাত ছিল না। তাদের অনেকেই পুরনো বাসিন্দা এবং তাদের প্রায় সকলেরই গন্তব্যস্থল ছিল ট্রান্সভাল, সে ক্ষেত্রে তাদের নাটালে অবস্থানের প্রশ্নই আসে না। তখনকার দিনে যারা সম্পদের সন্ধানে আসত তাদের জন্য নাটালের চেয়ে ট্রান্সভাল ছিল বেশি সম্ভাবনাময়। তাই অধিকাংশ ভারতীয় সেখানে যাওয়াই পছন্দ করত।

এই সাক্ষাৎকার এবং আক্রমণকারীদের শাস্তি প্রদানে আমার অস্বীকৃতি এমন গভীর প্রভাব ফেলল যে ডারবানে ইউরোপীয়ানরা তাদের আচরণের জন্য লজ্জিত হলো। সংবাদপত্রে আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করে উচ্ছৃঙ্খল জনতার নিন্দা করা হলো। এভাবে বিনা বিচারে আমাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান আমার জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনল। এতে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের মর্যাদা বেড়ে গেল এবং আমার কাজ আরো সহজ হলো।

তিন কি চার দিন পরে আমি বাসায় গেলাম এবং অল্প দিনের মধ্যে পুনরায় বসতি স্থাপন করলাম। এ ঘটনার পরে আইন ব্যবসাতেও আমার পসার বেড়ে গেল।

কিন্তু এ ঘটনায় একদিকে ভারতীয় সম্প্রদায়ের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল, অপরদিকে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষও বাড়তে থাকল। যখনই প্রমাণিত হলো যে কোনো ভারতীয় সাহসের সাথে সংগ্রাম করতে পারে, তখন থেকেই তাকে বিপজ্জনক বলে গণ্য করা হলো। নাটালের আইনসভায় দুটো বিল আনা হলো, যার একটি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব গড়ে তুলতে, অপরটি ভারতীয় অভিবাসীদের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে। সৌভাগ্যের কথা, ভোটাধিকারের সংগ্রামের ফলে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে কোনো আইন পাশ করা যাবে না, অর্থাৎ বলতে গেলে আইনের দৃষ্টিতে

www.pathagar.com

বর্ণ ও জাতিগত বৈষম্য থাকবে না। উত্থাপিত বিলগুলোর ভাষা হতে এগুলো সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য বলে মনে হলেও সেগুলোর উদ্দেশ্য ছিল নিঃসন্দেহে নাটালের ভারতীয় বাসিন্দাদের ওপর আরো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা।

বিলগুলো আমার জনসেবার কাজ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিল এবং ভারতীয় সম্প্রদায়কে আগের যে কোনো সময়ের চাইতে কর্তব্যবোধে উজ্জীবিত করল। ভারতীয় ভাষায় সেগুলো অনুবাদ করা হলো এবং পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা হলো যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা এর সূক্ষ্ম মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারে। আমরা কলোনীসমূহের সেক্রেটারী বরাবরে আবেদন পাঠালাম, কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে হস্ত ক্ষেপ করতে অস্বীকার করলেন এবং বিলগুলো পাশ হয়ে আইনে পরিণত হলো।

এখন থেকে আমার প্রায় পুরো সময় কাটতে লাগল গণকাজে। শ্রী মনসুখলাল নাজার, যিনি ইতিপূর্বেই ডারবানে এসেছেন, তিনি আমার সাথে থাকতে এলেন এবং গণকাজে সময় দিয়ে আমার দায়িত্বভার কিছুটা লাঘব করলেন।

আমার অনুপস্থিতিতে শেঠ আদমজী মিয়াখান অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে তার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সদস্য সংখ্যা বাড়িয়েছেন এবং নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের তহবিলে প্রায় ১০০০ পাউন্ড জমা করেছেন। বিল আনার ফলে বর্ধিত সচেতনতা এবং জাহাজের যাত্রীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে কাজে লাগিয়ে আমি সদস্য সংখ্যা ও তহবিল বৃদ্ধির আবেদন জানালাম। এতে তহবিল বেড়ে দাঁড়াল ৫০০০ পাউন্ডে। আমার ইচ্ছে ছিল কংগ্রেসের জন্য একটা স্থায়ী তহবিলের ব্যবস্থা করা যাতে এর নিজ নামে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করা যায় এবং তা ভাড়া দিয়ে সেই টাকায় এর কর্মকাণ্ডের ব্যয় নির্বাহ করা যায়। কোনো গণপ্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় এটা ছিল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। আমার প্রস্তাবটা সহকর্মীদের কাছে উপস্থাপন করলাম এবং তারা এটাকে স্বাগত জানাল। যে সম্পত্তি কেনা হলো তা লীজ দেয়া হলো লীজ থেকে প্রাপ্ত টাকা কংগ্রেসের চলতি ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট ছিল। একটা শক্তিশালী ট্রাস্টি গঠন করে তার ওপর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করা হলো, যা আজ পর্যন্তও বহাল আছে। তবে এ নিয়ে অন্তঃকলহ সৃষ্টি হওয়ায় ঐ সম্পত্তির আয় এখন কোর্টে জমা হয়।

আমি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে চলে আসার পরে এ দুঃখজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এ বিভেদ সৃষ্টির অনেক আগেই গণপ্রতিষ্ঠানের জন্য স্থায়ী তহবিল সংক্রান্ত আমার ধারণা পরিবর্তিত হয়েছিল। অনেকগুলো গণপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার অভিজ্ঞতা লাভের পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে গণপ্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য স্থায়ী তহবিল থাকা ভালো নয়। স্থায়ী তহবিলের মধ্যেই গণপ্রতিষ্ঠানের নৈতিক অধঃপতনের বীজ লুকিয়ে থাকে। গণপ্রতিষ্ঠানের অর্থ হচ্ছে, এমন কোনো প্রতিষ্ঠান যা জনগণের অনুমোদনে জনগণের টাকায় পরিচালিত হয়। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান যখন জনগণের সমর্থন হারায় তখন এর টিকে থাকার অধিকারও বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। যেসব প্রতিষ্ঠান স্থায়ী তহবিল দ্বারা পরিচালিত হয় তারা

www.pathagar.com

জনমতকে উপেক্ষা করে এবং প্রায়ই জনমতের বিরোধী কাজ করে। আমাদের দেশে পদে পদে এর প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। কতকগুলো তথাকথিত ধর্মীয় ট্রাস্ট তাদের আয়-ব্যয়ের লিখিত হিসাব পত্র রাখাও ছেড়ে দিয়েছে। ট্রাস্টিরা এগুলোর মালিক বনে গেছে এবং তারা কারো কাছেই দায়বদ্ধ নয়। এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে একটা গণ প্রতিষ্ঠানের বেঁচে থাকার জন্য আদর্শ হলো প্রকৃতির নিয়মে একদিন একদিন করে বাঁচা। যেসব প্রতিষ্ঠান জন সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয় তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ তার ব্যবস্থাপনার জনপ্রিয়তা ও সততার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ এবং আমার মতে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের এ পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া উচিত। কিন্তু আমাকে কেউ ভুল বুঝবেন না। আমার মতামত যে সব প্রতিষ্ঠান প্রকৃতিগতভাবেই স্থায়ী বিল্ডিং ছাড়া পরিচালিত হতে পারে না তাদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হলো এর চলতি ব্যয় প্রতি বছরের স্বতঃস্ফূর্তভাবে গৃহীত চাঁদার টাকা হতে নির্বাহ হওয়া উচিত।

আমার এ অভিমত দৃঢ়তর হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের দিনগুলোতে। সে সময় ছয় বছর ব্যাপী চমকপ্রদ প্রচারাভিযান স্থায়ী অর্থায়ন ছাড়াই পরিচালিত হয়েছিল, যদিও এর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার প্রয়োজন ছিল। আমার মনে আছে এমনও সময় গেছে যখন চাঁদা না পেলে পরের দিন কিভাবে চলবে তা আমাদের জানা ছিল না। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা এখনই বলব না। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে পাঠক আমার উপরে বর্ণিত অভিমতের সমর্থনে পর্যাপ্ত প্রমাণ পাবেন।

পাঁচ
বাচ্চাদের শিক্ষা

১৮৯৭ সালের জানুয়ারীতে আমি যখন ডারবানে নামলাম তখন আমার সাথে ছিল তিনটি বালক—দশ বছর বয়সী আমার বোনের ছেলে এবং নয় ও পাঁচ বছর বয়সী আমার দুই ছেলে। তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা কোথায় করি? আমি তাদেরকে ইউরোপীয়ান শিশুদের স্কুলে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু তা হতো আমার প্রতি অনুগ্রহ ও সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। কারণ আর কোনো ভারতীয় শিশুকে সেখানে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি। এদের জন্য ক্রিশ্চিয়ান মিশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্কুল ছিল, কিন্তু আমার ছেলেদের আমি সেখানে পাঠাতে চাচ্ছিলাম না, কারণ সেসব স্কুলে যে শিক্ষা দেয়া হতো তা আমার পছন্দ ছিল না। সেখানকার শিক্ষার মাধ্যম ছিল শুধু ইংরেজি। চেষ্টা করলে হয়তো অশুদ্ধ হিন্দী বা তামিল শেখানো যেত, তাও অতি কষ্টে ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল। কিন্তু আমি সেটা এবং অন্যান্য অসুবিধাগুলো মেনে নিতে পারছিলাম না। ইতিমধ্যে আমি নিজেই তাদের পড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছিলাম। কিন্তু তা ছিল খুবই অনিয়মিত এবং চেষ্টা করেও আমি কোনো যোগ্য গুজরাটী শিক্ষক যোগাড় করতে পারলাম না।

www.pathagar.com

এ অবস্থায় আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। একজন ইংরেজি শিক্ষকের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলাম, যিনি আমার নির্দেশনা মতো বাচ্চাদের পড়াবেন। শিক্ষক তাদেরকে কিছু বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা দেবেন, বাকীটা অনিয়মিতভাবে যতটা পারি আমি নিজে শেখাব। সুতরাং মাসে ৭ পাউন্ড বেতনে একজন গভর্নেস নিয়োগ করলাম। এভাবে কিছুদিন চলল, কিন্তু তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। আমি বাচ্চাদের সাথে সম্পূর্ণ মাতৃভাষায় কথোপকথন করতাম যার মাধ্যমে তারা অল্প কিছু গুজরাটী শিখল। আমি তাদেরকে ভারতে ফেরত পাঠাতে ইচ্ছুক ছিলাম না, কারণ তখন পর্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে ছোট বাচ্চাদেরকে তাদের মা-বাবা থেকে আলাদা রাখা উচিত নয়। বাচ্চারা সুনিয়ন্ত্রিত সংসারে স্বাভাবিক নিয়মে যে শিক্ষা আত্মস্থ করে ছাত্রবাসে থেকে তা অর্জন করা অসম্ভব। তাই বাচ্চাদেরকে আমি আমার সাথে রেখেছিলাম।

আমি আমার বড় ছেলে ও ভাগ্নেকে ভারতের একটি আবাসিক স্কুলে ভর্তি করেছিলাম, কিন্তু অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল। পরবর্তীকালে বড় ছেলের বয়স হয়ে যাবার অনেক পরে আমার থেকে পৃথক হয়ে ভারতে চলে গিয়েছিল আহমেদাবাদের একটা হাই স্কুলে ভর্তি হতে। আমার মনে হয় আমি যতটা ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম আমার ভাগ্নে তাতেই সন্তুষ্ট ছিল। দুর্ভাগ্যবশত পূর্ণ যুবক হয়ে সংক্ষিপ্ত রোগ ভোগের পর সে মারা যায়। আমার অন্য তিন ছেলে কখনো পাবলিক স্কুলে পড়েনি। তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহী অভিভাবকদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার প্রয়োজনে আমি একটা স্কুল খুলেছিলাম, তাতে তারা কিছুদিন নিয়মিত পড়ালেখা করেছিল।

এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। শিশুদেরকে যতটা সময় দেয়া প্রয়োজন, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমি তা দিতে পারিনি। তাদেরকে যে শিক্ষা দেবার ইচ্ছে ছিল তাদের প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ দিতে অপারগতা ও অন্যান্য অনিবার্য কারণে তা সম্ভব হয়নি এবং এ ব্যাপারে আমার পুত্রদের অভিযোগও রয়েছে। যখনই তারা কোন এম. এ বা বি. এ এমনকি ম্যাট্রিকুলেট ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছে, তারা বোধ হয় স্কুল শিক্ষার অভাবটা অনুভব করেছে।

এতদসত্ত্বেও আমার অভিমত হচ্ছে এই যে, তাদেরকে পাবলিক স্কুলে পড়ানোর ওপর যদি আমি জোর দিতাম তাহলে তারা সেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতো যা কেবল অভিজ্ঞতার স্কুল থেকে বা পিতামাতার সার্বক্ষণিক সংস্পর্শে থেকে পাওয়া যায়। তারা যা অর্জন করেছে সে বিষয়ে আজ আমি যেমন দুশ্চিন্তামুক্ত তেমনটি হতে পারতাম না যদি তারা আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইংল্যান্ড বা দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃত্রিম শিক্ষায় শিক্ষিত হতো। সেক্ষেত্রে আজ তাদের জীবনে তারা যে সরলতা ও সেবার মনোভাব দেখাচ্ছে তা কখনো শিখতে পারত না। বরং তাদের কৃত্রিম জীবন যাপন আমার গণ কাজের পথে গুরুতর বাধা হয়ে দাঁড়াত। অতএব যদিও আমি তাদেরকে আমার বা তাদের সন্তুষ্টি অনুযায়ী শিক্ষা দিতে পারিনি, কিন্তু অতীতের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত করে বলতে পারি না যে আমি তাদের প্রতি

www.pathagar.com

আমার কর্তব্য যথাসাধ্য পালন করিনি। আর তাদেরকে পাবলিক স্কুলে না পাঠানোর জন্য আমার কোনো দুঃখও নেই। আমি সর্বদা অনুভব করছি যে আমার বড় ছেলের মধ্যে আজ যেসব অনাকাঙ্ক্ষিত গুণাবলী দেখছি তা যেন আমার নিজের ছেলেবেলার বিশৃঙ্খল ও অনিয়ন্ত্রিত জীবনের প্রতিচ্ছবি। সে সময়টাকে আমি অপরিপক্ব জ্ঞান ও স্বেচ্ছাচারিতার সময় বলে মনে করি। আমার জীবনের ঐ সময়টার সাথে বড় ছেলের জীবনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বছরগুলোর মিল রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সে আমার জীবনের ঐ সময়টাকে স্বেচ্ছাচারিতা ও অনভিজ্ঞতার বয়স বলে স্বীকার করতে নারাজ। উল্টো সে বিশ্বাস করে যে ওটাই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল সময় এবং মতিভ্রমের কারণে ঘটে যাওয়া পরবর্তী পরিবর্তনগুলোকে ভুল করে আলোকপ্রাপ্ত বলা হচ্ছে। এসব সে বলতেই পারে। কেনইবা সে ভাববে না যে আমার জীবনের প্রথম বছরগুলো ছিল চেতনা জাগৃতির এবং পরবর্তী আমূল পরিবর্তনের সময়টা মতিভ্রম ও আত্মপ্রচারের? আমি বন্ধুদের কাছ থেকেও প্রায়ই এরূপ বিব্রতকর প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি, আমার ছেলেদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিলে কি ক্ষতি হতো? আমার কী অধিকার আছে তাদেরকে নিজ আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী চলতে না দেয়ার? তাদের ইচ্ছেমতো ডিগ্রী নেয়ার বা পেশা বেছে নেয়ার পথে আমি কেন বাধা হয়ে দাঁড়ালাম?

এসব প্রশ্নের তেমন যথার্থতা আছে বলে আমি মনে করি না। আমি অগণিত ছাত্রের সংস্পর্শে এসেছি। আমি নিজে বা অন্যদের মাধ্যমে শিক্ষা সংক্রান্ত আমার খেয়ালিপনা অন্য শিশুদের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি এবং তার ফলাফল লক্ষ্য করেছি। আমার ছেলেদের সমসাময়িক অনেক যুবককে আমি আজো চিনি। আমার মনে হয় না মানুষ হিসেবে তারা আমার ছেলেদের চাইতে উৎকৃষ্ট বা তাদের কাছ থেকে আমার ছেলেদের বেশি কিছু শেখার আছে।

তবে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল অপেক্ষা করছে ভবিষ্যতের গর্ভে। এখানে এ বিষয়টি আলোচনা করার উদ্দেশ্য হলো সভ্যতার ইতিহাসের ছাত্রের জন্য সুশৃঙ্খল গৃহশিক্ষা ও স্কুল শিক্ষার মধ্যে যে পার্থক্য হতে পারে তা দেখানো। তেমনি অভিভাবকরা তাদের জীবনে পরিবর্তনের সূচনা করলে তার প্রভাবেও পার্থক্য থাকবে। এ অধ্যায়টি লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন সত্যের পূজারী তার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কত দূর অগ্রসর হতে পারে তা তুলে ধরা এবং স্বাধীনতার পূজারীকে দেখানো যে পাষাণ দেবতা কত রকমের উৎসর্গ চাইতে পারে। আমার যদি আত্মসম্মানবোধ না থাকত এবং যে শিক্ষা অন্য শিশুরা পায় না সেই শিক্ষায় আমার ছেলেদের শিক্ষিত করে তৃপ্ত হতাম তাহলে আমি তাদেরকে স্বাধীনতা ও আত্মসম্মানবোধের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করতাম, যে শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিসর্জন দিয়ে আমি তাদেরকে দিতে পেরেছি। আর যখন স্বাধীনতা ও শিক্ষা এ দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নিতে বলা হয় তখন প্রথমটা যে দ্বিতীয়টার চেয়ে হাজার গুণে শ্রেয় সেকথা কে না বলবে?

www.pathagar.com

১৯২০ সালে আমি দাসত্বের দুর্গ স্কুল কলেজগুলো থেকে যেসব যুবকের বেরিয়ে আসার ডাক দিয়েছিলাম এবং যাদেরকে বলেছিলাম দাসত্বের শৃঙ্খলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের চেয়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অশিক্ষিত থাকা এবং পাথর ভাঙাও অনেক ভালো, তারা সম্ভবত এখন আমার ঐ উক্তির ভিত্তি খুঁজে পাবে।

ছয়
সেবার প্রবণতা

আমার পেশা ভালোভাবেই চলছিল কিন্তু তা আমাকে মোটেই সন্তুষ্ট করতে পারল না। আমার জীবন যাত্রা আরো সহজ সরল করা এবং ভারতীয়দের জন্য বাস্তব কিছু করার চিন্তা আমাকে সর্বক্ষণ অস্থির করে তুলল। এমন সময়ে একজন কুষ্ঠ রোগী আমার কাছে এলো। সুতরাং আমি তাকে আশ্রয় দিলাম, তার ক্ষত ড্রেসিং করে দিলাম এবং তার সেবাযত্ন করতে থাকলাম। কিন্তু এটা আমি অনির্দিষ্টকাল ধরে করতে পারলাম না। তাকে সব সময় আমার কাছে রাখব আমার সেরূপ ইচ্ছার অভাব ছিল, সংগতিও ছিল না। তাই আমি তাকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের সরকারী হাসপাতালে পাঠালাম।

কিন্তু আমি মনে শান্তি পাচ্ছিলাম না। মানবতার কল্যাণে কিছু করার জন্য আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। ডা. বুথ ছিলেন সেন্ট আইডান মিশনের প্রধান। তিনি ছিলেন দয়ালু লোক এবং তার রুগীদের বিনে পয়সায় চিকিৎসা দিতেন। পার্সী রুস্তমজীকে ধন্যবাদ। তাঁর বদান্যতায় ডা. বুথের তত্ত্বাবধানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন সম্ভব হলো। এ হাসপাতালে নার্স হিসেবে কাজ করার জন্য আমি প্রবল ইচ্ছে অনুভব করলাম। প্রতিদিন ওষুধ বিতরণের কাজে এক থেকে দু'ঘন্টা লাগত এবং আমি মন স্থির করে ফেললাম আমার অফিসের কাজের মধ্য থেকে এ সময় বের করে নেব যাতে আমি হাসপাতাল সংলগ্ন ডিসপেনসারিতে কম্পাউন্ডারের পদটি পূরণ করতে পারি। আমার পেশাগত দায়িত্বের বেশিরভাগ ছিল চেম্বারে বসা, সম্পত্তি হস্তান্তরের আইনগত প্রক্রিয়া সম্পাদন এবং সালিশ নিষ্পত্তির মধ্যস্থতা করা। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টেও অবশ্য অল্প ক'টি মামলা ছিল কিন্তু সেগুলো বিতর্কিত প্রকৃতির নয় এবং মি. খান, যিনি আমার সাথে দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিলেন এবং আমার সাথেই থাকতেন, তিনি আমার অনুপস্থিতিতে মামলাগুলো চালাতেন। সুতরাং আমি ছোট হাসপাতালটিতে কাজ করার সময় পেলাম। তার মানে হাসপাতালে যাওয়া আসার সময়সহ সকালের দু'ঘন্টা সময়। এ কাজ করতে গিয়ে আমি কিছুটা শান্তি পেলাম। এখানে আমার কাজের মধ্যে ছিল রুগীদের অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করে তা ডাক্তারের নিকট উপস্থাপন এবং প্রেসক্রিপশান মোতাবেক ওষুধ বিতরণ। এ কাজের মাধ্যমে আমি রোগাক্রান্ত ভারতীয়দের নিবিড় সান্নিধ্য পেলাম। তাদের অধিকাংশই ছিল তামিল, তেলেগু বা উত্তর ভারতীয়।

www.pathagar.com

শিশুদের গড়ে তোলার বিষয়টি সর্বদাই আমার মাথায় ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার দুই ছেলের জন্ম হয়েছিল এবং তাদের লালন পালনে আমার হাসপাতালে সেবার অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছিল। আমার স্বতন্ত্র মনোভাব ছিল সার্বক্ষণিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার উৎস। আমি ও আমার স্ত্রী সিদ্ধান্ত নিলাম তার সন্তান প্রসবকালে সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করব। কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তে যদি ডাক্তার ও নার্স আমাদেরকে পরিত্যাগ করে তাহলে আমরা কি করব? তাহলে নার্সটাকে হতে হবে ভারতীয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভারতীয় নার্স পাওয়া কতটা কঠিন তা ভারতে অনুরূপ অবস্থা থেকে সহজেই অনুমেয়। সুতরাং নিরাপদ প্রসবের জন্য কি কি প্রয়োজন তা আমি খতিয়ে দেখলাম। আমি ডা. ত্রিভুবনানন্দের লেখা "মা নে শিখামান" (মায়েদের প্রতি উপদেশ) বইটি পড়লাম এবং ঐ বইয়ের উপদেশ মতো আমার দুই ছেলেকে লালন পালন করলাম। এর সাথে অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতাও যুক্ত হলো। একজন নার্সের সেবাও গ্রহণ করা হলো, কিন্তু তা প্রতিবারে দু'মাসের বেশি সময়ের জন্য নয়। নার্সের কাজ ছিল মূলত আমার স্ত্রীকে সাহায্য করা, শিশুদের লালন-পালন নয়। শিশুদের লালন পালন আমি নিজেই করতাম।

সর্বশেষ ছেলের জন্মের সময় সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হলো। প্রসব বেদনা হঠাৎ করে শুরু হলো। তাৎক্ষণিকভাবে ডাক্তার পাওয়া গেল না। দাইকে আনতেও কিছু সময় চলে গেল। আর সে উপস্থিত থাকলেও প্রসবে সহায়তা করতে পারত না। প্রসবটা যাতে নিরাপদ হয় আমাকেই তা দেখতে হলো। ডা. ত্রিভুবনানন্দের বই আমাকে এ ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করল। আমি এ ব্যাপারে মোটেই ঘাবড়ে যাইনি।

আমি এ বিষয়ে একমত যে সঠিকভাবে শিশু পালনের জন্য পিতামাতার নবজাতক শিশুর যত্ন সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। প্রতিপদে আমি এ বিষয়ে পড়াশুনার সুফল পেয়েছি। আমার যদি এ বিষয়ে পড়াশুনা না থাকত এবং তা কাজে না লাগাতাম, তাহলে আমার ছেলেরা আজ যে সুস্বাস্থ্য উপভোগ করছে তা সম্ভব হতো না। আমাদের মধ্যে একটা কুসংস্কার প্রচলিত আছে যে শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বছর পর্যন্ত শেখার কিছু নেই। প্রকৃত সত্য বরং এর উল্টো অর্থাৎ শিশু প্রথম পাঁচ বছরে যা শেখে পরবর্তী সারা জীবনেও তা শেখে না। গর্ভ ধারণের পর হতেই শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। শিশুর ভেতর গর্ভ ধারণের মুহূর্তে পিতামাতার দৈহিক ও মানসিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটে। অতঃপর গর্ভকালীন সময়ে মায়ের মেজাজ, ইচ্ছা ও মানসিক অবস্থা ও জীবন যাত্রা শিশুর ওপর প্রভাব ফেলতে থাকে। জন্মের পর শিশু পিতামাতার অনুকরণ করে এবং বেড়ে ওঠার জন্য বেশ কয়েক বছর ধরে সম্পূর্ণরূপে তাদের ওপর নির্ভর করে।

এসব বিষয় যে দম্পতি বুঝতে পারে তারা সন্তান কামনা ছাড়া কেবল দৈহিক কামনা চরিতার্থ করার জন্য কখনো মিলিত হবে না। খাওয়া ও ঘুমানোর মতো

www.pathagar.com

রতিক্রিয়াও একটি দৈনন্দিন প্রয়োজন বলে বিশ্বাস করাকে আমি চূড়ান্ত অজ্ঞতা বলে মনে করি। প্রজনন ক্রিয়ার ওপর পৃথিবীর অস্তিত্ব নির্ভরশীল এবং যেহেতু পৃথিবী হচ্ছে ঈশ্বরের ক্রীড়াস্থল ও তাঁর মহিমার প্রতিফলন, সেহেতু পৃথিবীর সুশৃঙ্খল অগ্রগতির জন্য প্রজনন ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। যে এটা বুঝতে পারবে, সে যে কোনো মূল্যে তার কামনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, ভবিষ্যৎ বংশধরের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক কল্যাণের জন্য জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করবে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে সে জ্ঞানের সুফল দান করবে।

সাত
ব্রহ্মচর্য-১

আমরা এখন এ কাহিনীর এমন এক পর্যায়ে পৌছেছি যখন আমি গভীরভাবে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণের কথা চিন্তা করছিলাম। বিয়ের পর থেকে আমি একগামী আদর্শের অনুসারী ছিলাম। স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ততা ছিল আমার সত্যের প্রতি ভালোবাসার অংশ। দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমি ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের গুরুত্ব বুঝতে পারলাম, এমনকি স্ত্রী সম্ভোগের ব্যাপারেও। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারছি না কোন পরিস্থিতি বা কোন বই আমার চিন্তাধারাকে এ পথে নিয়ে এলো, তবে কিছু কিছু মনে পড়ে যে রায়চাঁদভাই, যার কথা আগেই বলেছি, তাঁর প্রভাব এর পেছনে কাজ করেছে। তাঁর সাথে কথোপকথনের কিছু অংশ এখনো মনে পড়ে। একবার আমি পতিভক্তির জন্য মিসেস গ্লাডস্টোনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলাম। আমি কোনো এক বইতে পড়েছিলাম মিসেস গ্লাডস্টোন হাউজ অব কমন্সের ভেতরেও মি. গ্লাডস্টোনের চা তৈরি করে দিতেন এবং এই কীর্তিমান দম্পতির জীবনে এটা একটা নিয়মে পরিণত হয়েছিল। আমি কবিকে এ কাহিনী বললাম এবং প্রসঙ্গক্রমে তাদের দাম্পত্য প্রেমের প্রশংসা করলাম। রায়চাঁদভাই জিজ্ঞেস করলেন, "স্ত্রী হিসেবে মি. গ্লাডস্টোনের প্রতি মিসেস গ্লাডস্টোনের ভালোবাসা আর মি. গ্লাডস্টোনের সাথে সম্পর্কের বাইরে মিসেস গ্লাডস্টোনের একাগ্র সেবা এ দুটোর মধ্যে কোনটিকে তুমি বেশি মূল্য দিচ্ছ? ধরে নাও সে যদি তার বোন হতো, বা তার অনুগত চাকর, এবং তার জন্য একই সেবা দিত তাহলে তুমি কি বলতে? এরকম বোন বা চাকরের দৃষ্টান্ত কি আমাদের মাঝে নেই? ধরো, একজন পুরুষ চাকরের মধ্যে একই রকম ভালোবাসা ও আনুগত্য পেলে, তাহলে কি তুমি একই রকম খুশি হবে যেমন মিসেস গ্লাডস্টোনের বেলায় হচ্ছ? আমার এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখো।"

রায়চাঁদভাই নিজে বিবাহিত। আমার ধারণা তাঁর কথাগুলো এ মুহূর্তে কর্কশ শোনালেও তা আমাকে অপ্রতিরোধ্যভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলল। অনুভব করলাম চাকরের আনুগত্য স্ত্রীর আনুগত্যের চেয়ে হাজার গুণে প্রশংসনীয়। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্যের মধ্যে অসাধারণ কিছু নেই, কারণ তাদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য বন্ধন রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আনুগত্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু মনিব ও ভৃত্যের মধ্যে একই

www.pathagar.com

রকম আনুগত্য সৃষ্টি করতে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন। কবির দৃষ্টিভঙ্গি আমার কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

নিজেকে প্রশ্ন করলাম, "স্ত্রীর সাথে আমার সম্পর্কের কি হবে? স্ত্রীকে রতিক্রিয়ার যন্ত্র বানানোর মধ্যেই কি তার প্রতি আমার বিশ্বস্ততা নিহিত ছিল? যতদিন আমি কামনার দাস ছিলাম ততদিন আমার বিশ্বস্ততা ছিল মূল্যহীন। স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করতে গিয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে, সে যৌন উচ্ছৃঙ্খল ছিল না। সুতরাং আমি চাইলেই ব্রহ্মচারী ব্রত গ্রহণ আমার জন্য অতি সহজ ব্যাপার ছিল। এ ক্ষেত্রে আমার ইচ্ছার দুর্বলতা ও কাম রিপুর প্রতি দুর্বলতা ছিল প্রধান অন্তরায়।

এ বিষয়ে আমার বিবেক জাগ্রত হবার পরেও আমি দু'বার ব্যর্থ হলাম। আমার ব্যর্থতার কারণ হলো চেষ্টাকে সংহত করার যে প্রেরণা তা তুঙ্গে ছিল না। আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল আরো সন্তান জন্মদান বন্ধ করা। ইংল্যান্ডে থাকাকালে জন্ম নিরোধক সম্পর্কে আমি সামান্য পড়েছিলাম। নিরামিষ ভোজন সংক্রান্ত অধ্যায়ে আমি ইতিপূর্বেই ডা. আলিনসনের জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচারণা সম্পর্কে উলেখ করেছি। আমার ওপর এর অস্থায়ী প্রভাব পড়ে থাকতে পারে। মি. হিলস কর্তৃক এ পদ্ধতির বিরোধীতা এবং বাহ্যিক এ ব্যবস্থার বিপরীতে অভ্যন্তরীণ নিজস্ব প্রচেষ্টা, এক কথায় আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি কার্যকর ও সুদূরপ্রসারী এবং যথাসময়ে তা মানিয়ে যায়। সুতরাং যখন দেখলাম যে আমি আর সন্তান চাচ্ছিনা তখন আত্ম-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা শুরু করলাম। এ কাজে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি দেখা দিল। আমরা স্বামী-স্ত্রী পৃথক বিছানায় ঘুমাতে লাগলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম সারাদিনের কাজ শেষে যখন একেবারে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত হব তখন শুতে যাব। এসব চেষ্টায় খুব একটা ফল হলো না। তবে আমি যখন অতীতের দিকে তাকাই তখন অনুভব করি যে অতীতের পুঞ্জীভূত চেষ্টা ও ব্যর্থতার ফলেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়েছিল।

অবশেষে অনেক দেরীতে ১৯০৬ সালে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। সত্যাগ্রহ তখনো শুরু হয়নি। এর আগমন সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণাও তখন ছিল না। আমি তখন জোহান্সবার্গে প্র্যাকটিস করছিলাম। এটা ছিল বোয়ার যুদ্ধের পরে নাটালের জুলু বিদ্রোহের সময়কার ঘটনা। এ বিদ্রোহ উপলক্ষে আমি নাটাল গভর্নমেন্টকে সেবা প্রদানের প্রস্তাব দিলাম। আমার প্রস্তাব গৃহীত হলো, যার বিস্তারিত বিবরণ অন্য অধ্যায়ে বর্ণনা করব। কিন্তু সেবার কাজ করতে গিয়ে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের চিন্তা আমাকে উন্মত্ত করে তুলল এবং আমার অভ্যাস মতো এসব চিন্তা নিয়ে সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন গণকাজের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। বিদ্রোহের সময়ে সেবা দানের জন্য জোহান্সবার্গে আমার বাসস্থান ছেড়ে দিতে হলো। যে বাসাটা আমি অতি যত্নে আসবাবপত্রে সজ্জিত করেছিলাম, সেবা দানের কাজে রত হবার এক মাসের মধ্যে তা ছেড়ে দিতে হলো। আমার স্ত্রী ও ছেলেদেরকে ফিনিক্সে নিয়ে গেলাম এবং নাটাল বাহিনীর অধীনে অ্যামবুলেন্স কোর পরিচালনা করলাম। ঐ সময়ে যে কঠিন কুচকাওয়াজ করতে হতো তার মধ্যে হঠাৎ ধারণাটা মাথায় এলো

www.pathagar.com

যে আমি যদি এ পদ্ধতিতে আমার সম্প্রদায়ের সেবা করতে চাই তাহলে আমাকে অবশ্যই সম্পদ ও সন্তান লাভের বাসনা ত্যাগ করতে হবে এবং সংসার ত্যাগী "বানপ্রস্থের" জীবন যাপন করতে হবে।

জুলু বিদ্রোহ আমাকে ছয় সপ্তাহের বেশি ব্যস্ত রাখতে পারেনি। কিন্তু এই স্বল্প সময়টা আমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল। ব্রত গ্রহণের গুরুত্ব অতীতের সকল সময়ের চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে অনুভব করতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম যে ব্রত গ্রহণ প্রকৃত স্বাধীনতার দুয়ার বন্ধ করার পরিবর্তে তা খুলে দেয়। এ সময় পর্যন্ত আমি সফল হতে পারিনি, কারণ ইচ্ছে শক্তির অভাব ছিল, নিজের ওপর আস্থা ছিল না, ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিশ্বাস ছিল না, আর সে কারণেই আমার মন সন্দেহের উত্তাল সাগরে দোল খাচ্ছিল। আমি বুঝতে পারলাম যে ব্রত গ্রহণ না করার ফলে মানুষ প্রলোভনের দিকে আকৃষ্ট হয়, আর ব্রতের বন্ধনে আবদ্ধ হলে তা বহুগামী লাম্পট্য থেকে একগামী বিবাহের মতো পথ দেখায়। "আমি চেষ্টায় বিশ্বাস করি, ব্রতের বন্ধনে নিজেকে বাঁধতে চাই না"—এ ধরনের উক্তি দুর্বল মনের পরিচায়ক এবং বিষয়টা এড়িয়ে যাবার সূক্ষ্ম বাসনার বহিঃপ্রকাশ। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করতে অসুবিধা কোথায়? যে সর্প আমাকে দংশন করবে বলে জানি তা থেকে আমরা পালানোর প্রাণপণ ব্রত গ্রহণ করি, কেবল নিছক চেষ্টা করি না। কারণ আমরা জানি, এ ক্ষেত্রে নিছক চেষ্টা নিশ্চিত মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। নিছক চেষ্টার অর্থ সাপ আমাকে হত্যা করবে এ সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতা। সুতরাং প্রকৃত সত্য হলো নিছক চেষ্টা নিয়ে বসে থাকার অর্থ আমি এখনো সুনির্দিষ্টভাবে কাজে নেমে পড়ার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারছি না। "কিন্তু মনে কর, ভবিষ্যতে আমার মনোভাবের পরিবর্তন হতে পারে, সে ক্ষেত্রে কেমন করে ব্রতের বন্ধনে আবদ্ধ হই?"—এরকম সন্দেহ আমাদেরকে প্রায়ই পিছিয়ে দেয়। এরূপ সন্দেহ কোনো বস্তুকে আনুষ্ঠানিকভাবে ত্যাগ করার ক্ষেত্রে স্পষ্ট ধারণার অভাবকেও প্রকাশ করে। সে কারণেই সাধু নিষ্কলুষানন্দ গেয়েছেন—

"বিরাগহীন ত্যাগ স্থায়িত্ববিহীন।"

সুতরাং বাসনা যেখানে তিরোহিত, ত্যাগের ব্রত সেখানে স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী।

আট
ব্রহ্মচর্য-২

পূর্ণাঙ্গ আলাপ আলোচনা ও পরিপক্ক বিচার বিবেচনার পর ১৯০৬ সালে আমি ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করলাম। স্ত্রীকে আমার চিন্তা ভাবনার অংশীদার করিনি, তবে ব্রত গ্রহণের সময় তার সাথে আলোচনা করলাম। তার কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গিয়ে বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হলাম। প্রয়োজনীয় মনের জোর আমার ছিল না। আমার কাম রিপুকে কিভাবে দমন করি?

www.pathagar.com

স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক ছিন্ন করাটা তখন অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে গণ্য করা হতো। কিন্তু ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতার ওপর আস্থা রেখে আমি শুরু করে দিলাম। ব্রত গ্রহণের বিশ বছর পর আমি যখন পিছন ফিরে তাকাই আমার মন আনন্দে ও বিস্ময়ে ভরে ওঠে। ১৯০১ সাল থেকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের কম বেশি সফল অনুশীলন চলে আসছিল। কিন্তু ব্রত গ্রহণের যে আনন্দ ও মুক্তির অনুভূতি তা ১৯০৬ সালের পূর্বে অনুভব করিনি। ব্রত গ্রহণের পূর্বে যে কোনো মুহূর্তে প্রলোভনে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। এখন প্রলোভনের বিরুদ্ধে ব্রত একটা নিশ্চিত সুরক্ষা। ব্রহ্মচর্য ব্রতের বিপুল সম্ভাবনা আমার কাছে প্রতিদিন আরো বেশি বেশি স্পষ্ট হতে লাগল। যখন ব্রত গ্রহণ করি তখন আমি ফিনিক্সে ছিলাম। অ্যামবুলেন্সের কাজ থেকে মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে আমি ফিনিক্সে চলে গেলাম, সেখান থেকে ফিরতে হলো জোহান্সবার্গে। এখানে ফিরে আসার এক মাসের মধ্যেই সত্যাগ্রহের ভিত্তি স্থাপিত হলো। ব্রহ্মচর্য ব্রত যেন আমার অজান্তেই আমাকে এর জন্য প্রস্তুত করছিল। সত্যাগ্রহ পূর্ব পরিকল্পিত কোনো ব্যাপার ছিল না। আমি না চাইতেই এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছিল। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমার অতীতের সকল পদক্ষেপই এই লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে। জোহান্সবার্গে বাসস্থান তুলে দিয়ে, বিরাট অংকের সাংসারিক ব্যয় বন্ধ করে আমি ফিনিক্সে গিয়েছিলাম ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করব বলে।

সঠিকভাবে ব্রহ্মচর্য পালনের অর্থ ব্রহ্মাকে বুঝতে পারা—এ জ্ঞান আমি শাস্ত্র পড়ে অর্জন করিনি। এটা ধীরে ধীরে আমার অভিজ্ঞতা থেকে এসেছে। এ বিষয়ে শাস্ত্রের বিধান আমি পরবর্তী জীবনে পড়েছি। দিনের পর দিন আমি এ জ্ঞান লাভের দিকে অগ্রসর হয়েছি যে, ব্রহ্মচর্যের মধ্যেই শরীর, মন ও আত্মার সুরক্ষা নিহিত আছে। কারণ ব্রহ্মচর্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার কঠোর কোনো প্রক্রিয়া নয়, এটা প্রশান্তি ও আনন্দের ব্যাপার। প্রতিদিন এর সৌন্দর্য নতুনরূপে বিকশিত হয়।

যদিও এর আনন্দ ক্রমবর্ধমান, কিন্তু পাঠক ভাববেন না যে আমার জন্য তা সহজ ব্যাপার ছিল। আমার বয়স ৫৬ বছর পার হয়ে যাবার পরও আমার জন্য এটা ছিল কঠিন। প্রতিনিয়ত আমি বুঝতে পারি যে এ কাজ ধারালো তরবারির ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার মতো, প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হয়।

এ ব্রত পালনের প্রথম অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হলো রসনাকে সংযত রাখা। আমি দেখলাম যে জিহ্বাকে সংযত রাখতে পারলে ব্রত পালন করা আমার জন্য খুব সহজ। সুতরাং এখন পথ্যবিদ্যা নিয়ে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো শুধু নিরামিষ ভোজনের দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং ব্রহ্মচারীর দৃষ্টিকোণ থেকেও চালাতে লাগলাম। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আমি দেখতে পেলাম যে একজন ব্রহ্মচারীর খাবার হওয়া উচিত অতি অল্প, অতি সাধারণ ও মশলাবিহীন, সম্ভব হলে রান্নাবিহীন।

www.pathagar.com

ছয় বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আমি দেখেছি যে ব্রহ্মচারীর আদর্শ খাবার হলো তাজা ফল আর বাদাম।

এ খাবার গ্রহণের ফলে যে কাম রিপু থেকে সুরক্ষা পেয়েছিলাম তা খাদ্যাভ্যাসের ঐ পরিবর্তনের আগে জানা ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন শুধু ফল আর বাদাম খেয়ে থাকতাম তখন ব্রহ্মচর্য পালন করতে বেগ পেতে হয়নি। দুধ খাওয়া শুরু করার পর থেকে ব্রহ্মচর্য পালন কষ্টকর চেষ্টার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলাহার থেকে দুধ পানে কেন ফিরে গেলাম সে প্রসঙ্গ পরে যথা সময়ে আলোচিত হবে। এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে দুধ পান ব্রহ্মচর্য পালনকে কঠিন করে তোলে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ থেকে এমন সিদ্ধান্তে আসার প্রয়োজন নেই যে সকল ব্রহ্মচারীকে দুধ পান ত্যাগ করতে হবে। ব্রহ্মচর্যের ওপর বিভিন্ন ধরনের খাবারের প্রভাব কেবল অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই জানা যেতে পারে। দুধের বিকল্প উপযুক্ত ফলাহার আমাকে এখনো খুঁজে বের করতে হবে যা দুধের মতই পেশী গঠনে সহায়ক এবং সহজ পাচ্য। ডাক্তার, বৈদ্য ও হেকিম সবাই আমাকে এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিতে সমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব দুধ কিছুটা উত্তেজক এটা জানা সত্ত্বেও আমি কাউকে দুধ পান ত্যাগ করতে পরামর্শ দিতে পারি না।

ব্রহ্মচর্যের বাহ্যিক সহায়ক হিসেবে পথ্য নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণের মত উপোষ করাও প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় শক্তি এতই প্রবল যে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে চারপাশ ও ওপর নিচ থেকে অবরুদ্ধ করে ফেলতে হবে। সাধারণভাবে আমরা জানি খাদ্যের অভাবে ইন্দ্রিয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। সুতরাং উপোষ ইন্দ্রিয় শক্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রণের জন্য খুবই ফলপ্রসূ হয় এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কারো কারো ক্ষেত্রে উপোষ ফলপ্রসূ হয় না, কারণ তারা মনে করে শুধু যান্ত্রিকভাবে উপোষ করলেই তাদের সুরক্ষা বাড়বে। তারা তাদের শরীরকে খাবার থেকে বিরত রাখে, কিন্তু মনকে মুক্ত করে দেয় সর্ব প্রকার সুস্বাদু খাদ্যের সন্ধানে, সর্বদা চিন্তা করতে থাকে উপোষ শেষে কি কি খাবে বা পান করবে। এভাবে উপোষ তাদের রসনা ও রিপু কোনোটাই দমনে সাহায্য করে না। উপোষ তখনই উপকারে আসে যখন উপোষী শরীরের সাথে মনও একযোগে কাজ করে। অন্য কথায় শরীরকে যেসব বস্তু থেকে বিরত রাখা হয় মনও সেগুলোর প্রতি বিতৃষ্ণ হয়। সকল ইন্দ্রিয় আসক্তির মূলে আছে মন। উপোসের কার্যকারিতা সীমিত, কারণ উপোষরত ব্যক্তিও ইন্দ্রিয় আসক্ত হতে পারে। তবে এটা বলা যেতে পারে যে উপোষ ছাড়া যৌন আসক্তি নির্মূল করা অসম্ভব, যা ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য অপরিহার্য। অনেক ব্রহ্মচর্য সাধক ব্যর্থ হয় কারণ তারা অব্রহ্মচারীদের মতো অন্যসব ইন্দ্রিয়গুলোর ব্যবহার অব্যাহত রাখে। অতএব তাদের সাধনা গ্রীষ্মের দাবদাহের মধ্যে হাড়কাঁপানো শীত অনুভব করার মতো অবাস্তব। একজন ব্রহ্মচারী ও অব্রহ্মচারীর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য থাকা উচিত। তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট হওয়া উচিত। উভয়েই তাদের দৃষ্টিশক্তি ব্যবহার করে, কিন্তু ব্রহ্মচারী

www.pathagar.com

তা ব্যবহার করে ঈশ্বরের মহিমা দর্শনের জন্য। অপর দিকে অব্রহ্মচারী ব্যবহার করে তার চারপাশের তুচ্ছ হ্যাংলামি দেখতে। উভয়েই তাদের কান ব্যবহার করে, একজন ঈশ্বরের প্রশংসা ছাড়া কিছু শুনতে পায় না, অথচ অপর জন অশ্লীল কৌতুকে তার কানকে তৃপ্ত করে। উভয়ে প্রায়ই রাত্রি জাগরণ করে, একজন ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনায় মগ্ন থাকে, অন্যজন তা অর্থহীন জংলী আচরণে অপচয় করে। উভয়েই খাবার গ্রহণ করে, একজন ঈশ্বরের দেউলকে সুস্থ অবস্থায় কার্যক্ষম রাখতে, অন্যজন রাক্ষসের মতো উদর পূর্তি করে পবিত্র পাকস্থলীকে পূতিগন্ধময় পয়ঃনালীতে পরিণত করতে। এভাবে দু'জন দুই মেরুতে অবস্থান করে এবং সময়ের সাথে সাথে তাদের মধ্যকার ব্যবধান বাড়তে থাকে, কমে না।

ব্রহ্মচর্যের অর্থ হলো চিন্তা, কথা ও কাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ। প্রতিদিনই আমি আরো বেশি করে এ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি। ত্যাগের সম্ভাবনার কোনো সীমা নেই, এমনকি তা একেবারে শূন্যতায়ও নামতে পারে। এরকম ব্রহ্মচর্য সীমিত সাধনায় অর্জন করা অসম্ভব। অনেকের জন্যই তা কেবল আদর্শ হয়েই থাকবে। ব্রহ্মচর্যের সাধনাকারী সর্বদা তার ভুল-ভ্রান্তির ব্যাপারে সজাগ থাকবে, হৃদয়ের গভীরে লেপ্টে থাকা রিপুসমূহকে খুঁজে বের করবে এবং অবিরাম চেষ্টা চালাবে তা থেকে মুক্ত হতে। যতদিন পর্যন্ত চিন্তা ইচ্ছার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে না আসবে ততদিন পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য পূর্ণাঙ্গ হবে না। অনিচ্ছাকৃত চিন্তা মনের একটি রোগ। সুতরাং চিন্তাকে দমন করার অর্থ হচ্ছে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা, যা বাতাসকে নিয়ন্ত্রণ করার চেয়েও কঠিন। এতদসত্ত্বেও আমাদের অন্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি মনের নিয়ন্ত্রণকেও সম্ভব করে তোলে। কেউ যেন না ভাবেন যে এটা কঠিন, তাই অসম্ভব। এ হচ্ছে সর্বোচ্চ গন্তব্য এবং আশ্চর্যের কিছু নেই যে এটা অর্জন করতেও সর্বোচ্চ সাধনার প্রয়োজন।

ভারতে আসার পরেই কেবল বুঝতে পারলাম যে শুধুমাত্র মানবিক সাধনায় এরকম ব্রহ্মচর্য অর্জন করা অসম্ভব। তখন পর্যন্ত আমার ভুল ধারণা ছিল যে ফলাহার করেই আমি রিপুর তাড়না থেকে মুক্তি পাব এবং নিজেকে মিথ্যে বুঝিয়েছিলাম যে এ ব্যাপারে আর কিছু করার নেই।

কিন্তু আমার সংগ্রামের অধ্যায়ের কথা এখানে আগাম বলব না। ইত্যবসরে এটা পরিষ্কার বলে রাখছি যে ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য যারা ব্রহ্মচর্য পালনে আগ্রহী তাদের হতাশ হবার প্রয়োজন নেই, যদি ঈশ্বরের ওপর তাদের বিশ্বাস ও নিজের সাধনার ওপর আত্মবিশ্বাস সমান সমান থাকে। "সংযমী আত্মার কাছ থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু দূর হয়ে যায়, কিন্তু পেছনে তার স্বাদ রেখে যায়। ঈশ্বর উপলব্ধির সাথে সাথে সে স্বাদও মিলিয়ে যায় (ভগবদ গীতা ২ঃ৫৯)।" অতএব তাঁর নাম ও তাঁর মহিমাই মোক্ষলাভের সাধনাকারীর সর্বশেষ প্রাপ্তি। এ সত্য আমার কাছে প্রতিভাত হলো কেবল ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর।

www.pathagar.com

নয়

সরল জীবন যাপন

আমি আরাম আয়েশের মধ্য দিয়ে জীবন শুরু করেছিলাম, কিন্তু সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল স্বল্পস্থায়ী। যদিও দামী আসবাবপত্র দিয়ে যত্নের সাথে ঘর সাজিয়েছিলাম, সে ঘর আমাকে ধরে রাখতে পারেনি। ঐ জীবন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ব্যয় কমিয়ে আনতে শুরু করলাম। ধোপার বিল ছিল খুব বেশি এবং যেহেতু সে নিয়মিত আসত না দুই থেকে তিন ডজন শার্ট-কলারও আমার জন্য যথেষ্ট ছিল না। কলার প্রতিদিনই বদলাতে হতো, আর শার্ট প্রতিদিন না হলেও একদিন পর পর। এর অর্থ দ্বিগুণ খরচ এবং আমার কাছে তা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হলো। সুতরাং ব্যয় কমানোর জন্য আমি একটা ধোপার অ্যাপ্রন কিনলাম। কাপড় ধোয়ার ওপর বই কিনে এ কাজের কৌশল জানলাম এবং আমার স্ত্রীকেও তা শেখালাম। এতে নিঃসন্দেহে আমার কাজ বাড়ল কিন্তু এর নতুনত্ব আনন্দও দিল।

নিজের হাতে সর্ব প্রথম যে কলারটি ধুয়েছিলাম তার কথা কখনো ভুলব না। এতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাড় ব্যবহার করেছিলাম, ইস্ত্রি যথেষ্ট গরম ছিল না এবং পুড়ে যাবার ভয়ে প্রয়োজন মতো ডলা হয়নি। এর ফলে যদিও কলারটি মোটামুটি শক্ত হয়েছিল, কিন্তু অতিরিক্ত মাড় সর্বক্ষণ ঝরে পড়ছিল। ঐ কলার পড়ে কোর্টে গেলাম এবং ব্যারিস্টার বন্ধুদের হাসির পাত্র হলাম। কিন্তু সে সময় আমি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ গায়ে মাখলাম না। আমি বললাম, "দেখ, এটাই আমার নিজের হাতে কলার ধোয়ার প্রথম অভিজ্ঞতা। সে কারণেই এতে আলগা মাড় রয়েছে। কিন্তু এতে আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। আর তার ওপর তোমাদেরকে আনন্দ দেয়ার বাড়তি সুবিধাও রয়েছে।"

"কিন্তু এখানে নিশ্চয়ই লন্ড্রির অভাব নেই?" এক বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন।

"লন্ড্রির বিল খুব বেশি" আমি বললাম। " একটা কলার ধোয়ার মজুরী এর মূল্যের প্রায় সমান। তার ওপর আছে ধোপার ওপর চিরস্থায়ী নির্ভরশীলতা। আমার কাপড় আমি নিজে ধোয়াই উত্তম মনে করি।"

কিন্তু আমি বন্ধুদেরকে আত্ম-নির্ভরতার সৌন্দর্য উপলব্ধি করাতে পারলাম না। কালক্রমে আমি একজন অভিজ্ঞ ধোপা হয়ে গেলাম, অন্তত আমার নিজের কাপড় ধোয়ার ব্যাপারে। এবং আমার কাপড় ধোয়া লন্ড্রিতে ধোয়ার চাইতে কোনোক্রমেই খারাপ ছিল না। অন্যদের চেয়ে আমার কলার কম শক্ত বা কম উজ্জ্বল ছিল না।

যখন গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে এলেন, তিনি একটা স্কার্ফ নিয়ে এসে ছিলেন যা তিনি মহাদেব গোবিন্দ রানাডের কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন। তিনি এটাকে স্মারক চিহ্ন স্বরূপ সযত্নে রক্ষা করছিলেন এবং কেবল বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্যবহার করতেন। তাঁর সম্মানে জোহান্সবার্গের ভারতীয়রা যে ভোজসভার আয়োজন করেছিল তা ছিল এরকম একটি বিশেষ অনুষ্ঠান।

www.pathagar.com

স্কার্ফটিতে ভাঁজ পড়েছিল এবং তা ইস্ত্রি করার প্রয়োজন ছিল। এটা লন্ড্রিতে পাঠিয়ে ইস্ত্রি করিয়ে আনানোর সময় ছিল না। আমি চেষ্টা করে দেখার প্রস্তাব দিলাম।

গোখলে বললেন, "ব্যারিস্টার হিসেবে তোমার ওপর আমার আস্থা আছে, কিন্তু ধোপা হিসেবে নয়। যদি এটা ময়লা করে ফেল, তাহলে কি হবে? তুমি কি জান, আমার কাছে এটার মূল্য কত?" এই বলে তিনি অতি আনন্দের সাথে তাঁর উপহার প্রাপ্তির কাহিনী বর্ণনা করলেন। আমি তবু পীড়াপীড়ি করতে থাকলাম, উত্তম কাজের নিশ্চয়তা দিয়ে তাঁর অনুমতি আদায় করলাম এবং ইস্ত্রি করার পর তাঁর সার্টিফিকেট জিতে নিলাম। অতঃপর এ কাজের জন্য সারা দুনিয়াও যদি আমাকে স্বীকৃতি না দেয় তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই।

যেভাবে আমি ধোপার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়েছিলাম, একইভাবে নাপিতের ওপর নির্ভরতাও ছুঁড়ে ফেললাম। যারা ইংল্যান্ডে যায় তাদের সবাই অন্তত নিজের দাঁড়ি কামানোর বিদ্যা শেখে, কিন্তু আমার জানামতে নিজের চুল কাটা কেউ শেখে না। আমাকে এটাও শিখতে হলো। আমি প্রিটোরিয়াতে এক ইংরেজ নাপিতের কাছে গেলাম। সে ঘৃণাভরে আমার চুল কাটতে অস্বীকার করল। আমি ভীষণ আহত বোধ করলাম। তৎক্ষণাৎ এক জোড়া কাঁচি কিনে আয়নার সামনে নিজের চুল কাটলাম। সামনের চুল কোনো রকমে কাটতে সমর্থ হলাম, কিন্তু পেছনেরটা কাটতে গিয়ে নষ্ট করে ফেললাম। চুলের অবস্থা দেখে পরদিন কোর্টে বন্ধুরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

"গান্ধী, তোমার চুলের এ কি দশা? ইঁদুরে খেয়েছে নাকি?"

"না, সাদা চামড়ার নাপিত দয়া করে আমার চুল কাটবেন না", আমি বললাম। "অতএব আমি নিজেই কাটলাম, খারাপ হলে হয়েছে, তাতে কিছু যায় আসে না।"

উত্তরটা বন্ধুদের বিস্মিত করেনি।

সাদা চামড়ার নাপিত আমার চুল কাটতে অস্বীকার করে কোনো দোষ করেনি। কালো আদমীর চুল কাটলে তার নিয়মিত খরিদ্দারদের সমর্থন হারানোর সমূহ সম্ভাবনা ছিল। ভারতে আমাদের নাপিতদেরকে আমরা আমাদের অস্পৃশ্য ভাইদের চুল কাটতে অনুমতি দেই না। দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমি এর পুরস্কার পেয়েছিলাম, একবার নয় বহুবার। এবং আমার বিশ্বাস যে, তা ছিল আমাদের নিজেদের পাপের শাস্তি। এ বিশ্বাস আমাকে রাগান্বিত হওয়া থেকে বিরত রেখেছিল।

আত্ম-নির্ভরতা ও সরলতার প্রতি আমার অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ কেমন রূপ ধারণ করেছিল তা যথাস্থানে বর্ণনা করব। এর বীজ অনেক আগেই রোপিত হয়েছিল। শিকড় গজানো, ফুল ফোটা ও ফল ধরার জন্য প্রয়োজন ছিল পানি সেচের এবং তা যথাসময়েই করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

দশ

বোয়ার যুদ্ধ

১৮৯৭ থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত সময়কালের অভিজ্ঞতা বর্ণনা এখানে বাদ রেখে সরাসরি বোয়ার যুদ্ধ প্রসঙ্গে যাচ্ছি। যখন যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতি ছিল বোয়ারদের পক্ষে, কিন্তু এসব ব্যাপারে আমি তখন বিশ্বাস করতাম যে আমার ব্যক্তিগত মতামত অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়ার অধিকার আমার নেই। এ বিষয়ে আমার অন্তরের দ্বন্দ্ব আমি বিস্তারিত বর্ণনা করেছি "দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার সত্যাগ্রহের ইতিহাস" বইয়ে এবং এখানে তার পুনরাবৃত্তি করব না। আগ্রহী পাঠকরা ঐ পৃষ্ঠাগুলো দেখে নিতে পারেন। এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে বৃটিশ শাসনের প্রতি আমার আনুগত্য এ যুদ্ধে আমাকে বৃটিশদের পক্ষে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আমি উপলব্ধি করেছিলাম বৃটিশ নাগরিক হিসেবে আমি অধিকার দাবি করলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষার কাজে অংশ নেয়া আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আমি তখন বিশ্বাস করতাম যে ভারত তার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে পারে কেবল বৃটিশদের মাধ্যমে। সুতরাং আমি যত বেশি সম্ভব সঙ্গী যোগাড় করলাম এবং অনেক কষ্টে তাদের নিয়ে এ্যামবুলেন্স কোরে যোগদানের অনুমতি পেলাম।

সাধারণ ইংরেজরা বিশ্বাস করত যে ভারতীয়রা ভীতু, কোনো ঝুঁকি নিতে বা নিজস্ব স্বার্থের বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করতে অক্ষম। তাই অনেক ইংরেজ বন্ধু আমার এ পরিকল্পনাকে নিরুৎসাহিত করলেন। কিন্তু মি. বুথ এটাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলেন। অ্যামবুলেন্সের কাজে তিনি আমাদেরকে প্রশিক্ষণ দিলেন। তিনি আমাদের সেবার যোগ্যতা সম্পর্কে মেডিকেল সার্টিফিকেটও দিলেন। মি. লাউটন এবং প্রয়াত মি. এসকম্ব সোৎসাহে আমাদের পরিকল্পনা সমর্থন করলেন এবং অবশেষে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদানের জন্য আবেদন জানালাম। গভর্নমেন্ট ধন্যবাদের সাথে আমাদের আবেদনের প্রাপ্তিস্বীকার করল, কিন্তু আমাদের সেবার প্রয়োজন নেই বলে জানিয়ে দিল।

এ প্রত্যাখ্যানের পরেও আমি বসে থাকলাম না। মি. বুথের কাছ থেকে পরিচিতি পত্র নিয়ে আমি নাটালের বিশপের সাথে দেখা করলাম। আমাদের কোরে অনেক ভারতীয় খৃষ্টান ছিল। বিশপ আমার প্রস্তাবে খুশী হলেন এবং আমাদের সেবার প্রস্তাব যাতে গ্রহণ করা হয় সে ব্যাপারে সাহায্য করবেন বলে কথা দিলেন।

সময়টা আমাদের অনুকূলে ছিল। যতটা আশা করা হয়েছিল বোয়াররা তার চেয়ে অনেক বেশি তেজ, দৃঢ়তা ও সাহস দেখিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের সেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

আমাদের কোরে ৪০ জন লিডারসহ ১১০০ সদস্য ছিল। এদের মধ্যে প্রায় ৩০০ জন মুক্ত ভারতীয়, বাকীরা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক। ডা. বুথও আমাদের সাথে ছিলেন। আমাদের কোর সুনাম অর্জন করেছিল। যদিও আমাদের কাজ ছিল ফায়ারিং লাইনের বাইরে এবং রেডক্রসের তত্ত্বাবধানে, সংকটের মুহূর্তে

www.pathagar.com

আমাদেরকে ফায়ারিং লাইনের ভেতরেও কাজ করতে বলা হলো। এতে আমাদের আপত্তি ছিল না। কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে গোলাগুলির মধ্যে যেতে দিতে চাননি। কিন্তু স্পিয়নকপে বৃটিশ বাহিনী পিছু হটার পর পরিস্থিতি বদলে গেল। জেনারেল বুলার বার্তা পাঠালেন যে যদিও আমরা ঝুঁকি নিতে বাধ্য নই, আমরা যদি রণাঙ্গন থেকে আহতদের সরিয়ে আনি গভর্নমেন্ট আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। আমাদের কোনো দ্বিধা ছিল না, তাই আমরা স্পিয়নকপে ফায়ারিং লাইনের মধ্যে কাজে নেমে পড়লাম। এই দিনগুলোতে প্রতিদিন স্ট্রেচারে আহতদের নিয়ে আমাদেরকে বিশ থেকে পঁচিশ মাইল মার্চ করতে হয়েছে। আহতদের মধ্যে জেনারেল উডগেট এর মতো সম্মানিত ব্যক্তিকে বহনের সুযোগও আমরা পেয়েছিলাম।

ছয় সপ্তাহ সেবার পরে আমাদের কোর ভেঙে দেয়া হলো। স্পিয়নকপ ও ভালক্রাঞ্জে পরাজয়ের পরে বৃটিশ কমান্ডার ইন চীফ লেডিস্মীথ ও অন্যান্য স্থান পুনরুদ্ধারের সংক্ষিপ্ত পথ পরিত্যাগ করলেন এবং ধীরে অগ্রসর হবার নীতি অবলম্বন করে ইংল্যান্ড ও ভারত থেকে আরো সৈন্য এসে শক্তি বৃদ্ধির অপেক্ষা করতে থাকলেন।

আমাদের ক্ষুদ্র কাজ ঐ মুহূর্তে দারুণ প্রশংসিত হলো এবং ভারতীয়দের সম্মান বৃদ্ধি পেল। সংবাদপত্রগুলো প্রশংসাসূচক ছড়াগান ছাপালো যার ধুয়া হলো- "সর্বোপরি আমরা সবাই সাম্রাজ্যের সন্তান"।

জেনারেল বুলার তার রিপোর্টে প্রশংসাসহ আমাদের কোরের উল্লেখ করলেন এবং লিডারদেরকে "ওয়ার মেডেল" দিয়ে পুরস্কৃত করা হলো।

ভারতীয় সম্প্রদায় আরো ভালোভাবে সংগঠিত হলো। আমি চুক্তিবদ্ধ ভারতীয়দের আরো নিবিড় সান্নিধ্যে এলাম। তাদের মধ্যে আরো বেশি জাগরণ এলো এবং হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, তামিল, গুজরাটি, সিন্ধী—সবাই ভারতীয় এবং একই দেশ মাতৃকার সন্তান এ বোধ তাদের মধ্যে দৃঢ়মূল হলো। প্রত্যেকে বিশ্বাস করল যে এবারে ভারতীয়দের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার হবে। সে মুহূর্তে সাদা চামড়ার লোকদের মধ্যে স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ করা গেল। যুদ্ধের সময় সাদাদের সাথে যে সম্পর্ক গড়ে উঠল তা ছিল সবচেয়ে মধুর। আমরা হাজার হাজার সৈনিকের সংস্পর্শে এলাম। তারা আমাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করল এবং তাদের সেবা করার জন্য আমাদেরকে ধন্যবাদ জানাল।

বিপদের সময় মানুষের প্রকৃত স্বভাব কিভাবে ফুটে ওঠে এখানে তার একটি মধুর স্মৃতির উল্লেখ না করে পারছি না। আমরা শিভলি ক্যাম্পের দিকে মার্চ করে যাচ্ছিলাম যেখানে লর্ড রবার্টস এর পুত্র লে. রবার্টস গুরুতর আহত হয়ে পড়ে আছেন। আমাদের কোর তাকে রণাঙ্গন থেকে বহন করে নেয়ার সম্মানের অধিকারী হলো। দিনটা ছিল গুমোট গরমের দিন। আমাদের মার্চের দিনের মতো। প্রত্যেকেই পানির পিপাসায় কাতর। পথে একটা ছোট নদী পড়ল যেখানে আমরা তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারি। কিন্তু কে আগে পান করবে? আমরা প্রস্তাব

www.pathagar.com

করলাম সৈনিকেরা শেষ করার পর আমরা পান করব। কিন্তু তারা প্রথমে শুরু করতে রাজি হলো না এবং আমাদেরকে শুরু করতে বলল। এভাবে কিছুক্ষণ একে অপরকে অগ্রাধিকার দেবার মধুর প্রতিযোগিতা চলল।

এগার

পরিচ্ছন্নতার সংস্কার ও দুর্ভিক্ষের ত্রাণ

জনগণের কাজে আসে না এমন রাজনৈতিক দলের কোনো সদস্যের সাথে সমঝোতায় আসা আমার পক্ষে কখনো সম্ভব হয়নি। আমার সম্প্রদায়ের লোকদের দুর্বলতা চেপে গিয়ে বা দেখেও না দেখার ভান করে অথবা তাদের দুর্নাম থেকে মুক্ত না করে কেবল অধিকার আদায়ের ব্যাপারে আমি সর্বদাই অনিচ্ছুক ছিলাম। তাই নাটালে আমার বসতি স্থাপনের পর থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম আমার সম্প্রদায়কে এমন একটা অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে যার মধ্যে কিছুটা সত্যতা ছিল। প্রায়ই অভিযোগ করা হতো ভারতীয়রা নোংরা স্বভাবের এবং তাদের বাড়িঘর ও আশপাশ পরিষ্কার রাখে না। তাই ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিরা ইতিমধ্যেই তাদের ঘর-বাড়ি গুছানো শুরু করেছিল। কিন্তু যখন ডারবানে প্লেগ আসন্ন বলে জানা গেল তখন ঘরে ঘরে পরিদর্শনের কর্মসূচী নেয়া হলো। নগরপিতাদের সাথে আলোচনা করে তাদের সম্মতি নিয়েই এটা করা হয়েছিল। তারাও আমাদের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। আমাদের সহযোগিতার ফলে তাদের কাজ সহজ হয়েছিল, একই সাথে তা আমাদেরও কষ্ট কমিয়ে দিয়েছিল। কারণ যখনই কোথাও মহামারী দেখা দেয়, সাধারণভাবে সেখানকার প্রশাসক উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন, বাড়াবাড়ি রকমের ব্যবস্থা নেন এবং এমন ব্যবহার করেন যাতে লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ভারতীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা নিজেরাই করে এ অত্যাচার থেকে রেহাই পেল।

তবে এ ব্যাপারে আমার কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতাও হলো। দেখলাম, অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আমার সম্প্রদায়ের যেরূপ সহযোগিতা পেয়েছিলাম, নিজেদের কর্তব্য পালন করানোর ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য তেমন সহজে পেলাম না। কোনো কোনো স্থানে আমাকে অপমান করা হলো, আবার কোনো কোনো স্থানে বিনয়ের সাথে উপেক্ষা করা হলো। তাদের চারপাশ পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে নিজেদের তৎপর করে তোলা যেন কোনো অসাধ্য ব্যাপার। এ কাজের জন্য তাদের টাকা খরচ করার কোনো প্রশ্নই আসে না। এসব অভিজ্ঞতা পূর্বের তুলনায় ভালোভাবে আমাকে শিক্ষা দিল যে অসীম ধৈর্য ছাড়া মানুষকে দিয়ে কোনো কাজ করানো অসম্ভব। যিনি সমাজের সংস্কারক তিনি সংস্কারের জন্য উদ্বিগ্ন থাকেন, কিন্তু সমাজ উদ্বিগ্ন থাকে না। সমাজের কাছে তিনি বিরোধীতা, ঘৃণা, এমনকি প্রাণঘাতী শাস্তি ছাড়া আর কিছু আশা করতে পারেন না। যেসব অনিয়ম অনাচারের সংস্কারের

www.pathagar.com

কাজকে একজন সংস্কারক তার প্রাণপ্রিয় দায়িত্ব মনে করেন, সমাজ কেন সেগুলোকে পশ্চাদপদতা বলে মনে করে না?

এতদসত্ত্বেও এ আন্দোলনের ফলে ভারতীয় সম্প্রদায় তাদের ঘরবাড়ি ও পরিবেশ পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা কম বেশি উপলব্ধি করতে পারল। আমিও কর্তৃপক্ষের শ্রদ্ধা অর্জন করলাম। তারা দেখলেন, যদিও আমার কাজ হলো অভাব অভিযোগ তুলে ধরা এবং অধিকার আদায়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করা, কিন্তু আত্মশুদ্ধির কাজেও আমার চেষ্টা ও আগ্রহের কমতি ছিল না।

একটা কাজ অবশ্য তখনো করার বাকী ছিল, তা হলো ভারতীয় অভিবাসীদের মধ্যে মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্যবোধ জাগ্রত করা। ভারত গরিব দেশ, ভারতীয় অভিবাসীরা দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছিল সম্পদের সন্ধানে এবং তারা তাদের আয়ের একটা অংশ দেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশার সময়ে তাদের উপকারের জন্য ব্যয় করতে দায়বদ্ধ ছিল। ভারতীয় অভিবাসীরা ১৮৯৭ ও ১৮৯৯ সালের ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের সময় তা করেছিল। তারা দুর্ভিক্ষের ত্রাণ তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করেছিল এবং ১৮৯৭ এর তুলনায় ১৮৯৯-এ আরো বেশি দিয়েছিল। ইংরেজদের কাছেও আমরা অর্থ সাহায্যের আবেদন করেছিলাম এবং তারাও ভালো সাড়া দিয়েছিল। এমন কি চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরাও তাদের আয়ের অংশ বিশেষ দান করেছিল। দুর্ভিক্ষের সময়ে চালু করা এ ব্যবস্থা চলতে থাকল এবং আমরা জানি ভারতের জাতীয় দুর্যোগের সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়রা উদার হস্তে দান করতে কখনো পিছপা হয়নি।

এভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের সেবা আমার কাছে প্রতি পদে পদে সত্যের নতুন অর্থ প্রকাশ করেছে। সত্য একটা বিশাল বৃক্ষের মতো, তুমি যত বেশি এর যত্ন নেবে, সে তত বেশি ফল দেবে। সত্যের খনিতে যত গভীরে অনুসন্ধান করবে, তত বেশি মণিমুক্তা আবিষ্কার করবে, তোমার সামনে বৈচিত্র্যময় সেবার বৃহত্তর দুয়ার খুলে যাবে।

বার
ভারতে প্রত্যাবর্তন

যুদ্ধের কাজ থেকে মুক্ত হবার পর উপলব্ধি করলাম যে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার আর তেমন কোনো কাজ নেই, আমার কাজ এখন ভারতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছুই করার নেই তা নয়, আমার আশংকা হচ্ছিল যে এখানে এখন আমার প্রধান কাজ হতে পারে টাকা রোজগার করা।

বন্ধুরা আমাকে চাপ দিচ্ছিল ভারতে ফিরে যেতে এবং আমিও অনুভব করলাম যে ভারতের সেবায় আমি বেশি কাজে লাগতে পারি। দক্ষিণ আফ্রিকার কাজ চালিয়ে নেবার জন্য অবশ্য মি. খান, মনসুখলাল নজর—এঁরা ছিলেন। তাই আমি আমার সহকর্মীদের অনুরোধ করলাম আমাকে ছেড়ে দিতে। অনেক বাধা-বিঘ্নের পর শর্ত সাপেক্ষে আমার অনুরোধ গৃহীত হলো। শর্তটা ছিল এক বছরের

www.pathagar.com

মধ্যে যদি ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে আবার দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে আসতে হবে। মনে হলো শর্তটা বেশ কঠিন, কিন্তু ভারতীয় সম্প্রদায়ের সাথে ভালোবাসার যে বন্ধন গড়ে উঠেছে সে সুবাদে আমি সম্মত হলাম। মীরাবাই গেয়েছেন—

প্রভু আমায় বেঁধেছেন ভালোবাসার বাঁধনে,
বাঁধা গোলাম আমি তাই প্রভুর দুটি চরণে।

আর আমার জন্যও ভালোবাসার যে সুতো সম্প্রদায়ের সাথে আমাকে বেঁধেছে সেটা এতই শক্ত যে তা ছিন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জনগণের কণ্ঠস্বরই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর এবং এ ক্ষেত্রে আমার বন্ধুদের কথা এত বাস্তব যে তা অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। আমি তাদের শর্ত মেনে নিলাম এবং চলে যাবার অনুমতি পেলাম।

ইতিপূর্বে ১৮৯৯ সালে ভারতে ফিরে যাবার সময় আমাকে উপহার দেয়া হয়েছিল, কিন্তু এবারের বিদায় সম্বর্ধনা ছিল অভিভূত করার মতো। উপহার সামগ্রীর মধ্যে সোনা, রূপা ও মূল্যবান হীরের জিনিসও ছিল। কি অধিকার আছে আমার এতসব উপহার গ্রহণের? এগুলো গ্রহণ করে নিজেকে কিভাবে বুঝাব যে কোনো প্রতিদান ছাড়া নিঃস্বার্থভাবে আমি সম্প্রদায়ের সেবা করেছি? আমার মক্কেলদের কিছু উপহার ছাড়া সবই দেয়া হয়েছিল সম্প্রদায়ের প্রতি আমার সেবার জন্য এবং আমি আমার মক্কেলদের থেকে সহকর্মীদের আলাদা করতে পারছিলাম না, কারণ মক্কেলরাও আমাকে গণকাজে সাহায্য করেছে।

উপহার সামগ্রীর মধ্যে আমার স্ত্রীর উদ্দেশে প্রদত্ত পঞ্চাশ গিনি মূল্যের একটি সোনার নেকলেস ছিল। কিন্তু ঐ উপহারটিও দেয়া হয়েছিল আমার গণকাজের জন্য। সে কারণে বাকী উপহার থেকে ওটাকে পৃথক করা যাচ্ছিল না।

যে বিকেলে আমাকে এত উপহারের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হলো, সে রাতে আমার ঘুম হলো না। গভীর উত্তেজনায় ঘরের ভেতর এদিক ওদিক পায়চারি করলাম, কিন্তু কোনো সমাধান খুঁজে পেলাম না। শত শত টাকা মূল্যের উপহারগুলো প্রত্যাখ্যান করা কঠিন ছিল, কিন্তু ওগুলো রাখা ছিল আরো কঠিন।

আর ওগুলো যদি আমি রাখি তাহলে আমার ছেলেরাই বা কি বলবে? আমার স্ত্রী কি বলবে? সেবার আদর্শে তাদের জীবন গড়ে তুলেছিলাম এবং তাদেরকে এ যাবৎ বোঝানো হয়েছে যে সেবা নিজেই সেবার পুরস্কার।

আমার ঘরে মূল্যবান কোনো অলংকার ছিল না। আমরা আমাদের জীবনযাত্রা সহজ সরল করে ফেলেছিলাম। সে ক্ষেত্রে আমরা সোনার ঘড়ি পরব কি করে? কিভাবে সোনার চেইন, হীরের আংটি পরব? তার ওপর এতদিন আমি মানুষকে সোনা-দানার প্রতি মোহকে জয় করতে অনুপ্রাণিত করে এসেছি। এখন আমার কাছে যে সোনা-দানা এলো তা নিয়ে আমি কি করি?

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত নিলাম আমি এগুলো রাখতে পারি না। একটা পত্রের খসড়া করলাম, সে পত্রে আমি ওগুলো দিয়ে ভারতীয় সম্প্রদায়ের নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করলাম এবং পার্সী রুস্তমজী ও অন্য কয়েকজনকে ট্রাস্টি নিয়োগ করলাম। সকাল বেলা আমি স্ত্রী ও পুত্রদের সাথে আলোচনা করলাম এবং অবশেষে আমি এ ভারী বোঝা থেকে মুক্ত হলাম।

আমি জানতাম স্ত্রীকে বোঝাতে কিছুটা অসুবিধে হবে। তবে আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ছেলেদেরকে বোঝাতে তেমন বেগ পেতে হবে না। তাই আমি তাদেরকে আমার এটর্নি নির্বাচন করলাম। ছেলেরা আমার প্রস্তাবে সাথে সাথেই রাজি হলো। তারা বলল, "এসব মূল্যবান উপহারে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই, আমরা অবশ্যই ওগুলো সম্প্রদায়ের নিকট ফেরত দেব, আর যদি কখনো আমাদের দরকার হয় তখন আমরা কিনে নেব।"

আমি শুনে খুশি হলাম। আমি তাদেরকে বললাম, "তাহলে তোমরা তোমাদের মাকে বুঝিয়ে বলবে, বলবে না?"

তারা বলল, "নিশ্চয়ই। এটা আমাদের দায়িত্ব। এসব অলংকার তার পরার দরকার নেই। সে চাইবে ওগুলো আমাদের জন্য রাখতে। আমরা যদি রাখতে না চাই তাহলে সে ওগুলো দিয়ে দিতে রাজি হবে না কেন?"

কিন্তু বলা যত সহজ কাজটা করা তত সহজ নয়।

আমার স্ত্রী বলল, "গহনাগুলো তোমার দরকার না হতে পারে, ছেলেদেরও দরকার না হতে পারে। মিষ্টি কথায় ভুলে গিয়ে তারা তোমার সুরে নেচে উঠবে। তুমি কেন আমাকে ওগুলো পরার অনুমতি দেবে না তা আমি বুঝি। কিন্তু আমার পুত্রবধূদের কি হবে? তাদের জন্য এগুলো অবশ্যই প্রয়োজন হবে। আর কে জানে, ভবিষ্যতে কি হবে? ভালোবেসে যে উপহার দেয়া হয়েছে তা আমি কিছুতেই ত্যাগ করব না।"

এভাবেই যুক্তি-তর্কের ঝঞ্ঝা বইতে থাকল, শেষে অশ্রুসহযোগে তার শক্তি বৃদ্ধি ঘটল। কিন্তু ছেলেরা অটল, আর আমিও অবিচল রইলাম।

আমি নরম সুরে বললাম, "ছেলেদের তো এখনো বিয়ে হয়নি। আমরা তাদেরকে অল্প বয়সে বিয়ে দিতে চাই না। যখন তারা বড় হবে, নিজেদের ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করবে। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের ছেলেদের জন্য এমন বউ আনব না যারা গহনার জন্য পাগল হবে। আর যদি তাদেরকে গহনা দিতেই হয়, তাহলে আমি তো আছিই। তখন তুমি আমাকে বলবে।"

"তোমাকে বলব? এতদিনে তোমাকে আমার হাড়ে হাড়ে চেনা হয়ে গেছে। তুমি আমাকে আমার সব গহনা থেকে বঞ্চিত করেছ। ওগুলো থাকলে তোমার শান্তি হচ্ছিল না। তুমি পুত্রবধূদেরকে গহনা কিনে দেবে সেই স্বপ্ন দেখাচ্ছ! তুমি আমার ছেলেদেরকে সাধু বানাচ্ছ কি আজ থেকে! না, আমি বলছি গহনাগুলো ফেরত দেয়া হবে না। দয়া করে বলো শুনি, আমার নেকলেসের ওপর তোমার কি অধিকার আছে?"

www.pathagar.com

প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, "কিন্তু নেকলেসটা কি তোমার সেবার কারণে দিয়েছে, না কি আমার সেবার কারণে?"

"আমি সেটা মানছি। কিন্তু তোমার সেবা যে কথা, আমার সেবাও সেই একই কথা। আমি তোমার জন্যে দিনরাত খেটেছি। সেটা কি কোনো সেবা নয়? তুমি আমার ওপর জোর জুলুম করেছ, আমাকে কাঁদিয়েছ, আর এজন্যেই কি আমি বাঁদীগিরি করেছি!"

এগুলো ছিল বেশ ধারালো অস্ত্র, যার কতকগুলো লক্ষ্যভেদ করল। আমি অলংকারগুলো ফেরৎ দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। কোনোমতে আমি তার অনুমতি আদায় করতে সক্ষম হলাম। ১৮৯৬ ও ১৯০১ সালে প্রাপ্ত সব উপহার ফেরৎ দেয়া হলো। একটা ট্রাস্ট দলিল তৈরি করা হলো এবং গহনাগুলো ব্যাংকে জমা রাখা হলো যাতে সেগুলো আমার বা ট্রাস্টিদের ইচ্ছায় সম্প্রদায়ের কাজে ব্যবহার করা যায়।

প্রায়ই দেখা গেছে গণকাজের জন্য যখন টাকার দরকার হয়েছে এবং মনে করেছি এবারে ট্রাস্টের তহবিল থেকে টাকা নিতেই হবে, তখনই প্রয়োজনমতো টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছি। ট্রাস্টের টাকায় আর হাত দিতে হয়নি। সেই তহবিল আজো আছে, প্রয়োজনে সেখান থেকে টাকা নেয়া হয় এবং নিয়মিত টাকা জমাও হয়।

আমার এ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য কখনো দুঃখবোধ করিনি এবং কালক্রমে আমার স্ত্রীও এর বিচক্ষণতা বুঝতে পেরেছে। এর দ্বারা আমরা অনেক প্রলোভন থেকে রক্ষা পেয়েছি।

আমি নিশ্চিত হয়ে এ অভিমত ব্যক্ত করছি যে, জনগণের সেবকের দামী কোনো উপহার সামগ্রী গ্রহণ করা উচিত নয়।

তের
আবার ভারতে

সুতরাং আমি সমুদ্রপথে স্বদেশ যাত্রা করলাম। যাত্রাপথে বিরতির বন্দরগুলোর মধ্যে একটি ছিল মরিশাস। যেহেতু জাহাজ সেখানে দীর্ঘ যাত্রা বিরতি করল, আমি তীরে নেমে স্থানীয় পরিবেশের সাথে পরিচিত হলাম। আমি এক রাতের জন্য কলোনীর গভর্নর স্যার চার্লস ব্রুসের অতিথি হলাম।

ভারতে পৌঁছার পর আমি কিছু সময় দেশের ভেতরে ঘুরে বেড়ালাম। ১৯০১ সালে মি. (পরবর্তীতে স্যার) দীনশ' ওয়াচার সভাপতিত্বে কলকাতায় কংগ্রেসের সভা অনুষ্ঠিত হলো। কংগ্রেস সম্পর্কে এটাই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা।

বোম্বে থেকে স্যার ফিরোজশাহ মেহতা যে ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন আমিও একই ট্রেনে উঠলাম, কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা সম্পর্কে তার সাথে আমার কথা বলার প্রয়োজন ছিল। তার রাজকীয় জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমি জানতাম। নিজের ভ্রমণের জন্য তিনি একটি সেলুন লাগিয়েছিলেন এবং আমি সেলুনে তার

www.pathagar.com

সাথে এক স্টেশন পর্যন্ত ভ্রমণ করে কথা বলার অনুমতি পেয়েছিলাম। সুতরাং আমি নির্ধারিত স্টেশনে গিয়ে সেলুনে রিপোর্ট করলাম। তার সাথে ছিলেন মি. ওয়াচা ও মি. (এখন স্যার) চিমনলাল সেতালবাদ। তারা রাজনীতি বিষয়ে আলাপ করছিলেন। স্যার ফিরোজশাহ্ আমাকে দেখামাত্রই বলে উঠলেন, "গান্ধী, মনে হচ্ছে তোমার জন্য কিছুই করা যাবে না। অবশ্য তুমি যেটা চাচ্ছ সে প্রস্তাব আমরা পাশ করব। কিন্তু নিজেদের দেশেই বা আমাদের কি অধিকার আছে? আমার বিশ্বাস যতদিন স্বদেশে আমরা ক্ষমতা না পাচ্ছি ততদিন কলোনীতে আমাদের অবস্থা এর চেয়ে ভালো হতে পারে না।"

আমি অবাক হলাম। স্যার ফিরোজশাহর মতের সাথে মি. সেতালবাদ একমত বলে মনে হলো। মি. ওয়াচা আমার দিকে দুঃখিতভাবে তাকালেন।

আমি স্যার ফিরোজশাহ্কে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু বোম্বের মুকুটহীন সম্রাটের সাথে যুক্তিতর্কে আমার মতো লোক পেরে ওঠার প্রশ্নই আসে না। অবশেষে বললাম আমাকে আমার প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে যাবার অনুমতি দেয়া উচিত।

আমাকে সাহস দেয়ার জন্য মি. ওয়াচা বললেন, "তোমার প্রস্তাবটা অবশ্যই আমাকে দেখাবে।" আমি তাকে ধন্যবাদ দিলাম এবং পরবর্তী স্টেশনে নেমে গেলাম।

আমরা কলকাতা পৌঁছলাম। সভাপতিকে অভ্যর্থনা কমিটি বিপুল আড়ম্বরে তার ক্যাম্পে নিয়ে গেল। একজন স্বেচ্ছাসেবককে জিজ্ঞেস করলাম আমি কোথায় উঠব। সে আমাকে রিপন কলেজে নিয়ে গেল যেখানে সভায় যোগদানকারী অতিথিদের আরো অনেকে উঠেছিলেন। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। আমি যে ব্লকে ছিলাম সে ব্লকেই লোকমান্য তিলককে রাখা হলো। আমার যতদূর মনে পড়ছে, তিনি আমার একদিন পরে এসেছিলেন।

স্বাভাবিকভাবেই লোকমান্য তাঁর "দরবার" বিহীন ছিলেন না। আমার স্মৃতিতে সে দৃশ্য এতই উজ্জ্বল হয়ে আছে যে আমি যদি চিত্রকর হতাম তাহলে ছবি এঁকে ঠিক সেভাবে দেখাতে পারতাম যেভাবে তিনি বিছানার ওপর বসেছিলেন। তাঁর সাথে দেখা করতে যে অগণিত লোক এসেছিলেন তাদের মধ্যে একজনের কথা মনে পড়ে, তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক বাবু মতিলাল ঘোষ। তাদের উচ্চ হাসি এবং শাসক গোষ্ঠীর অপকর্ম সম্পর্কে আলোচনা ভুলবার মতো নয়।

এ ক্যাম্পের সাজসজ্জা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্বেচ্ছাসেবীরা একে অপরের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল। তাদের একজনকে একটা কাজ করতে বললে সে আরেক্জনকে তা করতে বলছে, সে আবার তৃতীয় একজনকে বলছে এবং এভাবেই চলছে। আর অতিথিদের অবস্থা না ঘরকা, না ঘাটকা।

www.pathagar.com

আমি কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবীর সাথে বন্ধুত্ব করে ফেললাম। আমি তাদেরকে দক্ষিণ আফ্রিকার কাহিনী কিছুটা বললাম এবং তারা লজ্জা পেল। আমি তাদেরকে সেবার মূল কথা বোঝাতে চাইলাম। মনে হলো তারা বুঝল, কিন্তু সেবা ব্যাঙের ছাতার মতো দ্রুত বেড়ে ওঠে না। এর মূলে থাকতে হয় প্রথমত সেবার ইচ্ছে, এবং তারপর অভিজ্ঞতা। সরলমনা এসব যুবকদের মধ্যে ইচ্ছের অভাব ছিল না, কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা ছিল শূন্য। তিন দিনের সভার পরে কংগ্রেস সারা বছর ঘুমিয়ে থাকবে। বছরে তিন দিনের অনুষ্ঠান থেকে কোনো ব্যক্তি কি প্রশিক্ষণ নিতে পারে? আর অতিথিরাও ছিলেন স্বেচ্ছাসেবীদের সমগোত্রীয়। তাদেরও এর চেয়ে ভালো প্রশিক্ষণ ছিল না। তারা নিজেরা কিছুই করতে রাজি নন। তাদের সার্বক্ষণিক হুকুম ছিল, "ভলান্টিয়ার এটা কর, ভলান্টিয়ার ওটা কর" ইত্যাদি।

এখানেও আমি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অস্পৃশ্যতার মুখোমুখি হলাম। তামিলদের জন্য রান্নাঘর ছিল অন্যদেরটার থেকে অনেক দূরে। তামিল অতিথিদের বেলায় তারা যখন খাবার গ্রহণ করে ঐ সময়ে অন্য কেহ দেখে ফেললেও তাদের জন্য অশৌচ হয়। তাই তাদের জন্য কলেজ এলাকায় চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে একটি বিশেষ রান্নাঘর নির্মাণ করা হয়েছিল। এটা দম বন্ধ করা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকত। এটা ছিল একাধারে রান্নাঘর, খাবার ঘর, হাত্‌-মুখ ধোবার ঘর, অথচ এ বদ্ধ ঘরের বর্জ্য নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আমার কাছে এটা বর্ণ ধর্মের প্যারোডি বলে মনে হচ্ছিল। নিজে নিজে বললাম, কংগ্রেস প্রতিনিধিদের মধ্যেই যদি এরকম অস্পৃশ্যতা থাকে তাহলে অধস্তন সদস্যদের মধ্যে এটা কি পরিমাণে আছে তা সহজেই অনুমেয়। এ বিষয়ে চিন্তা করে আমি কেবল হতাশার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম।

পয়ঃ নিষ্কাশনে অব্যবস্থার কোনো সীমা ছিল না। যেখানে সেখানে পানি জমে ছিল। সেগুলো থেকে দুর্গন্ধের স্মৃতিচারণ আমাকে এখনো পীড়া দেয়। আমি ওগুলোর কথা স্বেচ্ছাসেবকদের বলেছিলাম। তারা সোজাসাপ্টা বলে দিল, "ওটা আমাদের কাজ নয়, মেথরদের কাজ।" আমি একটা ঝাড়ু চাইলাম। লোকটা আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল। আমি একটা ঝাঁটা সংগ্রহ করে পায়খানা পরিষ্কার করলাম। তবে তা আমার নিজের ব্যবহারের জন্য। লোকের ভীড় এত বেশি ছিল, আর সে তুলনায় পায়খানা এত কম ছিল যে তা ঘন ঘন পরিষ্কার করার প্রয়োজন ছিল, যা আমার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। তাই আমি কেবল নিজের প্রয়োজনটুকু করেই সন্তুষ্ট রইলাম। অন্যদেরকে দেখে মনে হলো দুর্গন্ধ ও ময়লার ব্যাপারে তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

কিন্তু এটাই শেষ নয়। অতিথিদের কেউ কেউ রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে তাদের রুমের বাইরের বারান্দা ব্যবহার করেছেন, এতে তাদের বিবেকে বাঁধেনি। সকাল বেলা আমি পেশাবের দাগযুক্ত স্থানগুলো স্বেচ্ছাসেবকদের দেখালাম। ওগুলো পরিষ্কারের কাজে হাত লাগাতে কেউই প্রস্তুত ছিল না এবং এ

www.pathagar.com

কাজে আমার সাথে অংশ নিয়ে সম্মানের ভাগীদার হবার মতো কাউকে পেলাম না। এখন অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু আজো এমন বিবেকহীন অতিথি আছে যারা যেখানে সেখানে ইচ্ছেমতো মলমূত্র ত্যাগ করে কংগ্রেস ক্যাম্পকে নোংরা করে এবং স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে সকলেই তা পরিষ্কার করতে প্রস্তুত নয়।

আমি দেখলাম, যদি কংগ্রেসের সভা আরো দীর্ঘায়িত হতো তাহলে মহামারী দেখা দেবার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যেত।

চৌদ্দ
কেরানী ও বেয়ারার

কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হতে আরো দু'দিন বাকী। কিছু অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি কংগ্রেস অফিসে সেবামূলক কাজ করার প্রস্তাব করব বলে মনস্থির করলাম। সুতরাং কলকাতা পৌঁছার সাথে সাথে প্রাত্যহিক স্নান সেরে কংগ্রেস অফিসের দিকে গেলাম।

বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত ঘোষাল ছিলেন সেক্রেটারী। আমি ভূপেন বাবুর নিকট গিয়ে আমার সেবার অভিপ্রায় জানালাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর বললেন, "আমার এখানে কোনো কাজ নেই। ঘোষাল বাবু হয়তো তোমাকে কিছু কাজ দিতে পারেন। তুমি তার কাছে যাও।"

সুতরাং আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে খুঁটিয়ে দেখলেন এবং মৃদু হেসে বললেন, "আমি তোমাকে শুধুমাত্র কেরানীর কাজ দিতে পারি। তুমি কি তা করবে?"

আমি বললাম, "অবশ্যই। আমার সাধ্যাতীত না হলে যে কোনো কাজ করতে আমি প্রস্তুত আছি।"

তিনি বললেন, "এই তো চাই! এটাইতো সঠিক মনোভাব, হে যুবক।" তাকে ঘিরে থাকা স্বেচ্ছাসেবীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা শুনলে, এ যুবক কি বলল?"

তারপর আমার দিকে ফিরে বলতে লাগলেন, "ভালোই হলো তাহলে। দেখো, এখানে এক গাদা চিঠি আছে। এগুলোর ব্যবস্থা করতে হবে। ঐ চেয়ারটাতে বসে শুরু করে দাও। তুমি তো দেখছ, আমার সাথে দেখা করতে শত শত লোক আসছে। এ অবস্থায় আমি কি করব? আমি তাদের সাথে দেখা করব, নাকি পরচর্চাকারীদের প্রেরিত এসব অগণিত চিঠির জবাব দেব? আমার এমন কোনো কেরানী নেই যার ওপর এগুলোর দায়িত্ব দিতে পারি। বেশিরভাগ চিঠিতেই কাজের কথা কিছু নেই। তুমি দয়া করে ওগুলো পড়ে দেখো। যেগুলো প্রাপ্তি স্বীকার করার উপযুক্ত সেগুলোর প্রাপ্তি স্বীকার কর, আর যেগুলোর সুচিন্তিত জবাব দেয়া প্রয়োজন সেগুলো আমাকে দেখিও।"

আমার ওপর তিনি যে আস্থা স্থাপন করলেন তাতে আমি আনন্দিত হলাম।

www.pathagar.com

শ্রীযুক্ত ঘোষাল আমাকে যখন কাজ দিলেন তখন তিনি আমাকে চিনতেন না। পরবর্তীতে তিনি আমার পরিচয় জেনেছিলেন।

আমার কাজটি মনে হলো খুব সোজা—চিঠির গাদা শেষ করে ফেললাম। এতে আমার তেমন সময় লাগল না এবং শ্রীযুক্ত ঘোষাল খুব খুশী হলেন। তিনি ছিলেন বাচাল প্রকৃতির লোক। এক নাগাড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতেন। যখন তিনি আমার অতীত ইতিহাস জানলেন, আমাকে কেরানীর কাজ দিয়েছেন বলে দুঃখিত হলেন। কিন্তু আমি তাকে পুনঃ পুনঃ আশ্বস্ত করলাম, "আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনার সামনে আমার কি মূল্য আছে? কংগ্রেসের সেবায় আপনার চুল পাকিয়েছেন এবং আপনি আমার অগ্রজতুল্য। আমি একজন অনভিজ্ঞ যুবক বই আর কিছু নই। আমাকে এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে আপনি আমাকে ঋণী করেছেন। কারণ আমি কংগ্রেসের কাজ করতে চাই, আপনি আমাকে সেই কাজের বিস্তারিত জানার বিরল সুযোগ করে দিয়েছেন।"

শ্রীযুক্ত ঘোষাল বললেন, "তোমাকে সত্যি সত্যি বলছি, এটাই সঠিক মনোভাব। কিন্তু আজকের ছেলে ছোকরারা তা বোঝে না। কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকেই অবশ্য আমি এর সাথে আছি। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের জন্মদানে মি. হিউমের সাথে আমিও অংশীদার বলে দাবি করতে পারি।"

এভাবে আমরা সুহৃদ বন্ধু হয়ে গেলাম। তার সাথে খাবার জন্য তিনি আমাকে পীড়াপীড়ি করলেন।

শ্রীযুক্ত ঘোষালের অভ্যাস ছিল তার বেয়ারারকে দিয়ে শার্টের বোতাম লাগানো। আমি স্বেচ্ছায় বেয়ারারের কাজ করে দিতে রাজি হলাম এবং তা করতে আমার ভালোই লাগল, কারণ জ্যেষ্ঠদের আমি সর্বদা সম্মান করতাম। তিনি যখন এটা জানতে পারলেন তখন আমি তার ছোটখাটো ব্যক্তিগত কাজ করে দেয়াতে তিনি আপত্তি করেননি। আসলে তিনি খুশিই হয়েছিলেন। তার শার্টের বোতাম লাগানোর জন্য বলার পরে তিনি বলতেন,"তুমি দেখো, কংগ্রেস সেক্রেটারী এখন এতই ব্যস্ত যে তার শার্টের বোতাম নিজে লাগানোরও সময় নেই। সব সময় তাকে একটা না একটা কাজ করতেই হচ্ছে।" শ্রীযুক্ত ঘোষালের সরলতায় আমি মজা পেতাম, কিন্তু তার এ ধরনের সেবা করার প্রতি আমার ভেতরে কোনো অনীহার সৃষ্টি হতো না। এরূপ সেবা থেকে আমি যে উপকার পেয়েছি তা অবর্ণনীয়।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমি কংগ্রেসের কাজ সম্পর্কে জেনে গেলাম। আমি অধিকাংশ নেতার সাথে দেখা করলাম। গোখলে ও সুরেন্দ্রনাথের মতো বড় নেতাদের চলাফেরা লক্ষ্য করলাম। সেখানে আমি সময়ের বড় অপচয়ও দেখলাম। দুঃখের সাথে এটাও লক্ষ করলাম যে আমাদের কাজকর্মে তখনো ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য রয়েছে। কর্মক্ষমতার অপচয়ের প্রতি তেমন নজর দেয়া হচ্ছিল না। একজনের কাজ কয়েকজনে করছিল, আবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি কারোরই নজর ছিল না।

www.pathagar.com

এসব দেখে আমি মনে মনে সমালোচনামুখর ছিলাম, আবার আমার ভিতর বদান্যতারও কমতি ছিল না। এমতাবস্থায় আমি সর্বদা চিন্তিত ছিলাম যে শেষ পর্যন্ত এ অবস্থা থেকে উন্নতি করা অসম্ভব এবং এ চিন্তা থেকে আমি কোনো কাজকেই অবমূল্যায়ন করিনি।

পনের

কংগ্রেসের অধিবেশনে

অবশেষে আমি কংগ্রেসের সভায় যোগ দিলাম। বিশাল প্যাভিলিয়ন, রাজকীয় সাজে সজ্জিত স্বেচ্ছাসেবক দল ও মঞ্চে উপবিষ্ট প্রবীণ নেতৃবৃন্দ আমাকে আনন্দে অভিভূত করল। ঐ বিশাল সমাবেশে আমার স্থান কোথায় তা ভেবে অবাক লাগল।

সভাপতির ভাষণ আয়তনে একটা বইয়ের সমান। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তা পড়ার প্রশ্নই আসে না। তাই ওটার অল্প কিছু অংশ পড়া হলো।

এর পর শুরু হলো বিষয়ভিত্তিক কমিটি নির্বাচন। গোখলে আমাকে কমিটি নির্বাচনের এ সভায় নিয়ে গেলেন।

স্যার ফিরোজশাহ অবশ্য আমার প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন, কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না কমিটির কাছে আমার প্রস্তাব কে উত্থাপন করবে, কখন করবে। কারণ প্রতিটি প্রস্তাবের পক্ষে লম্বা বক্তৃতা ছিল, তাও আবার পুরোটাই ইংরেজিতে এবং প্রতিটি প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন একজন করে সুপরিচিত নেতা। ঐসব ডামাডোলের মধ্যে আমার প্রস্তাব ছিল একটা বাঁশীর ক্ষীণ আওয়াজের মতো এবং যতই রাত ঘনিয়ে আসছিল আমার বুকের ধরফরানি ততই বেড়ে যাচ্ছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে একেবারে শেষের দিকের প্রস্তাবগুলো বিদ্যুৎগতিতে পার হয়ে গেল। প্রত্যেকেই চলে যাবার জন্য তাড়াহুড়ো করছিলেন। রাত ১১টা বেজে গেল। আমি কথা বলার সাহস পেলাম না। ইতিপূর্বেই আমি গোখলের সাথে দেখা করেছি এবং তিনি আমার প্রস্তাবটা দেখেছেন। সুতরাং তার চেয়ারের পাশে গিয়ে কানে কানে বললাম, "দয়া করে আমার জন্য কিছু করুন।" তিনি বললেন, "তোমার প্রস্তাবের কথা ভুলে যাইনি। দেখতেই পাচ্ছ কি দ্রুত গতিতে প্রস্তাবগুলো যাচ্ছে। কিন্তু আমি তোমারটা ওভাবে পার হতে দেব না।"

"তাহলে আমরা সব শেষ করেছি?" স্যার ফিরোজশাহ মেহতা বললেন।

"না, না, দক্ষিণ আফ্রিকা সংক্রান্ত প্রস্তাব এখনো বাকী আছে। মি. গান্ধী এটার জন্য দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করে আছে," গোখলে বলে উঠলেন।

স্যার ফিরোজশাহ বললেন, "আপনি কি প্রস্তাবটা দেখেছেন?"

"অবশ্যই।"

"আপনার পছন্দ হয়েছে?"

www.pathagar.com

"এটা খুব ভালো একটা প্রস্তাব।"

"ঠিক আছে, তাহলে আমরা এটা গ্রহণ করছি, মি. গান্ধী।"

আমি কাঁপতে কাঁপতে প্রস্তাবটা পড়লাম। গোখলে এটাকে সমর্থন করলেন।

"সর্বসম্মতভাবে গৃহীত", সবাই চীৎকার করে উঠল।

"মি. গান্ধী, তুমি প্রস্তাবের ওপর পাঁচ মিনিট বলতে পারবে," মি. ওয়াচা বললেন।

প্রস্তাব পাশের পদ্ধতিটা আমার কাছে মোটেই সন্তোষজনক মনে হলো না। প্রস্তাবে কি আছে তা বোঝার কষ্ট স্বীকার করতে কেউই রাজি নয়। সবাই ব্যস্ত চলে যেতে। আর যেহেতু গোখলে প্রস্তাবটা দেখেছেন, ধরে নেয়া হলো যে এটা আর কারো দেখার বা বোঝার প্রয়োজন নেই।

পরদিন সকালে আমি বক্তৃতা নিয়ে ভীষণ উদ্বেগে পড়লাম। পাঁচ মিনিটে আমি কি বলব? আমি মোটামুটি ভালোই প্রস্তুতি নিয়েছিলাম, তা সত্ত্বেও মুখে কথা সরছিল না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, বক্তৃতা পড়ব না, বরং উপস্থিত বক্তৃতা করব। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় বক্তৃতা করার যে অভ্যাস রপ্ত করেছিলাম এই মুহূর্তে তা হারিয়ে গেল।

আমার প্রস্তাবের পালা আসার সাথে সাথে মি. ওয়াচা আমার নাম ধরে ডাকলেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার মাথা ঘুরছিল। কোনোমতে আমি প্রস্তাবটা পড়লাম। কেউ একজন স্বদেশ ত্যাগ করে প্রবাসী হওয়ার প্রশংসায় স্বরচিত একটি কবিতা ছাপিয়ে তা সভায় আগত প্রতিনিধিদের মাঝে বিতরণ করেছিল। আমি ঐ কবিতাটা পড়েছিলাম এবং ঐ সূত্রে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসীদের দুঃখ-দুর্দশার কথা উল্লেখ করলাম। ঠিক এ মুহূর্তেই মি. ওয়াচা ঘন্টা বাজালেন। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে আমি তখনো পাঁচ মিনিট বক্তৃতা করিনি। আমি জানতাম না যে আরো দু'মিনিটের মধ্যে বক্তৃতা শেষ করার সতর্ক সংকেত হিসেবে ঐ ঘন্টা বাজানো হয়েছিল। আমি অন্যদেরকে দেখেছি আধা ঘন্টা বা পৌনে এক ঘন্টা ধরে বক্তৃতা করতে এবং তা সত্ত্বেও তাদের জন্য কোনো ঘন্টা বাজানো হয়নি। আমি আহত বোধ করলাম এবং ঘন্টা বাজার সাথে সাথে বসে পড়লাম। কিন্তু আমার শিশুসুলভ বুদ্ধিমত্তা নিয়ে ভাবলাম যে ঐ কবিতার মধ্যে স্যার ফিরোজশাহর বক্তব্যের (অধ্যায় ১৩, অনুঃ ৩) জবাব রয়ে গেছে। প্রস্তাব পাশ করার বিষয়ে কোনো দ্বিমত ছিল না। সে সময়ে দর্শনার্থী ও প্রতিনিধিদের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য ছিল না। প্রত্যেকেই তার হাত তুলত এবং সব প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাশ হয়ে যেত। আমার প্রস্তাবটাও এভাবেই পাশ হলো এবং আমার কাছে তা গুরুত্ব হারিয়ে ফেলল। তা সত্ত্বেও এটা যে কংগ্রেসে পাশ হয়েছে তাতেই মনে আনন্দ অনুভব করলাম। কোনো প্রস্তাব কংগ্রেস অনুমোদন করেছে, তার অর্থ হচ্ছে সমস্ত দেশবাসী অনুমোদন করেছে—এটা জানতে পারা যে কারো জন্যে যথেষ্ট আনন্দের বিষয়।

www.pathagar.com

ষোল
লর্ড কার্জনের "দরবার"

কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হলো। কিন্তু আমি চেম্বার অব কমার্স ও বিভিন্ন পেশার অন্যান্য লোকের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রসঙ্গে দেখা করার জন্য কোলকাতায় একমাস রয়ে গেলাম। এবারে হোটেলে থাকার পরিবর্তে প্রয়োজনীয় পরিচিতি সংগ্রহ করে ইন্ডিয়া ক্লাবে একটি রুম নিতে সক্ষম হলাম। ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে কিছু বিশিষ্ট ভারতীয় নাগরিক ছিলেন। আমি আশা করেছিলাম তাদের সাহচর্যে থেকে তাদেরকে দক্ষিণ আফ্রিকার কাজে আগ্রহী করে তুলব। গোখলে প্রায়ই এ ক্লাবে যেতেন বিলিয়ার্ড খেলতে, এবং যখন তিনি জানলেন যে আমি কিছুদিন কোলকাতায় থাকব, তিনি আমাকে তার সাথে থাকার আমন্ত্রণ জানালেন। আমি ধন্যবাদের সাথে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম কিন্তু নিজে থেকেই তাঁর ওখানে যাওয়াটা উচিত হবে না বলে মনে হলো। তিনি দু'একদিন অপেক্ষা করলেন, তারপর নিজেই এসে আমাকে নিয়ে গেলেন। তিনি আমার চাপা স্বভাব লক্ষ্য করে বললেন, "গান্ধী, তোমাকে এদেশে থাকতে হবে এবং এরকম চাপা স্বভাব হলে চলবে না। তোমাকে অবশ্যই যত বেশি সম্ভব মানুষের সাথে মিশতে হবে। আমি চাই তুমি কংগ্রেসের হয়ে কাজ করো।"

গোখলের সাথে অবস্থানের বিষয় বর্ণনার আগে আমি ইন্ডিয়া ক্লাবের একটি ঘটনা এখানে তুলে ধরতে চাই।

প্রায় এ সময়েই লর্ড কার্জনের "দরবার" অনুষ্ঠিত হলো। কতিপয় রাজা ও মহারাজা সে দরবারে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন, যারা ইন্ডিয়া ক্লাবেরও সদস্য ছিলেন। ক্লাবে আমি তাদেরকে সর্বদা চিকন বাংলা ধুতি, সার্ট ও চাদর পরিহিত দেখেছি। দরবার অনুষ্ঠানের দিনে তারা খানসামাদের ট্রাউজার ও চকচকে বুট জুতো পরেছিলেন। আমি অন্তরে ব্যথিত হলাম এবং তাদের একজনকে এ পরিবর্তনের হেতু জিজ্ঞেস করলাম।

জবাবে তিনি বললেন, "আমাদের দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার কথা কেবল আমরাই জানি। আমরাই কেবল জানি আমাদের সম্পদ ও উপাধি রক্ষার জন্য কি অপমান আমাদেরকে সহ্য করতে হয়।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু এই খানসামার পাগড়ী আর চকচকে জুতো কেন পরতে হয়?"

তিনি জবাব দিলেন, "খানসামার সাথে আমাদের কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ কি?" তারপর বললেন, "খানসামারা আমাদের খানসামা, আর আমরা লর্ড কার্জনের খানসামা। আমি যদি সভায় অনুপস্থিত থাকি, তাহলে তার প্রতিফল ভোগ করতে হবে। যদি আমি নিজের পোষাক পরে হাজির হই, তাহলে সেটা হবে অপরাধ। তুমি কি মনে কর আমি সেখানে গিয়ে লর্ড কার্জনের সাথে কথা বলতে পারি? মোটেই না।"

www.pathagar.com

এই সত্যভাষী বন্ধুর জন্য করুণা হলো। এটা আমাকে আরেক দরবারের কথা মনে করিয়ে দিল।

লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তখন একটা দরবার বসেছিল। অবশ্যই তাতে রাজা-মহারাজারা যোগদান করেছিলেন। পণ্ডিত মালব্যজী আমাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এতে যোগ দিতে এবং আমি যোগ দিয়েছিলাম।

আমি দেখে কষ্ট পেলাম যে মহারাজারা মহিলাদের সাজ-পোষাক পরেছিলেন—সিল্কের পায়জামা-আচকান, গলায় মুক্তার মালা, হাতের কব্জিতে বালা, পাগড়ীতে মুক্তা ও হীরা খচিত টাসেল এবং এগুলো ছাড়াও তাদের কোমরবন্ধ থেকে ঝুলানো সোনার বাঁটওয়ালা তরবারী। আমি বুঝতে পারলাম যে এগুলো তাদের রাজকীয় কর্তৃত্বের নিদর্শন নয়, বরং দাসত্বের চিহ্ন। আমার ধারণা ছিল যে তারা পুরুষত্বহীনতার প্রতীক এসব চিহ্ন স্বেচ্ছায় ধারণ করতেন। কিন্তু পরে জানলাম যে এসব অনুষ্ঠানে রাজাদের মূল্যবান অলংকারাদি পরিধান করা বাধ্যতামূলক ছিল। আমি আরো শুনেছিলাম যে তাদের কেউ কেউ এসব অলংকার পরা মোটেই পছন্দ করতেন না এবং তারা এগুলো শুধুমাত্র দরবার এর মতো অনুষ্ঠান ছাড়া কখনো পরতেন না।

আমি বলতে পারি না আমার জানা এ তথ্যগুলো কতটা সঠিক ছিল। কিন্তু অন্যান্য অনুষ্ঠানে তারা ওগুলো পরুক বা নাই পরুক, ভাইসরয়ের দরবারে মহিলাদের অলংকার পরে যোগদান করা—সেটাই মর্মযাতনার জন্য যথেষ্ট। সম্পদ, ক্ষমতা আর সম্মানের মোহ মানুষের কাছ থেকে পাপ ও ভুলের মাশুল কত গুণে আদায় করে নেয়!

সতের

গোখলের সাথে একমাস-১

গোখলের সাথে থাকার প্রথম দিন থেকেই তিনি আমাকে একবারে আপন করে নিলেন। তিনি আমার সাথে এমন ব্যবহার করলেন যেন আমি তার ছোট ভাই। তিনি নিজ থেকে আমার যা কিছু প্রয়োজন সব জেনে নিলেন এবং আমি যেন সবকিছু পাই তার ব্যবস্থা করলেন। সৌভাগ্যবশত আমার প্রয়োজন ছিল অতি অল্প, আর আমি যেহেতু স্বনির্ভরতার অভ্যাস গড়ে নিয়েছিলাম, আমার জন্য ব্যক্তিগত পরিচর্যার প্রয়োজন প্রায় ছিলই না। তিনি আমার স্বনির্ভরতার অভ্যাস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অধ্যবসায় ও নিয়মানুবর্তিতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং প্রায়ই প্রশংসা করে আমাকে অভিভূত করতেন।

তিনি আমার কাছ থেকে কিছুই গোপন রাখতেন না। তার কাছে যত বিখ্যাত ব্যক্তি আসতেন তাদের সকলের সাথেই আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতেন। এঁদের মধ্যে যার কথা আমার স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে তিনি ড. (বর্তমানে স্যার) পি.সি.

www.pathagar.com

রায়। তিনি আসলে পাশের বাড়িতে বাস করতেন এবং ঘন ঘন দেখা করতে আসতেন।

ড. রায়কে তিনি আমার সাথে এভাবে পরিচয় করিয়ে দিলেন, "ইনি হলেন প্রফেসর রায়, যিনি মাসে ৮০০/-টাকা বেতন পান, তা থেকে নিজের জন্যে ৪০/- টাকা রেখে বাকীটা জনকল্যাণে ব্যয় করেন। তিনি এখনো দার পরিগ্রহ করেননি, আর করতেও চান না।"

সেদিনের ড. রায় আর আজকের ড. রায়ের মধ্যে আমি তেমন পার্থক্য দেখি না। তার পোষাক সেই আগের মতোই সাধারণ ও পরিপাটি, অবশ্য পার্থক্য এই যে তখনকার দিনে তিনি ইন্ডিয়ান কলের তৈরি কাপড় পরতেন, আর এখন খাদি পরেন। আমি বুঝতে পারলাম যে গোখলে ও ড. রায়ের মধ্যকার কথাবার্তা আমি বেশি শুনতে পাব না, কারণ তারা সর্বোতভাবে গণকাজে যুক্ত হয়েছিলেন অথবা শিক্ষণীয় মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন। কখনো কখনো তারা যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, কারণ জননেতা হিসেবে তারা সমালোচনারও পাত্র ছিলেন। এর ফলে যাদেরকে আমি নেতৃস্থানীয় সংগ্রামী বলে মনে করতাম তাদের অনেককে আমার দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র দেখতে পেলাম।

গোখলেকে কর্মরত দেখলে যেমন আনন্দ হতো, তেমনি তা শিক্ষণীয় ছিল। তিনি কখনো একটা মিনিটও অপচয় করতেন না। তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব সবই ছিল জনগণের কল্যাণে নিবেদিত। তার সকল কথাবার্তা ছিল দেশের মঙ্গলের জন্য এবং তা ছিল সম্পূর্ণরূপে অসত্য বা কপটতামুক্ত। ভারতের দারিদ্র্য ও পরাধীনতা ছিল তার জন্য সার্বক্ষণিক তীব্র উদ্বেগের বিষয়। বিভিন্ন ধরনের মানুষ তাকে বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তিনি তাদের সকলকে একই জবাব দিয়েছেন, "যে কাজের কথা বলছ তা তোমরা নিজেরাই করো। আমার কাজ আমাকে করতে দাও। আমি যা চাই তা হলো আমার দেশের স্বাধীনতা। এটা অর্জনের পরে আমরা অন্য কাজের কথা চিন্তা করব। আপাতত আমার সকল সময় ও শক্তি ঐ একটি লক্ষ্য অর্জনে নিয়োজিত।"

রানাডের জন্য তার শ্রদ্ধা প্রতিটি মুহূর্তে প্রকাশ পেত। তার কাছে প্রতিটি বিষয়ে রানাডের সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত এবং প্রতি পদক্ষেপে তিনি তা উলেখ করতেন। গোখলের সাথে থাকার সময়ে রানাডের মৃত্যুবার্ষিকী (না কি জন্মবার্ষিকী, তা ভুলে গেছি) পালিত হলো। এ দিবসটি তিনি নিয়মিত পালন করতেন। তখন তার সাথে আমি ছাড়াও তার বন্ধু কাথাভাটে ও একজন সাবজজ ছিলেন। তিনি আমাদেরকে অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানালেন এবং তার বক্তৃতাতে রানাডের স্মৃতিচারণ করলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি রানাডের সাথে তেলাং ও মাণ্ডলিকের তুলনা করলেন। তিনি তেলাং এর মনোমুগ্ধকর স্টাইল এবং সমাজ সংস্কারক হিসেবে মাণ্ডলিকের প্রশংসা করলেন। মক্কেলদের জন্য মাণ্ডলিকের উদ্বেগের উদাহরণ দিতে গিয়ে একবার নির্ধারিত ট্রেন ফেল করার পর কিভাবে

www.pathagar.com

বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করে মক্কেলের সাথে তিনি কোর্টে হাজির হয়েছিলেন সে ঘটনার বর্ণনা দিলেন। কিন্তু বহুমুখী প্রতিভা হিসেবে রানাডে ছিলেন এঁদের সবার উর্ধ্বে। তিনি শুধু একজন মহান বিচারক ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন একাধারে মহান ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজ সংস্কারক। একজন বিচারক হয়েও তিনি নির্ভয়ে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতেন এবং তার প্রজ্ঞার ওপর সকলের এতই আস্থা ছিল যে তার সিদ্ধান্ত সবাই বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিত। গোখলে যখন তার মনিবের মেধা ও মননের এসব বর্ণনা দিতেন তখন তার আনন্দের সীমা থাকত না।

তখনকার দিনে গোখলের একটা ঘোড়া গাড়ি ছিল। কি পরিস্থিতির জন্য তার ঘোড়া গাড়ির প্রয়োজন হতো তা আমি জানতাম না। তাই আমি তার সাথে তর্ক করলাম, "এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াতের জন্য আপনি ট্রামকার ব্যবহার করতে পারেন না? ঘোড়া গাড়ি ব্যবহার করা একজন নেতার জন্য সম্মান হানিকর।"

কিছুটা ব্যথিত হয়ে তিনি বললেন, "দেখতে পাচ্ছি, তুমিও আমাকে বুঝতে পারনি। কাউন্সিলে (সভায়) যোগদানের জন্য আমি যে ভাতা পাই তা নিজের আরাম-আয়েশের জন্য ব্যয় করি না। তোমরা স্বাধীনভাবে ট্রামকারে যত্রতত্র যেতে পার, কিন্তু আমি তা পারি না; সেজন্যে আমার ঈর্ষা হয়। তুমি যখন আমার মতো ব্যাপক খ্যাতির শিকার হবে, তখন তোমার জন্যেও ট্রামকারে চলাফেরা অসম্ভব না হলেও কঠিন হবে। নেতারা যা কিছু করেন তার সবই তাদের ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশের জন্যে করেন এমনটা ভাবার কোনো যুক্তি নেই। তোমার সরল জীবন যাপন আমি পছন্দ করি। আমিও সাধ্যমতো সরল জীবন যাপন করি। কিন্তু আমার মতো লোকের পক্ষে কিছু কিছু ব্যয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে।"

এভাবে তিনি তার সম্পর্কে আমার একটা অভিযোগের সন্তোষজনক জবাব দিলেন। কিন্তু আরেকটি অভিযোগের জবাব আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। আমি বললাম, "কিন্তু আপনি তো বাইরে হাঁটতেও যান না। আপনি সব সময় অসুস্থ থাকবেন সেটা কি আশ্চর্যের ব্যাপার নয়? জনগণের কাজ করতে গিয়ে কি শারীরিক ব্যায়াম করার সময়ও পাওয়া যাবে না?"

তিনি জবাব দিলেন, "হাঁটতে যাবার মতো অবসর আমার আছে, এটা কখনো দেখেছ?"

গোখলের প্রতি আমার সম্মান এত বেশি ছিল যে আমি কখনো তার সাথে তর্ক-বিতর্ক করতাম না। যদিও এ জবাবটা আমাকে মোটেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি তবুও আমি নীরব রইলাম। আমি তখন বিশ্বাস করতাম, এখনো করি, একজন লোকের যত কাজই থাকুক না কেন, তাকে ব্যায়ামের জন্য কিছু সময় বের করে নিতে হবে, যেমনটা করতে হয় খাবারের জন্য। আমার বিনম্র অভিমত এই যে ব্যায়াম মানুষের কর্মক্ষমতা খর্ব করার পরিবর্তে তা বৃদ্ধি করে।

www.pathagar.com

আঠার

গোখলের সাথে একমাস-২

গোখলের বাড়িতে অবস্থানকালে আমি মোটেই ঘরে বসে থাকতে পারিনি। দক্ষিণ আফ্রিকায় খৃষ্টান বন্ধুদেরকে আমি বলেছিলাম যে ভারতে আমি খৃষ্টান ভারতীয়দের সাথে দেখা করে সেখানে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানাব। আমি বাবু কালীচরণ ব্যানার্জির কথা শুনেছি এবং তার সম্পর্কে আমার উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং তার সম্পর্কে আমার কোনো সংশয় ছিল না, যেমনটি সাধারণ ভারতীয় খৃষ্টানদের সম্পর্কে ছিল, যারা কংগ্রেস থেকে দূরে থাকত এবং নিজেদেরকে হিন্দু ও মুসলমানদের থেকে আলাদা করে রাখত। আমি গোখলেকে বললাম আমি কালীচরণ ব্যানার্জির সাথে দেখা করার কথা ভাবছি। তিনি বললেন,"তার সাথে দেখা করে কি হবে? তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ, কিন্তু আমার মনে হয় তিনি তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন না। আমি তাকে ভালো করেই চিনি। যাহোক, তুমি চাইলে অবশ্যই তার সাথে দেখা করবে।"

আমি বাবু কালীচরণ ব্যানার্জির সাক্ষাৎকার চাইলাম এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তা মঞ্জুর করলেন। আমি যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করি তার স্ত্রী তখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। তার বাড়িটি ছিল অতি সাধারণ। কংগ্রেস অধিবেশনে আমি তাকে কোট প্যান্ট পরিহিত দেখেছি, কিন্তু এখন তাকে বাঙালী ধুতি-শার্ট পরিহিত দেখে খুশি হলাম। তার সাধারণ পোষাক আমার পছন্দ হলো, যদিও আমি নিজে তখন পার্সী কোট-প্যান্ট পরা ছিলাম। বেশি ভণিতা না করে আমি আমার প্রয়োজনের কথা বললাম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আদি পাপের তত্ত্বে বিশ্বাস কর?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, করি।"

তিনি বললেন, "হিন্দু ধর্ম আদি পাপ থেকে মুক্তি দেয় না, কিন্তু খৃষ্টধর্ম দেয়।" তিনি আরো বললেন, "পাপের পরিণাম মৃত্যু, এবং বাইবেল বলে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো যীশুখৃষ্টে আত্মসমর্পণ।"

আমি ভগবত গীতা থেকে ভক্তিমার্গ (ভক্তির পথ) এর উল্লেখ করলাম। কিন্তু এতে কোনো কাজ হলো না। তার সহৃদয়তার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ জানালাম। তিনি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেননি, কিন্তু এ সাক্ষাৎকার থেকে আমি উপকৃত হয়েছি।

এ দিনগুলোতে আমি কলকাতার রাস্তায় পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি। অধিকাংশ স্থানে আমি হেঁটে গিয়েছি। আমি বিচারপতি মিত্র ও স্যার গুরুদাস ব্যানার্জির সাথে দেখা করে দক্ষিণ আফ্রিকার কাজে তাদের সাহায্য চেয়েছি। একই সময়কালে আমি রাজা স্যার পিয়ারীমোহন মুখার্জির সাথেও দেখা করেছি।

কালীচরণ ব্যানার্জি আমাকে কালী মন্দিরের কথা বলেছিলেন। আমি মন্দিরটি দেখতে আগ্রহী ছিলাম, কারণ আমি এ মন্দির সম্পর্কে বইতে পড়েছিলাম। তাই

www.pathagar.com

একদিন সেটা দেখতে গেলাম। বিচারপতি মিত্রের বাড়ি একই এলাকায় ছিল। সে কারণে যেদিন তার সাথে দেখা করতে গেলাম সেদিনই মন্দিরে গেলাম। পথে আমি মন্দিরের দিকে ভেড়ার পাল যেতে দেখলাম, ওগুলোকে কালীর সামনে বলি দেয়া হবে। মন্দিরের রাস্তায় সারি সারি ভিক্ষুক বসে ছিল। তাদের মধ্যে ধর্মের নামে প্রতারকও ছিল। সেই সময়েও আমি শক্ত সমর্থ ভিক্ষুকদেরকে ভিক্ষা দেয়ার কট্টর বিরোধী ছিলাম। তাদের এক দল আমার পিছু নিল। এরকম এক ভিক্ষুককে একটা বারান্দায় বসা দেখলাম। সে আমাকে থামাল এবং গায়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, "বৎস, কোথায় যাস?" আমি তার প্রশ্নের জবাব দিলাম। সে আমাকে ও আমার সঙ্গীকে বসতে বলল। আমরা বসলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "এই যে পশুবলি, একে কি তুমি ধর্ম বল?"

"পশু হত্যাকে কে ধর্ম বলে?"

"তাহলে তুমি এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হও না কেন?"

"ওটা আমার কাজ নয়। আমার কাজ হচ্ছে ঈশ্বরের উপাসনা করা।"

"কিন্তু তুমি কি অন্য কোনো স্থানে গিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পার না?"

"আমাদের জন্য সকল স্থানই সমান। মানুষ ভেড়ার পালের মতো, তাদের নেতা যেদিকে নিয়ে যায়, সেদিকেই যায়। এটা দেখা আমাদের মতো সাধুদের কাজ নয়।"

আমরা কথা না বাড়িয়ে মন্দিরের পথে চললাম। মন্দিরের কাছাকাছি আসতেই রক্তের নদী যেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। আমি অধৈর্য ও অস্থির হয়ে উঠলাম। সে দৃশ্য আমি কখনো ভুলতে পারব না।

সে দিনই সন্ধ্যায় বাঙালী বন্ধুদের এক ডিনার পার্টিতে আমার আমন্ত্রণ ছিল। সেখানে এক বন্ধুকে উপাসনার এ নিষ্ঠুর প্রথার কথা বললাম। তিনি বললেন, "ভেড়া কোনো কিছু বুঝতে পারে না। সেখানকার কোলাহল ও ঢাকঢোলের শব্দে ব্যথার অনুভূতি লোপ পায়।"

আমি এটা মেনে নিতে পারলাম না। আমি তাকে বললাম, ভেড়া যদি কথা বলতে পারত সে অন্য কাহিনী শোনাত। আমি অনুভব করলাম যে এ নিষ্ঠুর প্রথা রহিত হওয়া প্রয়োজন। আমি বুদ্ধের কাহিনী স্মরণ করলাম, কিন্তু এটা বন্ধ করা ছিল আমার সাধ্যের অতীত।

সেদিনের মতো আজো আমি একই মত পোষণ করি। আমার কাছে একটি মেষ শাবকের জীবন মানব জীবনের চেয়ে কম মূল্যবান নয়। মানব শরীরের জন্য মেষ শাবকের প্রাণনাশ করতে আমার ইচ্ছে হবে না। আমার মতে, যে প্রাণী যত বেশি অসহায়, মানুষের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে মানুষের দ্বারা নিরাপত্তা পাবার অধিকার তার তত বেশি। কিন্তু যে মানুষ নিজেকে এ সেবার যোগ্য করে তুলতে পারেনি, সে এ নিরাপত্তা প্রদানে সক্ষম নয়। এ অপবিত্র বলিদান থেকে মেষ শাবকদের রক্ষা করতে পারব—এ আশা করার আগে আমাকে আরো আত্মশুদ্ধি ও ত্যাগ

www.pathagar.com

স্বীকার করতে হবে। আমি সর্বক্ষণ এ প্রার্থনা করি পৃথিবীতে পুরুষ বা মহিলা এমন কোনো মহাত্মার জন্ম হোক, যার অন্তরে প্রজ্জ্বলিত থাকবে স্বর্গীয় দয়া, যিনি এ ঘৃণ্য পাপ থেকে আমাদেরকে মুক্তি দেবেন, নিষ্পাপ পশুদের জীবন রক্ষা করবেন এবং মন্দিরগুলোকে পবিত্র করবেন। এটা কি করে সম্ভব যে বাংলা তার এতো জ্ঞান-গরিমা, বুদ্ধিমত্তা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আবেগ নিয়ে এ ধরনের পশুবলি সহ্য করে যাচ্ছে?

উনিশ

গোখলের সাথে একমাস-৩

ধর্মের নামে কালীর সামনে ভয়ংকর বলিদানের প্রথা বাঙালীদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে জানার জন্য আমার আগ্রহ বাড়িয়ে দিল। ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে আমি অনেক কথা শুনেছি এবং পড়েছি। প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারের জীবন সম্পর্কেও কিছুটা জানতাম। তিনি বক্তৃতা করেছেন এরকম কয়েকটি সভায় আমি যোগদান করেছি। তার লেখা "কেশব চন্দ্র সেন" বইটি আমি আগ্রহ সহকারে পড়েছি এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও আদি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পেরেছি। আমি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সাথে দেখা করেছি এবং প্রফেসর কাথাভাটসহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তখন তিনি দেখা করতে রাজি হননি বলে তার সাথে দেখা করতে পারিনি। তার বাড়িতে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের এক অনুষ্ঠানে অবশ্য আমরা আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম এবং সেখানে আমাদের সুমধুর বাংলা সংগীত শ্রবণের সুযোগ হয়েছিল। তখন থেকেই আমি বাংলা সংগীতের ভক্ত।

ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে এতটা জানার পরে স্বামী বিবেকানন্দের সাথে দেখা না করে সন্তুষ্ট হতে পারছিলাম না। তাই প্রবল আগ্রহ নিয়ে পায়ে হেঁটে বেলুর মঠে গেলাম। মঠের নিরিবিলি পরিবেশ আমার বেশ পছন্দ হলো। যখন শুনলাম যে স্বামীজী কোলকাতার বাসভবনে অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছেন এবং তার সাথে দেখা করা যাবে না তখন হতাশ হলাম এবং দুঃখ পেলাম।

এরপর আমি সিস্টার নিবেদিতার বাসস্থান খুঁজে বের করলাম এবং চৌরঙ্গির এক ভবনে তার সাথে দেখা করলাম। তার চারপাশের জাঁকজমক দেখে আমি চমকে গেলাম, এবং আমাদের কথাবার্তাতেও কাজের কথা তেমন হলো না। আমি গোখলেকে এ ব্যাপারে জানালাম এবং তিনি বললেন তার মতো অস্থির চিত্ত মহিলার সাথে আমার যোগাযোগ ফলপ্রসূ হবে না, এতে অবাক হবার কিছু নেই।

তার সাথে আমার আবার দেখা হয়েছিল মি. পেষ্টনজী পাদশাহর বাড়িতে। তিনি যখন তার বৃদ্ধা মাতার সাথে কথা বলছিলেন তখন আমার সাথে দৈবাৎ তার দেখা, এবং আমি দু'জনের মধ্যে দোভাষীর কাজ করলাম। আমার কাজের প্রতি

www.pathagar.com

তার সম্মতি আদায় করতে ব্যর্থ হলেও হিন্দু ধর্মের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসার কারণে আমি তার প্রশংসা করি। পরবর্তীতে আমি তার লেখা বই পড়েছি।

দক্ষিণ আফ্রিকা সংক্রান্ত কাজের জন্য কোলকাতার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে দেখা করা এবং নগরীর ধর্মীয় ও গুরুত্বপূর্ণ গণপ্রতিষ্ঠানগুলো ঘুরে দেখা ও পড়াশুনার জন্য আমি দিনগুলোকে ভাগ করে নিলাম। ড. মল্লিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় বোয়ার যুদ্ধে ইন্ডিয়ান অ্যামবুলেন্স কোরের অবদানের ওপর আমি বক্তৃতা করলাম। দি ইংলিশম্যান পত্রিকার সাথে আমার পরিচিতি এবারেও বেশ কাজে লাগল। মি. সন্ডার্স তখন অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু আমাকে ১৮৯৮ সালের মতোই সাহায্য করলেন। গোখলে আমার বক্তৃতা পছন্দ করেছিলেন এবং ড. রায় এটার প্রশংসা করেছিলেন শুনে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন।

এভাবে গোখলের বাড়িতে অবস্থান কোলকাতায় আমার কাজ সহজ করে দিল, আমাকে নেতৃস্থানীয় বাঙালী পরিবারগুলোর সংস্পর্শে নিয়ে এলো এবং এটাই ছিল বাংলার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের শুরু।

এ স্মরণীয় মাসের অনেক স্মৃতি আমি এখানে উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকছি। আমি এখানে সংক্ষেপে বার্মায় আমার ঝটিকা সফর এবং সেখানকার ফুঙ্গী (পুরোহিত)-দের কথা উল্লেখ করব। আমি তাদের অলসতা দেখে ব্যথিত হয়েছি। সেখানে আমি স্বর্ণ প্যাগোডা দেখেছি। এর ভেতরে অসংখ্য মোমবাতি জ্বালানো আমার পছন্দ হয়নি এবং পবিত্র স্থানে ইঁদুরের দৌড়াদৌড়ি আমাকে মোরভীতে স্বামী দয়ানন্দের অভিজ্ঞতার কথা মনে করিয়ে দিল। বার্মিজ মহিলাদের স্বাধীনতা ও কর্মস্পৃহা যেমন আমাকে মুগ্ধ করেছে, তেমনি পুরুষদের কর্মবিমুখতা আমাকে ব্যথিত করেছে। আমার সংক্ষিপ্ত সফরে আমি এও দেখেছি যে বোম্বে যেমন ভারতবর্ষ নয়, রেঙ্গুনও তেমনি বার্মা নয়, এবং ভারতে যেমন আমরা ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কমিশন এজেন্ট হয়ে গেছি, সে রকম বার্মাতে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সাথে মিলে আমরা বার্মিজ জনগণকে আমাদের কমিশন এজেন্টে পরিণত করেছি।

বার্মা থেকে ফিরে এসে আমি গোখলের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বিচ্ছেদটা হৃদয় বিদারক ছিল, কিন্তু বাংলায় তথা কোলকাতায় আমার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং এখানে আমার আর অবস্থানের কোনো প্রয়োজন ছিল না।

এক জায়গায় স্থায়ী হবার আগে সারা ভারতে ঘুরে বেড়ানোর চিন্তা করলাম। এতে আমি ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করব এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুঃখ কষ্ট জানতে পারব। এ ব্যাপারে আমি গোখলেকে বললাম। প্রথমে তিনি এ আইডিয়াকে হেসে উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু যখন আমি ব্যাখ্যা করে বুঝালাম এ ভ্রমণ থেকে আমি কি পাওয়ার আশা করছি তখন তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন। প্রথমে আমি বেনারস যাবার পরিকল্পনা করলাম মিসেস বেসান্টকে সম্মান জানাতে, যিনি তখন অসুস্থ ছিলেন।

www.pathagar.com

ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের জন্য আমাকে নতুন করে প্রস্তুতি নিতে হলো। গোখলে নিজে আমাকে রসগোল্লা আর পুরিতে ঠাসা একটি টিফিন বক্স দিলেন। বারো আনা দিয়ে একটি ক্যানভাস ব্যাগ ও ছায়া (পোরবন্দর স্টেটের একটি স্থানের নাম) উলের একটি লংকোট কিনলাম। ব্যাগে নিতে হবে এই লংকোট, একটি ধুতি, একটি তোয়ালে ও একটি শার্ট। আমার গায়ে দেয়ার জন্য একটা কম্বল আর একটি পানির জগ ছিল। এভাবে প্রস্তুতি নিয়ে আমি যাত্রা শুরু করলাম। গোখলে ও ড. রায় স্টেশনে আসলেন আমাকে বিদায় জানাতে। আমি তাদেরকে কষ্ট করে আসতে নিষেধ করলাম, কিন্তু তারা শুনলেন না। গোখলে বললেন, "যদি তুমি প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে তাহলে আমি আসতাম না, কিন্তু এখন আমাকে আসতে হলো।"

প্লাটফরমে প্রবেশ করতে গোখলেকে কেউ বাধা দিল না। তিনি সিল্কের পাগড়ী, জ্যাকেট ও ধুতি পরেছিলেন। ড. রায় তার বাঙালী পোষাকে ছিলেন। টিকেট কালেক্টর তাকে আটকে দিল, কিন্তু গোখলে যখন বললেন ইনি তার বন্ধু তখন তাকে প্রবেশ করতে দিল।

তাদের শুভেচ্ছা নিয়ে এভাবে আমি ভ্রমণ শুরু করলাম।

বিশ
বেনারসে

ভ্রমণসূচী ছিল কোলকাতা থেকে রাজকোট, পথে আমি বেনারস, আগ্রা, জয়পুর ও পালানপুরে যাত্রা বিরতির পরিকল্পনা করলাম। এগুলোর বাইরে আর কোনো স্থান দেখার সময় আমার ছিল না। প্রতিটি শহরে আমি একদিন করে থাকলাম এবং পালানপুর ছাড়া সব জায়গায় কোনো ধর্মশালা বা পাণ্ডাদের সাথে সাধারণ তীর্থযাত্রীদের মতো রাত কাটালাম। আমার যতদূর মনে পড়ে, এ ভ্রমণে আমি ট্রেন ভাড়াসহ ৩১ টাকার বেশি ব্যয় করিনি।

ট্রেনে ভ্রমণের ক্ষেত্রে আমি মেইল ট্রেনের চাইতে সাধারণ (অর্ডিনারী) ট্রেন পছন্দ করতাম, কারণ মেইল ট্রেনে ভীড় বেশি, আবার ভাড়াও বেশি।

তখনকার দিনে তৃতীয় শ্রেণীর কম্পার্টমেন্টগুলো যেমন নোংরা এবং এর পায়খানাগুলো যেমন খারাপ ছিল, আজো ওগুলো সেরকমই আছে। এখন সামান্য উন্নতি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য এ দু'শ্রেণীর ভাড়ার পার্থক্যের সাথে কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সাথে ছাগল-ভেড়ার মতো ব্যবহার করা হতো এবং তাদের জন্য প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাও তদ্রূপই ছিল। ইউরোপে আমি সর্বদা তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেছি। কেবল একবার প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করেছিলাম, তাও শুধু দেখতে যে এটা কি রকম। কিন্তু সেখানে আমি তৃতীয় ও প্রথম শ্রেণীর মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য দেখিনি। দক্ষিণ আফ্রিকায় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা অধিকাংশই নিগ্রো, তবুও সেখানকার তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীসুবিধা এখানকার চেয়ে বেশি। দক্ষিণ

www.pathagar.com

আফ্রিকার কোনো কোনো অংশে তৃতীয় শ্রেণীতে ঘুমানোর ব্যবস্থা আছে এবং সীটে গদি লাগানো আছে। যাত্রী সংখ্যাও নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে ট্রেনে গাদাগাদি ভীড় না হয়। আর এখানে আমি দেখেছি, সাধারণত নির্ধারিত আসন সংখ্যার অতিরিক্ত যাত্রী বুক করা হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের আরাম-আয়েশের প্রতি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, এবং এর সাথে যাত্রীদের নিজেদের নোংরা ও অবিবেচক স্বভাব মিলে পরিচ্ছন্ন স্বভাবের যাত্রীর জন্য তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণকে ধৈর্যের পরীক্ষায় পরিণত করে। যাত্রীদের অপ্রিয় অভ্যাসের মধ্যে সাধারণত থাকে কম্পার্টমেন্টের মেঝেতে আবর্জনা ফেলা, যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে ধূমপান, পান-সুপারি খাওয়া ও পুরো কম্পার্টমেন্টকে পিকদানী হিসেবে ব্যবহার, চীৎকার চেচামেচি এবং সহযাত্রীদের সুবিধা-অসুবিধার তোয়াক্কা না করে অশ্রাব্য ভাষার ব্যবহার। ১৯০২ সালে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ ও ১৯১৫ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত সময়কালে তৃতীয় শ্রেণীতে একটানা ভ্রমণের অভিজ্ঞতার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করিনি।

এ জঘন্য অবস্থার প্রতিকার হিসেবে আমি একটা মাত্র উপায়ের কথা ভাবতে পারি—শিক্ষিত লোকদের উচিত তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করা এবং লোকের অভ্যাসের পরিবর্তন, সেই সাথে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে কখনো শান্তিতে থাকতে না দেয়া। প্রয়োজন মতো অভিযোগ পাঠিয়ে, তাদের ব্যক্তিস্বার্থে ঘুষ গ্রহণ বা বেআইনী কাজ করতে না দিয়ে, এবং সংশ্লিষ্ট কোনো পক্ষই আইন ভঙ্গ না করে। এ কাজগুলো করতে পারলে আমি নিশ্চিত যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯১৮-১৯ সালে আমার গুরুতর অসুস্থতার কারণে বাধ্য হয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ ত্যাগ করতে হলো এবং এটা আমার জন্য সার্বক্ষণিক বেদনাদায়ক ও লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল, বিশেষ করে এ অপারগতা এমন সময়ে ঘটল যখন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার আন্দোলন বেশ ভালোভাবে এগুচ্ছিল। দরিদ্র রেল ও স্টিমার যাত্রীদের দুঃখ-কষ্ট, যা তাদের নিজেদের বদ-অভ্যাসের কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; বৈদেশিক বাণিজ্যে গভর্নমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত অবৈধ সুবিধা এবং এ জাতীয় অন্যান্য অনিয়মগুলোর প্রতিকার করতে নাগরিক সমাজে একটি দল গড়ে তোলা যেতে পারে এবং এ ব্যাপারে দু'একজন উদ্যমী কর্মী সার্বক্ষণিকভাবে তাদের শ্রম দিতে পারে।

কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেরকে একই অবস্থায় ফেলে রেখে আমার বেনারসের অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে আসছি। আমি সকাল বেলায় সেখানে পৌছলাম এবং একজন পাণ্ডার সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। ট্রেন থেকে নামার সাথে সাথে অসংখ্য ব্রাহ্মণ আমাকে ঘিরে ধরল এবং আমি এদের একজনকে নির্বাচন করলাম যাকে অন্যদের তুলনায় পরিষ্কার ও ভালো মনে হলো। আমার পছন্দ সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। তার বাড়ির উঠানে একটা গরু ছিল এবং তার ঘরের দোতালায় আমার থাকার ব্যবস্থা হলো। শাস্ত্রীয় প্রথামতে গঙ্গাস্নান করে পবিত্র হওয়ার আগে

www.pathagar.com

আমি খেতে চাইলাম না। পাণ্ডা এর ব্যবস্থা করল। আমি তাকে আগেই বলে রেখেছিলাম কোনো অবস্থাতেই আমি সোয়া এক টাকার বেশি দক্ষিণা দেব না এবং গঙ্গাস্নানের প্রস্তুতি গ্রহণের সময় তার এটা মনে রাখা উচিত।

পাণ্ডা আমার কথায় সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেল। সে বলল, "তীর্থযাত্রী ধনী হোক বা দরিদ্র হোক, সবার জন্য একই নিয়ম। তবে আমরা যে দক্ষিণা পাই তার পরিমাণ তীর্থযাত্রীর ইচ্ছা ও সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে।" দেখলাম, আমার বেলায় পাণ্ডা সাধারণ আনুষ্ঠানিকতা মোটেই সংক্ষিপ্ত করল না। বেলা ১২ টায় পূজা শেষ হলো এবং আমি কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির দর্শনের জন্য গেলাম। সেখানে যা দেখলাম তাতে গভীর বেদনাহত হলাম। ১৮৯১ সালে যখন বোম্বেতে ব্যারিস্টার হিসেবে প্র্যাকটিস করছিলাম, সেখানে প্রার্থনা সমাজ হলে "কাশীতে তীর্থযাত্রা" শিরোনামে এক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলাম। তাই কিছু পরিমাণে হতাশ হবার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু প্রকৃত হতাশা আমার প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি হলো।

মন্দিরে গমনের পথ ছিল সরু ও পিচ্ছিল। সেখানে শান্তির লেশ মাত্র ছিল না। মাছির ভন ভন আর দোকানী ও তীর্থযাত্রীদের হট্টগোল একেবারেই অসহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

ধ্যান ও সম্মিলিত প্রার্থনায় অংশগ্রহণের প্রত্যাশিত পরিবেশ এখানে স্পষ্টভাবেই অনুপস্থিত। এখানে প্রার্থনার পরিবেশ ভক্তদেরকে নিজের মধ্যে খুঁজে নিতে হবে। আমি কয়েকজন ভক্ত বোনকে দেখলাম যারা ধ্যানে মগ্ন রয়েছেন, বাইরের পরিবেশ সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অচেতন। কিন্তু এর জন্য মন্দির কর্তৃপক্ষ কোনো কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না। কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হওয়া উচিত দৈহিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য মন্দিরের চারপাশে শুদ্ধ, মধুর ও শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি ও তা সংরক্ষণ করা। তার পরিবর্তে আমি দেখতে পেলাম একটি বাজার যেখানে ধূর্ত দোকানীরা মিষ্টি ও হাল ফ্যাশানের খেলনা বিক্রী করছে।

আমি যখন মন্দিরে পৌঁছলাম তখন প্রবেশদ্বারে আমাকে একগাদা দুর্গন্ধযুক্ত পচা ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হলো। মেঝেতে সুন্দর মার্বেল পাথর বসানো ছিল, যার অংশবিশেষ সৌন্দর্য জ্ঞানহীন কোন ভক্ত ভেঙে ফেলেছিল, ভাঙা স্থানে ধাতব মুদ্রা স্থাপন করায় এতে ময়লা ধারণের উত্তম ব্যবস্থা হয়েছিল।

আমি জ্ঞান-বাপীর (জ্ঞানের কূপ) নিকটে গেলাম। আমি এখানে ঈশ্বরের সন্ধান করলাম, কিন্তু পেলাম না। তাই আমার মন মেজাজ তেমন ভালো ছিল না। জ্ঞান-বাপীর চারপাশেও ময়লা আবর্জনার স্তূপ ছিল। দক্ষিণা দেয়ার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। তাই আমি এক পাই দক্ষিণা দিলাম। এখানে দায়িত্বরত পাণ্ডা রেগে গেল এবং পাইটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। সে আমাকে গালাগাল দিয়ে বলল, "এ অপমান তোকে সোজা নরকে নিয়ে যাবে।"

এতে আমি বিচলিত হলাম না। বললাম, "মহারাজ, আমার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। কিন্তু আপনার গোত্রের একজনের মুখে এরকম ভাষার ব্যবহার মানায়

www.pathagar.com

না। ইচ্ছে হলে এই এক পাই আপনি নিতে পারেন, না হলে এটাও আপনি হারাবেন।"

সে জবাব দিল, "দূর হয়ে যা। আমি তোর এক পাইয়ের পরোয়া করি না।" এর পর আরো গালির ঝাপ্টা বর্ষিত হলো।

আমি পাইটা তুলে নিয়ে আমার পথ ধরলাম। নিজেকে বোঝালাম, ব্রাহ্মণ এক পাই হারাল আর আমার এক পাই বাঁচল। কিন্তু মহারাজ একটা পাইও যেতে দেবার পাত্র ছিল না। সে আমাকে পেছন থেকে ডেকে বলল, "ঠিক আছে পাইটা এখানে রাখ, আমি তোর মতো হতে চাই না। আমি তোর পাই না নিলে তোর অমঙ্গল হবে।"

আমি নীরবে পাইটা তাকে দিলাম এবং একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেলাম।

এর পর আরো দু'বার আমি কাশী শিবনাথে গিয়েছি কিন্তু তা আমার মহাত্মা খেতাব পাবার পরে এবং তখন এবারের বর্ণিত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হওয়া আর সম্ভব ছিল না। আমাকে দর্শনের জন্য আগ্রহী জনতা আমাকে মন্দিরের দর্শন থেকে বঞ্চিত করছিল। মহাত্মাদের দুঃখ কেবল মহাত্মারাই জানেন। মহাত্মা হিসেবে আমার আগমন না ঘটলে মন্দিরের ময়লা আবর্জনা আর কোলাহল আগের মতোই থাকত।

ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহে যদি কারো সন্দেহ থাকে তিনি এসব পবিত্র স্থানে গিয়ে একনজর দেখতে পারেন। যোগীদের রাজপুত্র (ঈশ্বর) তাঁর পবিত্র নামে সংঘটিত কত ভণ্ডামি আর অধর্ম সহ্য করে যাচ্ছেন! বহু পূর্বেই তিনি ঘোষণা করেছেন, "মানুষ যেমন বীজ বপন করবে, তেমন ফসল পাবে।" কর্মের বিধান অপ্রতিরোধ্য এবং তা এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। সে কারণে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের তেমন কোনো প্রয়োজন পড়ে না। তিনি বিধান তৈরি করে দিয়েছেন, তারপর যেন অবসরে আছেন।

মন্দির দর্শনের পর আমি মিসেস বেসান্টের সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমি জানতাম যে তিনি সবেমাত্র অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন। আমার নাম তার কাছে পাঠালাম। তিনি তৎক্ষণাৎ এলেন। যেহেতু আমি কেবল তাকে সম্মান জানাতে এসেছিলাম, বললাম, "আমি জানি আপনার স্বাস্থ্য ভালো নয়। আমি কেবল আপনাকে সম্মান জানাতে চেয়েছিলাম। আপনার অসুস্থ শরীর নিয়েও দয়া করে আমাকে দেখা করার সুযোগ দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি আপনাকে আর কষ্ট দিতে চাই না।" একথা বলে আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

একুশ
বোম্বেতে বসতি স্থাপন?

বোম্বেতে আমার স্থায়ী হওয়ার ব্যাপারে গোখলে খুবই আগ্রহী ছিলেন যাতে আমি সেখানে বারে প্রাকটিস করতে পারি, সেই সাথে তাকে গণকাজে সাহায্যও করতে পারি। সে সময়ে গণকাজ বলতে কংগ্রেসের কাজ বুঝাত এবং সে মুহূর্তের প্রধান

www.pathagar.com

কাজ ছিল, যে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠায় তিনি শরীক ছিলেন সেই কংগ্রেসের প্রশাসন পরিচালনা করা।

গোখলের উপদেশ আমার পছন্দ হলো। কিন্তু আমি ব্যারিস্টার হিসেবে সাফল্যের ব্যাপারে আস্থাবান ছিলাম না। অতীত ব্যর্থতার অপ্রীতিকর স্মৃতি তখনো আমাকে তাড়া করছিল এবং ব্রীফ পাবার জন্যে চাটুকারিতা আমি তখনো বিষবৎ ঘৃণা করতাম।

অতএব প্রথমে আমি রাজকোটে কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার পুরনো শুভাকাংখী কেবলরাম মাভজীদেব, যিনি আমাকে ইংল্যান্ড যেতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তিনি রাজকোট কোর্টে ছিলেন এবং তিনি আমাকে সরাসরি তিনটি ব্রীফ দিয়ে দিলেন। এর মধ্যে দুটো ছিল কাথিয়াওয়াড়ের পলিটিক্যাল এজেন্টের জুডিশিয়াল এসিস্ট্যান্ট বরাবরে আবেদন, আরেকটি ছিল জামনগরে মূল কেস। শেষেরটা ছিল আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমি যখন বললাম কেসগুলো সঠিকভাবে করতে পারব বলে আমার নিজের ওপর ভরসা নেই, কেবলরাম মাভজীদেব অবাক হয়ে বললেন, "হার-জিত তো তোমার ব্যাপার নয়। তুমি সাধ্যমতো চেষ্টা করবে। আর তোমাকে সাহায্য করতে আমি তো আছিই।"

অন্য পক্ষের আইনজীবী ছিলেন প্রয়াত শ্রীযুক্ত সমার্থ। আমি মোটামুটি প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। আমি ভারতীয় আইন বেশি জানতাম তা নয়, তবে কেবলরাম আমাকে পুরোদস্তুর নির্দেশনা দিয়েছিলেন। আমি দক্ষিণ আফ্রিকা যাবার আগে বন্ধুদেরকে বলতে শুনেছি যে সাক্ষ্য আইন স্যার ফিরোজশাহর নখদর্পণে ছিল, আর সেটাই ছিল তার সাফল্যের গোপন রহস্য। আমি সেটা মনে রেখেছিলাম এবং আমার সমুদ্র যাত্রায় ভারতীয় সাক্ষ্য আইন এবং এর ভাষ্য যত্ন সহকারে পড়েছিলাম। অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা লব্ধ সুবিধাও আমার ছিল।

আমি কেসটাতে জিতলাম এবং কিছুটা আত্মবিশ্বাস অর্জন করলাম। আপীল আবেদনের বিষয়ে আমার কোনো ভয় ছিল না, সেগুলো যথারীতি সফল হয়েছিল। এ থেকে আমার মনে আশা জাগল যে হয়তো শেষ পর্যন্ত বোম্বেতেও আমি ব্যর্থ হব না।

কি পরিস্থিতিতে আমি বোম্বে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম তা বর্ণনার আগে ইংরেজ অফিসারদের অবিবেচনা ও অজ্ঞতা সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতার কিছু বর্ণনা দিতে চাই। জুডিশিয়াল এসিস্ট্যান্টের কোর্ট ছিল ভ্রাম্যমাণ। তিনি সর্বদা ভ্রমণে থাকতেন আর তিনি যেখানে তার ক্যাম্প স্থানান্তর করতেন উকিল ও মক্কেলদের সেখানে যেতে হতো। যখন সদর দপ্তরের বাইরে যেতে হতো তখন উকিলরা বেশি ফি দাবি করতেন এবং স্বাভাবিকভাবেই মক্কেলদের দ্বিগুণ টাকা গুণতে হতো। এ অসুবিধার ব্যাপারে বিচারকের কোনো মাথাব্যথা ছিল না।

আমি যে আপীলের কথা বলছি তার শুনানি হবে বেরাওয়ালে, যেখানে ব্যাপকভাবে প্লেগ দেখা দিয়েছে। আমার মনে পড়ে ৫৫০০ জনসংখ্যার ঐ শহরে

www.pathagar.com

প্রতিদিন অন্তত ৫০টি মামলা কোর্টে উঠত। বাস্তবে শহরটি জনশূন্য হয়ে পড়েছিল এবং আমি শহর থেকে দূরে একটা পরিত্যক্ত ধর্মশালায় উঠলাম। কিন্তু মক্কেলরা কোথায় থাকবে? তারা দরিদ্র হলে ঈশ্বরের দয়ার ওপর নিজেদের ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর ছিল না।

এ কোর্টে এক বন্ধুর কেস ছিল। তিনি তারবার্তা করে জানালেন বেরাওয়ালে প্লেগ দেখা দেয়ার কারণে ক্যাম্প সুবিধাজনক অন্য কোথাও সরিয়ে নিতে বিচারকের নিকট আমার আবেদন করা উচিত। আমি আবেদন পেশ করলে সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ভয় পাচ্ছ?"

আমি জবাব দিলাম, "এটা আমার ভয় পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্ন নয়। আমার মনে হয় আমি যে কোনো জায়গায় যেতে পারি, কিন্তু মক্কেলদের কি হবে?"

সাহেব বললেন, "প্লেগ ভারতে থাকার জন্যে এসেছে। একে ভয় পাচ্ছ কেন? বেরাওয়ালের জলবায়ু খুব ভালো। (সাহেব শহর থেকে অনেক দূরে সাগর তীরে খাটানো প্রাসাদোপম তাঁবুতে বাস করেন)। অবশ্যই লোকজনকে খোলা জায়গায় বাস করা শিখতে হবে।"

সাহেবের এ দর্শনের বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক করে লাভ নেই। সাহেব সেরেস্তাদারকে বললেন, "মি. গান্ধী যা বলল তা নোট করে রাখো এবং আমাকে জানাবে যে উকিল বা মক্কেলদের জন্যে সত্যিই খুব অসুবিধে হচ্ছে কি না।"

অবশ্য সাহেব যা সঠিক বলে মনে করেছেন, আন্তরিকভাবে তাই করেছেন। কিন্তু তিনি দরিদ্র ভারতবাসীর দুঃখকষ্ট কিভাবে বুঝবেন? সাধারণ লোকের প্রয়োজন, অভ্যাস, স্বভাব বৈচিত্র এবং রীতি নীতি তিনি কিভাবে বুঝবেন? যিনি স্বর্ণমুদ্রায় দ্রব্যমূল্য হিসেব করতে অভ্যস্ত, হঠাৎ করে কিভাবে তিনি ক্ষুদ্র তামার পয়সায় হিসেব করবেন? হাতী যেমন পিপড়ার মতো করে চিন্তা করতে অক্ষম, দুনিয়ার সর্বোচ্চ সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ইংরেজরা ভারতীয়দের মতো করে চিন্তা করতে বা তাদের পক্ষে আইন করতে তেমনি অক্ষম।

এবার মূল কাহিনীতে ফিরে যাই। আমার সাফল্য সত্ত্বেও আমি আরো কিছুদিন রাজকোটে থেকে যাবার চিন্তা করছিলাম। এমন সময়ে একদিন কেবলরাম আমার কাছে এসে বললেন, "গান্ধী, আমরা তোমাকে এখানে নীরস জীবন যাপন করতে দেব না। তুমি অবশ্যই বোম্বেতে স্থায়ী হবে।"

"কিন্তু সেখানে আমাকে কাজ জুটিয়ে দেবে কে? জিজ্ঞেস করলাম। "আপনি কি আমার খরচ চালাবেন?"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, চালাব। আমরা তোমাকে মাঝে মাঝে বড় ব্যারিস্টার হিসেবে বোম্বে থেকে এখানে নিয়ে আসব। আর মুসাবিদার কাজ ওখানেই পাঠিয়ে দেব। কোনো ব্যারিস্টারকে উঠানো বা ডুবানো আমাদের মতো উকিলদের হাতে। তুমি জামনগর ও বেরাওয়ালে তোমার যোগ্যতার প্রমাণ

www.pathagar.com

দিয়েছ। সুতরাং তোমার ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র আশংকা নেই। গণকাজ করা তোমার বিধিলিপি এবং তুমি কাথিয়াওয়াড়ে চাপা পড়ে থাকবে আমরা তা হতে দেব না। এবার বলো, তুমি কবে বোম্বে যাচ্ছ?"

আমি জবাব দিলাম, "নাটাল থেকে কিছু টাকা পাব বলে আশা করছি। ওটা পেলেই আমি যাব।"

প্রায় দু'সপ্তাহের মধ্যে টাকাটা এলো এবং আমি বোম্বে চলে গেলাম। পাইন, গিলবার্ট অ্যান্ড সায়ানীর অফিসে আমি চেম্বার নিলাম এবং মনে হলো যে আমি বোম্বেতে স্থায়ী হতে যাচ্ছি।

বাইশ
বিশ্বাসের পরীক্ষা

যদিও আমি ফোর্টে একটি চেম্বার ও গিরগাঁওয়ে বাসা ভাড়া নিলাম, ঈশ্বর চাননি যে আমি বোম্বেতে স্থায়ী হই। নতুন বাসায় উঠতে না উঠতেই আমার দ্বিতীয় পুত্র মণিলাল, কয়েক বছর আগে যার গুরুতর গুটি বসন্ত হয়েছিল, এবারে সে প্রবল টাইফয়েডে আক্রান্ত হলো, সেই সাথে রাতে প্রলাপ বকাসহ নিউমোনিয়া।

ডাক্তার ডাকা হলো। তিনি বললেন, ওষুধে তেমন কাজ হবে না, বরং ডিম ও মুরগীর সুরুয়া খাওয়ালে উপকার হবে।

মণিলালের বয়স তখন মাত্র ১০ বছর। সে কি খেতে চায় তা জানতে চাওয়া অবান্তর। তার অভিভাবক হিসেবে আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হলো। পার্সী ডাক্তারটি ছিলেন খুব ভালোমানুষ। আমি তাকে বললাম আমরা সবাই নিরামিষ ভোজী, সে কারণে সম্ভবত আমার ছেলেকে ঐ দুটোর কোনোটাই খাওয়াতে পারব না। তিনি কি অন্য কিছু খাওয়ানোর পরামর্শ দিতে পারেন?

ডাক্তার বললেন, "আপনার ছেলের জীবন সংকটাপন্ন। আমরা তাকে পানি মেশানো দুধ দিতে পারতাম, কিন্তু তাতে সে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাবে না। আপনি জানেন, অনেক হিন্দু পরিবারে আমাকে ডাকা হয় এবং আমি যা ব্যবস্থা দেই তাতে কেউ আপত্তি করে না। আমার মনে হয় আপনার পুত্রের অবস্থা বিবেচনায় এতটা শক্ত না হওয়াই ভালো।"

আমি বললাম, "আপনার কথা অত্যন্ত সঠিক। ডাক্তার হিসেবে আপনি তাই বলবেন। কিন্তু আমার দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন। ছেলেটা যদি বয়স্ক হতো তাহলে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা জেনে নিয়ে সেভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করা যেত। কিন্তু এখানে তার পক্ষে চিন্তা করে আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। আমার মনে হয় কেবল এরকম অবস্থাতেই মানুষের বিশ্বাসের সত্যিকার পরীক্ষা হয়। ভুল হোক বা শুদ্ধ হোক, এটা আমার ধর্মবিশ্বাসের অংশ যে, মানুষ মাংস, ডিম বা এ জাতীয় খাবার খেতে পারে না। জীবন ধারণের মাধ্যম হিসেবে খাবার গ্রহণের ব্যাপারেও একটা সীমারেখা থাকা উচিত। এমন কি জীবন রক্ষার জন্যে হলেও

www.pathagar.com

আমরা কিছু কিছু কাজ করতে পারি না। আমি যতটা বুঝি, আমার ধর্ম আমাকে বা আমার পরিবারের কাউকে এরকম সংকটময় মুহূর্তেও মাংস বা ডিম খাওয়ার অনুমতি দেয় না। সুতরাং আপনি যে আশংকার কথা বলছেন সে ব্যাপারে আমাকে ঝুঁকি নিতেই হচ্ছে। কিন্তু দয়া করে একটা কথা বলুন। যেহেতু আপনার চিকিৎসা আমি গ্রহণ করতে পারছি না, আমার জল চিকিৎসা জানা আছে, সেটা কি প্রয়োগ করে দেখতে পারি? কিন্তু সমস্যা হলো আমি ছেলের নাড়ী, বুক ও ফুসফুসের অবস্থা পরীক্ষার পদ্ধতি জানি না। আপনি যদি সময় সময় এসে পরীক্ষা করে তার অবস্থা আমাকে জানান, তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।"

ভালোমানুষ ডাক্তারটি আমার অসুবিধা বুঝলেন এবং আমার অনুরোধে সম্মত হলেন। যদিও মণিলাল তার পছন্দ-অপছন্দ বলতে পারছিল না, তবু ডাক্তারের সাথে আমার যা কথা হয়েছে তার সবকিছু তাকে বললাম এবং তার মতামত জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, "তুমি তোমার জল চিকিৎসা শুরু করে দাও। আমি ডিম বা মুরগীর সুরুয়া খাব না।"

এতে আমি খুশী হলাম। যদিও আমি বুঝলাম যে আমি যদি তাকে ডিম-মাংস দিতাম তাহলে সে তা গ্রহণ করত। আমি কুন (Kuhne) এর চিকিৎসা পদ্ধতি জানতাম এবং তা প্রয়োগ করলাম। আমি জানতাম উপোষ করলেও কাজ হতে পারে। সুতরাং আমি মণিলালকে কুনের পরামর্শমতে প্রতিবারে বাথটাবে তিন মিনিট করে ডুবিয়ে কোমর-স্নান (hip-bath) করাতে লাগলাম এবং পানি মেশানো কমলার রস খাওয়ালাম। এভাবে তিন দিন চলল। কিন্তু জ্বর ছাড়ল না, কখনো কখনো তা ১০৪ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠল। রাতে সে প্রলাপ বকতে থাকল, আমি উদ্বিগ্ন হতে লাগলাম। লোকে আমাকে কি বলবে? আমার বড়দা আমার সম্পর্কে কি ভাববে? আমরা কি আরেকজন ডাক্তার ডাকতে পারতাম না? একজন আয়ুর্বেদ চিকিৎসককে কেন ডাকছি না? পিতামাতার কি অধিকার আছে তাদের খামখেয়ালীপনা সন্তানের ওপর চাপিয়ে দেয়ার?

এ ধরনের চিন্তা আমাকে তাড়া করছিল। এর বিপরীত চিন্তাধারাও এলো। ঈশ্বর অবশ্যই দেখে খুশী হবেন যে আমি নিজের জন্যে যে চিকিৎসা দিতাম, ছেলের জন্যে তাই দিচ্ছি। জল চিকিৎসায় আমার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এলোপ্যাথিতে বিশ্বাস ছিল না। ডাক্তাররা তো আরোগ্যের নিশ্চয়তা দিতে পারছিলেন না। বড়জোর তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা (experiment) করতে পারতেন। জীবনের সুতো তো ঈশ্বরের হাতে। ভালো-মন্দের ভার কেন আমি তাঁর হাতে ছেড়ে দিচ্ছি না? আর যেটা আমি সঠিক চিকিৎসা বলে মনে করছি তাঁর নাম নিয়ে সেটাই কেন চালিয়ে যাচ্ছি না?

আমার মন এরকম বিপরীত চিন্তায় দ্বিধা বিভক্ত হচ্ছিল। রাত নেমে এলো। আমি মণিলালের বিছানায় তার পাশে শুয়ে ছিলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম তাকে ভেজা কাপড়ে জড়িয়ে (wet sheet pack) দেব। উঠে পড়লাম। একটা কাপড়

www.pathagar.com

ভিজালাম, চিপে পানি বের করলাম এবং মণিলালের গায়ে জড়িয়ে দিলাম, শুধু মাথাটা বাইরে থাকল এবং দুটো কম্বলে তাকে ঢেকে দিলাম। মাথাটাও ভেজা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে দিলাম। পুরো শরীর আগুনে পোড়ানো লোহার মতো জ্বলছিল, চামড়া যেন পুড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘাম একেবারেই হচ্ছিল না। আমি ভীষণ ক্লান্তি বোধ করছিলাম। মণিলালকে তার মায়ের দায়িত্বে রেখে আমি নিজেকে একটু চাঙ্গা করার জন্য চৌপাটিতে হাঁটতে গেলাম। তখন রাত প্রায় দশটা। বাইরে পথচারী খুব কম। গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকায় তাদের প্রতি আমার নজরও ছিল না। নিজের মনে বার বার বলছিলাম, "হে প্রভু, এ সংকটের পরীক্ষায় আমার মান-সম্মান তোমার হাতে।" মুখে ছিল অবিরাম রাম নাম। অল্পক্ষণ পরে আমি ফিরে এলাম, হৃদপিণ্ড বুকের মধ্যে লাফাচ্ছিল।

আমি ঘরে প্রবেশের সাথে সাথেই মণিলাল বলে উঠল, "তুমি ফিরে এসেছ বাপু?"

"হ্যাঁ, বাবা।"

"আমাকে টেনে বের করো, আমার গা পুড়ে যাচ্ছে।"

"তোমার কি ঘাম হচ্ছে, বাবা?"

"ঘামে একেবারে ভিজে গেছি। আমাকে বের করে দাও।"

কপালে হাত দিলাম। সারা কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল। জ্বর নামছিল। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম।

"মণিলাল, তোমার জ্বর এখন নিশ্চয়ই ছেড়ে যাবে। আরেকটু ঘাম বের হতে দাও, তারপর তোমাকে বের করে আনব।"

"না, আর পারছি না। আমাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে মুক্তি দাও। ইচ্ছে হলে আমাকে অন্য সময় আবার জড়িয়ে দিও।"

তার মনোযোগ অন্য প্রসঙ্গে ঘুরিয়ে দিয়ে আরো কয়েক মিনিট ঐ অবস্থায় রাখতে সক্ষম হলাম। তার কপাল থেকে স্রোতের মতো ঘাম গড়িয়ে পড়ল। তার ভেজা কাপড় খুলে দিয়ে শরীর শুকালাম। এরপর পিতা-পুত্র একই বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমরা দু'জনেই মড়ার মতো ঘুমালাম। পরদিন সকাল বেলা মণিলালের জ্বর অনেক কম ছিল। এ অবস্থায় চল্লিশ দিন সে শুধু পানি মেশানো দুধ ও ফলের রস খেয়ে কাটাল। আমার ভয় কেটে গেল। জ্বরটা ছিল নাছোড়বান্দা প্রকৃতির এবং শেষ পর্যন্ত তা দমন করা সম্ভব হলো।

মণিলাল আজ আমার পুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে স্বাস্থ্যবান। তার রোগমুক্তি কিভাবে সম্ভব হয়েছিল– ঈশ্বরের দয়ায়, জল-চিকিৎসায়, না কি সযত্ন পরিচর্যা ও সঠিক পথ্যের কারণে, তা কে বলবে? যার যেমন বিশ্বাস তিনি তেমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আমার ব্যাপারে বলতে পারি, ঈশ্বর আমার সম্মান বাঁচিয়েছেন, আর আমার সে বিশ্বাস আজো অটুট আছে।

www.pathagar.com

তেইশ

আবার দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা

মণিলাল সেরে উঠল। কিন্তু আমি দেখলাম, গিরগাঁওয়ের বাসায় বসবাস করা সম্ভব নয়। বাসাটা ছিল স্যাঁতসেঁতে আর কম আলো-বাতাস সম্পন্ন। সুতরাং শ্রী রেবাশংকর জগজীবনের সাথে আলোচনা করে বোম্বের উপশহরে আরো বেশি আলো-বাতাস চলাচল করে এমন একটি বাসা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি বান্দ্রা ও সান্তাক্রুজ এলাকায় হেঁটে বেড়ালাম। বান্দ্রা এলাকায় কসাইখানা থাকায় সে এলাকা আমাদের পছন্দ হলো না। ঘাটকোপার ও এর আশেপাশের এলাকা সমুদ্র থেকে বেশি দূরে হয়। অবশেষে সান্তাক্রুজে আমরা একটা সুন্দর বাংলো খুঁজে পেলাম যেটা সর্বাধিক স্বাস্থ্যসম্মত বিবেচনা করে ভাড়া নিলাম।

আমি সান্তাক্রুজ থেকে চার্চগেট পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর সিজন টিকেট কিনলাম এবং মনে আছে প্রায় দিনই প্রথম শ্রেণীর কম্পার্টমেন্টে আমিই একমাত্র যাত্রী হিসেবে এক ধরনের গর্ব অনুভব করতাম। প্রায়ই আমি পায়ে হেঁটে বান্দ্রা স্টেশনে গিয়ে সেখান থেকে সরাসরি চার্চগেট যাবার দ্রুততর ট্রেন ধরতাম।

আমার পেশাতে যতটা আশা করেছিলাম তার চেয়ে বেশি উন্নতি করলাম। আমার দক্ষিণ আফ্রিকান মক্কেলরা প্রায়ই আমাকে তাদের কাজ দিতেন, এ থেকে যে আয় হতো তা আমার জীবন যাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট ছিল।

আমি তখনো হাইকোর্টে কাজ ধরতে পারিনি। কিন্তু তখনকার দিনে মুট (নির্ধারিত কিছু বিষয়ে আলোচনা) অনুষ্ঠিত হতো তাতে যোগদান করেছি, যদিও আলোচনায় অংশগ্রহণ করিনি। মনে আছে জামিয়াত্রাম নানাভাই এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন। অন্যান্য নতুন ব্যারিস্টারদের মতো আমিও কেসের শুনানী শোনার জন্য হাইকোর্টে যেতাম, তবে তা যতটা জ্ঞান লাভের জন্য, তার চেয়ে বেশি সমুদ্র থেকে সরাসরি ভেসে আসা নিদ্রাকর হাওয়া উপভোগের জন্য। লক্ষ করলাম, এ আনন্দ উপভোগকারী আমি একা নই। এটা এক ধরনের ফ্যাশানে পরিণত হয়েছিল এবং এতে লজ্জা পাওয়ারও কিছু ছিল না।

যাহোক, আমি হাইকোর্টের লাইব্রেরীতে পড়াশুনা শুরু করলাম এবং নতুন নতুন ব্যক্তিদের সাথে পরিচিত হতে থাকলাম। অনুভব করলাম যে শিগগিরই আমি হাইকোর্টের কাজ ধরতে পারব।

এভাবে একদিকে আমি যেমন আমার পেশায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম, অপরদিকে গোখলে আমার ওপর সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখছিলেন এবং আমাকে নিয়ে তার নিজস্ব পরিকল্পনা তৈরি করছিলেন। তিনি প্রতি সপ্তাহে আমার অফিসে দু'তিনবার করে ঢুঁ মারতেন, তার সাথে এমন বন্ধুদের নিয়ে আসতেন যাদের সাথে আমার পরিচিত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করতেন এবং তার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আমাকে অবহিত রাখতেন।

কিন্তু বলা যেতে পারে যে আমার কোনো পরিকল্পনা কার্যকর হোক ঈশ্বর তা চাননি। তিনি তাঁর নিজ ইচ্ছেমতো আমাকে পরিচালনা করেছেন।

www.pathagar.com

যখন আমি নিজ ইচ্ছে অনুযায়ী বসতি স্থাপন করতে মনস্থির করেছি, ঠিক তখনই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে অপ্রত্যাশিত তারবার্তা পেলাম, "চেম্বারলেন আসছেন, শিগগীর ফিরে আসুন।" আমি আমার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে এ মর্মে তারবার্তা পাঠালাম, যে মুহূর্তে তারা আমার ব্যয় নির্বাহের টাকা পাঠাবেন সে মুহূর্তেই আমি রওনা হতে প্রস্তুত আছি। তাঁরা দ্রুত ব্যবস্থা নিলেন, আমি চেম্বার বন্ধ করে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করলাম।

আমার ধারণা ছিল সেখানে আমার কাজ শেষ করতে অন্তত এক বছর লাগবে, তাই আমি বাংলোটা রাখলাম এবং আমার ছেলেদের রেখে গেলাম।

তখন আমি বিশ্বাস করতাম যেসব উদ্যমী যুবক দেশে সুবিধা করতে পারে না তাদের উচিত নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে যাওয়া। সে কারণে আমি আমার সাথে এরকম চার পাঁচজন যুবককে নিলাম, মগনলাল গান্ধী তাদেরই একজন।

গান্ধী পরিবার খুব বড় পরিবার ছিল এবং এখনো আছে। এ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যারা প্রচলিত পথ ত্যাগ করে বিদেশ গমনে ইচ্ছুক আমি তাদের সকলকে খুঁজে বের করতে চাইলাম। আমার বাবা এরকম অনেককে রাষ্ট্রীয় চাকরিতে নিয়োগ দিয়েছিলেন। আমি তাদেরকে চাকরীর মোহ থেকে মুক্ত করতে চাইলাম। আমি তাদের জন্য অন্য কোনো চাকরীর ব্যবস্থা করতে পারিনি, আসলে তা করতে চাইনি। আমি চেয়েছিলাম তারা স্বাবলম্বী হোক।

কিন্তু আমার আদর্শের অগ্রগতির সাথে সাথে এসব যুবককে আমার আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চেষ্টা করলাম এবং মগনলাল গান্ধীকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমি সবচেয়ে বেশি সফল হয়েছিলাম।

স্ত্রী-পুত্রদের থেকে বিচ্ছেদ, স্থায়ী বসতি ভেঙে দেয়া এবং নিশ্চিত অবস্থান থেকে অনিশ্চিতের পথে যাত্রা—এসবই সাময়িক বেদনাদায়ক কিন্তু আমি অনিশ্চিত জীবনে নিজেকে অভ্যস্ত করে নিয়েছিলাম। আমার ধারণা এ পৃথিবীতে ঈশ্বর তথা সত্য ছাড়া সবকিছুই যখন অনিশ্চিত সেখানে কোনো বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার আশা করাই ভুল। আমাদের চারপাশে যা ঘটে বা ঘটছে বলে মনে হয় তার সবই অনিশ্চিত, ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এর মধ্যে সর্বোচ্চ এক সত্তা নিশ্চিতরূপে লুকিয়ে আছেন এবং যে ঐ নিশ্চিতের ক্ষণিক দেখা পায় সে আশীর্বাদপ্রাপ্ত এবং সে তার জীবনের গাড়ি তাঁর সাথে জুড়ে দিতে পারে। সেই সত্যের অন্বেষাই জীবনের পরম মঙ্গল।

ডারবানে পৌঁছতে আমার একদিন দেরী হয়ে গেল। আমার জন্যে অনেক কাজ জমে ছিল। মি. চেম্বারলেনের সাথে দেখা করার দিন নির্ধারিত হয়েছিল। তার কাছে পেশ করার জন্যে স্মারকলিপির মুসাবিদা আমাকে করতে হলো এবং সেটাসহ প্রতিনিধিদলের সাথে আমাকে যেতে হলো।

www.pathagar.com

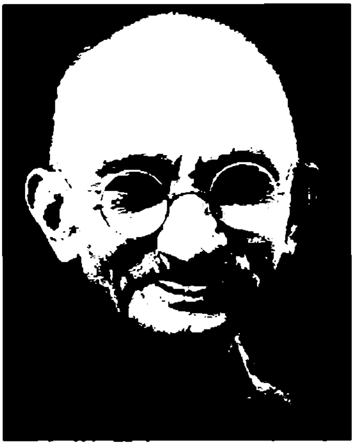

আমার আত্মজীবনী

[চতুর্থ পর্ব]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক

ভালোবাসার শ্রম বিফলে গেল

মি. চেম্বারলেন দক্ষিণ আফ্রিকা এসেছিলেন ৩ কোটি ৫০ লক্ষ পাউন্ড উপঢৌকন হিসেবে নিতে, আর ইংরেজ ও বোয়ারদের হৃদয় জয় করতে। অতএব ভারতীয়দের দাবিদাওয়া তিনি ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন।

তিনি বললেন, "আপনারা জানেন, স্বায়ত্তশাসিত কলোনীগুলোর ওপর সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ প্রায় নেই। আপনাদের দুঃখ-দুর্দশা সত্য বলেই মনে হচ্ছে। আমি যতটা পারি আপনাদের জন্য করব, কিন্তু যদি আপনারা ইউরোপীয়ানদের মধ্যে বাস করতে চান তাহলে আপনাদেরকে সাধ্যমতো চেষ্টা করতে হবে তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে এবং তাদের সাথে মানিয়ে চলতে।"

দাবি দাওয়া পেশকারী প্রতিনিধি দলকে এ জবাব হতোদ্যম করে দিল। আমি নিজেও হতাশ হলাম। এটা আমাদের চোখ খুলে দিল এবং আমি ভেবে দেখলাম আমাদের কাজ আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। সহকর্মীদেরকে আমি পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বোঝালাম।

প্রকৃতপক্ষে মি. চেম্বারলেনের জবাবে কোনো ভুল ছিল না। তিনি ভণিতা না করে খোলাখুলি বলে দিয়েছিলেন, সেটাই বরং ভালো হয়েছিল। তিনি ভদ্রভাবে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, এখানে জোর যার মুল্লুক তার বা তলোয়ারের আইন চালু থাকবে।

কিন্তু আমাদের তো তলোয়ার বলতে কিছুই ছিল না। আর তলোয়ারের আঘাত সহ্য করার মতো দৈহিক ও মানসিক শক্তিও আমাদের ছিল না।

মি. চেম্বারলেন উপমহাদেশ সফরে এসেছিলেন খুব অল্প সময়ের জন্য। শ্রীনগর থেকে কেপ কমোরিন পর্যন্ত ১৯০০ মাইল এবং ডারবান থেকে কেপটাউন ১১০০ মাইলের বেশি। মি. চেম্বারলেনকে এ দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়েছিল ঝটিকাবেগে।

নাটাল থেকে তাড়াহুড়ো করে তিনি ট্রান্সভালে গেলেন। সেখানেও তার কাছে ভারতীয়দের দাবি দাওয়া পেশ করানোর প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। কিন্তু আমি প্রিটোরিয়াতে এত দ্রুত পৌছব কি করে? সেখানে আমার সময়মতো পৌছার জন্য প্রয়োজনীয় বৈধ অনুমতির ব্যবস্থা করা আমার লোকদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যুদ্ধ ট্রান্সভালকে ভুতুড়ে বিরান ভূমিতে পরিণত করেছিল। সেখানে খাওয়া-পরার উপকরণ সহজলভ্য ছিল না। দোকানগুলো ছিল খালি অথবা বন্ধ, সেগুলোতে

www.pathagar.com

মালামাল তোলা বা খোলার অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু তা ছিল সময় সাপেক্ষ। দোকানগুলো প্রয়োজনীয় মালামালে পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উদ্বাস্তুদেরকেও ফেরার অনুমতি দেয়া যাচ্ছিল না। সুতরাং ট্রান্সভালের প্রত্যেক বাসিন্দাকে শহরে প্রবেশের জন্য অনুমতিপত্র নিতে হচ্ছিল। ইউরোপীয়ানদের জন্য এটা পাওয়া কোনো সমস্যাই ছিল না, কিন্তু ভারতীয়দের জন্য তা খুব কঠিন ছিল।

যুদ্ধের সময় ভারত ও সিলোন থেকে অনেক অফিসার ও সৈনিক দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিল এবং বৃটিশ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ছিল তারা সেখানে বসতি স্থাপন করতে চাইলে তার ব্যবস্থা করে দেয়া। যেমন করেই হোক, নতুন অফিসারদেরকে নিয়োগ দিতে হবে এবং এসব অভিজ্ঞ লোক তাদের খুব কাজে আসবে। তাদের দ্রুত উদ্ভাবন ক্ষমতার বলে নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা হলো। এতে তাদের কর্মদক্ষতা প্রমাণিত হলো। নিগ্রোদের জন্য আলাদা বিভাগ ছিল। কাজেই এশিয়ানদের জন্য কেন আলাদা বিভাগ থাকবে না? মনে হলো এ যুক্তি যথেষ্ট জোরালো ও গ্রহণযোগ্য। আমি যখন ট্রান্সভালে পৌছলাম ততদিনে এই নতুন বিভাগ খোলা হয়ে গিয়েছিল এবং তা ক্রমান্বয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছিল। ফিরে আসা উদ্বাস্তুদের জন্য যে অফিসাররা অনুমতিপত্র প্রদান করছিলেন তারা সকলকেই অনুমতিপত্র দিতে পারতেন, কিন্তু এখন এশিয়ানদের জন্য নতুন বিভাগের হস্তক্ষেপ ছাড়া তারা কিভাবে অনুমতিপত্র দেবেন? আর নতুন বিভাগের সুপারিশের ভিত্তিতে যদি অনুমতিপত্র দেয়া হতো, তাহলে অনুমতি প্রদানকারী অফিসারের দায়িত্বের বোঝা অনেকটা কমানো যেত। এভাবে তারা যুক্তি দেখিয়েছিল। আসলে নতুন বিভাগ কিছু কাজ পাওয়ার অজুহাত খুঁজছিল এবং তারা টাকা কামাতে চাচ্ছিল। যদি তাদের কোনো কাজই না থাকে, তাদের থাকাটাও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে এবং তাদের চাকরিও বহাল থাকবে না। সুতরাং তারা নিজেদের স্বার্থেই কাজ তৈরি করে নিল।

ট্রান্সভালে প্রবেশের অনুমতিপত্রের জন্য ভারতীয়দেরকে ঐ বিভাগে আবেদন করতে হতো। অনেকদিন পরে দয়া করে একটা জবাব দেয়া হতো। ট্রান্সভালে ফেরতগামী লোকের সংখ্যা যেহেতু অনেক, সেখানে দালাল-টাউটের দল গড়ে উঠল যারা অফিসারদের সাথে মিলে দরিদ্র ভারতীয়দের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা লুটে নিল। আমাকে বলা হলো প্রভাব খাটানো ছাড়া কোনো অনুমতিপত্র পাওয়া যাচ্ছে না এবং প্রভাব খাটানোর পরেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১০০ পাউন্ড পর্যন্ত দিতে হয়েছে। এমতাবস্থায় মনে হলো আমার জন্য আর কোনো উপায় নেই। আমি আমার পুরনো বন্ধু ডারবানের পুলিশ সুপারের কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম, "দয়া করে আমাকে পারমিট অফিসারের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন এবং আমাকে একটা পারমিট পেতে সাহায্য করুন। আপনি জানেন যে আমি ট্রান্সভালের বাসিন্দা ছিলাম।" তিনি সাথে সাথেই মাথায় টুপি চড়িয়ে বের হলেন এবং আমাকে একটা পারমিট এনে দিলেন। আমার ট্রেন ছাড়ার পূর্বে এক ঘন্টারও

www.pathagar.com

কম সময় ছিল। লাগেজ গুছানোই ছিল। আমি পুলিশ সুপার আলেকজান্ডারকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রিটোরিয়া যাত্রা করলাম।

সামনে কি ধরনের অসুবিধার মোকাবেলা করতে হবে তার কিছুটা ধারণা পেয়ে গেলাম। প্রিটোরিয়া পৌছে আমি স্মারকলিপির খসড়া করলাম। ডারবানে মি. চেম্বারলেনের সাথে দেখা করতে ইচ্ছুক প্রতিনিধিদের নাম আগেই পেশ করতে বলা হয়েছিল বলে মনে পড়ে না, কিন্তু এখানে নতুন বিভাগ আগে নাম দিতে বলল। প্রিটোরিয়ার ভারতীয়রা আগেই জানতে পেরেছিল যে অফিসাররা প্রতিনিধিদল থেকে আমাকে বাদ দিতে চাইছেন।

কিন্তু সে বেদনাদায়ক অথচ হাস্যকর ঘটনার বর্ণনা দিতে আরেকটি অধ্যায়ের অবতারণা প্রয়োজন।

দুই
এশিয়া থেকে আগত স্বৈরাচার

নতুন ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা ভেবে পেলেন না আমি কিভাবে ট্রান্সভালে প্রবেশ করলাম। যে সব ভারতীয় তাদের কাছে যাচ্ছিল তাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল, কিন্তু তারা নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারল না। তারা অনুমান করলেন যে আমি পুরাতন পরিচিতির বলে কোনো পারমিট ছাড়াই ঢুকতে সক্ষম হয়েছি। আর সেটাই যদি সত্য হয়, তাহলে আমাকে গ্রেফতার করা যেতে পারে।

কোনো বড় যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে সাধারণ প্রথানুযায়ী কিছুদিনের জন্য সরকারকে বিশেষ ক্ষমতা দেয়া হয়। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও তাই হলো। সরকার শান্তিরক্ষা অর্ডিন্যান্স জারী করলেন যাতে বলা হলো পারমিট ছাড়া কেউ ট্রান্সভালে প্রবেশ করলে তাকে গ্রেফতার করা ও কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে। এ আইন বলে আমাকে গ্রেফতার করার বিষয়ে আলোচনা হলো, কিন্তু আমাকে পারমিট দেখানোর জন্য বলতে কারো সাহস হলো না।

অবশ্য অফিসাররা ডারবানে টেলিগ্রাম পাঠালেন এবং সেখান থেকে যখন জানলেন যে আমি পারমিট নিয়েই ঢুকেছি তখন তারা হতাশ হলেন। কিন্তু এ ধরনের হতাশায় হাল ছেড়ে দেবার মতো লোক তারা নন। যদিও আমি ট্রান্সভালে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছি, কিন্তু চেম্বারলেনের সাথে দেখা করা থেকে আমাকে বিরত রাখতে তারা সক্ষম হলেন।

সুতরাং ভারতীয়দেরকে বলা হলো প্রতিনিধিদলের সদস্যদের নাম পেশ করতে। দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বত্র বর্ণবিদ্বেষ প্রকট ছিল, কিন্তু ভারতীয় কর্মচারীদের যেরূপ নোংরা এবং অনৈতিক কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছি এখানে তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। দক্ষিণ আফ্রিকায় সরকারী ডিপার্টমেন্টগুলো জনগণের মঙ্গলের জন্য কাজ করত এবং জনগণের মতামতের প্রতি দায়বদ্ধ ছিল। ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীরা কিছু পরিমাণে হলেও শিষ্টাচার ও নম্রতা দেখাত এবং কালো আদমীরাও এর সুফল ভোগ করত। এশিয়ান অফিসারদের আগমনের সাথে সাথে

www.pathagar.com

সেখানকার স্বৈরাচার এবং স্বৈরাচারীরা যে অভ্যাস রপ্ত করেছিল তাও চলে এলো। দক্ষিণ আফ্রিকাতে একধরনের দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু এশিয়া থেকে আমদানীকৃত মাল ছিল বিশুদ্ধ স্বৈরাচার, কারণ এশিয়াতে তখন কোনো দায়িত্বশীল সরকার ছিল না, তারা শাসিত হচ্ছিল বিদেশী শক্তি দ্বারা। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইউরোপীয়ানরা ছিল দেশত্যাগ করে আসা বসতি স্থাপনকারী। তারা দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিকত্ব নিয়েছিল এবং ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। কিন্তু এখন এশিয়া থেকে আগত স্বৈরাচারীরা দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলো এবং ভারতীয় সম্প্রদায় নিজেদেরকে দেখতে পেল উভয় সংকটে পড়ে হাবুডুবু খেতে।

এ স্বৈরাচারের মোটামুটি অভিজ্ঞতা আমার ছিল। প্রথমে আমাকে সিলোন থেকে আগত ডিপার্টমেন্টের চীফ অফিসারের সাথে দেখা করতে সমন পাঠানো হলো। আমি এখানে আমাকে "সমন পাঠানো হলো" কথাটা যে অতিরঞ্জিত করে বলছি না তা একটু পরিষ্কার করা দরকার। আমাকে কোনো লিখিত আদেশ পাঠানো হয়নি। ভারতীয় নেতাদের প্রায়ই এশিয়ান অফিসারদের সাথে দেখা করতে হতো। এঁদের মধ্যে প্রয়াত শেঠ তৈয়ব হাজী খান মোহাম্মদও ছিলেন। অফিস প্রধান তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি কে এবং আমি সেখানে কেন গিয়েছিলাম।

তৈয়ব শেঠ বলেছিলেন, "উনি আমাদের উকিল এবং আমাদের অনুরোধে এখানে এসেছেন।"

"তাহলে আমরা এখানে কি করতে আছি? তোমাদের ভালোমন্দ দেখার জন্য কি আমাদের নিয়োগ করা হয়নি? এখানকার অবস্থা সম্পর্কে গান্ধী কি জানে?" স্বৈরাচারী অফিসার জিজ্ঞেস করলেন।

তৈয়ব শেঠ যতটা সম্ভব এ অভিযোগের জবাব দিলেন, "অবশ্যই আপনারা আছেন। কিন্তু গান্ধী আমাদেরই লোক। তিনি আমাদের ভাষা জানেন এবং আমাদের সমস্যা বোঝেন। আপনারা তো সরকারী কর্মচারী।"

সাহেব তৈয়ব শেঠকে আদেশ দিলেন আমাকে তার সামনে হাজির করতে। আমি তৈয়ব শেঠ ও অন্যদের সাথে সাহেবের সামনে গেলাম। আমাদেরকে বসতে দেয়া হলো না, সবাই দাঁড়িয়ে রইলাম।

সাহেব আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "কি করতে এখানে আসা হয়েছে?"

আমি জবাব দিলাম, "আমার স্বদেশীদের অনুরোধে এখানে এসেছি, আমার পরামর্শ দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করতে।"

"কিন্তু তুমি কি জান না যে তোমার এখানে আসার কোনো অধিকার নেই? তোমার কাছে যে পারমিট আছে তা ভুলক্রমে দেয়া হয়েছে। তোমাকে স্থায়ী ভারতীয় অভিবাসী গণ্য করা যায় না। তোমাকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। তুমি মি. চেম্বারলেনের সাথে দেখা করতে পারবে না। ভারতীয়দের দেখভাল করার জন্যই এখানে বিশেষভাবে এশিয়াটিক ডিপার্টমেন্ট খোলা হয়েছে। ঠিক আছে,

www.pathagar.com

তুমি যেতে পার।" এ কথাগুলো বলে তিনি আমাকে বিদায় করলেন, আমাকে জবাব দেয়ার কোনো সুযোগ দিলেন না।

কিন্তু তিনি আমার সঙ্গীদেরকে আটকে রাখলেন। তিনি তাদেরকে আচ্ছামতো বকা দিলেন এবং আমাকে ফেরত পাঠানোর উপদেশ দিলেন।

বিষণ্ন বদনে তারা ফিরে এলো। আমরা এখন এক অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম।

তিন
আপমানটা হজম করলাম

এ অপমানে আমি ব্যথিত হলাম, কিন্তু যেহেতু অতীতে এরকম অনেক অপমান সহ্য করে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম তাই সর্বশেষ এ অপমানটা ভুলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং আবেগতাড়িত না হয়ে এরূপ ক্ষেত্রে যা করা উচিত তাই করতে মনস্থ করলাম।

এশিয়াটিক ডিপার্টমেন্টের প্রধানের কাছ থেকে আমরা এ মর্মে পত্র পেলাম যে যেহেতু আমি ইতিপূর্বে ডারবানে মি. চেম্বারলেনের সাথে দেখা করেছি, সেহেতু দেখা করার প্রতিনিধি দল থেকে আমার নাম বাদ দেয়া প্রয়োজন।

এ পত্রের আদেশ আমার সহকর্মীদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তারা দাবি দাওয়া পেশ করার ধারণা একেবারেই বাদ দিতে চাইল। আমি ভারতীয় সম্প্রদায়ের নাজুক অবস্থার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। বললাম, "যদি তোমরা মি. চেম্বারলেনের নিকট দাবি দাওয়া পেশ না কর, তাহলে ধরে নেয়া হবে তোমাদের কোনো দাবি দাওয়া নেই। যাই ঘটুক না কেন আমাদের দাবি পেশ করতে হবে লিখিত আকারে এবং তা আমরা তৈরি করে ফেলেছি। এটা আমি পড়লাম, না অন্য কেউ পড়ল, তাতে কিছু আসে যায় না। মি. চেম্বারলেন এটা নিয়ে আমাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবেন না। আমার মনে হয় অপমানটা আমাদের হজম করা উচিত।"

আমার কথা শেষ না হতেই তৈয়ব শেঠ চীৎকার করে বললেন, "আপনাকে অপমান করা কি পুরো ভারতীয় সম্প্রদায়কে অপমান করা নয়? আপনি আমাদের প্রতিনিধি সেটা কি আমরা ভুলতে পারি?"

আমি বললাম, "খুবই সত্যি কথা। কিন্তু পুরো সম্প্রদায়কেই এরকম অপমান সহ্য করতে হবে। এ ছাড়া কি আমাদের আর কিছু করার আছে?"

তৈয়ব শেঠ জিজ্ঞেস করলেন, "যত যাই ঘটুক, নতুন করে অপমান কেন সহ্য করব? আমাদের ভাগ্যে এর চেয়ে খারাপ আর কি ঘটতে পারে? আমাদের হারানোর আর কি বাকী আছে?"

এটা ছিল তেজোদ্দীপ্ত জবাব, কিন্তু এতে কি কোনো কাজ হবে? আমি সম্প্রদায়ের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম। বন্ধুদেরকে শান্ত করলাম এবং আমার পরিবর্তে ভারতীয় ব্যারিস্টার জর্জ গডফ্রেকে সঙ্গে নিতে বললাম।

www.pathagar.com

সুতরাং মি. গডফ্রে প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিলেন। মি. চেম্বারলেন তার জবাবে আমাকে বাদ দেয়ার কথা উল্লেখ করলেন। "একই প্রতিনিধির কথা বার বার শোনার চেয়ে নতুন কারো কথা শোনা কি ভালো নয়?" এ উক্তি করে তিনি আমাদের আঘাত প্রশমিত করার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু এসব ঘটনা ব্যাপারটি নিষ্পত্তির বদলে সম্প্রদায়ের এবং সেই সাথে আমারও কাজ বাড়িয়ে দিল। আমাদেরকে নতুন করে শুরু করতে হলো।

"আপনার অনুরোধে ভারতীয় সম্প্রদায় যুদ্ধে সাহায্য করেছিল, এখন তার ফলাফল দেখুন"—একথা বলে কিছু লোক আমাকে বিদ্রূপ করল। কিন্তু সে বিদ্রূপ আমার ওপর কোনো প্রভাব ফেলল না। বললাম, "আমার পরামর্শের জন্য আমি অনুতপ্ত নই। আমি এখনো বলি, আমরা যুদ্ধে যোগদান করে ভালো করেছি। এটা করে আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করেছি। আমরা আমাদের শ্রমের বদলে পুরস্কারের আশায় বসে থাকব না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সকল ভালো কাজের প্রতিদান শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়। আসুন, আমরা অতীতের কথা ভুলে গিয়ে সামনে যে কাজ আছে তা নিয়ে চিন্তা করি।" আমার এ প্রস্তাবে সবাই রাজি হলো।

আমি আরো বললাম, "সত্যি কথা হলো, আপনারা যে কাজের জন্য আমায় ডেকেছেন তা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আপনারা অনুমতি দিলেও আমার ট্রান্সভাল ত্যাগ করা উচিত নয়। আগের মতো নাটালে থেকে কাজ করার চাইতে এবারে আমি এখানে থেকে কাজ চালাতে চাই। এক বছরের মধ্যে আমি আর ভারতে ফেরার চিন্তা করব না, তবে ট্রান্সভাল সুপ্রীম কোর্টে অবশ্যই তালিকাভুক্ত হব। এই নতুন ডিপার্টমেন্টকে দেখে নেবার মতো যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস আমার আছে। আমরা যদি এটা না করি, ভারতীয় সম্প্রদায়ের সর্বস্ব লুটে নেয়া ছাড়াও কুকুর লেলিয়ে দিয়ে তাদেরকে এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে। প্রতিদিন তাদের ওপর নতুন নতুন অপমানের বোঝা চাপানো হবে। মি. চেম্বারলেন আমার সাথে দেখা করতে অস্বীকার করেছেন, এবং অফিসার আমাকে যে অপমান করেছেন, সমগ্র ভারতীয় সম্প্রদায়ের অপমানের তুলনায় তা কিছুই নয়। অদূর ভবিষ্যতে আমাদেরকে কুকুরের জীবন যাপন করতে হবে বলে আশা করছি, আর তা হবে সত্যি অসহনীয়।"

এভাবে আমি আন্দোলনের সূচনা করলাম, প্রিটোরিয়া ও জোহান্সবার্গের ভারতীয়দের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলাম এবং অবশেষে জোহান্সবার্গে অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলাম।

ট্রান্সভাল সুপ্রীমকোর্টে আমি তালিকাভুক্ত হতে পারব কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। আইন সমিতি আমার আবেদনের বিরোধীতা করল না এবং কোর্ট অনুমতি দিল। সুবিধাজনক এলাকায় ভারতীয়দের অফিস স্থাপনের জন্য ঘর ভাড়া পাওয়া কঠিন ছিল। আমি সেখানকার অন্যতম ব্যবসায়ী মি. রিচ-এর সাথে মোটামুটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলাম। তার

www.pathagar.com

পরিচিত একজন হাউজ এজেন্টের মাধ্যমে আমি অফিসের জন্য শহরের উকিল পাড়ায় একটা ঘর নিতে সমর্থ হলাম এবং আমার পেশাগত কাজ শুরু করে দিলাম।

চার
উজ্জীবিত সেবার মনোভাব

ট্রান্সভালে ভারতীয় অভিবাসীদের অধিকার এবং তাদের সাথে এশিয়াটিক ডিপার্টমেন্টের দুর্ব্যবহার সংক্রান্ত সংগ্রামের বিষয় বর্ণনার আগে আমি আমার জীবনের অন্যান্য কিছু দিক সম্পর্কে আলোকপাত করব।

এ পর্যন্ত আমার মধ্যে মিশ্র আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করেছে। আমার সেবার মনোভাব ভবিষ্যতের জন্য স্থায়ী কিছু করার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা আরো শক্তিশালী হয়েছে।

আমি যখন বোম্বেতে অফিস স্থাপন করেছিলাম সে সময়ে আমার কাছে একজন আমেরিকান বীমার দালাল এসেছিলেন। তিনি ছিলেন সুদর্শন, প্রসন্ন চেহারার মিষ্টভাষী মানুষ। তিনি এমনভাবে আমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের বিষয়ে কথা বললেন যেন আমরা অনেক দিনের পুরনো বন্ধু। "আমেরিকাতে তোমার মতো সম্মানিত ব্যক্তিরা সকলেই তাদের জীবন বীমা করে থাকেন। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তুমিও কি নিজ জীবনের বীমা করবে না? জীবন অনিশ্চিত। আমেরিকাতে আমরা জীবন বীমা করানোকে ধর্মীয় দায়িত্ব বলে মনে করি। আমার কথায় তুমি কি একটা ছোট পলিসি গ্রহণ করবে?"

এ যাবৎ দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতে আমার কাছে যত দালাল এসেছে তাদের সবাইকে আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। কারণ আমার ধারণা ছিল জীবন বীমা করানোর অর্থ হচ্ছে ভীত হওয়া এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসের অভাব বোধ করা। কিন্তু এবারে আমি এ আমেরিকান এজেন্টের কাছে ধরা দিলাম। সে যখন যুক্তি দেখাচ্ছিল তখন আমার মনে স্ত্রী-পুত্রদের মুখ ভেসে উঠছিল। নিজে নিজে বললাম, "তুমি তোমার স্ত্রীর সকল গহনা পর্যন্ত বিক্রী করে দিয়েছ। তোমার যদি কিছু ঘটে, তাহলে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পড়বে তোমার দরিদ্র ভাইয়ের ওপর, যিনি স্বর্গীয় পিতার মহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। সেটা কি তোমার জন্য মানানসই হবে?" এ ধরনের যুক্তি বিবেচনা করে ১০,০০০/- টাকার একটা পলিসি নিতে রাজি হলাম।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাতে যখন আমার জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এলো, তখন আমার দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হলো। এ পরীক্ষামূলক সময়ে আমি যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছি তার সবই ছিল ঈশ্বরের নামে এবং তাঁরই সেবায় নিবেদিত। আমি জানতাম না দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাকে কতদিন থাকতে হবে। আমার আশংকা ছিল যে আমার আর ভারতে ফিরে যাওয়া নাও হতে পারে, তাই আমি স্ত্রী-পুত্রদেরকে আমার সাথে রাখতে এবং তাদের ব্যয়ভার বহন করতে প্রয়োজনীয়

www.pathagar.com

অর্থ উপার্জনের সিদ্ধান্ত নিলাম। এ পরিকল্পনার পর আমি বীমা পলিসি গ্রহণের জন্য অনুতপ্ত হলাম এবং বীমার দালালের খপ্পরে পড়ার জন্য লজ্জিত হলাম। নিজের মনে বললাম, "আমার ভাই যদি সত্যিই পিতার দায়িত্ব নিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি আমার বিধবা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করাকে বড় কোনো বোঝা মনে করবেন না, যদি সেরকম পরিস্থিতি কখনো হয়। আর অন্যদের আগে আমার মৃত্যু হতে পারে, এ ধারণারই বা ভিত্তি কি? সর্বোপরি প্রকৃত রক্ষাকর্তা তো ঈশ্বর, আমি নই, আমার ভাইও নয়। আমার জীবন বীমা করিয়ে আমি স্ত্রী-পুত্রদেরকে আত্ম-নির্ভরতা থেকে বঞ্চিত করছি। তারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করবে এ আশা কেন করব না? পৃথিবীতে অসংখ্য দরিদ্র পরিবারের ভাগ্যে কি ঘটে থাকে? আমি নিজেকে কেন তাদের একজন বলে ভাবতে পারছি না?"

মনের মধ্যে এ ধরনের অনেক চিন্তার স্রোত বয়ে গেল কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ কিছু করলাম না। মনে পড়ে আমি দক্ষিণ আফ্রিকাতে আসার পরে অন্তত একবার বীমার প্রিমিয়াম জমা দিয়েছিলাম।

বাহ্যিক অবস্থাও আমার এ ধরনের চিন্তাধারাকে সমর্থন করল। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার প্রথমবার অবস্থানকালে খৃষ্টান প্রভাব আমার মনে ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত রেখেছিল। এখন ঐশ্বরিক প্রেরণার প্রভাব একে আরো শক্তিশালী করল। মি. রিচ একজন থিওসফিস্ট ছিলেন এবং তিনি আমাকে জোহান্সবার্গের থিওসফিস্ট সোসাইটির সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমি ঐ সোসাইটির সদস্য হইনি, কারণ তাদের সাথে আমার মতপার্থক্য ছিল, কিন্তু আমি প্রায় প্রত্যেক থিওসফিস্টের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছি। তাদের সাথে প্রতিদিন ধর্ম নিয়ে আমার আলোচনা হতো। থিওসফি সংক্রান্ত বই থেকে সেখানে পাঠ করা হতো এবং কখনো কখনো তাদের সভায় আমি বক্তৃতা করতাম। থিওসফির মূল কথা ছিল ভ্রাতৃত্ববোধের অনুশীলন ও উন্নয়ন। আমরা এর ওপর অনেক আলোচনা করতাম। যখন সদস্যদের কাজকর্ম তাদের আদর্শের সাথে সংগতিপূর্ণ হতো না আমি তাদের সমালোচনা করতাম। এ সমালোচনার শুভ প্রভাব আমার নিজের ওপরেও পড়েছিল। এটা আমাকে অন্তদর্শনে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

পাঁচ
অন্তর্দর্শনের ফলাফল

১৮৯৩ সালে যখন আমি খৃষ্টান বন্ধুদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে আসি তখন আমি ছিলাম অনভিজ্ঞ শিক্ষানবিশ। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যীশুর বাণী আমাকে বোঝাতে এবং তা আমাকে গ্রহণ করাতে। আর আমি ছিলাম তাদের কাছে খোলামনের শ্রদ্ধাশীল বিনম্র শ্রোতা। সে সময়ে আমি হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে সাধ্যমতো পড়াশুনা করেছিলাম এবং অন্য ধর্মগুলোও বোঝার চেষ্টা করেছিলাম।

১৯০৩ সালে পরিস্থিতি কিছুটা বদলে গেল। থিওসফিস্ট বন্ধুরা আমাকে তাদের সমিতিতে টানতে চাইলেন, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল একজন হিন্দু

www.pathagar.com

হিসেবে আমার কাছ থেকে কিছু পাওয়া। থিওসফিক্যাল বইপুস্তক ছিল হিন্দু প্রভাবে পরিপূর্ণ, তাই এসব বন্ধুরা ভেবেছিলেন আমি তাদের জন্য সহায়ক হব। আমি তাদেরকে বোঝালাম যে সংস্কৃত ভাষায় আমার পড়াশুনা তেমন নেই, আর হিন্দু ধর্মের মূল বইগুলো আমি পড়িনি এবং সেগুলোর অনুবাদের সাথেও আমার পরিচিতি ন্যূনতম। কিন্তু "সংস্কার" (পূর্বজন্ম থেকে প্রাপ্ত প্রবণতা) ও "পুনর্জন্ম"-তে বিশ্বাসী ছিলাম বলে তারা ধরে নিলেন আমি কিছুটা হলেও তাদেরকে সাহায্য করতে পারব। সুতরাং আমার অবস্থা হলো মিনৌজদের মধ্যে টাইটানের মতো। আমি কয়েকজন বন্ধুর সাথে স্বামী বিবেকানন্দের "রাজযোগ" পড়তে শুরু করলাম এবং আরো কয়েকজনের সাথে এম. এন. দ্বীবেদীর "রাজযোগ"। একজন বন্ধুর সাথে পতঞ্জলির "যোগসূত্র" পড়লাম এবং অনেকের সাথে একসঙ্গে "ভগবদ্গীতা"। আমি অনেকটা "সন্ধানী ক্লাব" মতো গড়ে তুললাম যেখানে নিয়মিত পড়াশুনা চলত। গীতায় আমার বিশ্বাস আগেই ছিল, এর প্রতি আমার একটা মোহও ছিল। আমি এখন এতে গভীরভাবে অবগাহনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলাম। আমার কাছে এর একটা কি দুটো অনুবাদ ছিল যার সাহায্যে আমি সংস্কৃতে লেখা মূল বই বুঝার চেষ্টা করলাম। প্রতিদিন এটা বা দুটো করে শ্লোক মুখস্ত করারও সিদ্ধান্ত নিলাম। এ কাজের জন্য আমি প্রাতঃকালীন প্রক্ষালনের সময়কে বেছে নিলাম। পাঠক্রিয়াতে পঁয়ত্রিশ মিনিট, দাঁত ব্রাশ করতে পনের মিনিট এবং স্নান করতে বিশ মিনিট সময় লাগত। প্রথম কাজটা আমি পশ্চিমা স্টাইলে দাঁড়িয়ে করতাম। উল্টো দিকের দেয়ালে গীতার শ্লোক লেখা কাগজ সেঁটে দিতাম এবং মনে রাখার সুবিধার জন্য যখন তখন সেগুলো দেখতাম। প্রতিদিনের অংশ মুখস্ত করা এবং ইতিপূর্বে শেখা অংশ পুনরাবৃত্তির জন্য এ সময়টা যথেষ্ট ছিল। আমার মনে পড়ে, এভাবে আমি গীতার তেরো অধ্যায় পর্যন্ত মুখস্ত করে ফেলেছিলাম। কিন্তু গীতা মুখস্ত করতে গিয়ে অন্যান্য কাজ এবং সত্যাগ্রহের সৃষ্টি ও পুষ্টি বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। কারণ তখন সত্যাগ্রহ ছিল আমার ধ্যান-জ্ঞান, এতেই আমার অধিকাংশ সময় ব্যয় হতো এবং আজো তা সমৃদ্ধকরণের কাজ অব্যাহত আছে।

এভাবে গীতা পাঠের ফলে বন্ধুদের কি উপকার হয়েছিল তা তারাই বলতে পারেন। তবে আমার কাছে গীতা হয়ে উঠল অভ্রান্ত পথনির্দেশক, প্রতিদিনের উদ্ধৃতির অভিধান। আমি যেমন অজানা ইংরেজি শব্দের অর্থ জানার জন্যে ডিকশনারীর সাহায্য নেই, তেমনই আমার সকল সমস্যা ও পরীক্ষাতে আমি আচরণ বিধির এ ডিকশনারীতে তাৎক্ষণিক সমাধান খুঁজে পাই। অপরিগ্রহ (স্বত্ব ত্যাগ), এবং সমভাব (সাম্যাবস্থা) এ জাতীয় শব্দগুলো আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কিভাবে সাম্যাবস্থা (ধীর স্থিরতা) অর্জন ও ধরে রাখা সম্ভব সেটাই প্রশ্ন। অপমানকারী, উদ্ধত ও দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মচারী, অর্থহীন বিরোধীতায় লিপ্ত সেদিনের কনিষ্ঠ সহকর্মী আর ঐসব লোক যারা সর্বদা অন্যের মঙ্গল করছেন তাদের সবাইকে এক নজরে দেখা কি করে সম্ভব? বস্তুগত সকল সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ

www.pathagar.com

করা কিভাবে সম্ভব? নিজের দেহটাও কি সম্পদ নয়? স্ত্রী-সন্তানরাও কি সম্পদ নয়? আমাকে সকল বইয়ের আলমারীও ধ্বংস করে ফেলতে হবে? আমার যা কিছু আছে তা সবই ছেড়ে দিয়ে কি শুধু তাঁরই অনুসরণ করব? সোজাসুজি উত্তর পেলাম, আমার যা কিছু আছে তার সবই ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি তাঁর অনুসরণ করতে পারব না। আমার ইংলিশ ল' এর জ্ঞান আমাকে সাহায্য করল। ন্যায়পরায়ণতার নীতির ওপর স্নেলের আলোচনা আমার মনে পড়ল। গীতার আলোকে আরো পরিষ্কারভাবে আমি ট্রাস্টি শব্দের অর্থ বুঝতে পারলাম। জুরিসপ্রুডেন্সের ওপর আমার আস্থা বেড়ে গেল, আমি এর মধ্যে ধর্ম খুঁজে পেলাম। গীতার শিক্ষা থেকে বুঝলাম, অপরিগ্রহ অর্থ হলো যারা আত্মার মুক্তি চায় তাদেরকে ট্রাস্টির মতো কাজ করতে হবে অর্থাৎ বিপুল সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও তার কণামাত্রও নিজের বলে মনে করবে না। আমার কাছে দিবালোকের মতো পরিষ্কার হলো যে অপরিগ্রহ ও সমভাব অর্জনের পূর্বশর্ত হলো মনের পরিবর্তন, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। আমি তখন রেভাশংকরভাইকে পত্র লিখলাম আমার ইন্স্যুরেন্স পলিসিটা তামাদি করে দিতে এবং যা ফেরত পাওয়া যায় তা নিয়ে নিতে, অন্যথায় এযাবৎ প্রদত্ত প্রিমিয়াম গচ্চা গেছে বলে মনে করতে। কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ঈশ্বর আমাকে ও আমার স্ত্রী-সন্ত ানদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাদের দেখ-ভাল করবেন। আমার পিতৃতুল্য ভাইকে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ পত্র লিখলাম এটা জানিয়ে যে এ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার যা সঞ্চয় আছে তার সবই তাকে দিয়ে দিচ্ছি, তবে এখন থেকে আমার কাছ থেকে আর কিছু পাওয়ার আশা করবে না, আর ভবিষ্যতে যদি সঞ্চয় কিছু হয় তা ব্যবহৃত হবে আমার সম্প্রদায়ের কল্যাণে।

আমার ভাইকে আমি ব্যাপারটা সহজে বুঝাতে পারলাম না। তিনি কঠোর ভাষায় তার প্রতি আমার কর্তব্যের কথা উল্লেখ করে পত্র লিখলেন। তার কথায়, আমাদের পিতার চেয়ে বেশি জ্ঞানী হওয়ার উচ্চাশা পোষণ করা আমার উচিত নয়। তার মতো আমারো উচিত পরিবারের ব্যয়ভার বহন করা। আমি জানালাম, বাবা যা করে গেছেন আমি ঠিক তাই করছি। "পরিবার" কথাটা আরো একটু বৃহত্তর অর্থে গণ্য করলে আমার পদক্ষেপের বিচক্ষণতা তার কাছে পরিষ্কার হবে।

আমার ভাই আমাকে ত্যাগ করলেন এবং আমার সাথে সকল যোগাযোগ বন্ধ করে দিলেন। আমি গভীর দুঃখ পেলাম। কিন্তু আমি যেটা আমার কর্তব্য বলে মনে করি তা ত্যাগ করা হতো আরো বেশি দুঃখজনক। কিন্তু ভাইয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আগের মতোই নিখাদ ও অটুট রইল। তার দুঃখ পাওয়ার মূলে ছিল আমার প্রতি তার ভালোবাসা। তিনি আমার কাছে অর্থ কড়ি ততটা চাননি, যতটা চেয়েছিলেন পরিবারের প্রতি আমার ভালো আচরণ। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অবশ্য তিনি আমার দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি যখন প্রায় মৃত্যুশয্যায় তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে আমার পদক্ষেপগুলো সঠিক ছিল এবং আমাকে অত্যন্ত করুণ ভাষায় একটা পত্র দিয়েছিলেন। তিনি আমার নিকট ক্ষমা

www.pathagar.com

চেয়েছিলেন, পিতা যেমন পুত্রের কাছেও ক্ষমা চাইতে পারেন। তিনি তার পুত্রদেরকে আমার দায়িত্বে ন্যস্ত করেছিলেন তাদেরকে আমার ইচ্ছেমতো গড়ে তুলতে এবং তিনি আমার সাথে দেখা করার জন্য অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। তারবার্তা করে জানিয়েছিলেন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় আসতে চান এবং জবাবে আমি তারবার্তা পাঠিয়েছিলাম যে তিনি আসতে পারেন। কিন্তু তা সম্ভব ছিল না। পুত্রদের সম্পর্কে তার আশাও পূর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করার আগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন।

তার পুত্ররা সেই পুরনো পরিবেশেই বড় হয়েছিল এবং তাদের জীবনযাত্রা বদলাতে পারেনি। আমি তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারিনি। এতে তাদের কোনো দোষ ছিল না। "কে বলতে পারে, মানুষ তার স্বভাবের টানে অতোদূর যাবে, তার বেশি যাবে না?" যে বিধিলিপি নিয়ে মানুষ জন্মায় তা কে মুছে দিতে পারে? কারো সন্তান বা পোষ্যরা তার নিজের মতো একই রকম জীবনের পথ পরিক্রম করবে তা আশা করা বৃথা।

এ দৃষ্টান্ত থেকে কিছুটা প্রতীয়মান হয় যে পিতামাতার ওপর কি ভীষণ দায়িত্ব এসে পড়ে।

ছয়
নিরামিষ ভোজনবাদের প্রতি উৎসর্গ

ত্যাগ ও সরল জীবন যাপনের আদর্শ আরো বেশি করে বুঝতে পারা এবং দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় চেতনা আরো বেশি জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে জীবনের অন্যতম মিশন (ব্রত) হিসেবে নিরামিষ ভোজনবাদের প্রতি আমার প্রবল আগ্রহও বাড়তে থাকল। এ মিশন সফল করার জন্য একটা পথই আমার জানা আছে, তা হলো নিজে করে দৃষ্টান্ত স্থাপন এবং জ্ঞানপিপাসুদের সাথে আলোচনা।

জোহান্সবার্গে একজন জার্মান কর্তৃক পরিচালিত একটি নিরামিষ রেস্টুরেন্ট ছিল। তিনি কুন-এর জল চিকিৎসায় বিশ্বাস করতেন। আমি এ রেস্টুরেন্টে যেতাম এবং সেখানে ইংরেজ বন্ধুদের নিয়ে গিয়ে তাকে সাহায্য করতাম। কিন্তু সর্বদা আর্থিক অনটনে থাকার কারণে রেস্টুরেন্টটি টিকতে পারল না। আমি এটার প্রাপ্য অনুযায়ী টিকে থাকতে সাহায্য করলাম এবং কিছু অর্থও ব্যয় করলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা বন্ধ হয়ে গেল।

অধিকাংশ থিওসফিস্ট মোটামুটি নিরামিষভোজী। এ সমিতির সদস্য একজন মহিলা উদ্যোক্তা বড় আকারের একটি নিরামিষ রেস্টুরেন্ট স্থাপন করলেন। তিনি ছিলেন শিল্পানুরাগী, অমিতব্যয়ী এবং হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে অজ্ঞ। তার বন্ধুত্বের পরিধি বেশ বড় ছিল। তিনি ব্যবসা শুরু করেছিলেন ছোট আকারে, পরে বড় একটা রুম নিয়ে তা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেন। এ বিষয়ে তিনি আমার সাহায্য চাইলেন। যখন তিনি আমার কাছে অর্থ সাহায্য চাইলেন, আমি তার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না, কিন্তু ধরে নিলাম যে ব্যবসার জন্য তার সম্ভাব্য

www.pathagar.com

বিনিয়োগের হিসাব মোটামুটি সঠিকই হবে। আর তাকে সাহায্য করা আমার সাধ্যের মধ্যেই আছে। আমার মক্কেলরা আমার কাছে বড় অংকের টাকা জমা রাখত। এরকম একজন মক্কেলের সম্মতি নিয়ে তার জমা টাকা থেকে আমি এক হাজার পাউন্ড ঐ ভদ্রমহিলাকে ধার দিলাম। মক্কেলটি ছিল খুব দিল-দরিয়া এবং বিশ্বস্ত। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছিলেন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে। তিনি বললেন, "আপনি ভালো মনে করলে টাকা দিয়ে দিন। এসব বিষয়ে আমি কিছু জানি না। আমি কেবল আপনাকে চিনি।" তার নাম ছিল বদরী। পরবর্তীতে সত্যাগ্রহ পালনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এবং জেলও খাটেন। সুতরাং আমি এ সম্মতি যথেষ্ট মনে করে টাকা ধার দিলাম।

দুই কি তিন মাসের মধ্যে আমি জানতে পারলাম যে ঐ টাকা আর ফেরত পাওয়া যাবে না। এ ক্ষতি পূরণ করা আমার জন্য কষ্টসাধ্য। এ টাকা আমি আরো অনেক জরুরি প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারতাম। ঐ টাকা আর কখনো ফেরৎ পাইনি। কিন্তু বিশ্বস্ত বদরীকে কি করে ক্ষতিগ্রস্ত করব? সে তো কেবল আমাকে চেনে। আমিই তার টাকার ক্ষতি পূরণ করলাম।

এক মক্কেল বন্ধুকে এই লেনদেনের কথা বললে তিনি আমার বোকামীর জন্য মিষ্টি ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন। তিনি বললেন, "ভাই, (সৌভাগ্যক্রমে আমি তখনো 'মহাত্মা' বা 'বাপু' (পিতা) খেতাব পাইনি, বন্ধুরা আদর করে ভাই বলতেন) এ কাজ আপনার করা উচিত হয়নি। অনেক বিষয়ে আমরা আপনার ওপর ভরসা করি। এ টাকা আপনি ফেরত পাবেন না। আমি জানি আপনি বদরীকেও দুঃখ পেতে দেবেন না, কারণ আপনি আপনার পকেট থেকে টাকা দিয়ে দেবেন। কিন্তু আপনার সংস্কার কাজে সাহায্যের জন্য যদি মক্কেলদের গচ্ছিত টাকা ব্যবহার করতে থাকেন, তাহলে গরিব বেচারীরা মারা পড়বে, আর আপনিও শীগগিরই ফতুর হয়ে যাবেন। কিন্তু আপনি আমাদের ট্রাস্টি, আপনাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আপনি যদি ভিক্ষুকে পরিণত হন, আমাদের সব গণকাজ বন্ধ হয়ে যাবে।"

কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করছি যে ঐ বন্ধু এখনো বেঁচে আছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা বা অন্য কোথাও তার চেয়ে খাঁটি লোক আমি আর দেখিনি। আমি জানি, তিনি কাউকে সন্দেহ করলে এবং সে সন্দেহ অমূলক প্রমাণিত হলে, নিজেকে কলুষমুক্ত করার জন্য তিনি যাকে সন্দেহ করেছিলেন তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতেন।

আমি দেখলাম, তিনি আমাকে সতর্ক করে দিয়ে ঠিক কাজটি করেছেন। কারণ, যদিও বদরীর ক্ষতি আমি পূরণ করে দিয়েছি, এরকম আর কোনো ক্ষতি পূরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে আমাকে ঋণ করতে হবে, যা আমি জীবনে করিনি এবং যা আমি সর্বদা ঘৃণা করি। আমি বুঝলাম যে সংস্কারের উৎসাহেও সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়। এটাও দেখলাম যে গচ্ছিত টাকা এভাবে ধার দিয়ে আমি গীতার মূল শিক্ষা 'সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্তব্য হলো

www.pathagar.com

ফল প্রাপ্তির প্রত্যাশা না করে কাজ করে যাওয়া' অমান্য করেছি। এ ভুল আমার ভবিষ্যতের জন্য সতর্ককারী হয়ে রইল।

নিরামিষ ভোজনবাদের বেদীমূলে এ উৎসর্গ ইচ্ছাকৃত ছিল না, প্রত্যাশিতও নয়। এটা ছিল প্রয়োজনের তাগিদে করা সৎকর্ম।

সাত
মাটি ও জল চিকিৎসা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

আমার জীবনে সরলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ওষুধের প্রতি আমার অনীহা ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগল। ডারবানে প্র্যাকটিস করার সময়ে আমি কিছুদিন দুর্বলতা ও বাতজনিত ফুলে যাওয়া রোগে আক্রান্ত হলাম। ডা. পি. জে. মেহতা আমার সাথে দেখা করতে এসে চিকিৎসা দিলেন এবং আমি সেরে উঠলাম। তারপর থেকে ভারতে ফেরার সময় পর্যন্ত আমার মনে পড়ে না যে আমি আর কোনো রোগে অসুস্থ হয়েছি।

কিন্তু জোহান্সবার্গে থাকতে আমি কোষ্ঠকাঠিন্য ও ঘন ঘন মাথা ব্যথায় ভুগতাম। মাঝে মাঝে জোলাপের ওষুধ খেয়ে ও সুনিয়ন্ত্রিত পথ্য গ্রহণ করে আমি নিজেকে ফিট রাখতাম। কিন্তু আমি নিজেকে স্বাস্থ্যবান বলতে পারতাম না এবং ভাবতাম, কখন আমি এসব জোলাপের হাত থেকে মুক্ত হতে পারব।

প্রায় এ সময়ে ম্যাঞ্চেস্টারে "নো ব্রেকফাস্ট এসোসিয়েশন" গঠিত হয়েছে বলে খবরে পড়লাম। এর উদ্যোক্তাদের যুক্তি ছিল ইংরেজরা খুব ঘন ঘন এবং খুব বেশি পরিমাণে খায়, তারা মধ্যরাত পর্যন্ত খেতেই থাকে বলে ডাক্তারের বিল দিতে হয় বেশি এবং যদি তারা এ অবস্থা থেকে উন্নতি করতে চায় তাহলে অন্তত তাদের সকালের নাশতা বন্ধ করে দিতে হবে। যদিও এর সব কথা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কিন্তু তা আংশিকভাবে আমার বেলায়ও খাটে। আমি প্রতিদিন তিনবার পুরো আহার করতাম, তার ওপর বিকেলে চা পান করতাম। আমি কখনো কম খাওয়ার পাত্র ছিলাম না এবং মশলা ছাড়া নিরামিষ খাবারের যতগুলো সুস্বাদু পদ হতে পারে তার সবই খেতাম। সকালে ৬ বা ৭ টার আগে আমি উঠতাম না। তাই আমি যুক্তি দেখালাম যে আমিও যদি সকালের নাশতা বন্ধ করে দেই তাহলে মাথা ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে পারি। সুতরাং আমি এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালাম। প্রথমে কয়েকদিন একটু কঠিন হলো, কিন্তু মাথাব্যথা পুরোপুরি সেরে গেল। এ থেকে আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, আমি এতদিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেয়েছি।

কিন্তু এ পরিবর্তনের ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য আরো বেড়ে গেল। আমি কুন-এর হিপবাথ নিলাম। এতে কিছুটা উপকার হলো বটে, আমাকে তা পুরোপুরি আরোগ্য করতে পারল না। ইত্যবসরে যে জার্মান বন্ধুর নিরামিষ রেস্টুরেন্ট ছিল তিনি নাকি অন্য কোনো বন্ধু, ঠিক মনে করতে পারছি না, আমাকে জাস্ট এর লেখা "প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন" বইটি ধরিয়ে দিলেন। এ বইতে আমি মাটি চিকিৎসা

www.pathagar.com

সম্পর্কে পড়লাম। লেখক তাজা ফল ও বাদাম জাতীয় খাবারকে মানুষের জন্য স্বাভাবিক পথ্য বলেও ওকালতি করেছেন। আমি তৎক্ষণাৎ পুরোপুরি ফলাহার শুরু করলাম না, তবে মাটি চিকিৎসা শুরু করলাম এবং চমৎকার ফল পেলাম। চিকিৎসাটা হলো পরিষ্কার মাটি ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে পেটের ওপর ব্যান্ডেজের মতো লাগিয়ে দেয়া এবং পাতলা কাপড়ে জড়িয়ে পুলটিশের মতো লাগানো। শোবার সময় এটা লাগাতাম এবং রাতে বা সকালে যখনই জাগতাম তখন এটা সরিয়ে ফেলতাম। এতে রোগের সমূলে আরোগ্য প্রমাণিত হলো। সেই থেকে আমি নিজে এ চিকিৎসা নিয়েছি এবং বন্ধুদেরকে দিয়েছি, এতে কখনো অনুশোচনার কারণ ঘটেনি। ভারতে একই রকম আত্মবিশ্বাস নিয়ে এ চিকিৎসা প্রয়োগ করতে পারিনি। এর একটা কারণ হলো এ পরীক্ষা চালানোর জন্য আমি কখনো এক স্থানে স্থায়ী হওয়ার সময়ই পাইনি। আজ পর্যন্তও আমি নিজের জন্য কিছু পরিমাণে মাটি চিকিৎসা নেই এবং প্রয়োজনমতো আমার সহকর্মীদেরও নিতে বলি।

যদিও আমার জীবনে দু'বার গুরুতর অসুখ হয়েছিল, আমি বিশ্বাস করি যে মানুষের ওষুধের প্রয়োজন অতি সামান্য। এক হাজার রুগীর মধ্যে নয়শত নিরানব্বইটি কেসে সুনিয়ন্ত্রিত পথ্য, মাটি ও জল চিকিৎসা এবং ঘরোয়া টোটকা চিকিৎসার দ্বারা রোগ আরোগ্য করা সম্ভব। ছোটখাটো যে কোনো অসুখেই যে ব্যক্তি ডাক্তার, বৈদ্য বা হেকিমের কাছে দৌড়ায় এবং সব ধরনের ভেষজ ও খনিজ ওষুধ খায়, সে শুধু তার আয়ু ক্ষয় করে তাই নয়, বরং সে নিজের শরীরের প্রভু না হয়ে দাস হয়, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং অবশেষে সে আর মানুষ থাকে না।

আমার এ পর্যবেক্ষণ কেউ যেন অবিশ্বাস না করে, কারণ রোগশয্যায় বসে আমি এগুলো লিখছি। আমি আমার অসুস্থতার কারণ জানি। আমি পূর্ণ সচেতন যে আমি নিজেই আমার অসুস্থতার জন্য দায়ী, আর এ সচেতনতার কারণেই আমি ধৈর্যহারা হইনি। এ অসুস্থতার মাধ্যমে আমাকে শিক্ষা দান এবং অজস্র ওষুধ সেবনের প্রলোভনকে সফলভাবে দমন করতে পারার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি জানি, আমার একগুঁয়েমি প্রায়ই ডাক্তারদের জন্য ধৈর্যের পরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু তারা দয়া করে আমার ওপর রুষ্ট হয়ে আমাকে ত্যাগ করেন না।

যাহোক, মূল প্রসঙ্গ হতে আমি আর বিচ্যুত হতে চাই না। আরো অগ্রসর হবার আগে একটা বিষয়ে আমি পাঠকদেরকে সতর্ক করে দিতে চাই। এ অধ্যায়টি পড়ে যারা জাস্ট এর বই কিনবেন তাদের উচিত নয় এ বইয়ের সবকিছু বাইবেলের মতো অভ্রান্ত সত্য বলে মনে করা। একজন লেখক প্রায় সর্বদাই কোনো বিষয়ের একটি দিক তুলে ধরেন, অথচ প্রতিটি বিষয় অন্যূন সাতটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে, যার প্রতিটি আলাদাভাবে সত্য, কিন্তু সবগুলো একত্রে একই পরিস্থিতিতে সত্য নয়। আবার অনেক বই লেখার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে গ্রাহক পাওয়া এবং সুনাম-খ্যাতি অর্জন। সুতরাং যারা এ ধরনের বই পড়বে তারা যেন উপলব্ধি করার আগ্রহসহকারে পড়ে এবং এর যেকোনো পরীক্ষা-

www.pathagar.com

নিরীক্ষা নিজে করার আগে কোনো অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নেয় অথবা এ বইয়ের উপদেশ মতো কাজ করার আগে যেন তারা বইটি ধৈর্যসহকারে পড়ে ও পুরোপুরি আত্মস্থ করে।

আট
একটি সতর্কবাণী

আমার মনে হচ্ছে মূল প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুতি পরবর্তী অধ্যায় পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। মাটি চিকিৎসায় আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি পথ্যবিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছিল। শেষেরটার বিষয়ে আমার পর্যবেক্ষণ এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যদিও পরে এ প্রসঙ্গে পুনরায় আলোচনা করব।

আমি এখানে বা পরবর্তীতে পথ্যবিদ্যার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করব না, কারণ এর বিস্তারিত বিবরণ গুজরাটী ভাষায় ধারাবাহিক প্রবন্ধে লিখেছিলাম যা কয়েক বছর আগে ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তা বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, ইংরেজি ভাষায় তা "এ গাইড টু হেল্থ" (সুস্বাস্থ্যের পথনির্দেশ) নামে জনপ্রিয় হয়েছিল। আমার ছোট বইগুলোর মধ্যে এ বইটা সবচেয়ে বেশি পঠিত হয়েছে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সমভাবে, এর কারণ আমি আজো বুঝতে পারিনি। ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন পত্রিকার পাঠকদের উপকারের জন্য আমি ওটা লিখেছিলাম। কিন্তু আমি জানি যে পুস্তিকাটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেকের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল, যারা কখনো ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন পড়েনি। তারা আমার সাথে এ বিষয়ে পত্রালাপও করেছিল। তাই এখানে পুস্তিকাটি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ এতে যে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে তা পরিবর্তনের কোনো যুক্তি আমি দেখি না, তবে বাস্তব অনুশীলনে কিছু ক্ষেত্রে আমি মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছি যার সম্পর্কে বইটির সকল পাঠক অবহিত নয়, এবং মনে হয় তাদেরকে তা জানানো উচিত।

আমার অন্যান্য সকল লেখার মতো এ পুস্তিকাটিও আধ্যাত্মিক কল্যাণের লক্ষ্যে লেখা হয়েছিল যা দ্বারা আমার প্রতিটি কাজ অনুপ্রাণিত, আর সে কারণেই আমার জন্য গভীর পরিতাপের বিষয় যে ঐ পুস্তকে যেসব তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে তার কতকগুলির অনুশীলনে আমি নিজেই আজ অপারগ।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে শিশুকালে মায়ের দুধপানের পর মানুষের জন্য আর দুধপানের প্রয়োজন নেই। তার পথ্য হওয়া উচিত রোদে শুকানো ফল ও বাদাম, অন্য কিছু নয়। সে তার পেশির জন্য আঙ্গুর ও কাঠবাদাম জাতীয় ফল থেকে যথেষ্ট পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারে। এরকম খাবার যে খায় তার জন্য যৌন কামনা ও অন্যান্য আবেগ প্রশমন সহজ হয়। অভিজ্ঞতা থেকে আমি ও আমার সহকর্মীরা দেখেছি যে, যে যেমন খায় সে তেমন হয়-এ ভারতীয় প্রবচনের সত্যতা আছে। বইটিতে এসব বিষয়ে বিস্তারিত মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভারতে এসে আমার কিছু কিছু তত্ত্বকে বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে অস্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। আমি যখন খেদাতে সৈন্য সংগ্রহ অভিযানে ব্যস্ত ছিলাম তখন ভুল খাবার ও পথ্য গ্রহণের ফলে আমি শয্যাশায়ী হয়ে মৃত্যুর দুয়ারে চলে গিয়েছিলাম। দুধ না খেয়ে ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা চালালাম। ডাক্তার, বৈদ্য, বিজ্ঞানী যাদের আমি চিনতাম তাদের কাছে দুধের বিকল্প খাবার সম্পর্কে পরামর্শ চাইলাম। কেউ পরামর্শ দিলেন মুগ-পানি পান করতে, কেউ মোহরা তেল, আবার কেউবা বাদামের দুধ পান করতে বললেন। এগুলো খাওয়ার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শরীর আরো ক্ষয় হলো, কিন্তু রোগশয্যা ত্যাগে কোনোটাই সহায়ক হলো না। চিকিৎসা বিদ্যায় ধর্মীয় অনুশাসনের কোনো স্থান নেই এটা প্রমাণ করতে বৈদ্যগণ চরকের শ্লোক পড়ে শোনালেন। সুতরাং তাদের কাছে দুধ না খেয়ে বাঁচার বিষয়ে পরামর্শ আশা করা বৃথা। আর যারা আমাকে নির্দ্বিধায় গোমাংস-চা সেবনের পরামর্শ দিলেন তারা দুগ্ধহীন পথ্যের ব্যাপারে আর কি সাহায্য করবেন?

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকার কারণে আমি গরু বা মহিষের দুধ পান করতে পারতাম না। প্রতিজ্ঞাতে অবশ্য দুধ বলতে সকল প্রকার দুধই বুঝায়, কিন্তু আমি যখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই তখন গো-মাতা আর মহিষ-মাতার কথাই আমার মাথায় ছিল এবং বাঁচার তাগিদে আমি শপথের কথাগুলোতে গো-মহিষের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ছাগলের দুধ পানের সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম যে যখন আমি ছাগ-মাতার দুধ পান করা শুরু করলাম তখনই আমার প্রতিজ্ঞার অন্তর্নিহিত নীতির বিচ্যুতি ঘটল।

কিন্তু এ সময়ে রাউলাট এ্যাক্টের বিরুদ্ধে প্রচারণায় নেতৃত্ব দেয়ার চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আর সেই সাথে বাঁচার ইচ্ছাও প্রবল হয়ে উঠল। এর ফলে আমার জীবনের অন্যতম বড় পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি অধ্যায়ের অবসান ঘটল।

আমি জানি, এরকম যুক্তি দেখানো হয় যে মানুষ যা খায় বা পান করে তার সাথে আত্মার কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ আত্মা খায় না, পানও করে না। আরো বলা হয় যে বাইরে থেকে শরীরের ভেতরে যা প্রবেশ করে তার চেয়ে ভেতর থেকে যা বাইরে প্রকাশ পায় তা বেশি গুরুত্ববহ। এ যুক্তি কিছুটা জোরালো তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এসব যুক্তি তর্কের সত্যাসত্য যাচাই করার চেয়ে আমি আমার দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করতে চাই যে, কেউ যদি মনে ঈশ্বরভীতি পোষণ করে এবং তাঁকে সামনা সামনি দেখতে চায় তার জন্য আহারের পরিমাণ ও গুণগত বিষয়ে সংযম পালন চিন্তা ও কথায় সংযম পালনের মতোই অত্যাবশ্যক।

একটা বিষয়ে অবশ্য আমার তত্ত্ব ব্যর্থ হয়েছে। সেটা আমি সবাইকে জানাব শুধু তাই নয়, বরং এটা গ্রহণ না করার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করব। যারা আমার প্রচারিত তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে দুধপান ছেড়ে দিতে পারেন তাদের উদ্দেশে বলছি এটা যদি তাদের জন্য সর্ব বিষয়ে উপকারী না হয় বা অভিজ্ঞ

www.pathagar.com

চিকিৎসক যদি পরামর্শ না দেন তাহলে তারা যেন এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত না রাখেন। এ যাবৎ আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে যাদের হজম শক্তি দুর্বল এবং যারা শয্যাশায়ী তাদের জন্য দুধের মতো পুষ্টিকর ও হালকা পথ্য আর নেই।

এ অধ্যায়টি পড়ার পরে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কেউ যদি পুঁথিগত বিদ্যা থেকে নয়, বরং নিজ অভিজ্ঞতা থেকে দুধের মতই পুষ্টিকর ও সহজপাচ্য কোনো ভেষজ বিকল্প পথ্যের সন্ধান দিতে পারেন তাহলে আমি তার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব।

নয়
ক্ষমতাসীনদের সাথে দ্বন্দ্ব

এবারে এশিয়াটিক ডিপার্টমেন্টের প্রসঙ্গে আসা যাক।

জোহান্সবার্গ ছিল এশিয়াটিক অফিসারদের ঘাটি। আমি লক্ষ্য করছিলাম যে এই অফিসাররা ভারতীয়, চীনা ও অন্যান্যদেরকে রক্ষা করা তো দূরের কথা, তাদেরকে আরো নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ট করছিল। প্রতিদিন আমি এ ধরনের অভিযোগ পেয়েছি—"যাদের সত্যিকার প্রবেশাধিকার আছে তারা প্রবেশ করতে পারছে না, অথচ যাদের প্রবেশাধিকার নেই তারা ১০০ পাউন্ডের বিনিময়ে ঢুকে যাচ্ছে। আপনি যদি এগুলোর প্রতিকার না করেন, তাহলে আর কে করবে?" আমি তাদের সাথে সহমর্মিতা বোধ করলাম। আমি যদি এ অনাচার দূর না করতে পারি তাহলে ট্রান্সভালে আমার অবস্থান বৃথা যাবে।

অতএব আমি সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে লাগলাম, এবং মোটামুটি যথেষ্ট সংগ্রহের পর আমি পুলিশ কমিশনারের শরণাপন্ন হলাম। তাকে এব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ বলে মনে হলো। আমাকে নিরুৎসাহিত করার পরিবর্তে তিনি ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনলেন এবং আমার কাছে যতগুলো সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে তার সবই দেখতে চাইলেন। তিনি সাক্ষীদেরকে নিজে জেরা করলেন এবং সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু আমার মতো তিনিও জানতেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকাতে সাদা আদমীদের জুরীকে দিয়ে কালো আদমীর বিরুদ্ধে মামলায় কোনো সাদা আদমীকে অভিযুক্ত করিয়ে শাস্তি প্রদান অত্যন্ত কঠিন। তিনি বললেন, "কিন্তু আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি। জুরীরা ছেড়ে দেবে এই ভয়ে এসব অপরাধীদের নির্বিঘ্নে ছেড়ে দেয়াও তো উচিত নয়। আমি তাদেরকে গ্রেফতার করিয়ে ছাড়ব। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমার পক্ষ থেকে চেষ্টার ত্রুটি করব না।"

আমার জন্য এ আশ্বাসের প্রয়োজন ছিল না। বেশ কয়েকজন অফিসারের প্রতি আমার সন্দেহ ছিল, কিন্তু তাদের সকলের বিরুদ্ধে অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ আমার হাতে ছিল না বলে তাদের দু'একজনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হলো যাদের দোষ সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

আমার চলাফেরাও গোপন রাখা গেল না। অনেকেই জানত আমি প্রায় প্রতিদিনই পুলিশ কমিশনারের কাছে যাওয়া আসা করছি। যে দু'জন অফিসারের

www.pathagar.com

নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়েছিল তাদের গুপ্তচরেরা বেশ দক্ষ ছিল। তারা আমার অফিস পাহারা দিত এবং আমার গতিবিধির খবর অফিসারদেরকে জানাত। আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে যে এ অফিসাররা এতই খারাপ ছিল যে তাদের হয়ে কাজ করবে এমন গুপ্তচরও বেশি ছিল না। যদি ভারতীয় ও চীনারা আমাকে সাহায্য না করত তাহলে তাদেরকে গ্রেফতার করা সম্ভব হতো না।

এদের একজন আত্মগোপন করল। পুলিশ কমিশনার তার বিরুদ্ধে এক্সট্রাডিশন ওয়ারেন্ট (বিদেশে পলাতক আসামীকে ধরে যে রাষ্ট্রে দোষ করেছে সেই রাষ্ট্রের কাছে অর্পণ করার ওয়ারেন্ট) জারী করলেন এবং তাকে গ্রেফতার করে ট্রান্সভালে নিয়ে এলেন। তাদের বিচার হলো, যদিও তাদের বিরুদ্ধে জোরালো সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল, এবং জুরীর কাছে তাদের একজনের পলাতক থাকার প্রমাণও ছিল, তা সত্ত্বেও তাদের দু'জনকেই নির্দোষ ঘোষণা করে খালাস দেয়া হলো।

আমি গভীরভাবে মর্মাহত হলাম। পুলিশ কমিশনারও খুব দুঃখ পেলেন। আইন পেশার প্রতি আমার ঘেন্না ধরে গেল। মেধাটাই ঘৃণার বস্তুতে পরিণত হলো, কারণ এ মেধা খাটিয়ে অপরাধীকে আড়াল করার মাধ্যমে নিচু উপায়ে অর্থোপার্জন করে নিজের মানহানি ঘটানো হয়ে থাকে।

যাহোক, এ দু'জন অফিসারের দোষ এতই স্পষ্ট ছিল যে আদালত তাদেরকে খালাস দেয়া সত্ত্বেও গভর্নমেন্ট তাদেরকে প্রশ্রয় দিতে পারল না। উভয়কেই অপমানজনকভাবে বরখাস্ত করা হলো এবং এশিয়াটিক ডিপার্টমেন্ট তুলনামূলকভাবে দুর্নীতিমুক্ত হলো, আর ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এলো।

এ ঘটনায় আমার সম্মান বৃদ্ধি পেল এবং আমার ব্যবসাও বেড়ে গেল। প্রতি মাসে ভারতীয়রা যে শত শত পাউন্ড অফিসারদের আত্মসাতের জন্য অপব্যয় করছিল তার সবটা না হলেও বড় অংশ বেঁচে গেল। পুরোটা বাঁচানো যাচ্ছিল না কারণ অসৎ অফিসাররা তখনো তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। তবে এখন সৎ লোকের পক্ষে সততা রক্ষা করে সম্ভব হচ্ছিল।

আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে যদিও এসব অফিসার খুবই অসৎ ছিল, তাদের বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল না। তারা নিজেরাও সেটা জানত এবং বিপদে পড়ে তারা আমার কাছে সাহায্যের জন্য এলে তাদেরকে সাহায্যও করেছি। জোহান্সবার্গ মিউনিসিপ্যালটিতে তারা চাকরীর সুযোগ পেল, আমি বিরোধীতা করলে তারা সেটা পেত না। এ ব্যাপারে তাদের এক বন্ধু আমার সাথে দেখা করল, আমি তাদের পথে বাধা সৃষ্টি না করতে সম্মত হলাম এবং তারা তাদের চেষ্টায় সফল হলো।

আমার এ মনোভাব আমার সাহচর্যে আসা অফিসারদেরকে আমার সাথে সম্পূর্ণ সহজ সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক হলো, এবং যদিও আমাকে প্রায়ই তাদের ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে এবং কড়া ভাষায় কথাও বলতে হয়েছে,

www.pathagar.com

তারা আমার সাথে বন্ধুর মতোই ছিল। আমি তখনো এ ব্যাপারে সচেতন ছিলাম না যে আমার এ আচরণ আমার স্বভাবেরই অংশ। পরবর্তীতে আমি জানতে পারলাম যে এটা সত্যাগ্রহের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং অহিংসার অন্যতম গুণ।

মানুষ ও তার কর্ম দুটো আলাদা জিনিস। ভালো কাজ যেখানে প্রশংসা নিয়ে আসে, মন্দ কাজ আনে নিন্দা। কিন্তু যে ব্যক্তি কাজ করে, ভালো করুক আর মন্দ করুক, তার কাজ অনুযায়ী সম্মান বা নিন্দা তার প্রাপ্য। "পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়"– এ হিতোপদেশটি বুঝতে যদিও সহজ, কিন্তু বাস্তবে তা খুব কমই মেনে চলা হয়, আর সে কারণেই ঘৃণার বিষবাষ্প সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে যায়।

এ অহিংসাই হলো সত্য অন্বেষণের ভিত্তি। প্রতি নিয়ত আমি উপলব্ধি করছি যে, অহিংসার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হলে সত্যান্বেষণের এ প্রচেষ্টা বৃথা যাবে। কোনো পদ্ধতি (System)-কে প্রতিরোধ বা আক্রমণ করায় দোষ নেই, কিন্তু ঐ পদ্ধতির প্রবর্তনকারীকে প্রতিরোধ বা আক্রমণ করলে তা হবে কোনো ব্যক্তিকে আক্রমণ করার সমতুল্য। কারণ আমরা সবাই একই তুলিতে রঞ্জিত, এবং এক ও অদ্বিতীয় স্রষ্টার সন্তান। সে কারণেই আমাদের মাঝে স্বর্গীয় শক্তিও অসীম। একজন ব্যক্তিকে অবমাননা করার অর্থ সকল স্বর্গীয় শক্তিকে অবমাননা করা, আর এভাবে শুধু ঐ ব্যক্তিকে নয়, তার সাথে সমগ্র পৃথিবীকেই অবমাননা করা হয়।

দশ

একটি পবিত্র স্মৃতিচারণ ও অনুশোচনা

জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী আমাকে বিভিন্ন ধর্মের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের সংস্পর্শে নিয়ে এসেছে এবং তাদের সকলের সাথে মেলামেশার অভিজ্ঞতা থেকে এ অভিমত ব্যক্ত করছি যে, আমার কাছে আত্মীয় ও আগন্তুকে, স্বদেশী ও বিদেশীতে, সাদা ও কালো আদমীতে, ভারতের হিন্দু ও অন্য ধর্মে বিশ্বাসীতে কোনো ভেদাভেদ নেই, হোক সে মুসলমান, পার্সী, খৃষ্টান বা ইহুদী। বলা যেতে পারে, আমার হৃদয় মানুষে মানুষে এ ধরনের বৈষম্য সৃষ্টিতে অক্ষম। আমি এটাকে আমার বিশেষ গুণ বলে দাবি করতে পারি না, কারণ এটা আমার কোনো চেষ্টার ফল নয়, বরং আমার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত, স্বভাবজাত। অপর দিকে অহিংসা (হিংস্রতা না করা), ব্রহ্মচর্য (কৌমার্য), অপরিগ্রহ (স্বত্ব ত্যাগ করা) ও অন্যান্য প্রধান গুণাবলীর ক্ষেত্রে আমাকে পূর্ণ সচেতনভাবে লাগাতার চেষ্টা চালাতে হয় এগুলো অর্জনের জন্য।

আমি যখন ডারবানে ওকালতি করি তখন আমার অফিসের কেরানীরা আমার সাথেই থাকত এবং তাদের মধ্যে হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিল, আর প্রদেশের নামে বললে তারা ছিল গুজরাটী ও তামিল। আমি তাদেরকে আমার আত্মীয় পরিজন ছাড়া কখনো অন্য কিছু ভেবেছি এমনটা মনে পড়ে না। আমি তাদের সাথে পরিবারের সদস্যের মতো ব্যবহার করতাম এবং তাদের সাথে এরকম আচরণে বাধা দেয়ার কারণে আমার স্ত্রীর সাথে অপ্রীতিকর পরিস্থিতিরও সৃষ্টি

www.pathagar.com

হয়েছিল। কেরানীদের মধ্যে একজন খৃষ্টান ছিল, সে ছিল অস্পৃশ্য পিতামাতার সন্তান।

আমার বাসাটি ছিল পশ্চিমা মডেলের এবং সে কারণে রুমের ময়লা পানি নির্গমনের কোনো পথ ছিল না। তাই প্রতি রুমে "চেম্বার পট" (প্রস্রাব করার পাত্র) ছিল। কোনো চাকর বা সুইপার দিয়ে ওগুলো পরিষ্কার করার বদলে আমার স্ত্রী বা আমি নিজে কাজটা করতাম। যেসব কেরানী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল তারা নিজেদের পট নিজেরাই পরিষ্কার করত। কিন্তু খৃষ্টান কেরানীটি ছিল নবাগত এবং আমাদের দায়িত্ব ছিল তার বেডরুম পরিষ্কার করা। আমার স্ত্রী অন্য সবার পট পরিষ্কার করল, কিন্তু একজন অস্পৃশ্য-পুত্রের ব্যবহৃত পট পরিষ্কার করতে তার আত্ম-সম্মানে বাধল। এ নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। আমি পটগুলো পরিষ্কার করব সেটা তার সহ্য হলো না, আবার নিজেই করবে সেটাও তার পছন্দ নয়। সে আমাকে যেভাবে বকাঝকা করেছিল সে চিত্র আজো আমার মনে আছে—রাগে তার দু'চোখ লাল, মুক্তোর মতো অশ্রুবিন্দু তার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে, সে অবস্থায় পট হাতে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। কিন্তু তার স্বামী হিসেবে আমি নিষ্ঠুর অথচ দয়ালু ছিলাম। আমি নিজেকে তার শিক্ষক বলে মনে করতাম, আর সে কারণে ভালোবেসেও তাকে কষ্ট দিতাম। সে শুধু পটটা নিয়ে যাচ্ছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট ছিলাম না। আমি চেয়েছিলাম কাজটা সে আনন্দের সাথে করবে। তাই আমি গলা চড়িয়ে বললাম, "আমার বাড়িতে এসব ননসেন্স সহ্য করব না।"

এ কথাগুলো তাকে তীরের মতো বিদ্ধ করল। সে চীৎকার করে জবাব দিল, "তোমার বাড়ি নিয়ে তুমি নিজেই থাকো, আমি চললাম।" আমি নিজের অবস্থান ভুলে গেলাম, আমার ভিতরের সহমর্মিতার ঝর্ণাধারা শুকিয়ে গেল। আমি তার হাত ধরলাম, অসহায় মহিলাকে টেনে সিঁড়ির উল্টোদিকে গেট পর্যন্ত নিয়ে গেলাম এবং তাকে ধাক্কা মেরে বের করে দেয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে গেট খুলতে এগিয়ে গেলাম। তার গণ্ড বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরছিল এবং সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "তোমার কোনো লজ্জা নেই? তুমি কি এভাবে নিজেকে ভুলে যাচ্ছ? আমি কোথায় যাব? এখানে আমার পিতামাতা বা কোনো আত্মীয় নেই যে আমাকে আশ্রয় দেবে। আমি তোমার স্ত্রী, তাই বলে কি ভাব তোমার লাথি-গুতা আমি সহ্য করব? ঈশ্বরের দোহাই, এখন থামো এবং গেট বন্ধ করো। অন্য লোকের সামনে এ ধরনের দৃশ্যের অবতারণা ক'রো না।"

আমি ভয় না পাওয়ার ভান করলাম, তবে সত্যি সত্যি লজ্জিত হলাম এবং গেট বন্ধ করলাম। আমার স্ত্রী যদি আমাকে ত্যাগ করতে না পারে, আমিও তো তাকে ত্যাগ করতে পারি না। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমাদের অনেক ঝগড়া হয়েছে, কিন্তু ঝগড়ার শেষে সর্বদাই শান্তি এসেছে। স্ত্রী তার অসীম সহ্য ক্ষমতার গুণে সর্বদাই বিজয়ী হয়েছে।

আজ আমি ঐ ঘটনাটি কিছুটা নিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করতে পারছি। কারণ এটা এমন একটা সময়ের ঘটনা যে সময় থেকে সৌভাগ্যক্রমে আমি বেরিয়ে

www.pathagar.com

এসেছি। এখন আমি আর সেই অন্ধ, মোহগ্রস্ত স্বামী নই, আমি এখন তার শিক্ষকও নই। কস্তুরবাই ইচ্ছে করলে আজ আমার সাথে ঐরূপ খারাপ ব্যবহার করতে পারে যা আগে আমি করেছি। আমরা একে অপরের পরীক্ষিত বন্ধু, একজন আরেকজনকে আর কাম চরিতার্থ করার বস্তু বলে গণ্য করি না। আমার অসুস্থতার সময়ে সে ছিল বিশ্বস্ত সেবিকা, যে সেবা করেছে কোনো রকম পুরস্কারের আশা না করেই।

এ ঘটনাটি ঘটেছিল ১৮৯৮ সালে যখন ব্রহ্মচর্য সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। এটা ছিল এমন এক সময় যখন আমি ভাবতাম, স্ত্রী হলো স্বামীর যৌন লালসা পূরণের বস্তু, স্বামীর আনন্দ-বেদনায় সাহায্যকারী, সহকর্মী ও অংশীদার হওয়ার জন্য নয়, বরং স্বামীর আদেশ পালনের জন্যই তার জন্ম হয়েছে। ১৯০০ সালে এসে আমার এসব ধারণা আমূল পাল্টে গেল এবং ১৯০৬ সালে তা সুনির্দিষ্ট রূপ নিল। কিন্তু এসবের বর্ণনা আমি যথাস্থানে করব। এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আমার ভেতরে দৈহিক কামনা ক্রমশ লোপ পাওয়ার সাথে সাথে আমার পারিবারিক জীবন শান্তিপূর্ণ, মধুর ও সুখময় হয়েছে এবং আরো হচ্ছে।

আমার এ পবিত্র স্মৃতিচারণের বর্ণনা থেকে কেউ যেন না ভাবেন যে আমরা যে কোনো বিচারেই আদর্শ দম্পতি ছিলাম, কিংবা আমাদের মধ্যে আদর্শগত পূর্ণ মতৈক্য ছিল। কস্তুরবাই নিজেই হয়তো জানে না আমার থেকে আলাদা কোনো আদর্শ তার ছিল কিনা। এটা হতেই পারে যে আমার অনেক কাজ আজ পর্যন্তও সে পছন্দ করে না। ওগুলো নিয়ে আমরা কখনো আলোচনা করি না, আলোচনা করে কোনো ফায়দা আছে বলেও আমি মনে করি না। কারণ তার পিতামাতার কাছ থেকে সে শিক্ষা লাভ করেনি, আর আমার যখন শিক্ষা দেয়ার কথা তখন আমিও তাকে শিক্ষা দেইনি। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদ স্বরূপ একটি বড় গুণ সে যথেষ্ট পরিমাণে পেয়েছে, যা অধিকাংশ হিন্দু স্ত্রীরা কিছু না কিছু পরিমাণে পেয়ে থাকে। আর তা হলো, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, জেনে হোক বা না জেনে হোক, আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করাকেই নিজের জন্য আশীর্বাদ বলে মনে করেছে এবং আমার সংযমী জীবন যাপনের প্রচেষ্টায় সে কখনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। যদিও আমাদের মধ্যে বড় রকমের বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবধান ছিল, তথাপি আমার সর্বদাই মনে হয়েছে যে আমাদের জীবন ছিল সন্তুষ্টির, সুখের ও প্রগতির।

এগার
ইউরোপীয়ানদের নিবিড় সাহচর্য

এ অধ্যায়ে এসে আমি এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছি যখন প্রতি সপ্তাহে কিভাবে আমি এ কাহিনী লিখেছি পাঠককে তার বর্ণনা দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি। যখন আমি এ কাহিনী লিখতে শুরু করি তখন আমার সামনে নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা ছিল না। আমার কোনো ডাইরী বা প্রামাণ্য দলিলাদি নেই যার ওপর

www.pathagar.com

ভিত্তি করে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করব। লেখার সময়ে আমার অন্তরাত্মা যেভাবে চাইছে আমি সেভাবেই লিখছি। আমার সকল চিন্তা ও কর্ম জ্ঞাতসারে আত্মার নির্দেশে করছি এমন দাবি আমি করি না। আমার জীবনের বড় বড় পদক্ষেপগুলো এবং যেগুলো ছোট বলে গণ্য সেগুলোও, পরীক্ষা করলে এটা বলা অসঙ্গত হবে না যে সেগুলো আত্মার নির্দেশনামতেই করেছিলাম।

আমি তাঁকে (ঈশ্বরকে) দেখিনি, আর তাঁকে চিনতেও পারিনি। ঈশ্বরের প্রতি সারা দুনিয়ার বিশ্বাসকে আমার নিজের করে নিয়েছি। আর আমার বিশ্বাস যেহেতু অমোচনীয় আমার নিকট তা অভিজ্ঞতার পর্যায়ে উন্নীত বলে আমি মনে করি। যাহোক, বিশ্বাসকে অভিজ্ঞতা বলে বর্ণনা করা যেহেতু অবিমিশ্র সত্য নয়, তাই সম্ভবত এটা বলাই সঠিক যে ঈশ্বরে আমার বিশ্বাসের সঠিক বর্ণনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই।

আমার আত্মা আমাকে যেভাবে বলেছে আমি সেভাবে লিখেছি। আমি কেন এটা বলেছি এখন হয়তো তা বুঝতে কিছুটা সহজ হবে। সর্বশেষ যে অধ্যায়টা লিখেছি তা লিখতে গিয়ে আমি এ অধ্যায়ের জন্য যে শিরোনাম দিয়েছি তা ওটার জন্যে দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি যখন লেখা চালিয়ে যাচ্ছিলাম, উপলব্ধি করলাম যে ইউরোপীয়ানদের নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা বর্ণনার আগে এর ভূমিকা স্বরূপ কিছু লেখা প্রয়োজন। আমি তাই করলাম এবং শিরোনামটা বদলে দিলাম।

এখন এ অধ্যায়টা পুনরায় লিখতে গিয়ে নতুন এক সমস্যার সম্মুখীন হলাম। আমার ইংরেজ বন্ধুদের নিয়ে লিখতে গিয়ে কোনটা লিখব আর কোনটা বাদ দেব তা নিয়ে গুরুতর সমস্যা দেখা দিল। প্রাসঙ্গিক বিষয় যদি বাদ দেই তাহলে সত্যকে মলিন করা হবে। আর এ কাহিনী লেখার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কেই যখন আমি নিশ্চিত নই, তখন তাদের বিষয়ে কোনটা প্রাসঙ্গিক তা নির্ধারণ করা আরো দুরূহ।

সব আত্মজীবনীকে অসম্পূর্ণ ইতিহাস গণ্য করা সম্পর্কে অনেক পূর্বে আমি যা পড়েছিলাম এখন তা আরো পরিষ্কার বুঝতে পারছি। আমি জানি আমার যা মনে আছে তার সবই এ কাহিনীতে লিখছি না। সত্যের খাতিরে আমি কতটা লিখব আর কতটা বাদ দেব তা কে বলবে? আর আমার জীবনের কিছু কিছু ঘটনার যে অসম্পূর্ণ একতরফা বিবরণ আমি দেব আইনের আদালতে তার মূল্যইবা কতটুকু হবে? যদি কোনো পরচর্চাকারী এ যাবৎ যে অধ্যায়গুলো লিখেছি সেগুলোর ব্যাপারে জেরা শুরু করেন তাহলে তিনি হয়তো ওগুলোর ব্যাপারে আরো বিশদ আলোকপাত করতে পারবেন। আর যদি কোনো বৈরী সমালোচক জেরা করেন তাহলে তিনি আমার "আত্মাভিমানের শূন্যগর্ভতা" তুলে ধরে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারবেন।

তাই আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করি আমার কাহিনীর এ অধ্যায়গুলো লেখা বন্ধ করে দেয়াই সমীচীন হবে কিনা। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত অন্তরাত্মার নিষেধাজ্ঞা শুনতে

www.pathagar.com

না পাচ্ছি ততদিন লেখা চালিয়েই যাব। এ ব্যাপারে আমি সেই বিজ্ঞ প্রবচন মেনে চলব–"কোন কাজ একবার শুরু করলে তা শেষ করবে, যদি নীতিগতভাবে তা ভুল প্রমাণিত না হয়।"

আমি সমালোচকদের সন্তুষ্ট করার জন্য আত্মজীবনী লিখছি না। এ আত্মজীবনী লেখাটাও সত্য নিয়ে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো আমার সহকর্মীদের কিছুটা সান্ত্বনা ও চিন্তার খোরাক দেয়া। আসলে তাদের ইচ্ছেতেই আমি এটা লিখতে শুরু করেছিলাম। যদি জেরামদাস ও স্বামী আনন্দ লাগাতার তাগাদা না দিতেন তাহলে হয়তো আমি এটা লিখতাম না। তাই আমি এটা লিখে যদি ভুল করে থাকি তাহলে তারাও সে অপবাদের ভাগীদার হবেন।

এবারে শিরোনামে উল্লিখিত প্রসঙ্গে আসা যাক। ডারবানে আমার পরিবারের সদস্য হিসেবে ভারতীয়রা যেমন ছিল, তেমনি ইংরেজ বন্ধুও ছিল। আমার সাথে যারা বাস করত তারা সবাই যে এটা পছন্দ করত তা নয়। কিন্তু আমি তাদেরকে আমার সাথে রাখার জন্য জিদ করতাম। সব ক্ষেত্রে আমি সঠিক ছিলাম তাও নয়। আমার তিক্ত অভিজ্ঞতাও হয়েছে, কিন্তু তা ভারতীয় ও ইউরোপীয়ান উভয়কে নিয়েই। তবে সে তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য আমি দুঃখিত হইনি। তিক্ত অভিজ্ঞতা ও বন্ধুদের অসুবিধা ও উদ্বেগের কারণ হওয়া সত্ত্বেও আমি আমার অভ্যাস পাল্টাইনি এবং আমার বন্ধুরা দয়া করে তা সহ্য করেছেন। যখনই নতুন আগন্তুকের সাথে আমার সাহচর্যের কারণে বন্ধুরা কষ্ট পেয়েছেন, আমি তাদেরকে দোষারোপ করতে দ্বিধা করিনি। আমি মনে করি, যারা নিজের মধ্যে যে ঈশ্বরকে দেখতে পায় এবং সেই একই ঈশ্বরকে অন্যের মধ্যেও দেখতে চায় তাদেরকে সকলের সাথেই যথেষ্ট নিরপেক্ষতা নিয়ে বসবাস করতে হবে। এবং এভাবে বসবাসের ক্ষমতা চর্চার মাধ্যমে আয়ত্ত করতে হবে, এ ধরনের সাহচর্যের অযাচিত সুযোগকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নয়, বরং সেবার প্রেরণা নিয়ে তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে এবং তাদের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে।

যখন বোয়ার যুদ্ধ শুরু হলো, তখন যদিও আমার বাসা পূর্ণ ছিল তখন আমার এখানে জোহান্সবার্গ থেকে দু'জন ইংরেজ এলো। তাদের দু'জনেই ছিল থিওসফিস্ট, একজনের নাম মি. কিচিন, যার সম্পর্কে আমরা পরে আরো বিস্তারিত জানতে পারব। এ বন্ধুদের কারণে আমার স্ত্রীকে যথেষ্ট কাঁদতে হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত আমার কারণে তাকে এরকম অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের মতো ঘনিষ্ঠভাবে ইংরেজ বন্ধুদের আমার সাথে বসবাস এবারেই প্রথম। ইংল্যান্ডে থাকা কালে আমি ইংরেজ পরিবারে থেকেছি, কিন্তু সেখানে আমি তাদের জীবনযাত্রার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছি এবং তা ছিল কোনো বোর্ডিং-এ থাকার মতো। এখানে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তার বিপরীত। ইংরেজ বন্ধুরাই পরিবারের সদস্য হয়ে গেল। অনেক ব্যাপারে তারা ভারতীয় রীতি গ্রহণ করল। যদিও বাসার আসবাবপত্র ছিল পশ্চিমা ধাচের, অভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রা

www.pathagar.com

ছিল ভারতীয়। মনে পড়ে, পরিবারের সদস্য হিসেবে তাদেরকে রাখতে গিয়ে আমার কিছু অসুবিধা হয়েছিল, কিন্তু এটা হলফ করে বলতে পারি যে আমার বাসায় তারা কোনো প্রকার অসুবিধা বোধ করেনি এবং তাদের অবস্থান সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যময় ছিল। ডারবানের তুলনায় জোহান্সবার্গে এসব সাহচর্য আরো বৃদ্ধি পেল।

বার
ইউরোপীয়ান সাহচর্য (চলমান)

জোহান্সবার্গে এক সময়ে আমার সাথে চারজন ভারতীয় কেরানী ছিল যারা সম্ভবত কেরানীর চাইতে বেশি আমার পুত্রের মতো ছিল। কিন্তু আমার কাজের জন্য তারা যথেষ্ট ছিল না। টাইপ করা ছাড়া লেখার কাজ চলত না, এবং আমি ছাড়া আর কেউ টাইপ জানত না। এদের মধ্যে দু'জন কেরানীকে আমি টাইপ করা শেখালাম, কিন্তু ইংরেজি ভাষা কম জানার কারণে তারা কোনোভাবেই প্রয়োজনমতো দক্ষতা অর্জন করতে পারল না। তাদের একজনকে আমি হিসাব রক্ষণ কাজের প্রশিক্ষণ দিতে চাইলাম। নাটাল থেকে আমি কাউকে আনতে পারছিলাম না, কারণ পারমিট ছাড়া কাউকে ট্রান্সভালে ঢুকতে দেয়া হচ্ছিল না এবং ব্যক্তিগত সুবিধার কারণে আমি পারমিট অফিসারের অনুগ্রহপ্রার্থী হতে অনিচ্ছুক ছিলাম।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। কাজের পাহাড় জমতে থাকল এবং তা এত বৃদ্ধি পেতে থাকল যে মনে হলো আমি নিজে যত চেষ্টাই করি না কেন কোনোভাবেই পেশাগত ও গণকাজ শেষ করার ব্যাপারে কুলিয়ে উঠতে পারব না। একজন ইউরোপীয়ান কেরানী নিয়োগ করতে আমি খুব আগ্রহী ছিলাম কিন্তু আমার মতো কালো আদমীর অধীনে কাজ করতে রাজি হবে এমন কোনো পুরুষ বা মহিলা সাদা আদমী পাব কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম না। যাহোক আমি চেষ্টা করে দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার জানাশোনা একজন টাইপরাইটিং এজেন্টের শরণাপন্ন হলাম এবং আমাকে একজন স্টেনোগ্রাফার যোগাড় করে দিতে বললাম। মহিলা স্টেনোগ্রাফার পাওয়া যাচ্ছিল এবং সে আমাকে একজন যোগাড় করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিল। সে স্কটল্যান্ড থেকে সদ্য আগত মিস ডিক নামে এক স্কটিশ মহিলাকে পেল। সৎভাবে যে কোনো কাজ করে জীবিকা উপার্জনে তার আপত্তি ছিল না এবং তার একটা কাজ পাওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাই এজেন্ট তাকে আমার কাছে পাঠাল। সে তৎক্ষণাৎ আমার মন জয় করে ফেলল।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "একজন ভারতীয়ের অধীনে কাজ করতে তোমার সম্মানে বাধবে না?"

তার দৃঢ় উত্তর ছিল, "মোটেই না।"

"তুমি কত বেতন আশা কর?"

"১৭ পাউন্ড ১০ সেন্ট কি আপনার জন্য খুব বেশি হবে?"

www.pathagar.com

"তোমার কাছ থেকে যে কাজ চাই তা যদি করতে পার, তাহলে এটা খুব বেশি নয়। তুমি কখন যোগদান করতে পারবে?"

"আপনি চাইলে এই মুহূর্তেই।"

আমি খুব সন্তুষ্ট হলাম এবং সাথে সাথেই চিঠিপত্রের ডিকটেশন দিতে শুরু করলাম।

অল্পদিনের মধ্যেই সে আমার কাছে স্টেনোগ্রাফার নয়, নিজের মেয়ে বা বোনের মতো হয়ে উঠল। তার কাজে তেমন কোনো খুঁত পেলাম না। তাকে প্রায়ই হাজার পাউন্ড পর্যন্ত তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেয়া হতো এবং হিসাব-নিকাশের খাতা তার দায়িত্বে ছিল। সে আমার পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করল। অধিকন্তু সে তার অন্তরের একান্ত গোপন চিন্তা ও অনুভূতির কথাও আমাকে বলত। সে তার স্বামী নির্বাচনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমার উপদেশ নিয়েছিল এবং আমার সুযোগ হয়েছিল তাকে বিয়ে দেবার। মিস ডিক থেকে মিসেস ম্যাকডোনাল্ড হওয়ার সাথে সাথে সে বাধ্য হলো আমাকে ছেড়ে যেতে। কিন্তু তার বিয়ের পরেও যখনই আমি কাজের চাপ সামলাতে না পেরে তাকে ডেকেছি, সে আমার ডাকে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়নি।

কিন্তু তার স্থলে একজন স্থায়ী স্টেনোটাইপিস্টের প্রয়োজন ছিল এবং আরেকজন যুবতীকে পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তার নাম ছিল মিস শ্লেসিম। মি. ক্যালেনবাচ, যার সম্পর্কে পাঠকরা যথাসময়ে জানতে পারবেন, আমার সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এখন সে ট্রান্সভালের কোনো একটা হাইস্কুলে শিক্ষকতা করছে। সে যখন আমার কাছে আসে তখন তার বয়স প্রায় ১৭ বছর। তার কিছু কিছু স্বভাবগত আচরণ কখনো কখনো মি. ক্যালেনবাচ ও আমার জন্য অসহনীয় ছিল। স্টেনোগ্রাফার হওয়ার চাইতে তার উদ্দেশ্য বেশি ছিল অভিজ্ঞতা অর্জন করা। বর্ণবিদ্বেষ কি জিনিস তা তার স্বভাবে ছিল না। বয়োজ্যেষ্ঠ্যতা বা অভিজ্ঞতার প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। সে কোনো লোককে অপমান করতে এবং তার সম্পর্কে সে কি ভাবছে তা বলতে দ্বিধা করত না। তার উগ্র আচরণ প্রায়ই আমাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলত কিন্তু তার খোলামেলা ছলনাহীন স্বভাব আবার তা দূর করে দিত। তার টাইপ করা চিঠি আমি প্রায়ই না পড়ে সই করে দিতাম কারণ আমি মনে করতাম তার ইংরেজি জ্ঞান আমার চেয়ে ভালো এবং তার আনুগত্যের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা ছিল।

তার ত্যাগ স্বীকার ছিল অত্যন্ত বড়। একটা লম্বা সময় পর্যন্ত সে প্রতিমাসে ৬ পাউন্ডের বেশি নিত না এবং ১০ পাউন্ডের বেশি নিতে বরাবরই অস্বীকার করত। আমি যখন তাকে বেশি নিতে বলতাম সে আমাকে বকুনি দিয়ে বলত, "আমি আপনার কাছ থেকে বেতন নিতে এখানে আসিনি। আমি এখানে এসেছি কারণ আমি আপনার আদর্শ পছন্দ করি এবং আপনার সাথে কাজ করতে চাই।

শুধুমাত্র একবার সে আমার কাছ থেকে ৪০ পাউন্ড নিয়েছিল, কিন্তু এটা সে ধার হিসেবে দেখানোর জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল এবং পুরো টাকাই সে গত বছরে

www.pathagar.com

শোধ করেছে। তার সাহসও ছিল ত্যাগের মতোই। যে কয়জন বিশিষ্ট মহিলার সাথে আমার পরিচয়ের সুযোগ হয়েছে সে তাদের একজন যার চরিত্র স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, আর সাহস যোদ্ধাকে লজ্জা দেবার মতো। এখন সে বর্ষীয়সী মহিলা। যখন সে আমার সাথে ছিল তখনো তার মনের কথা জানতে পারিনি, এখনো জানি না। তবে এই যুবতী মহিলার সাথে আমার দিনগুলো চিরদিন পবিত্র স্মৃতি হিসেবে অম্লান হয়ে থাকবে। সুতরাং তার সম্পর্কে যা জানি তা প্রকাশ না করলে সত্যের অপলাপ হবে।

তার কাজ করতে গিয়ে সে দিন-রাত ভুলে যেত। রাতের অন্ধকারে সে সম্পূর্ণ একাকী ভ্রমণে বের হতো এবং নিরাপত্তা সঙ্গী হিসেবে কাউকে সাথে নেবার পরামর্শ রাগান্বিতভাবে নাকচ করে দিত। হাজার হাজার নেতৃস্থানীয় ভারতীয় নির্দেশনা নিতে তার কাছে যেত। সত্যাগ্রহের দিনগুলোতে যখন প্রায় সব নেতা জেলে গেল, সে একা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল। তার হাতে ছিল সহস্রাধিক লোকের ব্যবস্থাপনা, ব্যাপক লেখালেখি এবং ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন পত্রিকা পরিচালনার ভার, কিন্তু সে কখনো ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েনি।

আমি মিস শ্লেসিম সম্পর্কে এভাবে অন্তহীন লিখে যেতে পারি, কিন্তু তার সম্পর্কে গোখলের মন্তব্য উদ্ধৃত করে এ অধ্যায়ের ইতি টানতে চাই। গোখলে আমার সহকর্মীদের সবাইকেই চিনতেন। তাদের অনেকের ব্যবহারে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাদের সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতেন। সকল ভারতীয় ও ইউরোপীয়ান সহকর্মীদের মধ্যে তিনি মিস শ্লেসিমকে সর্বাগ্রে স্থান দিতেন। তিনি বলতেন, "মিস শ্লেসিমের মধ্যে যে ত্যাগ, পবিত্রতা ও নির্ভীকতা দেখেছি তেমনটা আর কারো মধ্যে দেখিনি। তোমার সহকর্মীদের মধ্যে আমার বিবেচনায় সে হলো প্রথম স্থানে।"

তের
ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন

অন্যান্য ইউরোপীয়ানদের সাথে ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের প্রসঙ্গে আসার আগে দু'তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। একটা সম্পর্কের কথা অবশ্য এখনই উল্লেখ করা উচিত। আমার কাজের জন্য মিস ডিককে নিয়োগ করাই যথেষ্ট ছিল না। আমার আরো সাহায্যকারীর প্রয়োজন ছিল। পূর্বের এক অধ্যায়ে আমি মি. রিচ এর কথা উল্লেখ করেছি। আমি তাকে খুব ভালো করেই চিনতাম। সে একটা ফার্মের ম্যানেজার ছিল। সে আমার পরামর্শ মোতাবেক ফার্মের চাকরী ছেড়ে দিয়ে আমার অধীনে কেরানী হিসেবে যোগদানে সম্মত হলো এবং সে আমার কাজের বোঝা যথেষ্ট পরিমাণে হালকা করে দিল।

প্রায় এ সময়েই শ্রীযুক্ত মদনজিত "ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন" পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব নিয়ে আমার সাথে দেখা করলেন এবং আমার মতামত চাইলেন। তিনি আগে থেকে একটি ছাপাখানা চালাচ্ছিলেন এবং আমি তার প্রস্তাব সমর্থন করলাম।

www.pathagar.com

পত্রিকাটির প্রকাশনা শুরু হলো ১৯০৪ সালে এবং শ্রীযুক্ত মনসুখলাল নজর এর প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। কিন্তু পত্রিকা প্রকাশের ধকল আমাকেই সামলাতে হলো কারণ বাস্তবে আমার ওপরেই পত্রিকার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। শ্রীযুক্ত মনসুখলাল দায়িত্ব পালন করতে পারছিলেন না তা নয়। ভারতে থাকতে তিনি বেশ কিছুকাল সাংবাদিকতা করেছেন, কিন্তু আমি থাকতে দক্ষিণ আফ্রিকার জটিল সমস্যা নিয়ে লিখতে তিনি সাহস পাচ্ছিলেন না। আমার উপলব্ধির ওপর তার গভীর আস্থা ছিল। তাই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখার দায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়েছিলেন। অদ্যাবধি সাময়িকীটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে বের হচ্ছে। প্রথমে এটা গুজরাটি, হিন্দী, তামিল ও ইংরেজি ভাষায় ছাপা হতো। আমি দেখলাম যে তামিল আর হিন্দী অংশগুলো অযথা ছাপা হচ্ছে। যে উদ্দেশে তা ছাপা হচ্ছিল সে উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছিল না। তাই আমি ওগুলো বন্ধ করে দিলাম কারণ ওগুলো ছাপানো অব্যাহত রাখলে তাতে কিছুটা ছলনার আশ্রয় নেয়া হতো।

এ পত্রিকা প্রকাশ করতে গিয়ে আমাকে আর্থিক বিনিয়োগ করতে হতে পারে এমন ধারণা ছিল না। কিন্তু শিগগীরই আবিষ্কার করলাম যে আমার আর্থিক সাহায্য ছাড়া এটা চলতে পারবে না। ভারতীয় ও ইউরোপীয় সবাই জানত যে যদিও আমি প্রকাশ্যে ইন্ডিয়ান ওপিনিয়নের সম্পাদক নই, কিন্তু বাস্তবে এর সকল কাজের দায়িত্ব আমার ওপরেই ছিল। যদি পত্রিকাটি আদৌ প্রকাশ না করা হতো তাহলে কোনো কথা ছিল না, কিন্তু প্রকাশ হওয়ার পরে তা বন্ধ করে দেয়া ক্ষতিকর ও লজ্জার ব্যাপার হতো। সুতরাং এটার পেছনে আমি অর্থ ব্যয় করতে থাকলাম এবং শেষ পর্যন্ত আমার সকল সঞ্চয় এর জন্য ব্যয় হয়ে গেল। মনে আছে এক সময়ে আমাকে এটার জন্য মাসে ৭৫ পাউন্ড পাঠাতে হয়েছে।

কিন্তু এত বছর পরে এসে মনে হচ্ছে পত্রিকাটি ভারতীয় সম্প্রদায়ের যথেষ্ট উপকারে এসেছে। এটা কখনো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে ছাপা হয়নি। এটা যতদিন আমার নিয়ন্ত্রণে ছিল ততদিন পত্রিকাটির কোনো পরিবর্তন আমার জীবনে পরিবর্তনের ইঙ্গিতবহ ছিল। আজকের ইয়ং ইন্ডিয়া বা নবজীবন পত্রিকার মতো সেদিনের ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন ছিল আমার জীবনের একাংশের দর্শন বিশেষ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে আমি এর কলামগুলোতে আমার প্রাণের প্রবাহ সঞ্চালিত করেছি এবং সত্যাগ্রহের নীতিমালা ও অনুশীলন আমি যতটা বুঝেছি তার ব্যাখ্যা করেছি। ১০ বছর ধরে অর্থাৎ ১৯১৪ পর্যন্ত, কারাগারে বাধ্যতামূলক অবসরকালীন বিরতি ব্যতীত, আমার কোনো লেখা ছাড়া ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন প্রকাশিত হতো না। মনে পড়ে না আমার প্রবন্ধে একটা শব্দও বিনা চিন্তা-ভাবনায় লিখেছি, বা সচেতনভাবে একটি শব্দও বাড়িয়ে বলেছি, বা শুধুমাত্র কাউকে সন্তুষ্ট করতে একটি শব্দও লিখেছি। প্রকৃতপক্ষে পত্রিকাটি ছিল আমার জন্যে আত্ম-সংযমের প্রশিক্ষণ, আর বন্ধুদের জন্যে তা ছিল আমার চিন্তার সাথে সম্পৃক্ত থাকার একটি মাধ্যম। সমালোচকরা এর মধ্যে আপত্তিকর বিষয় খুব কমই পেতেন। মূলত ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন সমালোচকদের কলমকে সংযত থাকতে বাধ্য করত। সম্ভবত

www.pathagar.com

ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন না থাকলে সত্যাগ্রহের উদ্ভব হতো না। পাঠকরা এর দিকে চেয়ে থাকত সত্যাগ্রহের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য। আমার জন্য এটা মানব চরিত্রের সকল দিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল, কারণ সম্পাদক ও পাঠকের মধ্যে একটা আন্তরিক ও স্বচ্ছ বন্ধন গড়ে তোলাই ছিল আমার লক্ষ্য। পত্র লেখকদের হৃদয় নিংড়ানো লেখাসহ বন্যার মতো পত্র আসতে লাগল। লেখকের মেজাজ-মর্জি অনুযায়ী পত্রগুলো বন্ধুত্বপূর্ণ, সমালোচনাপূর্ণ বা তিক্তাপূর্ণ ছিল। সেগুলো পড়া, আত্মস্থ করা এবং উত্তর দেয়া আমার জন্য সুন্দর শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠল। আমার সাথে পত্র লেখালেখির মাধ্যমে ভারতীয় সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠল। এর মাধ্যমে আমি একজন সাংবাদিকের দায়িত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করলাম এবং এভাবে ভারতীয় সম্প্রদায়ের ওপর আমি যে প্রভাব অর্জন করলাম তা আমার ভবিষ্যৎ প্রচারণার কাজকে কার্যকর, মর্যাদাপূর্ণ ও অপ্রতিরোধ্য করে তুলল।

ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন প্রকাশের প্রথম মাস থেকেই আমি বুঝলাম যে সাংবাদিকতার লক্ষ্য হওয়া উচিত সেবা। সংবাদপত্রের শক্তি ব্যাপক, কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত পানির স্রোত যেমন গ্রামের পর গ্রাম ডুবিয়ে দেয় ও শস্যক্ষেত ধ্বংস করে, তেমনি অনিয়ন্ত্রিত কলমও ধ্বংসের সেবায় মেতে ওঠে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ যদি বাইরে থেকে চাপানো হয় তা নিয়ন্ত্রণহীনতার চেয়েও বিষাক্ত হয়ে পড়ে। নিয়ন্ত্রণ লেখকের ভেতর থেকে চর্চা করলেই কেবল তা উপকারী হতে পারে। এ যুক্তি যদি সঠিক হয়, তালে পৃথিবীর কতটি সংবাদপত্র এ পরীক্ষায় টিকতে পারবে? কিন্তু যেগুলো অপ্রয়োজনীয় সেগুলোকে কে রোধ করবে? আর এর বিচারকই বা কে হবে? ভালো এবং মন্দ যেমন পাশাপাশি চলে, তেমনি প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় সংবাদপত্রও পাশাপাশি চলবে এবং মানুষ এ দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নেবে।

চৌদ্দ
কুলি বস্তি না কি গেটো (বঞ্চিতদের বাসস্থান)?

সমাজের কিছু লোক যারা আমাদেরকে সবচেয়ে বড় সামাজিক সেবা প্রদান করে অথচ আমরা হিন্দুরা যাদেরকে "অস্পৃশ্য" বলে গণ্য করি তাদেরকে আমরা শহর বা গ্রামের বাইরে প্রত্যন্ত এলাকায় নির্বাসিত করি যাকে গুজরাটী ভাষায় "ধেদওয়াদো" বলা হয় এবং এ নামের মধ্যে একটা দুর্গন্ধ আছে। খৃষ্টান ইউরোপেও তেমনি ইহুদীদেরকে এককালে অস্পৃশ্য গণ্য করা হতো এবং তাদের বাসস্থান হিসেবে চিহ্নিত এলাকাকে পূতিগন্ধযুক্ত "গেটো" নামে অভিহিত করা হতো। একইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমরা অস্পৃশ্য জাতিতে পরিণত হয়েছি। এখন দেখার বিষয় এন্ড্রুজ এর ত্যাগ ও শাস্ত্রীর যাদুর কাঠি আমাদের পুনর্বাসনে কতটা সহায়ক হয়।

www.pathagar.com

প্রাচীন ইহুদীরা অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে নিজেদেরকে ঈশ্বরের পছন্দের জাতি মনে করত। এর ফলে তাদের বংশধরেরা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অদ্ভুত, এমন কি অন্যায় শাস্তি ভোগ করেছে। প্রায় একইভাবে হিন্দুরা নিজেদেরকে মনে করেছে আর্য বা সভ্য, এবং তাদেরই একাংশকে মনে করেছে অনার্য বা অস্পৃশ্য। তার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার হিন্দুদের ওপর এক অদ্ভুত প্রতিহিংসা নেমে এসেছে। আর তা কেবল হিন্দুদের ওপর নয়, মুসলমান ও পার্সীদের ওপরেও কারণ তারাও তাদের হিন্দু ভাইদের মতো একই দেশের ও একই বর্ণের।

এতক্ষণে পাঠক নিশ্চয়ই কিছুটা বুঝে থাকবেন আমি এ অধ্যায়ের শিরোনামে "বস্তি" শব্দটি কি অর্থে ব্যবহার করেছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমরা পূতিগন্ধময় "কুলি" খেতাব অর্জন করেছি। ভারতে কুলি শব্দের অর্থ মালবাহক বা ভাড়া করা শ্রমিক, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় তা ঘৃণ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, আমাদের কাছে যা নিচু জাত বা অস্পৃশ্য বোঝায় ওদের ভাষায় কুলি অর্থ তাই এবং কুলিদের বাসস্থানকে বলা হয় "কুলি বস্তি"। জোহান্সবার্গে এ ধরনের একটা কুলি বস্তি ছিল। কিন্তু অন্য স্থানের কুলিবস্তিতে ভারতীয়দের ভূমির মালিকানা ছিল, এখানে তাদেরকে নিরানব্বই বছরের লিজ হিসেবে জমির প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। এ বস্তিতে মানুষ গাদাগাদি করে বাস করত কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও জমির পরিমাণ বাড়ত না। দায়সারাভাবে এ বস্তিতে পায়খানা পরিষ্কার করানো ছাড়া মিউনিসিপ্যালটি আর কোনো স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করত না। রাস্তাঘাট বা আলোর অবস্থা ছিল আরো খারাপ। পৌর কর্তৃপক্ষ যখন বাসিন্দাদের কল্যাণের উদাসীন ছিল তখন তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার দিকে নজর না দেবারই কথা। বস্তিবাসীরা মিউনিসিপ্যালটির পয়ঃ নিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়ম-কানুন জানত না এবং কর্তৃপক্ষের সাহায্য বা তত্ত্বাবধান ছাড়া তা কার্যকর করা সম্ভব ছিল না। যারা সেখানে বাস করতে গিয়েছিল তাদের সবাই যদি রবিনসন ক্রুসো হতো তাহলে কাহিনী অন্য রকম হতো। কিন্তু একাকী একজন রবিনসন ক্রুসোকে নিয়ে কলোনী স্থাপনের কাহিনী আমাদের জানা নেই। সাধারণত মানুষ দেশ ত্যাগ করে বিদেশে যায় সম্পদ ও ব্যবসার সন্ধানে, কিন্তু ভারত থেকে যে বিপুল সংখ্যক লোক দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছিল তারা ছিল অশিক্ষিত হতদরিদ্র কৃষক যাদের জন্য সম্ভব সব রকমের সুরক্ষার প্রয়োজন ছিল। তাদের পরে যে সব ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত লোক গিয়েছিল তারা সংখ্যায় ছিল অতি নগণ্য।

মিউনিসিপ্যালটির ক্ষমার অযোগ্য অবহেলা এবং ভারতীয় অভিবাসীদের অজ্ঞতা মিলে বস্তিটির পরিবেশ সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর করে তুলেছিল। মিউনিসিপ্যালটি বস্তির উন্নয়নের জন্য কিছু করা দূরে থাক, তাদের নিজেদের অবহেলার কারণে সৃষ্ট অস্বাস্থ্যকর অবস্থাকে কুলি বস্তি ধ্বংসের অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করল এবং সে উদ্দেশে স্থানীয় আইন প্রণেতা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিল ভারতীয় অভিবাসীদের উচ্ছেদ করার জন্য। আমি যখন জোহান্সবার্গে বসতি স্থাপন করলাম তখন এই ছিল ভারতীয়দের অবস্থা।

www.pathagar.com

ভারতীয় অভিবাসীদের জমির মালিকানা স্বত্ব থাকায় স্বভাবিকভাবেই তারা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী ছিল। ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছিল। রায়ত যদি মিউনিসিপ্যালটির প্রস্তাব গ্রহণে রাজি না হতো, তাহলে তার ট্রাইবুনালে আপীল করার অধিকার ছিল। ট্রাইবুনালের রায়ে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ যদি মিউনিসিপ্যালটির প্রস্তাবের চেয়ে বেশি হতো সে ক্ষেত্রে মিউনিসিপ্যালটি মূল্য পরিশোধ করত।

অধিকাংশ রায়ত আমাকে উকিল নিযুক্ত করল। এসব কেস থেকে টাকা উপার্জনের কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিল না। সুতরাং আমি তাদেরকে বললাম যে তারা জিতলে ট্রাইবুনাল যে টাকা নির্ধারণ করে দেবে তা নিয়েই আমি সন্তুষ্ট থাকব এবং কেসে হার জিত যাই হোক, প্রতি কেসে আমাকে ১০ পাউন্ড করে দিতে হবে। আমি তাদেরকে এটাও বললাম যে আমি এ টাকার অর্ধেক আলাদা করে রাখব দরিদ্রদের জন্য একটা হাসপাতাল বা ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য। স্বাভাবিকভাবেই তারা এ প্রস্তাবে খুশি হলো।

প্রায় সত্তরটি কেসের মধ্যে একটিতে হার হলো। সুতরাং মামলার ফি হিসেবে পাওয়া টাকা একটা মোটা অংকে দাঁড়াল। কিন্তু ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন নাছোড়বান্দার দাবি নিয়ে হা করে ছিল এবং যতদূর মনে পড়ে, ১৬০০ পাউন্ড গ্রাস করে ফেলল। আমি এ কেসগুলোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলাম। মক্কেলরা আমাকে সর্বক্ষণ ঘিরে রেখেছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল দক্ষিণ ভারত থেকে আগত চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক। তাদের বিশেষ দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের জন্য তারা নিজেদের একটা সমিতি গঠন করেছিল, যা মুক্ত ভারতীয় ও ব্যবসায়ীদের থেকে আলাদা ছিল। তাদের অনেকেই ছিল মুক্ত মনের উদার ব্যক্তি এবং উন্নত চরিত্রবান। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন শ্রীযুক্ত জয়রাম সিং, প্রেসিডেন্ট এবং শ্রীযুক্ত বদরী, যিনি প্রেসিডেন্টের মতোই ভালো মানুষ ছিলেন। তাদের দু'জনের কেউ আজ জীবিত নেই। তারা আমার জন্য অপরিসীম মাত্রায় সহায়ক ছিলেন। শ্রীযুক্ত বদরী আমার অতি ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলেন এবং সত্যাগ্রহে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। এসব বন্ধু ও অন্যান্যদের মাধ্যমে আমি উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে আগত অসংখ্য অভিবাসীদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলাম। আমি শুধুমাত্র উকিলের চেয়ে তাদের ভাই হিসেবে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম এবং তাদের বাহ্যিক ও ব্যক্তিগত দুঃখ-দুর্দশার ভাগীদার হয়েছিলাম।

ভারতীয়রা আমাকে কি নাম দিয়েছিল পাঠকের জন্যে তা কৌতূহলের বিষয় হতে পারে। আব্দুল্লাহ শেঠ আমাকে গান্ধী নামে ডাকতে অস্বীকার করলেন। সৌভাগ্যক্রমে কেউই আমাকে কখনো "সাহেব" গণ্য করে বা ঐ নামে ডেকে অপমান করেনি। আব্দুল্লাহ শেঠ একটা সুন্দর নাম আবিষ্কার করল "ভাই" অর্থাৎ ভ্রাতা। অন্যেরাও তার অনুসরণে আমাকে দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ করার আগে পর্যন্ত "ভাই" সম্বোধন অব্যাহত রাখল। এ নামের মধ্যে একটা মধুর রেশ থাকত যখন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা আমাকে এ নামে ডাকত।

www.pathagar.com

পনের

ব্ল্যাক প্লেগ-১

মিউনিসিপ্যালটি মালিকানা অর্জনের সাথে সাথেই কুলি বস্তি থেকে ভারতীয়দেরকে উচ্ছেদ করল না। তাদেরকে সরিয়ে দেয়ার আগে তাদের জন্য নতুন বাসস্থানের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যেহেতু মিউনিসিপ্যালটি সহজে তা করতে পারছিল না, ভারতীয়দেরকে একই নোংরা বস্তিতে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছিল। অবশ্য পার্থক্য এই ছিল যে তাদের অবস্থা পূর্বের তুলনায় আরো শোচনীয় হলো। ভূমির মালিকানা হারিয়ে তারা মিউনিসিপ্যালটির রায়তে পরিণত হলো। ফলে তাদের চারপাশ সর্ব সময়ের চেয়ে বেশি নোংরা হয়ে উঠল। তারা যখন ভূমির মালিক ছিল আইনের ভয়ে হলেও তাদেরকে কিছুটা পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতে হতো। মিউনিসিপ্যালটির অধীনে তাদের সে ভয় ছিল না। বাসিন্দার সংখ্যা বাড়ল এবং সেই সাথে বাড়ল জঘন্য আবর্জনার স্তূপ আর বিশৃঙ্খলা।

ভারতীয়রা যখন এরকম অবস্থায় অস্থির হয়ে উঠেছিল, তখন হঠাৎ করে ব্ল্যাক প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিল যার অপর নাম নিউমোনিক প্লেগ। এটা বিউবোনিক (গ্রন্থিস্ফীতিযুক্ত দ্রুত সংক্রামক) প্লেগের চেয়েও অধিক ভয়ঙ্কর ও প্রাণঘাতী।

সৌভাগ্যক্রমে কুলি বস্তি থেকে এর উৎপত্তি হয়নি। এর উৎপত্তি হয়েছিল জোহান্সবার্গের নিকটবর্তী একটা সোনার খনি থেকে। এ খনির অধিকাংশ শ্রমিক ছিল নিগ্রো, যাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব ছিল পুরোপুরি তাদের সাদা চামড়ার মনিবদের ওপর। অল্প কিছু ভারতীয়ও খনির কাজে জড়িত ছিল, তাদের মধ্যে ২৩ জনের শরীরে প্লেগ সংক্রমিত হলো এবং এক বিকেলে তারা কুলি বস্তিতে তাদের ঘরে ফিরে এলো প্লেগের প্রবল আক্রমণ নিয়ে। শ্রী মদনজিত তখন ইন্ডিয়ান ওপিনিয়নের পক্ষে প্রচার চালিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি ঐ সময় কুলি বস্তিতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অসাধারণ সাহসী লোক ছিলেন। প্লেগে আক্রান্তদের অবস্থা দেখে তার হৃদয় কেঁদে উঠল এবং তিনি পেন্সিলে লেখা এরকম একটা নোট আমাকে পাঠালেন—"হঠাৎ করে ব্ল্যাক প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে। আপনাকে শিগগীর আসতে হবে এবং দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্যথায় আমাদেরকে ভয়াবহ পরিণতির জন্য তৈরি থাকতে হবে। দয়া করে এক্ষুনি চলে আসুন।"

শ্রী মদনজিত সাহস করে একটি খালি বাড়ির দরজা ভেঙে ফেললেন এবং সব রুগীকে সেখানে রাখলেন। আমি সাইকেল চালিয়ে কুলি বস্তিতে গেলাম এবং কি অবস্থায় পড়ে আমরা খালি বাড়িটার দখল নিয়েছি টাউন ক্লার্ককে পত্র লিখে তা জানালাম।

ডা. উইলিয়াম গডফ্রে তখন জোহান্সবার্গে ডাক্তারী করছিলেন। তিনি খবর পাওয়ার সাথে সাথে উদ্ধার তৎপরতায় ছুটে এলেন এবং রুগীদের জন্য একাই ডাক্তার ও নার্স উভয়ের সেবা দিতে থাকলেন। কিন্তু আমাদের তিনজনের পক্ষে তেইশজন রুগীকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ল।

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতা থেকে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে যদি কারো অন্তর বিশুদ্ধ থাকে তাহলে তা দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সাথে করে লোক লস্কর ও রসদ নিয়ে আসে। ঐ সময়ে আমার অফিসে চারজন ভারতীয় কর্মচারী ছিল—শ্রী কল্যাণদাস, শ্রী মানেকলাল, শ্রী গুণাভাস্ত্রে গুণাভাস্ত্রাই দেশাই ও আরেকজন, যার নাম এখন মনে পড়ছে না। কল্যাণদাসকে তার পিতা আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে কল্যাণদাসের চাইতে বেশি অনুগত ও আনুগত্য প্রদর্শনে ইচ্ছুক ব্যক্তি আমি খুব কমই দেখেছি। সৌভাগ্যবশত সে তখনো অবিবাহিত ছিল এবং আমি তার ওপর দায়িত্ব চাপাতে দ্বিধা করলাম না, সে দায়িত্ব যতই ঝুঁকিপূর্ণ হোক না কেন। মানেকলালকে আমি পেয়েছিলাম জোহান্সবার্গে। যতদূর মনে পড়ে সেও তখন অবিবাহিত ছিল। সুতরাং কেরানী বলুন, সহকর্মী বলুন, আর পুত্রই বলুন আমি তাদের চারজনকেই ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করলাম। কল্যাণদাসের সাথে আলোচনার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। অন্যদেরকেও বলার সাথে সাথে তারা রাজি হয়ে গেল। তাদের সংক্ষিপ্ত ও মধুর জবাব ছিল, "আপনি যেখানে আছেন, আমরাও সেখানে।"

মি. রিচের পরিবার ছিল বড়। তিনি ঝুঁকি নিয়ে কাজে নামতে চাইলেন, কিন্তু আমি বাধা দিলাম। এ ঝুঁকির মধ্যে তাকে ঠেলে দেয়ার সাহস আমার ছিল না। তাই তিনি বিপজ্জনক এলাকার বাইরের কাজ দেখাশুনা করতে থাকলেন।

রাতটা ছিল ভয়ঙ্কর। রাত জেগে প্রার্থনা আর সেবার রাত। অতীতে আমি অনেক রুগীর সেবা করেছি কিন্তু ব্ল্যাক প্লেগে আক্রান্ত রুগীর সেবা কখনো করিনি। ডা. গডফ্রের সাহস সবার মাঝে সংক্রামিত হলো। খুব বেশি নার্সিং এর প্রয়োজন হলো না। আমাদেরকে যা করতে হলো তা হলো সময়মতো ওষুধ খাওয়ানো, তাদের প্রয়োজন পূরণ করা, তাদের শরীর ও বিছানা পরিষ্কার রাখা এবং তাদের মনোবল চাঙ্গা রাখা। যে অক্লান্ত উদ্দীপনা ও অকুতোভয়ে এসব যুবকেরা কাজ করল তাতে আমার আনন্দের সীমা রইল না। ডা. গডফ্রে ও শ্রী মদনজিতের মতো অভিজ্ঞ লোকের সাহসিকতা আন্দাজ করা যায়, কিন্তু ঐ সব অনভিজ্ঞ যুবকদের তেজস্বীতার ব্যাপারে কি বলব!

যতদূর মনে পড়ে, সারারাত জেগে আমরা রুগীদের সেবা করে গেলাম। কিন্তু পুরো ঘটনাটা, এর দুঃখের দিক বাদে, আমাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল এবং আমার কাছে এর ধর্মীয় মূল্য এতো বেশি ছিল যে এটা নিয়ে আমি অন্তত আরো দুটো অধ্যায় লিখব।

ষোল
ব্ল্যাক প্লেগ-২

টাউন ক্লার্ক আমাকে ধন্যবাদ জানাল খালি বাড়িতে রুগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। সে খোলাখুলি স্বীকার করল যে এ ধরনের জরুরি অবস্থা মোকাবেলার কোনো ব্যবস্থা টাউন কাউন্সিলের নেই। তবে এ ব্যাপারে তাদের

www.pathagar.com

সাধ্যমতো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। তাদের দায়িত্ব বোধ জাগ্রত হওয়ার পরে মিউনিসিপ্যালটি ব্যবস্থা গ্রহণে বিলম্ব করল না।

পরদিন তারা একটি খালি গুদামঘর আমার দায়িত্বে অর্পণ করল এবং রুগীদেরকে সেখানে স্থানান্তরের পরামর্শ দিল কিন্তু মিউনিসিপ্যালটি এর আঙিনা পরিষ্কার করল না। বিল্ডিংটা ছিল অগোছালো ও অপরিষ্কার। আমরা নিজেরাই এটা পরিষ্কার করলাম, কয়েকটা বিছানা পাতলাম এবং দানশীল ভারতীয়দের সহায়তায় অন্যান্য জিনিসপত্রের ব্যবস্থা করলাম। এভাবে এটাকে একটা অস্থায়ী হাসপাতাল বানিয়ে ফেললাম। মিউনিসিপ্যালটি একজন নার্স পাঠাল যে ব্রান্ডি ও হাসপাতালের অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে এলো। ডা. গডফ্রে তখনো এটার সার্বিক দায়িত্বে থাকলেন।

নার্সটি দয়ালু মহিলা ছিলেন এবং রুগীদের সেবায় আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু আমরা তাকে রুগীদের স্পর্শ করতে দিতাম না যাতে তিনি নিজে আক্রান্ত না হন।

রুগীদেরকে ঘন ঘন স্বল্প মাত্রায় ব্রান্ডি খাওয়ানোর জন্য আমাদের ওপর নির্দেশ ছিল। নার্সটি প্রতিষেধক হিসেবে আমাদেরকেও ব্রান্ডি খেতে বলেছিল এবং সে নিজেও খাচ্ছিল। কিন্তু আমরা কেউই ব্রাণ্ডি স্পর্শ করলাম না। এর কোনো উপকারিতা আছে বলে আমি বিশ্বাস করতাম না, এমন কি রুগীদের জন্যও। ডা. গডফ্রের অনুমতি নিয়ে ব্রান্ডি না খেতে রাজি আছে এমন তিনজন রুগীকে মাটি-চিকিৎসা দিলাম, অর্থাৎ ভিজা মাটি দিয়ে তাদের মাথা ও বুক ঢেকে দিলাম। এদের দু'জন বেঁচে গেল। অন্য বিশজন গোডাউনে মারা গেল।

ইতিমধ্যে মিউনিসিপ্যালটি অন্যান্য ব্যবস্থা নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। জোহান্সবার্গ থেকে সাত মাইল দূরে একটি সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসা কেন্দ্র ছিল। বেঁচে যাওয়া দু'জনকে ঐ চিকিৎসা কেন্দ্রের নিকটবর্তী তাঁবুতে পাঠানো হলো। নতুন রুগীদেরকেও সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা নেয়া হলো। এভাবে আমাদের দায়িত্ব থেকে আমরা অব্যাহতি পেলাম।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা জানতে পারলাম যে ভদ্রমহিলা নার্সটি প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। কিভাবে দু'জন রুগী বেঁচে গেল আর আমরা নিজেরা অনাক্রান্ত থাকলাম তা বলা সম্ভব নয়, তবে এ অভিজ্ঞতা মাটি-চিকিৎসায় আমার বিশ্বাস বৃদ্ধি করল, সেই সাথে ওষুধ হিসেবে ব্রান্ডির কার্যকারিতার বিষয়ে সন্দেহও বাড়িয়ে দিল। আমি জানি আমার এ বিশ্বাস ও সন্দেহ কোনোটারই দৃঢ় ভিত্তি নেই, তবু আমার যে ধারণা হয়েছে তা এখনো অটুট আছে। আর সে কারণেই এখানে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করলাম।

প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার পর আমি কড়া ভাষায় সংবাদপত্রে একটি লম্বা পত্র লিখলাম। এতে আমি মিউনিসিপ্যালটিকে কুলি বস্তি তাদের নিয়ন্ত্রণে আনার পরে এর প্রতি অবহেলা এবং প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার জন্য দায়ী করলাম। আমার এ পত্রটি মি. হেনরি পোলাকের সাথে আমার বন্ধুত্ব গড়ে দিল এবং

www.pathagar.com

প্রয়াত রেভারেন্ড যোসেফ ডোক এর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতেও সাহায্য করল।

পূর্বের এক অধ্যায়ে আমি উল্লেখ করেছি যে আমি একটা নিরামিষ রেস্টুরেন্টে খাবার খেতাম। এখানে আমি আলবার্ট ওয়েস্ট এর দেখা পেলাম। প্রতিদিন বিকেলে আমরা এ রেস্টুরেন্টে মিলিত হতাম এবং ডিনারের পরে হাঁটতে বের হতাম। মি. ওয়েস্ট একটা ছোট প্রিন্টিং প্রতিষ্ঠানের অংশীদার ছিলেন। প্লেগ ছড়িয়ে পড়া সম্পর্কে সংবাদপত্রে আমার চিঠিটা তিনি পড়েছিলেন এবং আমাকে কয়েকদিন রেস্টুরেন্টে না দেখতে পেয়ে অস্বস্তিতে পড়েছিলেন।

প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার সময় থেকে আমি ও আমার সহকর্মীরা আমাদের খাবারের পরিমাণ কমিয়ে ফেলেছিলাম, কারণ আমি অনেক পূর্ব থেকেই মহামারীর সময়ে নিয়ম করে কম খেতাম। তাই এ দিনগুলোতে আমি রাতের খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম। আর দুপুরের খাবারটাও অন্য অতিথিরা আসার আগেই খেয়ে নিতাম। রেস্টুরেন্টের মালিক আমার খুব পরিচিত ছিল এবং আমি তাকে জানিয়েছিলাম যে আমি প্লেগ রুগীদের সেবায় নিয়োজিত আছি, তাই যতদূর সম্ভব অন্য মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে চাই।

রেস্টুরেন্টে আমাকে এক দু'দিন না দেখে মি. ওয়েস্ট একদিন ভোরবেলায় আমার বাসার দরজায় হাজির হলেন। আমি তখন বাইরে হাটতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। আমি দরজা খুললে মি. ওয়েস্ট বললেন, "আমি আপনাকে রেস্টুরেন্টে কয়েকদিন দেখছি না। আমি ভয় করছিলাম আপনার কিছু হলো কিনা। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম খুব ভোরে আপনার এখানে আসার যাতে আপনাকে বাসায় পাওয়া যায়। ভালো কথা, আমি এখন আপনার অধীন। আমি রুগীদের সেবা করতে প্রস্তুত আছি। আর আপনি তো জানেন, আমার ওপর কেউ নির্ভরশীল নেই।"

আমি তাকে কৃতজ্ঞতা জানালাম এবং এক সেকেন্ডও দেরী না করে বললাম, "আমি আপনাকে নার্স হিসেবে নিতে চাই না। যদি আর কোনো রুগী না আসে তাহলে দু'এক দিনের মধ্যে আমরা ছাড়া পাব। একটা ব্যাপার অবশ্য আছে।"

"হ্যাঁ, বলুন সেটা কি?"

"আপনি কি ডারবানে ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন প্রেসের দায়িত্ব নিতে পারবেন? মি. মদনজিত সম্ভবত এখানে ব্যস্ত থাকবেন এবং ডারবানে অন্য একজনকে দরকার। যদি আপনি যেতে পারেন তাহলে আমি ওখানকার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

"আপনি জানেন, আমার একটা প্রেস আছে। খুব সম্ভব আমি যেতে পারব, তবে আমি কি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আজ সন্ধ্যায় জানাতে পারি? সন্ধ্যায় হাঁটতে হাঁটতে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করতে পারি।"

আমি আনন্দিত হলাম। আমাদের আলোচনা হলো। তিনি যেতে রাজি হলেন। বেতন নির্ধারণ তার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা ছিল না, যেহেতু অর্থোপার্জন তার লক্ষ্য ছিল না। তবুও মাসে ১০ পাউন্ড এবং লাভ হলে তার একটা অংশ তার

www.pathagar.com

বেতন হিসেবে নির্ধারিত হলো। পরদিন বিকেলের মেল ট্রেনেই মি. ওয়েস্ট ডারবানের উদ্দেশে রওনা হলেন। তার বকেয়া পাওনা আদায়ের দায়িত্ব আমাকে দিয়ে গেলেন। সেই দিন থেকে আমি দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তিনি আমার সুখ-দুঃখের অংশীদার ছিলেন।

মি. ওয়েস্ট লাউথ (লিংকনশায়ার) এর এক কৃষক পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি সাধারণ স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন, কিন্তু অভিজ্ঞতার স্কুলে নিজের চেষ্টায় অনেক কিছু শিখেছেন। আমি তাকে সর্বদা দেখেছি একজন খাঁটি, ধীর স্থির, ঈশ্বর ভীরু, দয়ালু ইংরেজ হিসেবে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা তার ও তার পরিবার সম্পর্কে আরো জানতে পারব।

সতের

কুলি বস্তিতে আগুন

যদিও আমি ও আমার সহকর্মীরা রুগীদের দেখাশুনার দায়িত্ব থেকে রেহাই পেলাম, কিন্তু ব্ল্যাক প্লেগ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আরো অনেক কিছু করা বাকী ছিল।

কুলি বস্তির প্রতি মিউনিসিপ্যালটির অবহেলার কথা আমি উল্লেখ করেছি। কিন্তু মিউনিসিপ্যালটি তার সাদা নাগরিকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ছিল অতি সচেতন। তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এ সংস্থা বিপুল অর্থ ব্যয় করেছিল এবং এখন প্লেগ তাড়াতে পানির মতো টাকা ঢালতে লাগল। ভারতীয়দের প্রতি অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আমি মিউনিসিপ্যালটিকে দায়ী করলেও সাদা আদমীদের জন্য এর উৎকণ্ঠার প্রশংসা না করে পারলাম না এবং আমি এর ভালো কাজের চেষ্টায় যথাসাধ্য সাহায্য করলাম। আমার ধারণা যে, যদি আমি সাহায্য করা বন্ধ করি মিউনিসিপ্যালটির জন্য কাজটি আরো কঠিন হবে এবং এ কাজে তারা সশস্ত্র বাহিনীকে তলব করতে দ্বিধা করবে না এবং তাতে অনিষ্টের চূড়ান্ত হবে।

কিন্তু সেসব এড়ানো গেল। মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হলো এবং প্লেগ সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা অনেকটা সহজ করা হলো। মিউনিসিপ্যালটির শর্ত পূরণে আমি ভারতীয়দের ওপর যথাসম্ভব আমার প্রভাব খাটালাম এবং আমার মনে পড়ে না কেউ আমার বিরোধীতা করেছে।

কুলি বস্তিটাকে কড়া পাহারায় রাখা হয়েছিল এবং বিনা অনুমতিতে বের হওয়া বা ভেতরে ঢোকা অসম্ভব ছিল। আমি ও আমার সহকর্মীদের জন্য প্রবেশ করার ও বের হবার অবারিত অনুমতি ছিল। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে পুরো বস্তি খালি করে বস্তির লোকদেরকে জোহান্সবার্গ থেকে তের মাইল দূরে খোলা মাঠে তাবুতে রাখা হবে এবং বস্তিটি আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হবে। তাবুতে বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও রসদ সংগ্রহে কিছুটা সময় অবশ্যই লাগবে এবং এ মধ্যবর্তী সময়ের জন্য পাহারার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল।

www.pathagar.com

মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড আতঙ্ক বিরাজ করছিল কিন্তু আমার সার্বক্ষণিক উপস্থিতি তাদের জন্য ছিল সান্ত্বনা স্বরূপ। দরিদ্র লোকদের অনেকেই তাদের সামান্য সঞ্চয় মাটির নিচে পুতে রেখেছিল। এগুলো মাটি খুঁড়ে বের করা হলো। তাদের কোনো ব্যাংক ছিল না, ব্যাংক সম্পর্কে তারা জানতও না। আমি তাদের ব্যাংকার হলাম। স্রোতের মতো টাকা আমার অফিসে আসতে থাকল। এ সংকটের মুহূর্তে আমি আমার পরিশ্রমের জন্য কোনো ফি দাবি করতে পারলাম না। কোনোরকমে কাজটা সামাল দিলাম। আমার ব্যাংক ম্যানেজারকে ভালোভাবেই চিনতাম। আমি তাকে বললাম এসব টাকা তার ব্যাংকে জমা রাখতে হবে। ব্যাংকের অবশ্য বিপুল পরিমাণ তাম্র ও রৌপ্যমুদ্রা জমা রাখার ব্যাপারে কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। প্লেগ আক্রান্ত এলাকা থেকে আসা টাকা গ্রহণ করতে ব্যাংকের কেরানীরা অস্বীকৃতি জানাতে পারে এমন আশংকাও ছিল। কিন্তু ম্যানেজার আমার জন্য সব ব্যবস্থা করে দিলেন। ব্যাংকে পাঠানোর আগে সব টাকা জীবাণুমুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। আমার যতদূর মনে পড়ে প্রায় ৬০ হাজার পাউন্ড এভাবে জমা দেয়া হয়েছিল। যাদের বড় অংকের টাকা ছিল তাদেরকে আমি স্থায়ী আমানত (ফিক্সড ডিপোজিট) করার পরামর্শ দিলাম এবং তারা মেনে নিল। এর ফলে তাদের অনেকের ব্যাংকে টাকা বিনিয়োগের অভ্যাস গড়ে উঠল।

কুলি বস্তির বাসিন্দাদেরকে বিশেষ ট্রেনে করে জোহান্সবার্গের অদূরে ক্লিপস্প্রুট ফার্মে সরিয়ে নেয়া হলো। সেখানে তাদেরকে মিউনিসিপ্যালটি কর্তৃক সরকারী ব্যয়ে খাবার দেয়া হলো। এই তাবু শহরটি মিলিটারী ক্যাম্পের মতো মনে হলো। যারা এরূপ তাবুতে বসবাসে অভ্যস্ত নয় তারা কষ্ট পেল এবং এ ব্যবস্থা দেখে অবাক হলো, কিন্তু তাদেরকে বিশেষ কোনো অসুবিধা ভোগ করতে হলো না। আমি সাইকেলে চড়ে প্রতিদিন তাদেরকে দেখতে যেতাম। ২৮ ঘন্টার মধ্যে তারা তাদের দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে আনন্দে বাস করতে লাগল। আমি যখনই তাদেরকে দেখতে গিয়েছি তাদেরকে গান-বাজনা ও হাসি-তামাশায় মশগুল দেখেছি। খোলামেলা পরিবেশে তিন সপ্তাহ থাকার ফলে স্পষ্টতই তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছিল।

যতদূর মনে পড়ে, খালি করার পরদিনই কুলি বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল। মিউনিসিপ্যালটি আগুন থেকে কোনো কিছু বাঁচানোর বিন্দুমাত্রও আগ্রহ দেখায়নি। ঠিক একই সময়ে এবং একই কারণে মিউনিসিপ্যালটি বাজারের সমস্ত কাঠ আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং এতে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১০ হাজার পাউন্ড। এই কঠোর পদক্ষেপের কারণ হলো বাজারে কিছু মরা ইঁদুর পাওয়া গিয়েছিল।

মিউনিসিপ্যালটি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল কিন্তু প্লেগের বিস্তার রোধ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং নগরবাসীরা আবার মুক্তভাবে শ্বাস নিতে পেরেছিল।

www.pathagar.com

আঠার

একটা বই এর যাদুমন্ত্র

ব্ল্যাক প্লেগ দরিদ্র ভারতীয়দের ওপর আমার প্রভাব বাড়িয়ে দিল এবং আমার ব্যবসা ও দায়িত্বও বৃদ্ধি করল। কিছু নতুন ইউরোপীয়ানের সাথে পরিচয় এমন ঘনিষ্ঠ হলো যে তা আমার নৈতিক ঋণের বোঝা আরো ভারী করল। মি. ওয়েস্ট এর মতো মি. পোলাক এর সাথেও আমি নিরামিষ রেস্টুরেন্টে পরিচিত হয়েছিলাম। এক সন্ধ্যায় কিছুটা দূরের টেবিলে এক যুবক বসে খাচ্ছিল। সে আমাকে তার কার্ড পাঠাল আমার সাথে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করে। আমি তাকে আমার টেবিলে আসার আমন্ত্রণ জানালাম এবং সে এলো।

সে বলল, "আমি দি ক্রিটিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। আমি যখন প্লেগ সম্পর্কে আপনার পত্রটা পড়ি তখন আপনাকে দেখার প্রবল ইচ্ছে জেগেছিল। সে সুযোগ পাওয়াতে আমি আনন্দিত।"

মি. পোলাকের স্পষ্টবাদীতা আমাকে আকৃষ্ট করল। সে সন্ধ্যাতেই আমরা একে অপরের সম্পর্কে জানলাম। মনে হলো জীবনের অনেক অপরিহার্য বিষয়েই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় অভিন্ন। সে সরল জীবন যাপন পছন্দ করত। নিজের বিবেচনায় যা কিছু ভালো মনে হতো তা কার্যে পরিণত করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তার। সে তার জীবনে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছে, তা যেমন দ্রুত তেমনি মৌলিক।

ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন চালু রাখার ব্যয় দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছিল। মি. ওয়েস্ট এর কাছ থেকে প্রথম রিপোর্টটাই আশংকাজনক ছিল। তিনি লিখেছিলেন, "আপনি যে সম্ভাব্য লাভের চিন্তা করছিলেন আমি এ প্রতিষ্ঠান থেকে তা আশা করতে পারছি না। আমার আশংকা হচ্ছে যে এতে লোকসানও হতে পারে। পত্রিকার চাহিদা নেই। প্রচুর বাকী পড়ে আছে যার মাথামুণ্ডু সুরাহা করা যাচ্ছে না। যন্ত্রপাতির উল্লেখযোগ্য মেরামত প্রয়োজন। কিন্তু এসব নিয়ে আপনার দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সবকিছু ঠিকঠাক করতে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব। লাভ হোক বা না হোক, আমি আছি এবং থাকব।"

মি. ওয়েস্ট যখন দেখলেন যে পত্রিকাটিতে লাভের আশা নেই তখন তিনি চলে যেতে পারতেন এবং সে ক্ষেত্রে আমি তার দোষ দিতে পারতাম না। প্রকৃতপক্ষে সঠিক প্রমাণ ব্যতীত পত্রিকাটিকে লাভজনক বলার জন্য আদালতে আমার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ করার অধিকার ছিল। কিন্তু অভিযোগের সুরে তিনি একটি শব্দও কখনো উচ্চারণ করেননি। তবে আমার ধারণা প্রকৃত অবস্থা জানার পরে মি. ওয়েস্ট আমাকে একজন বিশ্বাসপ্রবণ ব্যক্তি বলে ধরে নিয়েছেন। আমি শ্রী মদনজিতের দেয়া হিসাব পরীক্ষা না করেই সরল বিশ্বাসে তা মেনে নিয়েছিলাম এবং মি. ওয়েস্টকে সম্ভাব্য লাভের কথা বলেছিলাম।

এখন আমি বুঝতে পারি যে গণকাজে জড়িত ব্যক্তিদের নিশ্চিত না হয়ে কোনো বিষয়ে বক্তব্য দেয়া উচিত নয়। সর্বোপরি সত্যের পূজারীকে সর্বোচ্চ

www.pathagar.com

সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পূর্ণ পরীক্ষা ছাড়া কাউকে কোনো কিছু বিশ্বাস করতে দেয়ার অর্থ হলো সত্যের সাথে সমঝোতা করা। আমি দুঃখের সাথে স্বীকার করছি যে এটা জানা সত্ত্বেও আমার বিশ্বাসপ্রবণতাকে পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। সাধ্যের বাইরে কাজ করার লক্ষ্যে আমার উচ্চাশা এর জন্য দায়ী। এ উচ্চাশা আমার চেয়ে আমার সহকর্মীদের জন্য প্রায়ই দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে।

মি. ওয়েস্টের পত্র পাওয়ার পর আমি নাটালের পথে রওনা হলাম। আমি মি. পোলাকের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখলাম। আমাকে বিদায় জানাতে সে স্টেশনে এলো এবং ভ্রমণকালে পড়ার জন্য একটা বই দিয়ে গেল এবং বলল যে বইটি আমার অবশ্যই ভালো লাগবে। বইটি ছিল রাশকিনের "শেষ পর্যন্ত" (Unto This Last)।

বইটি পড়া শুরু করার পরে শেষ না করে রেখে দেয়া সম্ভব ছিল না। এটা আমাকে গ্রাস করে ফেলল। জোহান্সবার্গ থেকে ডারবান ২৪ ঘন্টার ভ্রমণপথ। ট্রেনটি সেখানে পৌঁছল বিকেলে। সে রাতে আমি ঘুমাতে পারলাম না। এ বইয়ের আদর্শে আমার জীবন যাত্রায় পরিবর্তন সাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম।

রাশকিনের বই পড়া এটাই আমার প্রথম। আমার ছাত্রজীবনে প্রকৃতপক্ষে পাঠ্য বইয়ের বাইরে তেমন কিছুই পড়িনি এবং কর্মজীবনে প্রবেশ করে বই পড়ার সময়ই করতে পারিনি। সুতরাং আমার বই পড়ার জ্ঞান আছে এমন দাবি করতে পারি না। তবে আমার বিশ্বাস এই চাপানো নিয়ন্ত্রণের ফলে আমি খুব বেশি কিছু হারাইনি। অপরদিকে অল্প পড়ার ফলে যতটুকু পড়েছি তা পুরোপুরি হজম করতে সমর্থ হয়েছি। এসব বইয়ের মধ্যে যেটি আমার জীবনে তাৎক্ষণিক ও বাস্তব পরিবর্তন এনেছে তা হলো "শেষ পর্যন্ত" (Unto This Last)। পরে আমি এটা গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করেছি, যার নাম দিয়েছি "সর্বোদয়া" (সকলের প্রতি দয়া)।

আমার বিশ্বাস যে রাশকিনের এ মহৎ পুস্তকে আমার অন্তরের গভীর বিশ্বাসের প্রতিফলন আবিষ্কার করেছি এবং সে কারণেই এটা আমাকে এভাবে মুগ্ধ করেছে এবং আমার জীবনযাত্রা পরিবর্তনে বাধ্য করেছে। তিনিই কবি যিনি মানব মনের সুপ্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করতে পারেন। কবির প্রভাব সবার ওপর সমান হয় না কারণ প্রত্যেকের মননশীলতা সমভাবে বিকশিত হয় না।

আমি যতটা বুঝেছি তাতে "শেষ পর্যন্ত" (Unto This Last) বইটির শিক্ষা হলো—

১। সমষ্টির কল্যাণের মধ্যেই ব্যক্তির কল্যাণ নিহিত আছে।

২। উকিলের কাজের মূল্য নাপিতের কাজের সমান, কারণ সকলেরই কাজ করে জীবিকা অর্জনের সমান অধিকার আছে।

৩। শ্রমজীবীর জীবন অর্থাৎ কৃষক ও হস্তশিল্পীর জীবনই উৎকৃষ্ট জীবন।

এগুলোর প্রথমটি আমি জানতাম। দ্বিতীয়টি আমি অস্পষ্টভাবে বুঝেছি। তৃতীয়টি আমার জীবনে কখনো ঘটেনি। "Unto This Last" বইটি আমার কাছে

www.pathagar.com

দিবালোকের মতো স্পষ্ট করে দিল যে প্রথমটির মধ্যেই দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি লুকিয়ে আছে।

আমি যেন প্রভাতে জেগে উঠলাম এসব নীতি কার্যে পরিণত করার প্রস্তুতি নিয়ে।

উনিশ
ফিনিক্সের বসতি

আমি পুরো ব্যাপারটি নিয়ে মি. ওয়েস্ট এর সাথে কথা বললাম, আমার মনের ওপর "Unto This Last" বইটি যে প্রভাব ফেলেছে তার বর্ণনা দিলাম এবং প্রস্তাব করলাম যে ইন্ডিয়ান ওপিনিয়নকে একটা খামারে স্থানান্তর করা হোক যেখানে প্রত্যেকে শ্রম দেবে, ভরণ পোষণের জন্য একই বেতন নেবে এবং অবসর সময়ে প্রেসের কাজ করবে। মি. ওয়েস্ট প্রস্তাবটা সমর্থন করলেন এবং জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে মাথাপিছু ৩ পাউন্ড করে ভাতা নির্ধারিত হলো।

কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল দশ বা ততোধিক কর্মচারীর প্রত্যেকেই প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটা খামারে বসতি স্থাপনে রাজি হবে কিনা এবং ন্যূনতম খোরপোষ ভাতায় সন্তুষ্ট হবে কিনা। সুতরাং আমরা প্রস্তাব করলাম যে যারা এ পরিকল্পনা মেনে নিতে পারবেনা তারা তাদের বেতন পেতে থাকবে এবং চেষ্টা করবে ক্রমান্বয়ে ফার্মের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে।

এ প্রস্তাবের শর্তাদি নিয়ে আমি কর্মচারীদের সাথে কথা বললাম। শ্রী মদনজিতের এটা পছন্দ হলো না। সে আমার প্রস্তাবকে একটা বোকামী আখ্যায়িত করে বলল, যে প্রতিষ্ঠানের জন্য সে তার জীবনের সর্বস্ব বাজী রেখেছে এ প্রস্তাব প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংস করে ফেলবে, কর্মচারীরা পালিয়ে যাবে, ইন্ডিয়ান ওপিনিয়নের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাবে এবং প্রেসটাও বন্ধ করে দিতে হবে।

যারা প্রেসে কাজ করছিল তাদের একজন ছিল আমার জ্ঞাতিভাই ছগনলাল গান্ধী। আমি মি. ওয়েস্ট এর নিকট প্রস্তাব করার সময় তার কাছেও প্রস্তাব করেছিলাম। তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে ছিল। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই সে আমার কাছে শিক্ষা গ্রহণ এবং আমার অধীনে কাজ করার ব্রত গ্রহণ করেছিল। আমার ওপর তার পূর্ণ আস্থা ছিল। সুতরাং কোনো রকম যুক্তি তর্ক না করে সে সম্মত হলো এবং সেই থেকে সে আমার সাথেই আছে। মেশিন চালক গোবিন্দস্বামীও প্রস্তাব মেনে নিল। অন্যরা এ প্রকল্পে যোগ দিল না তবে প্রেস যেখানেই স্থানান্তর করা হোক তারা সেখানে যেতে রাজি হলো।

আমার মনে হয় না কর্মচারীদের সাথে বিষয়টি নিয়ে বোঝাপড়া করতে দু'দিনের বেশি সময় লেগেছিল। তারপর দেরি না করে ডারবানের আশেপাশে রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী স্থানে এক খণ্ড জমি কেনার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিলাম। ফিনিক্স এলাকা থেকে একটা প্রস্তাব এলো। মি. ওয়েস্ট এবং আমি এস্টেটটি পরিদর্শনে গেলাম। এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা ২০ একর জমি কিনে

www.pathagar.com

ফেললাম। এতে একটি সুন্দর ঝর্ণা ছিল এবং কয়েকটি কমলা ও আম গাছ ছিল। এটার সাথে লাগোয়া ছিল ৮০ একরের আরেকটি প্লট যেখানে অনেক বেশি ফলের গাছ ও একটি জরাজীর্ণ বাড়ি ছিল। আমরা সেটাও কিনে নিলাম। সব মিলিয়ে দাম পড়ল ১০০০ পাউন্ড।

প্রয়াত মি. রুস্তমজী এ ধরনের উদ্যোগে আমাকে সর্বদা সমর্থন দিতেন। তিনি প্রকল্পটি পছন্দ করেছিলেন। তিনি আমাকে একটি বড় গুদামের ঢেউটিন ও অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী দিয়েছিলেন যা দিয়ে আমরা কাজ শুরু করলাম। কয়েকজন ইন্ডিয়ান কাঠমিস্ত্রী ও রাজমিস্ত্রী যারা বোয়ার যুদ্ধে আমার সাথে কাজ করেছিল প্রেসের জন্য একটা ঘর তুলতে তারা আমাকে সাহায্য করল। এ ঘরটি দৈর্ঘ্যে ৭৫ ফিট ও প্রস্থে ৫০ ফিট এবং তা এক মাসের কম সময়ে সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেল। মি. ওয়েস্ট ও অন্য কয়েকজন বিরাট ঝুঁকি নিয়ে কাঠমিস্ত্রী ও রাজমিস্ত্রীদের সাথে থাকল। স্থানটিতে মনুষ্য বসতি না থাকায় তা ঘাসে ভরে গিয়েছিল সেখানে সাপের উৎপাত ছিল এবং স্পষ্টতই বসবাসের জন্য তা বিপজ্জনক ছিল। প্রথমে সবাই তাবুতে বাস করছিল। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে আমরা গাড়িতে করে আমাদের মালামাল ফিনিক্সে নিয়ে এলাম। এটা ছিল ডারবান থেকে ১৪ মাইল দূরে এবং ফিনিক্স স্টেশন থেকে আড়াই মাইল দূরে।

প্রেস স্থানান্তরের কারণে ইন্ডিয়ান ওপিনিয়নের একটিমাত্র সংখ্যা বাইরের মার্কারী প্রেস থেকে ছাপাতে হয়েছিল।

আমি তখন চেষ্টা করতে থাকলাম সেইসব আত্মীয় ও বন্ধুদেরকে ফিনিক্সে নিয়ে আসতে যারা ভারত থেকে ভাগ্যান্বেষণে আমার সাথে এসেছিল এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল। তারা এসেছিল সম্পদের সন্ধানে, তাই তাদেরকে রাজি করানোটা কঠিন ছিল। তবে কিছু লোক রাজি হলো। এদের মধ্যে আমার কেবল মগনলাল গান্ধীর নাম মনে পড়ছে। অন্যরা ব্যবসায়ে ফিরে গেল। মগনলাল গান্ধী তার ব্যবসা চিরতরে ছেড়ে দিয়ে আমার সাথে তার ভাগ্যকে জড়িয়ে নিল এবং নিজের যোগ্যতা, ত্যাগ ও একাগ্রতাবলে নৈতিকতার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আমার মূল সহকর্মীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলো। একজন স্বশিক্ষিত হস্তশিল্পী হিসেবে সে ছিল অনন্য।

এভাবে ফিনিক্স বসতি স্থাপিত হলো ১৯০৪ সালে এবং সেখানে অগণিত সমস্যা সত্ত্বেও ইন্ডিয়ান ওপিনিয়নের প্রকাশ অব্যাহত আছে।

কিন্তু প্রাথমিক সমস্যা, সাধিত পরিবর্তন, আশা-নিরাশা ইত্যাদির বর্ণনা দিতে আলাদা একটি অধ্যায়ের প্রয়োজন।

বিশ
প্রথম রাত

ফিনিক্স থেকে ইন্ডিয়ান ওপিনিয়নের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করা সহজসাধ্য ছিল না। আমি যদি দুটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না নিতাম তাহলে প্রথম সংখ্যার প্রকাশনা বাদ দিতে হতো অথবা বিলম্বিত হতো। প্রেস চালানোর জন্য একটা ইঞ্জিন কেনার

www.pathagar.com

আইডিয়া আমার পছন্দ হলো না। চিন্তা করলাম সকল কৃষিকাজ যেখানে হাতে করা হচ্ছে সে পরিবেশে হস্তশক্তিতে প্রেস চালানোটাই মানানসই হবে। কিন্তু আইডিয়াটা যেহেতু বাস্তব সম্মত বলে প্রতীয়মান হলোনা তখন আমরা একটা তেল চালিত ইঞ্জিন বসালাম। তবে আমি ওয়েস্টকে পরামর্শ দিলাম যদি ইঞ্জিন বিকল হয় সেক্ষেত্রে হাতে চালানোর ব্যবস্থা রাখতে। সুতরাং সে একটি চাকার ব্যবস্থা রাখল যা হাতে ঘুরিয়ে প্রেস চালানো যায়। ফিনিক্সের মতো প্রত্যন্ত এলাকায় কাগজের আকার দৈনিক সংবাদপত্রের মতো বড় রাখা বাস্তব সম্মত মনে হলো না। একে ছোট করে ফুলস্ক্যাপ আকারে নিয়ে আসা হলো যাতে জরুরি অবস্থায় পায়ে চালিত ট্রেডল দিয়েও ছাপার কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়।

· প্রথম পর্যায়ে পত্রিকা বের হওয়ার আগের রাতে আমাদের সবাইকে জাগতে হতো। ছোট-বড়, যুবক-বৃদ্ধ সবাই মিলে ছাপানো পাতা ভাঁজ করতে হতো। আমরা সাধারণত রাত ১০টা হতে মাঝরাতের মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলতাম। কিন্তু প্রথম রাতটার কথা ভুলবার নয়। মেশিনে কাগজ দেয়া হলো কিন্তু ইঞ্জিন চলল না। আমরা ডারবান থেকে ইঞ্জিনটা স্থাপন এবং চালু করার জন্য একজন ইঞ্জিনিয়ার এনছিলাম। সে এবং ওয়েস্ট মিলে সাধ্যমতো চেষ্টা করল, কিন্তু কাজ হলো না। সবাই উদ্বিগ্ন হলো। ওয়েস্ট হতাশ হয়ে আমার কাছে এলো, তার চোখে তখন পানি। বলল, "ইঞ্জিনটা চলবে না, আমার আশংকা হচ্ছে সময়মতো আমরা পত্রিকা বের করতে পারব না।"

"যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। চোখের পানি ফেলে লাভ নেই। মানবিক শক্তিতে কতটা করা সম্ভব সেই চেষ্টা করে দেখতে হবে। হস্তচালিত চাকাটার কি অবস্থা?"– আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম।

"ওটা চালাবার মতো লোক আমাদের কোথায়?" সে জবাব দিল। "আমাদের যে লোক আছে তাতে কুলিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। এতে এক এক দলে চারজন করে লোক লাগবে। আর আমাদের লোকেরা সবাই এখন ক্লান্ত।"

নির্মাণ কাজ তখনো শেষ হয়নি। তাই কাঠ মিস্ত্রীরা তখনো সেখানে ছিল। প্রেসের মেঝেতে তারা ঘুমাচ্ছিল। তাদের দেখিয়ে আমি বললাম, "আমরা কি এ কাঠমিস্ত্রীদেরকে ব্যবহার করতে পারি না? আর আমাদের সামনে সারাটা রাত কাজ করার সময় আছে। আমার মনে হয় এ ব্যবস্থাই আমাদের নিতে হবে।"

ওয়েস্ট বলল, "আমি কাঠমিস্ত্রীদের জাগাতে সাহস পাচ্ছি না। আর আমাদের লোকেরা আসলেই খুব ক্লান্ত।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে, তাদেরকে বোঝানোর ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।"

ওয়েস্ট জবাব দিল, "তাহলে কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতে পারে।"

আমি কাঠ মিস্ত্রীদেরকে ডেকে তুললাম এবং তাদের সহযোগিতা চাইলাম। তাদের ওপর কোনো চাপ দিতে হলো না। তারা বললে, "জরুরি প্রয়োজনে যদি

www.pathagar.com

আমাদেরকে কাজে না লাগান, তাহলে আমরা আছি কি করতে? আপনি আরাম করুন গিয়ে, আমরা চাকা ঘুরাব। আমাদের জন্য এটা অতি সহজ কাজ।" আমাদের নিজেদের লোকও তৈরি ছিল।

ওয়েস্ট খুব আনন্দিত হলো এবং আমরা কাজ শুরু করলে সে একটা ভক্তিগীত গাইতে লাগল। আমি কাঠ মিস্ত্রীদের সাথে হাত লাগালাম, অন্যেরা পালাক্রমে এতে যোগ দিল। এভাবে সকাল ৭টা পর্যন্ত চলল। তখনো অনেক কাজ বাকী। তাই আমি ওয়েস্টকে বললাম, এখন ইঞ্জিনিয়ারকে জাগানো যেতে পারে। সে ইঞ্জিন চালু করতে চেষ্টা করে দেখুক যাতে আমরা সময়মতো কাজ শেষ করতে পারি।

ওয়েস্ট তাকে জাগাল এবং সে সাথে সাথেই ইঞ্জিনরুমে চলে গেল। আর দেখো, কি আনন্দ! সে হাত দেয়ার সাথে সাথেই ইঞ্জিন চালু হয়ে গেল। পুরো প্রেস আনন্দধ্বনিতে কেঁপে উঠল। "এটা কি করে সম্ভব হলো? গতরাতে আমাদের সকলের সব রকম চেষ্টা ব্যর্থ হলো, অথচ সকালে এটা এমনভাবে চালু হয়ে গেল যেন এতে কোনো ত্রুটিই ছিল না!"—আমি প্রশ্ন করলাম।

"তা বলা মুশকিল" ওয়েস্ট নাকি ইঞ্জিনিয়ার বলল তা মনে নেই। "কোনো কোনো সময় আমাদের মতো তাদেরও বিশ্রাম প্রয়োজন।"

আমার মতে ইঞ্জিন বিকলের ঘটনাটা ছিল আমাদের সবার জন্য একটা পরীক্ষা এবং চূড়ান্ত মুহূর্তে এটা চালু হওয়াটা আমাদের সৎ ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফল।

পত্রিকার কপি যথাসময়ে সর্বত্র পাঠানো হলো এবং সবাই খুশি হলো। পত্রিকা চালু রাখার জন্য নাছোড়বান্দার মতো এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা এর নিয়মিত প্রকাশনাকে নিশ্চিত করল এবং ফিনিক্সে একটা আত্ম-নির্ভরতার পরিবেশ তৈরি করল। একটা সময় এলো যখন মাঝে মাঝে আমরা ইচ্ছে করেই ইঞ্জিন ব্যবহার বন্ধ রাখতাম এবং শুধুমাত্র হাতের শক্তিতে কাজ করতাম। আমার মতে ফিনিক্স বসতির জন্য সে দিনগুলো ছিল সর্বোচ্চ নৈতিক উৎকর্ষতার সময়।

একুশ
পোলাকের দায়িত্ব গ্রহণ

আমার একট স্থায়ী দুঃখ এই যে যদিও আমি ফিনিক্সের বস্তি শুরু করেছিলাম কিন্তু আমি নিজে সেখানে খুব অল্প সময় থাকতে পেরেছি। আমার মূল পরিকল্পনা ছিল ক্রমান্বয়ে প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে ফিনিক্স বস্তিতে গিয়ে বাস করা, সেখানে শারীরিক শ্রম দিয়ে জীবিকা উপার্জন করা এবং ফিনিক্সকে পরিপূর্ণরূপে গড়ে তোলার আনন্দের অংশীদার হওয়া। কিন্তু বিধি লিপিতে তা হবার নয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে মানুষ যে পরিকল্পনা করে ঈশ্বর প্রায়ই তা উল্টে দেন। কিন্তু একই সময়ে চূড়ান্ত গন্তব্য যেখানে সত্যের অনুসন্ধান, সেখানে মানুষের

www.pathagar.com

পরিকল্পনা ভেস্তে গেলেও কিছু যায় আসে না, ফলাফল কখনো ক্ষতিকর হয় না, বরং তা প্রত্যাশার চেয়ে উত্তম হয়। ফিনিক্সের ঘটনাবলী যে অপ্রত্যাশিত মোড় নিয়েছিল এবং সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনাগুলো নিশ্চয়ই ক্ষতিকর হয়নি, যদিও তা আমাদের মূল প্রত্যাশার চেয়ে ভালো ছিল কিনা তা বলা কঠিন।

আমাদের প্রত্যেকে যাতে দৈহিক শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন করতে পারি সে লক্ষ্যে প্রেসের চার পাশের জমি প্রতিটি ৩ একরের প্লটে ভাগ করলাম। প্লটগুলোর একটা আমার ভাগে পড়ল। প্রতিটি প্লটে আমাদের একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটি করে ঢেউটিনের ঘর তোলা হলো। আমাদের ইচ্ছা ছিল খড়ের ছাউনিসহ মাটির ঘর অথবা কৃষকদের জন্য মানানসই ছোট ছোট ইটের ঘর তৈরি করার, কিন্তু তা সম্ভব হলো না। ওগুলো করতে গেলে ব্যয় বেশি হতো আর সময়ও বেশি লাগত। প্রত্যেকেই যথাশীঘ্র বসতি স্থাপনের আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

মনসুখলাল নজর তখনো সম্পাদক। সে নতুন প্রকল্পে যোগ দেয়নি এবং ডারবানে ইন্ডিয়ান ওপিনিয়নের শাখা অফিস থেকে পত্রিকা সম্পাদনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। যদিও আমাদের বেতনভুক কম্পোজিটর ছিল, তথাপি আমাদের ইচ্ছা ছিল যে বসতির প্রত্যেক সদস্যকে টাইপ সেটিং শিখতে হবে যা একটি ছাপাখানার কার্যক্রমের মধ্যে সবচেয়ে সহজ কিন্তু সবচেয়ে একঘেঁয়ে কাজ। সুতরাং যারা কাজটা জানত না তারা শিখে নিল। তবে আমি শেষ অবধি অজ্ঞই রয়ে গেলাম। মগনলাল গান্ধী আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেল। যদিও সে আগে কখনো প্রেসে কাজ করেনি কম্পোজিটর হিসেবে সে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠল এবং এ কাজে কেবল দ্রুতগতি অর্জন করল তাই নয়, আমাকে অবাক করে দিয়ে প্রেসের অন্যান্য সকল শাখার কাজেও ওস্তাদ হয়ে উঠল। আমি সর্বদা ভেবেছি যে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সে নিজেই জানত না।

আমরা সবেমাত্র বসতি গড়েছি, বিল্ডিং নির্মাণ তখনো শেষ হয়ে ওঠেনি, সে অবস্থায় আমাকে নবনির্মিত বাসস্থান ত্যাগ করে জোহান্সবার্গ যেতে হলো। সেখানকার কাজ আরো দীর্ঘ সময় ধরে ফেলে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।

জোহান্সবার্গে ফিরে আমি আমার জীবন যাত্রায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত করেছি তা পোলাককে জানালাম। সে যখন জানতে পারল তার ধার দেওয়া বই এতটা ফলপ্রসূ হয়েছে তখন তার আনন্দের সীমা রইল না। সে জিজ্ঞেস করল, "নতুন প্রকল্পে আমার যোগদান করা কি সম্ভব?" আমি বললাম, "নিশ্চয়ই। ইচ্ছে করলেই তুমি বসতিতে যোগদান করতে পার।" সে জবাব দিল, "আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত, যদি আপনি অনুমতি দেন।"

তার দৃঢ় প্রত্যয় আমাকে মুগ্ধ করল। দি ক্রিটিক পত্রিকা থেকে অব্যাহতি চেয়ে সে তার মনিবকে এক মাসের নোটিশ দিল এবং যথাসময়ে ফিনিক্সে পৌঁছাল। সে তার মিশুক স্বভাবের দ্বারা সকলের হৃদয় জয় করে নিল

www.pathagar.com

এবং শিগগীরই সে সেখানকার পরিবারের সদস্য হয়ে গেল। তার স্বভাবে সরলতা এত বেশি ছিল যে ফিনিক্সের জীবনযাত্রা তার কাছে অস্বাভাবিক বা কঠিন মনে হওয়া তো দূরের কথা, হাস যেমন জলে বিচরণে অভ্যস্ত, সেও এখানকার জীবন যাত্রায় তেমনি অভ্যস্ত হয়ে গেল। কিন্তু আমি তাকে সেখানে দীর্ঘদিন রাখতে পারলাম না। মি. রিচ সিদ্ধান্ত নিলেন ইংল্যান্ডে গিয়ে তার আইন পড়া শেষ করবেন। আমার জন্য একা অফিসের কাজের চাপ কুলিয়ে ওঠা সম্ভব হলো না। তাই আমি পোলাককে আমার অফিসে যোগদানের পরামর্শ দিলাম এবং এটর্নি হিসেবে প্রশিক্ষণ নিতে বললাম।

আমি ভেবেছিলাম শেষ পর্যন্ত আমরা দু'জনেই অবসরে গিয়ে ফিনিক্সে বসতি স্থাপন করব, কিন্তু তা কখনো হয়ে ওঠেনি। পোলাকের স্বভাব এমন বিশ্বাসপ্রবণ ছিল যে একবার কোনো বন্ধুর ওপর আস্থা স্থাপন করলে সে তার সাথে যুক্তি-তর্কে না গিয়ে একমত হতে চেষ্টা করত। সে ফিনিক্স থেকে আমাকে লিখেছিল যে সেখানকার জীবন সে ভালোবেসে ফেলেছে এবং সে সম্পূর্ণ আনন্দে আছে এবং বসতির উন্নয়নে অবদান রাখার আশা রাখে। এতদসত্ত্বেও সে অফিসে যোগদান করতে এবং এটর্নি হিসেবে প্রশিক্ষণ নিতে প্রস্তুত আছে, যদি আমি মনে করি যে এর মাধ্যমে আমরা আরো দ্রুত আদর্শ বাস্তবায়নে সক্ষম হব। আমি পত্রটাকে স্বাগত জানালাম। পোলাক ফিনিক্স ত্যাগ করল, জোহান্সবার্গে এলো এবং আমার অধীনে কাজ করতে চুক্তিবদ্ধ হলো।

প্রায় এ সময়ে একজন স্কট থিওসফিষ্ট, যাকে আমি আইন পরীক্ষার জন্য পড়াচ্ছিলাম, পোলাকের অনুসরণে আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমার অফিসে চুক্তিবদ্ধ কেরানী হিসেবে যোগদান করল। তার নাম ছিল মি. ম্যাকইনটায়ার।

এভাবে ফিনিক্সে আমার আদর্শ দ্রুত বাস্তবায়নের প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়ে আমার মনে হলো আমি বিপরীতমুখী কর্মস্রোতে গভীর থেকে আরো গভীরে তলিয়ে যাচ্ছি এবং ঈশ্বর যদি অন্য রকম ইচ্ছা না করতেন সরল জীবন যাপনের নামে আমি নিজেকে এই বসতির জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলতাম।

আরো কয়েকটি অধ্যায়ের পর বর্ণনা করব কিভাবে আমি ও আমার আদর্শ এমন এক অপ্রত্যাশিত উপায়ে রক্ষা পেয়েছিল যার কথা কেউ চিন্তা বা আশা করেনি।

বাইশ
ঈশ্বর যাকে রক্ষা করেন

অদূর ভবিষ্যতে ভারতে ফেরার সব আশা ত্যাগ করলাম। আমার স্ত্রীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে এক বছরের মধ্যে ফিরে আসব। এক বছর চলে গেল কিন্তু ফিরে যাবার সম্ভাবনা দেখা গেল না। সুতরাং আমি স্ত্রী ও সন্তানদেরকে চলে আসতে বললাম।

www.pathagar.com

যে জাহাজে চড়ে তারা দক্ষিণ আফ্রিকা আসছিল সে জাহাজের ক্যাপ্টেনের সাথে খেলা করতে গিয়ে আমার তৃতীয় পুত্র রামদাস হাত ভেঙে ফেলল। ক্যাপ্টেন ভালোভাবে তার দেখাশুনা করল এবং জাহাজের ডাক্তারকে দেখাল। রামদাস তার হাত গলায় ঝুলানো অবস্থায় জাহাজ থেকে নামল। ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছিলেন বাড়িতে পৌঁছার সাথে সাথেই একজন প্রশিক্ষিত ডাক্তারকে দিয়ে ক্ষত ড্রেসিং করাতে হবে। কিন্তু এটা ছিল সেই সময় যখন মাটি চিকিৎসার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আমি পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী ছিলাম। এমনকি আমার মক্কেলদের মধ্যে যারা হাতুড়ে চিকিৎসায় বিশ্বাস করত তাদেরকেও জল ও মাটি চিকিৎসা প্রয়োগ করে দেখতে রাজি করিয়েছিলাম।

এ অবস্থায় রামদাসের জন্য আমার কি করা উচিত? সে তখন মাত্র আট বছরের বালক। জিজ্ঞাসা করলাম আমি তার ক্ষত ড্রেসিং করে দিলে তার আপত্তি আছে কিনা। হাসিমুখে সে বলল তার কোনো আপত্তি নেই। অবশ্য ঐ বয়সে তার জন্য কোনটা ভালো সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব ছিল না। কিন্তু হাতুড়ে চিকিৎসা আর সঠিক ডাক্তারী চিকিৎসার মধ্যেকার পার্থক্য সে ভালো করেই জানত। সে আমার পারিবারিক চিকিৎসার অভ্যাসের কথা জানত এবং আমার ওপর তার আস্থা ছিল। মনে ভয় নিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে আমি তার হাতের ব্যান্ডেজ খুলে ফেললাম, ক্ষত ধুয়ে দিলাম, পরিষ্কার মাটির পুলটিশ দিয়ে হাতটা আবার বেঁধে দিলাম। এ ধরনের ড্রেসিং প্রায় একমাস ধরে চলতে থাকল ক্ষতটা সম্পূর্ণ না সারা পর্যন্ত। এতে কোনো অসুবিধা দেখা দেয়নি এবং প্রচলিত চিকিৎসায় যতটা সময় লাগবে বলে জাহাজের ডাক্তার জানিয়েছিল তার চেয়ে বেশি সময়ও লাগেনি।

এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পারিবারিক চিকিৎসায় আমার বিশ্বাস বাড়িয়ে দিল এবং এ চিকিৎসা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমি আরো আত্মবিশ্বাসী হলাম। আমি এগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত করলাম এবং জল চিকিৎসা, মাটি চিকিৎসা ও উপোষ ক্ষত, জ্বর, বদহজম, জন্ডিস ও আন্যান্য রোগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করলাম। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমার যে বিশ্বাস ছিল এখন তা নেই এবং অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় স্পষ্ট ঝুঁকি রয়েছে।

যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলোর কথা এখানে উল্লেখ করলাম সেগুলোর সাফল্য বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আমি পূর্ণ সাফল্য দাবি করি না। এমন কি ডাক্তাররাও তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এরকম সাফল্য দাবি করতে পারেন না। আমার উদ্দেশ্য শুধু এটা দেখানো যে কেউ যদি নতুন কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চায় তাহলে নিজেকে দিয়ে শুরু করতে হয়। এতে সত্যের উদ্ঘাটন ত্বরান্বিত হয় আর সৎ পরীক্ষককে ঈশ্বরও সুরক্ষা দেন।

প্রাকৃতিক চিকিৎসার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মতো ইউরোপীয়ান সাহচর্য অর্জনের পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও গুরুতর ঝুঁকি ছিল। তবে সে ঝুঁকির ধরন ছিল অন্যরকম। কিন্তু ইউরোপীয়ান সাহচর্য অর্জনের ক্ষেত্রে ঝুঁকির বিষয়টি কখনও চিন্তাই করিনি।

www.pathagar.com

আমি পোলাককে চলে আসতে এবং আমার সাথে থাকতে আমন্ত্রণ জানালাম। আমরা রক্তের সম্পর্কের ভাই এর মতো বাস করতে লাগলাম। যে মহিলা শীঘ্রই মিসেস পোলাক হবেন তার সাথে পোলাকের কয়েক বছর হলো বাগদান হয়ে রয়েছে কিন্তু শুভলগ্নের অপেক্ষায় তাদের বিয়েটা বিলম্বিত হচ্ছিল। আমার ধারণা পোলাক বিবাহিত জীবনে থিতু হবার আগে কিছু অর্থ সঞ্চয় করে নিতে চেয়েছিল। রাশকিনের নীতিকথা সে আমার চেয়ে বেশি জানত কিন্তু রাশকিনের শিক্ষা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যে পরিণত করার ক্ষেত্রে তার চারপাশের পশ্চিমা পরিবেশ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আমি তাকে যুক্তি দেখালাম, "যখন দুটি হৃদয়ের মিলন ঘটে, যেমনটা তোমাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আর্থিক বিবেচনায় বিয়ে বিলম্বিত করা ঠিক নয়। দারিদ্র্য যদি বিয়ের অন্তরায় হয় তাহলে দরিদ্র লোকেরা কখনোই বিয়ে করতে পারবে না। আর এখন তুমি আমার সাথে থাকছ। এখানে সাংসারিক খরচের কোনো প্রশ্নই নেই। আমার মতে যত শীঘ্র সম্ভব তোমার বিয়েটা সেরে ফেলা উচিত।" আমি আগের একটা অধ্যায়ে যেমন বলেছি, পোলাককে কখনো একই কথা বারবার বলতে হয় না। সে আমার যুক্তির মর্ম বুঝতে পারল এবং এ বিষয়ে ইংল্যান্ডে অবস্থানরত মিসেস পোলাকের সাথে তৎক্ষণাৎ পত্র যোগাযোগ শুরু করল। বিয়ের প্রস্তাবে সে সানন্দে রাজি হলো এবং কয়েক মাসের মধ্যেই জোহান্সবার্গ পৌঁছল। এ বিয়েতে কোনো খরচের প্রশ্নই ছিল না, এমনকি বিয়ের বিশেষ পোষাক তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথাও চিন্তা করা হলো না। তাদের বিবাহবন্ধন মজবুত করতে কোনো ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতাও পালন করার প্রয়োজন হলো না। মিসেস পোলাক ছিল জন্মসূত্রে খৃষ্টান আর পোলাক ছিল ইহুদী। তাদের উভয়ের সাধারণ ধর্ম ছিল নৈতিকতার ধর্ম।

এ বিয়ের প্রসঙ্গে আমি একটা মজার ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। ট্রান্সভালের ইউরোপীয়ান বিবাহ রেজিস্ট্রার কালো আদমীদের বিয়ে রেজিস্ট্রি করতেন না। এ বিয়েতে আমি ছিলাম বরের সঙ্গী। এ কাজের জন্য কোনো ইউরোপীয়ানকে আমরা খুঁজে পাইনি তা নয়, কিন্তু পোলাক এতে রাজি ছিল না। অতএব আমরা তিন জন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার এর কাছে গেলাম। যে বিয়েতে আমার মতো কালো আদমী বরের সঙ্গী হয়ে এসেছে সে বিয়ের পাত্র-পাত্রী সাদা আদমী হবে তা তিনি কি করে নিশ্চিত হবেন? এ বিষয়ে তদন্ত করে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিয়ে স্থগিত রাখার প্রস্তাব করলেন। পরের দিনটি ছিল রোববার। তার পরের দিন ছিল নববর্ষ এবং সরকারী ছুটির দিন। এ রকম তুচ্ছ অজুহাতে আনুষ্ঠানিক বিয়ের আয়োজন স্থগিত হয়ে যাওয়া কারো পক্ষেই মেনে নেয়া সম্ভব নয়। চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে আমার জানাশোনা ছিল, তিনি রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্টের প্রধান ছিলেন। অতএব আমি নবদম্পতিকে নিয়ে তার সামনে হাজির হলাম। তিনি হাসিতে ফেটে পড়লেন এবং রেজিস্ট্রারকে লেখা একটি নোট আমাকে দিলেন এবং যথারীতি বিয়ে রেজিস্ট্রি হয়ে গেল।

www.pathagar.com

এ যাবৎ যত ইউরোপীয়ান আমাদের সাথে বাস করেছে তাদের সবাই কম বেশি আমার পূর্ব পরিচিত। কিন্তু এখন আমার পরিবারে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ইংরেজ ভদ্রমহিলা প্রবেশ করলেন। নবদম্পতির সাথে কখনো আমার মতবিরোধ হয়েছে বলে মনে পড়ে না। তবে মিসেস পোলাক ও আমার স্ত্রীর মধ্যে কিছু কিছু অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হলেও তা সর্বোত্তম নিয়ন্ত্রিত সমমনা পরিবারের মধ্যে ঘটে যাওয়া অপ্রীতিকর ঘটনার চেয়ে বেশি নয়। আর মনে রাখা প্রয়োজন যে আমার পরিবার ছিল মূলত অসমমনা পরিবার যেখানে সকল প্রকার ও সকল মনোভাবের লোকের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। এ নিয়ে আমরা যখন চিন্তা করি সমমনা ও অসমমনার মধ্যেকার পার্থক্য সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলে মনে হয়। কারণ আমরা সকলেই একই পরিবারভুক্ত।

এ অধ্যায়েই আমি ওয়েস্ট এর বিয়ের ঘটনাও ব্যক্ত করতে চাই। জীবনের এ পর্যায়ে এসে ব্রহ্মচর্য সম্পর্কে আমার ধারণা পরিপক্ব হয়নি। আর তাই আমার সকল অবিবাহিত বন্ধুদের বিয়ে দিতে আমি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। ঐ সময়ে ওয়েস্ট তার পিতামাতাকে দেখার জন্য লাউথে গেল। আমি তাকে পরামর্শ দিলাম সম্ভব হলে বিয়ে করে ফিরতে। ফিনিক্স ছিল সকলেরই বাসস্থান এবং আমরা সবাই সেখানে কৃষক হিসেবে বাস করার কথা। আমাদের মধ্যে বিয়ে এবং এর পরবর্তী ফলাফল সম্পর্কে কোনো ভীতি ছিল না। ওয়েস্ট ফিরে এলো লিস্টারের সুন্দরী যুবতী বধূ মিসেস ওয়েস্টকে সাথে নিয়ে। সে ছিল জুতা প্রস্তুতকারক পরিবারের সদস্য যারা লিস্টারের একটা ফ্যাক্টরীতে কাজ করত। মিসেস ওয়েস্ট এর নিজেরও এ ফ্যাক্টরীতে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল। আমি তাকে সুন্দরী বলেছি, কারণ তার নৈতিক সৌন্দর্য আমাকে তৎক্ষণাৎ মুগ্ধ করেছিল, আসলে সত্যিকার সৌন্দর্য অন্তরের বিশুদ্ধতার মধ্যে নিহিত থাকে। মি. ওয়েস্ট এর সাথে তার শাশুড়ীও এসেছিলেন। বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা এখনো জীবিত। তিনি তার পরিশ্রমী, প্রাণবন্ত ও উৎফুল্ল স্বভাবদ্বারা আমাদের সকলকে লজ্জা দিলেন।

যেভাবে আমি ইউরোপীয়ান বন্ধুদেরকে বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলাম, অনুরূপভাবে ভারতীয় বন্ধুদেরকেও দেশ থেকে তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে আসতে উৎসাহিত করছিলাম। এভাবে ফিনিক্স একটি ছোট গ্রাম হিসেবে গড়ে উঠল, আধাডজন পরিবার সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকল।

তেইশ
গৃহস্থালীতে উঁকিঝুঁকি

ইতিমধ্যেই দেখা গেছে যে, ডারবানে থাকতেই সাংসারিক ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও সরল জীবন যাত্রার শুরুও হয়েছিল সেখান থেকে। কিন্তু জোহান্সবার্গের বাসায় রাশকিনের শিক্ষার আলোকে কঠোর কৃচ্ছতা পালন শুরু হলো।

www.pathagar.com

একজন ব্যারিস্টারের বাসায় যতটা সরল জীবন যাপন সম্ভব আমি তার প্রচলন করলাম। কিছু পরিমাণ আসবাবপত্র ছাড়া চলা সম্ভব ছিল না। বাহ্যিক পরিবর্তনের চেয়ে অন্তরের পরিবর্তন ছিল বেশি। শারীরিক পরিশ্রমে নিজের সকল কাজ করে নেয়ার প্রতি সবার আগ্রহ বৃদ্ধি পেল। আমি আমার সন্তানদেরকেও একই শৃংখলায় অন্তর্ভুক্ত করতে লাগলাম।

বেকারী থেকে তৈরি রুটি কেনার পরিবর্তে কুনের রেসিপি মোতাবেক ঈস্ট ছাড়া রুটি ঘরেই তৈরি করতে শুরু করলাম। কলের তৈরি ময়দা এর জন্য উপযুক্ত ছিল না। হাতে ভাঙানো গমের আটা ব্যবহার আরো বেশি সহজ, স্বাস্থ্যসম্মত ও সাশ্রয়ী হবে বলে ধারণা করা হলো। সুতরাং আমি ৭ পাউন্ড দিয়ে একটা হস্তচালিত যাঁতাকল কিনলাম। এটা লোহার তৈরি ভারী একটা চাকা যা একজনের জন্য ঘোরানো কষ্টকর, তবে দু'জনের জন্য সহজ ছিল। আমি, পোলাক ও ছেলেরা মিলে সাধারণত এটা চালাতাম। আমার স্ত্রীও মাঝে মাঝে হাত লাগাতেন, যদিও গম পেষার সময়টা ছিল তার রান্নাঘরের কাজের সময়। মিসেস পোলাক আসার পরে তিনিও আমদের সাথে যোগ দিলেন। ছেলেদের জন্য যাঁতাকল ঘোরানো খুব উপকারী একটা ব্যায়াম বলে প্রমাণিত হলো। এ কাজ বা অন্য কোনো কাজ তাদের উপর কখনও চাপিয়ে দেয়া হয়নি। কিন্তু এ কাজে সহায়তা করা তাদের জন্য ছিল খেলা স্বরূপ এবং যখনই ক্লান্ত বোধ করত তখনই তারা ক্ষান্ত হয়ে চলে যেতে পারত। কিন্তু ছেলেরা এবং অন্যরাও, যাদের কথা আমি পরে বর্ণনা করব, কখনও আমার কাজে ব্যর্থ হয়নি। আমার দলে কোনো দুর্বল লোক ছিল না তা নয়, তবে অধিকাংশই আনন্দের সাথে তাদের কাজ করত। কয়েকজন তরুণের কথা আমার মনে পড়ে যারা কাজ দেখে ভয়ে দূরে থাকত অথবা ক্লান্ত হওয়ার অজুহাত দেখাত।

ঘরের কাজ করার জন্য আমরা একজন চাকর রেখেছিলাম। সে আমার সাথে পরিবারের সদস্য হিসেবে বাস করত এবং ছেলেরা তার কাজে সাহায্য করত। পৌরসভার মেথর মলমূত্র পরিষ্কার করত, কিন্তু আমাদের কক্ষগুলো চাকরকে না বলে বা চাকর পরিষ্কার করবে সে আশায় না থেকে আমরা নিজেরাই পরিষ্কার করে নিতাম। এটা ছেলেদের জন্য একটা ভালো শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। এর ফলে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারের কাজে আমার ছেলেদের কারোই বিতৃষ্ণা জন্মেনি এবং পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কে তাদের ভালো ধারণা গড়ে উঠেছিল। জোহান্সবার্গের বাসায় অসুখ বিসুখ খুব কমই হতো, আর কখনও হলেও ছেলেরাই সাগ্রহে রোগীর সেবা-যত্ন করত।

আমি বলব না যে আমি তাদের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি উদাসীন ছিলাম, কিন্তু নিঃসন্দেহে আমি তা ত্যাগ করতে দ্বিধা করিনি। তাই আমার প্রতি আমার ছেলেদের কিছুটা ক্ষোভ রয়েছে। তারা মাঝে মাঝে সে ক্ষোভ প্রকাশও করেছে এবং আমি নিজেকে এ ব্যাপারে কিছুটা অপরাধী মনে করি। তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছা আমার ছিল। আমি নিজেই তাদেরকে সে শিক্ষা

www.pathagar.com

দেয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু প্রতিবারেই কোনো না কোনো বাধা-বিঘ্নের কারণে তা হয়ে ওঠেনি। আমি যেহেতু তাদের গৃহ-শিক্ষার অন্য কোনো ব্যবস্থা করিনি, আমি তাদেরকে আমার সাথে পায়ে হেঁটে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে আমার অফিসে নিয়ে যেতাম এবং ফেরৎ আনতাম। এতে আমার ও তাদের মোটামুটি ভালো ব্যায়াম হতো। এ হাঁটার সময় কথাবার্তার মাধ্যমে আমি তাদেরকে শিক্ষা দিতাম, পথে যদি আর কেউ আমার মনোযোগ আকৃষ্ট না করত। বড় ছেলে হরিলাল, যে ভারতে অবস্থান করছিল, সে ছাড়া আর সব ছেলেরাই জোহান্সবার্গে এভাবে বেড়ে উঠেছিল। যদি আমি তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য কঠোর নিয়মে দৈনিক এক ঘন্টা করে সময় দিতে পারতাম তাহলে আমার মতে তাদেরকে আমি আদর্শ শিক্ষা দিতে পারতাম। কিন্তু এটা তাদের জন্য যেমন, তেমনি আমার জন্যও দুঃখজনক যে, আমি তাদের জন্য পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারিনি। বড় ছেলে প্রায়ই একাকী আমার কাছে গোপনে তার দুঃখের কথা বলেছে এবং প্রকাশ্যে সাংবাদিকদেরও বলেছে। অন্য ছেলেরা আমার এ ব্যর্থতাকে অনিবার্য বলে উদারমনে ক্ষমা করে দিয়েছে। এতে আমার হৃদয় ভেঙে পড়েনি এবং এজন্য কোনো দুঃখ যদি থাকে তা হলো, আমি নিজেকে একজন আদর্শ পিতা প্রমাণ করতে পারিনি। কিন্তু আমার অভিমত হলো, এ অভিমত ভুলও হতে পারে, যেটাকে আমি ভারতীয় সম্প্রদায়ের সেবা বলে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছি তার জন্য তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে উৎসর্গ করেছি। আমি বিবেকের কাছে পরিষ্কার যে তাদের চরিত্র গঠনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা করতে অবহেলা করিনি। আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি পিতামাতার অবশ্য কর্তব্য সন্তানের চরিত্র গঠনে সম্ভব সব কিছু করা। আমার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি তাদের চরিত্রে অসম্পূর্ণতা থাকে তাহলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, তাদের মধ্যে তাদের পিতা-মাতার ত্রুটিগুলো ফুটে উঠেছে, আমার অযত্ন নয়।

সন্তানরা বংশগতভাবে পিতামাতার শারীরিক বৈশিষ্ট্যই শুধু অর্জন করে না, তাদের গুণাবলীও পেয়ে থাকে। পরিবেশ তাদের ওপর প্রভাব ফেললেও জীবনের যে মৌলিক মূলধন নিয়ে তাদের যাত্রা শুরু তা পূর্বপুরুষের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। আমি মানুষকে উত্তরাধিকারের অশুভ প্রভাবও সাফল্যের সাথে কাটিয়ে উঠতে দেখেছি। সেটা সম্ভব হয়েছে আত্মার অন্তর্নিহিত বিশুদ্ধ গুণাবলীর কারণে।

সন্তানদেরকে ইংরেজী শিক্ষা দেয়া উচিত কিনা এ নিয়ে পোলাকের সাথে আমার অত্যন্ত উত্তপ্ত আলোচনা হতো। আমার সর্বদাই বিশ্বাস যে ভারতীয় পিতামাতা যারা তাদের সন্তানদেরকে একেবারে শিশুকাল থেকে ইংরেজীতে চিন্তা করতে ও কথা বলতে শেখায় তারা তাদের সন্তান ও দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তারা সন্তানকে তাদের জাতির আত্মিক ও সামাজিক উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এবং তাদেরকে জাতির সেবার জন্য অযোগ্য করে তোলে। এসব বিশ্বাসের কারণে আমি আমার ছেলেদের সাথে সর্বদা গুজরাটিতে কথা বলতাম। পোলাক এটা কখনো পছন্দ করত না। সে মনে করত আমি তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট

www.pathagar.com

করছি। সে তার পূর্ণ শক্তি ও ভালোবাসার জোরে যুক্তি দেখাত যে শিশুকাল থেকে যদি সন্তানরা ইংরেজীর মতো একটি বিশ্বজনীন ভাষা শেখে তাহলে জীবনের প্রতিযোগিতায় তারা অবশ্যই অন্যদের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে। তার যুক্তি আমাকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছিল। আমার এখন মনে পড়ছে না আমি তাকে আমার মনোভাবের যৌক্তিকতা বোঝাতে পেরেছিলাম, না কি সে আমাকে গোঁয়ার গোবিন্দ বলে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। এসব ঘটেছিল বিশ বছর আগে এবং অভিজ্ঞতা বাড়ার সাথে সাথে আমার এ বিশ্বাস আরো গভীর হয়েছে। যদিও আমার ছেলেরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাবে কষ্ট পেয়েছে কিন্তু মাতৃভাষার যে জ্ঞান তারা স্বাভাবিকভাবে অর্জন করেছে তা তাদের নিজেদের এবং দেশের জন্য কল্যাণকর হয়েছে কারণ আজ তাদেরকে বিদেশী বলে মনে হয় না, যা হতে পারত। প্রতিদিন বিরাট বন্ধুমহলের সাহচর্যের কারণে তারা স্বাভাবিকভাবেই দ্বিভাষী হয়ে উঠেছে, সহজেই ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারে এবং তা এমন একটি দেশে অবস্থানের কারণে সম্ভব হয়েছে যেখানে ইংরেজি হলো প্রধান কথ্য ভাষা।

চব্বিশ
জুলু বিদ্রোহ

জোহান্সবার্গে স্থায়ী বসতি গড়েছি বলে মনে হওয়ার পরেও আমার ভাগ্যে স্থায়ী হওয়া ছিল না। যখনই মনে করেছি এবারে শান্তির নিশ্বাস ফেলব তখনই অপ্রত্যাশিত কিছু একটা ঘটেছে। সংবাদপত্রে খবর বেরুল নাটালে জুলু বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। জুলুদের বিরুদ্ধে আমার কোনো আক্রোশ ছিল না, তারা কোনো ভারতীয়ের ক্ষতিও করেনি। "বিদ্রোহ" কথাটায় আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু আমি তখন বিশ্বাস করতাম যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব সারা বিশ্বের জন্য কল্যাণকর। বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্য আমাকে এর অশুভ কামনা করা থেকেও বিরত রাখত। সুতরাং "বিদ্রোহ" ন্যায়সংগত কিনা তা আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলেনি। নাটালের একটা ভলান্টিয়ার ডিফেন্স ফোর্স (স্বেচ্ছাসেবক প্রতিরক্ষা বাহিনী) ছিল। এতে আরো লোক নিয়োগ চলছিল। সংবাদে পড়লাম যে এই বাহিনীকে "বিদ্রোহ" দমনে ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে।

নাটালের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বিধায় আমি নিজেকে নাটালের নাগরিক বলে মনে করতাম। তাই আমি গভর্নরকে পত্র দিয়ে জানালাম যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমি ইন্ডিয়ান অ্যাম্বুলেন্স কোর গঠন করতে প্রস্তুত আছি। আমার প্রস্তাব গ্রহণ করে তিনি দ্রুত জবাব দিলেন।

আমার প্রস্তাব এত তাড়াতাড়ি গৃহীত হবে তা আমি আশা করিনি। সৌভাগ্যক্রমে পত্রটা লেখার আগেই আমি প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিলাম। আমার প্রস্তাব যদি গৃহীত হয় তাহলে জোহান্সবার্গে আমার বাস তুলে দেব। পোলাক একটা ছোট বাসা নেবে, এবং আমার স্ত্রী চলে যাবে

www.pathagar.com

ফিনিক্সের বসতিতে। আমার এ প্রস্তাবে তার পূর্ণ সম্মতি নিয়েছিলাম। এসব ব্যাপারে সে আমার সামনে কখনো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এমনটা মনে পড়ে না। সুতরাং গভর্নরের জবাব পাওয়ার সাথে সাথেই স্বাভাবিক নিয়মে বাসা ছেড়ে দেয়ার জন্য মালিককে একমাসের নোটিশ দিলাম, কিছু আসবাবপত্র ফিনিক্সে পাঠালাম, আর কিছু পোলাকের জন্য রেখে গেলাম।

আমি ডারবানে গেলাম এবং লোক যোগাড়ের জন্য আবেদন জানালাম। বড় দল গঠনের প্রয়োজন ছিল না। চব্বিশ জনের একটা দল গঠিত হলো, যার মধ্যে আমি ছাড়া আরো চারজন ছিল গুজরাটী। বাকিরা ছিল দক্ষিণ ভারত থেকে আগত সাবেক চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক, একজন মুক্ত পাঠান ছাড়া।

আমাকে পদ মর্যাদা দেয়া এবং কাজ সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য প্রচলিত রীতি মোতাবেক চীফ মেডিক্যাল অফিসার আমাকে অস্থায়ীভাবে সার্জেন্ট মেজর পদে নিয়োগ করলেন এবং আমার নির্বাচিত তিনজনকে সার্জেন্ট এবং একজনকে কর্পোরাল পদে নিয়োগ করা হলো। গভর্নমেন্ট থেকে আমরা আমাদের ইউনিফরম পেলাম। আমাদের কোর (দল) প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে সক্রিয় সেবায় নিয়োজিত ছিল। বিদ্রোহের দৃশ্যপটে পৌঁছে দেখলাম যে "বিদ্রোহ" নামের যথার্থতা প্রমাণ করতে পারে তেমন কিছু সেখানে নেই। সেখানে কোনো প্রতিরোধ দেখা গেল না। একটা বিশৃংখলাকে বড় করে বিদ্রোহ বলে প্রচারের পিছনে মূল ঘটনা ছিল যে, একজন জুলু প্রধান তার লোকদেরকে নতুন আরোপিত একটা ট্যাক্স প্রদান করতে বারণ করেছিল এবং ট্যাক্স সংগ্রহ করতে যাওয়ায় একজন সার্জেন্টকে হত্যা করেছিল। যে কোনো বিচারে আমার আন্তরিক সমর্থন ছিল জুলুদের পক্ষে এবং হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে আমি শুনে আনন্দিত হলাম যে আমার প্রধান কাজ হবে আহত জুলুদের সেবা করা। ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। তিনি বললেন সাদা আদমিরা আহত জুলুদের সেবা করতে আগ্রহী নয়, আহতের ক্ষতে পচন ধরেছে এবং এ অবস্থায় তিনি কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। তিনি আমাদের আগমনকে ঐসব নিষ্পাপ লোকদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে স্বাগত জানালেন এবং আমাদেরকে ব্যান্ডেজ, জীবাণুনাশক ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত করলেন এবং আমাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে স্থাপিত হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। জুলুরা আমাদের দেখে আনন্দিত হলো। সাদা চামড়ার সৈনিকেরা তাদের ও আমাদের মধ্যে অবস্থিত বেড়ার ফাঁক দিয়ে নজর রাখছিল এবং আহতদের চিকিৎসা করতে আমাদেরকে বারণ করছিল। আর আমরা যেহেতু তাদের কথায় কর্ণপাত করছিলাম না তাই তারা রাগান্বিত হয়ে জুলুদের ওপর অকথ্য গালিবর্ষণ করছিল।

ক্রমান্বয়ে আমি এ সব সৈনিকদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলাম এবং তারা বাধা দানে বিরত হলো। কমান্ডিং অফিসারদের মধ্যে কর্নেল স্পার্কস ও কর্নেল ওয়াইলি যারা ১৮৯৬ সালে তীব্রভাবে আমার বিরোধীতা করেছিলেন। আমার মনোভাব দেখে তারা বিস্মিত হলেন এবং আমাকে ডেকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানালেন।

www.pathagar.com

তারা আমাকে জেনারেল ম্যাকেঞ্জির সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পাঠক যেন না ভাবেন যে এরা পেশাদার সৈনিক। কর্নেল ওয়াইলি ছিলেন ডারবানের সুপরিচিত আইনজীবী। কর্নেল স্পার্কস ডারবানের একটি সুপরিচিত কসাইখানার মালিক। জেনারেল ম্যাকেঞ্জি ছিলেন নাটালের নামকরা কৃষক। এ ভদ্রলোকেরা ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক এবং তারা সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন এবং সৈনিক হিসেবে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন।

আমাদের দায়িত্বে যেসব আহতরা ছিল তারা যুদ্ধে আহত হয়নি। তাদের একদলকে সন্দেহভাজন হিসেবে কারাবন্দী করা হয়েছিল। জেনারেল তাদেরকে চাবুক মারতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। চাবুকের আঘাতে তাদের গুরুতর ঘা হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসার অভাবে তাদের ঘায়ে পচন ধরেছিল। অন্য আহতরা ছিল জুলুদের বন্ধু। যদিও তাদেরকে 'শত্রু' থেকে আলাদা করার জন্য ব্যাজ দেয়া হয়েছিল, তথাপি সৈন্যরা ভুল করে তাদেরকে গুলি করেছিল।

এ কাজ ছাড়াও আমাকে সাদা সৈনিকদের জন্য ওষুধ তৈরি করে দিতে হতো। এ কাজটা আমার জন্য অতি সহজ ছিল, কারণ আমি ডা. বুথ এর ছোট হাসপাতালে এক বছরের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। এ কাজ আমাকে অনেক ইউরোপীয়ানের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে নিয়ে এলো।

দ্রুত স্থান পরিবর্তনকারী একটি দলের সাথে আমাদেরকে যুক্ত করা হয়েছিল। যেখানেই বিপদের খবর আসত সেখানেই এ দলটিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হতো। এ দলের অধিকাংশই ছিল মাউন্টেড ইনফ্যান্ট্রি। যখনই আমাদের ক্যাম্প অন্যত্র যাত্রা করত আমাদেরও স্ট্রেচার কাঁধে নিয়ে মার্চ করে তাদের পিছনে যেতে হতো। দু'বার কি তিনবার একদিনে আমাদের চল্লিশ মাইল পর্যন্ত মার্চ করতে হয়েছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এজন্য যে আমরা যেখানেই গিয়েছি সেখানেই ভালো কাজ পেয়েছি, জুলুদের আহত বন্ধু যারা অসাবধানতাবশত আহত হয়েছিল তাদেরকে স্ট্রেচারে বয়ে নিয়ে এসেছি এবং নার্স হিসেবে তাদের সেবা করেছি।

পঁচিশ
আত্ম অন্বেষা

জুলু বিদ্রোহ আমার জন্য নতুন অভিজ্ঞতায় পূর্ণ ছিল এবং আমাকে প্রচুর চিন্তার খোরাক যুগিয়েছিল। বোয়ার যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধের বিভীষিকা ততটা বুঝতে পারিনি, কিন্তু এ বিদ্রোহের সময়ে তা জীবন্তভাবে প্রত্যক্ষ করলাম। এটা কোনো যুদ্ধ ছিল না, ছিল মানব-শিকার। এটা শুধু আমার অভিমত নয়, অনেক ইংরেজের সাথে আমার কথা হয়েছে, তাদেরও একই মত। প্রতিদিন সকালে নিষ্পাপ গ্রামবাসীর ওপর বাজী ফুটানোর মতো সৈন্যদের গুলি বর্ষণের শব্দ শোনা এবং তার মাঝে বাস করা একটা পরীক্ষার মতো। কিন্তু আমি তেতো ওষুধ গিলেছিলাম, কারণ আমার কোরের কাজ ছিল বিশেষ করে শুধুমাত্র আহত জুলুদের সেবা করা।

www.pathagar.com

কিন্তু চিন্তা করার আরো অনেক কিছু ছিল। এটা ছিল দেশের বিরল জনবসতিপূর্ণ এলাকা। বিরল পাহাড়ের মধ্যে ছড়ানো ছিটানো ছিল সহজ সরল তথাকথিত "অসভ্য" জুলুদের ক্রাল (ঘেরা দেয়া বসতি)। এ গম্ভীর নির্জনতার মাঝে, কাঁধে আহতদের নিয়ে অথবা আহতদের ছাড়া, মার্চ করতে করতে আমি প্রায়ই গভীর চিন্তায় ডুবে যেতাম।

আমি ব্রহ্মচর্য ও এর তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা করতাম এবং আমার বিশ্বাস আরো গভীর হতো। আমি সহকর্মীদের সাথে এ নিয়ে আলোচনা করতাম। আত্ম-উপলব্ধির জন্য এটা যে কতটা অপরিহার্য তা আমি আগে বুঝতে পারিনি। এখন স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে, কেউ যদি সর্বান্তঃকরণে মানবতার সেবা করার আশা পোষণ করে, ব্রহ্মচর্য ছাড়া তা সম্ভব নয়। আমার উপলব্ধি হলো যে, আমি যে ধরনের সেবা করে যাচ্ছি তা আরো বেশি বেশি করা উচিত এবং যদি আমি সংসার জীবনের আনন্দে গা ভাসিয়ে দেই, বংশ বিস্তার ও সন্তানদের লালন-পালনে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ি তাহলে আমি আমার দায়িত্ব পালনের অযোগ্য হয়ে পড়ব।

এক কথায় বলতে গেলে আমি একই সাথে দেহ ও আত্মার জন্য বাঁচতে পারব না। উদাহরণ স্বরূপ বর্তমান অবস্থার কথাই ধরুন, আমার স্ত্রী যদি সন্তান কামনা করত তাহলে আমি এ পদক্ষেপ নিতাম না। ব্রহ্মচর্য পালন ব্যতীত পরিবারের সেবা ভারতীয় সম্প্রদায়ের সেবার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো না। ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমেই কেবল তা পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে।

এরকম চিন্তা করে আমি চূড়ান্তভাবে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণের জন্য কিছুটা অধৈর্য হয়ে উঠলাম। ব্রত গ্রহণের সম্ভাবনা আমার মধ্যে এক ধরনের উল্লাস নিয়ে এলো। কল্পনার জগতও উন্মুক্ত হলো এবং অসীম সেবার অগণিত পথ আমার সামনে খুলে দিল।

আমি যখন এরকম কঠোর শারীরিক ও মানসিক কাজে ব্যস্ত তখন এ মর্মে খবর এলো যে বিদ্রোহ দমনের কাজ প্রায় শেষ এবং আমাদেরকে শিগগীরই ছেড়ে দেয়া হবে। এর একদিন কি দুদিন পরে আমাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হলো এবং অল্প ক'দিনের মধ্যে আমরা ঘরে ফিরে এলাম।

অল্পদিনের মধ্যেই গভর্নরের কাছ থেকে একটা পত্র পেলাম। এতে তিনি অ্যাম্বুলেন্স কোরের সেবার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ফিনিক্সে পৌছার পর আমি ব্রহ্মচর্য বিষয়ে ছগনলাল, মগনলাল, ওয়েস্ট এবং অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করলাম। তারা এ ধারণা পছন্দ করল এবং ব্রত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করল। তবে তারা এর অসুবিধার দিকগুলিও তুলে ধরল। তাদের কেউ কেউ সাহস নিয়ে এ ব্রত পালন শুরু করল এবং আমি জানি এদের কেউ কেউ সফলও হয়েছিল।

www.pathagar.com

আমি নিজেও ঝাঁপ দিলাম, সারা জীবনের জন্য ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করলাম। স্বীকার করতেই হবে আমি তখনো পুরোপুরি বুঝিনি কি বিশাল দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি। এর অসুবিধাগুলো এখনো আমার সামনে রয়ে গেছে। ব্রত গ্রহণের গুরুত্ব আমার কাছে প্রতিদিনই আরো বেশি করে প্রতিভাত হচ্ছে। ব্রহ্মচর্য ব্যতীত আমার কাছে জীবনটা পানসে এবং পাশবিক বলে মনে হয়। পশুরা স্বভাবগতভাবেই আত্মসংযম কি তা জানে না। মানুষ আত্ম-নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এবং করে বলেই সে মানুষ। আমাদের ধর্মপুস্তকে ব্রহ্মচর্যের প্রশংসা আগে আমার কাছে অতিরঞ্জিত মনে হলেও এখন প্রতিদিনের ক্রমবর্ধমান উপলব্ধির সাথে সাথে তা সম্পূর্ণ সঠিক ও অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হচ্ছে।

আমি দেখলাম যে ব্রহ্মচর্য আশ্চর্য সম্ভাবনায় ভরপুর হলেও তা পালন করা সহজ নয় এবং এটা অবশ্যই শুধু শরীরের ব্যাপার নয়। শারীরিক সংযম দ্বারা এর শুরু হয় কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এর পূর্ণতা অশুদ্ধ চিন্তাকেও নিবারণ করে। সত্যিকার ব্রহ্মচারী শারীরিক কামনা চরিতার্থ করার কথা স্বপ্নেও ভাবে না এবং সে অবস্থায় না পৌঁছা পর্যন্ত তাকে অনেক সাধনা করতে হয়।

আমার জন্য শারীরিক ব্রহ্মচর্য পালন ছিল বিভিন্ন অসুবিধায় পূর্ণ। আজ আমি নিজেকে মোটামুটি নিরাপদ মনে করি, কিন্তু আমাকে এখনো চিন্তার ওপর কর্তৃত্ব অর্জন করতে হবে, যা অর্জন করা একান্ত অপরিহার্য। আমার ইচ্ছা বা চেষ্টার কমতি আছে তা নয়। এতদসত্ত্বেও সমস্যা হলো কোথা থেকে যেন অনভিপ্রেত চিন্তা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং বিশ্বাসঘাতকের মতো আক্রমণ করে বসে। অনভিপ্রেত চিন্তাকে বাইরে তালাবদ্ধ করে রাখার উপায় আছে এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রত্যেককে তা নিজের মতো করে খুঁজে বের করে নিতে হবে। সাধু-সন্ন্যাসীরা আমাদের জন্য তাদের অভিজ্ঞতা রেখে গেছেন, কিন্তু তারা আমাদের জন্য কোনো অভ্রান্ত ও সর্বজনীন পথনির্দেশ দিয়ে যাননি। নৈতিক উৎকর্ষতা বা ভ্রান্তি থেকে মুক্তি আসে কেবল ঐশ্বরিক করুণা হতে, আর তাই ঈশ্বর অন্বেষণকারীগণ আমাদের জন্য তাদের ব্যক্তিগত কৃচ্ছতায় পবিত্র করা এবং শুচিতায় ভরা বিভিন্ন মন্ত্র রেখে গেছেন, যেমন রামনাম। তাঁর মহত্ত্বে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ছাড়া চিন্তার ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করা অসম্ভব। বড় বড় সকল ধর্মগ্রন্থের এটাই শিক্ষা এবং পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য লাভের প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তে আমি এর সত্যতা উপলব্ধি করছি।

কিন্তু আমার সে প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের কাহিনীর অংশবিশেষ পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বর্ণনা করব। আমি ব্রত গ্রহণের কাজ কিভাবে শুরু করলাম তার ইঙ্গিত দিয়ে এ অধ্যায়ের ইতি টানব। প্রাথমিক আবেগের উচ্ছ্বাসে ব্রত পালন আমার জন্য খুব সহজ মনে হলো। আমার জীবন যাত্রায় প্রথম যে পরিবর্তন আনলাম তা হলো স্ত্রীর সাথে একই বিছানায় শয়ন বন্ধ করা এবং তাকে নির্জনে পাওয়ার বাসনা ত্যাগ করা।

এভাবে ১৯০০ সাল হতে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে ব্রহ্মচর্য পালন করে আসছিলাম ১৯০৬ সালে ব্রত গ্রহণের দ্বারা তা মজবুত হলো।

www.pathagar.com

ছাব্বিশ

সত্যাগ্রহের জন্ম

জোহান্সবার্গে ঘটনাপঞ্জী এমনভাবে ঘটে যাচ্ছিল যেন আমার এ আত্মশুদ্ধি আমার জন্য ছিল সত্যাগ্রহের পূর্বপ্রস্তুতি। আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমার জীবনের প্রধান ঘটনাগুলো, ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণের মাধ্যমে যার পূর্ণতা প্রাপ্তি, সত্যাগ্রহের জন্য তা আমাকে নীরবে তৈরি করছিল। যাকে আমরা "সত্যাগ্রহ" নাম দিয়েছি তার নীতিগুলোর জন্ম হয়েছিল নাম আবিষ্কারের পূর্বেই। যখন এটার জন্ম হলো তখনো আমি জানতাম না আসলে এটা কী। গুজরাটী ভাষাতেও একে আমরা ইংরেজি শব্দে "প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স" (অক্রিয় প্রতিরোধ) বলে বর্ণনা করতাম। ইউরোপীয়ানদের এক সভায় যখন আমি দেখলাম যে "প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স" কথাটার খুব সংকীর্ণ অর্থ করা হলো, বলা হলো যে এটা দুর্বলের অস্ত্র, এতে ঘৃণার বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সন্ত্রাসের মাধ্যমে এর আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে তখন এসব বক্তব্যের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে আমাকে ভারতীয় আন্দোলনের প্রকৃত রূপ ব্যাখ্যা করতে হলো। এটা স্পষ্ট হলো যে ভারতীয়দের সংগ্রামের জন্য অবশ্যই একটা অর্থবহ নাম উদ্ভাবন করতে হবে।

কিন্তু আমার জীবনের এ প্রচেষ্টার জন্য আমি কোনো নাম খুঁজে পেলাম না। তাই ইন্ডিয়ান ওপিনিয়নের পাঠকদের মধ্য হতে যে শ্রেষ্ঠ নাম দিতে পারবে তার জন্য নামমাত্র পুরস্কারের প্রস্তাবসহ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলো। এর ফলে মগনলাল গান্ধী "সদাগ্রহ" (সৎ=সত্য, আগ্রহ=দৃঢ়তা) শব্দটি উদ্ভাবন করল এবং পুরস্কার জিতে নিল। কিন্তু নামটাকে আরো স্পষ্ট করার জন্য আমি শব্দটি পরিবর্তন করে "সত্যাগ্রহ" করলাম সেই তখন থেকে যা গুজরাটী ভাষায় সংগ্রামের প্রতিশব্দরূপে চালু রয়েছে।

বাস্তবিক পক্ষে এ সংগ্রামের কাহিনী দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার অবশিষ্ট জীবনের কাহিনী এবং বিশেষ করে তা ঐ উপমহাদেশে সত্য নিয়ে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাহিনী। এ কাহিনীর বেশিরভাগ আমি লিখেছি ইয়েরাভদা জেলে বসে এবং শেষ করেছি ছাড়া পাওয়ার পরে। প্রথমে এটা নবজীবন পত্রিকায় ছাপা হয় এবং পরবর্তীতে বই এর আকারে বের হয়। শ্রীযুক্ত বালাজী গোবিন্দজী দেশাই "কারেন্ট থট" পত্রিকার জন্য এটার ইংরেজি অনুবাদ করছিলেন, কিন্তু আমি এখন যথাশীঘ্র এটার ইংরেজি অনুবাদ বই আকারে প্রকাশের জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি যাতে আগ্রহী পাঠকগণ দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্পর্কে জানতে পারেন। যারা ইতিমধ্যে আমার লেখা "দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের ইতিহাস" বইটি পড়েননি তাদেরকে সেটা পড়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি। সেখানে যা লিখেছি এখানে তার পুনরাবৃত্তি করব না, কিন্তু পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার জীবনের কিছু ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করব যা ঐ বইতে লেখা হয়নি। এগুলো শেষ করার পর আমি পাঠককে ভারতে

www.pathagar.com

আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে কিছু ধারণা দেব। অতএব যারা এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঘটনা সঠিক ক্রমানুসারে দেখতে চান তাদের উচিত হবে "দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের ইতিহাস" বইটি সামনে রাখা।

সাতাশ
পথ্যবিদ্যায় আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা

চিন্তায়, কথায় ও কাজে ব্রহ্মচর্য পালনে আমি প্রবল আগ্রহী ছিলাম। একই সাথে আমি সত্যাগ্রহের সংগ্রামে আমার সময়ের অধিকাংশ ব্যয় করতে এবং শুদ্ধতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে এর উপযোগী করে তুলতে আগ্রহী ছিলাম। আর তাই খাবারের ব্যাপারে আমাকে নিজের ওপর আরো বেশি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হলো। খাদ্য পরিবর্তনে ইতিপূর্বের পদক্ষেপগুলো ছিল মূলত স্বাস্থ্যবিদ্যা সংক্রান্ত, কিন্তু নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো ছিল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে।

আহারে সংযম ও উপোষ এখন আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকল। সাধারণত মানুষের কাম ও রসনা তৃপ্তির বাসনা একই সাথে বিদ্যমান থাকে। এবং আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। কাম ও রসনা নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায় আমি অনেক বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছি এবং এখন পর্যন্ত আমি ওগুলোকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছি বলে দাবি করতে পারি না। আমি নিজেকে একজন বড় খাদক বলে মনে করি। বন্ধুরা যে অর্থে নিয়ন্ত্রণ বুঝে থাকেন আমার কাছে এর অর্থ তা নয়। আমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ যে পর্যায়ে উন্নীত করেছি তা করতে ব্যর্থ হলে আমি পশুর চেয়ে নিম্নস্তরে নেমে যেতাম এবং অনেক আগেই ধ্বংসের মুখোমুখী হতাম। যাহোক, আমি যেহেতু নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলাম, আমি সেগুলো থেকে মুক্ত হতে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলাম। এ প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ, কারণ এর ফলেই এত বছর ধরে আমার শরীর সুস্থ রয়েছে এবং আমার নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছি।

আমার দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতনতা এবং অপ্রত্যাশিতভাবে সমমনা লোকের সঙ্গলাভের ফলে আমি সম্পূর্ণ ফলাহার অথবা একাদশীর দিনে উপোষ করতে শুরু করলাম এবং জন্মাষ্টমীসহ অন্যান্য ছুটির দিন ধর্মীয় রীতিতে পালন করতে লাগলাম।

আমি ফলাহার দিয়ে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ শুরু করলাম কিন্তু সংযম পালনের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি ফলাহার ও শস্যকণার খাবারের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য খুঁজে পেলাম না। লক্ষ্য করলাম, ফলের তৈরি খাবারকে শস্যকণার খাবারের মতোই সুস্বাদু করা সম্ভব, এমনকি অভ্যেস হয়ে গেলে বেশি সুস্বাদু করাও সম্ভব। সুতরাং আমি ছুটির দিনে উপোষ করা অথবা কেবল একবার আহার করার ওপর বেশি গুরুত্ব দিলাম। আর যদি প্রায়শ্চিত্ত করার বা অনুরূপ কোনো দিন পাওয়া যেত সেটাও আমি সানন্দে উপোষ করার কাজে লাগাতাম।

www.pathagar.com

কিন্তু আমি এটাও লক্ষ্য করলাম যে শরীরটা আরো কার্যকরভাবে শুকিয়ে যাবার ফলে খাবারের স্বাদ বেড়ে গেল এবং ক্ষুধা তীব্রতর হলো। আমার নিকট এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে উপোষকে স্বেচ্ছাচারিতা বা সংযম পালন উভয়ের জন্যই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ চমকপ্রদ সত্যের সমর্থনে প্রমাণ স্বরূপ আমার নিজের ও অন্যদের অনেক অনুরূপ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরতে পারি। আমি আমার শরীরকে উন্নত ও প্রশিক্ষিত করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এখন যেহেতু আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে সংযম পালন ও রসনার ওপর বিজয় অর্জন করা তাই প্রথমে আমি একটা খাবার বেছে নিতাম, পরে আরেকটা এবং সেই সাথে পরিমাণ কমিয়ে দিতাম। কিন্তু রসনা তৃপ্তির বাসনা যেন আমাকে ছাড়ল না। আমি যখন একটা পদ ছেড়ে দিয়ে আরেকটা ধরতাম তখন আগেরটার চাইতে পরেরটা আরো নতুন এবং বেশি সুস্বাদু মনে হতো।

এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে আমার কয়েকজন সঙ্গী ছিলেন যার মধ্যে হারম্যান ক্যালেনবাচ ছিলেন প্রধান। আমি এ বন্ধুর সম্পর্কে ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের ইতিহাস বইতে লিখেছি এবং এখানে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করব না। মি. ক্যালেনবাচ সর্বদাই আমার সঙ্গী ছিলেন, কি উপোসে, কি খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনে। সত্যাগ্রহের সংগ্রাম যখন তুঙ্গে তখন আমি তার সাথে তার বাসায় থাকতাম। আমরা আমাদের খাবার পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করতাম এবং পুরাতন খাবারের স্থলে নতুন খাবার থেকে আরো বেশি স্বাদ ও তৃপ্তি পেতাম। এ ধরনের কথাবার্তা তখনকার দিনে বেশ আনন্দদায়ক মনে হতো এবং মোটেই অসংগত বলে মনে হতো না। যাহোক, অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি যে খাবারের স্বাদ নিয়ে আলোচনা করাটা ভুল ছিল। রসনা তৃপ্তির জন্য নয়, বরং শরীরটাকে সচল রাখতেই খাওয়া উচিত। শরীরের প্রতিটি অঙ্গের ইন্দ্রিয়ানুভূতি যখন শরীরের সহায়ক এবং শরীর সহায়তা করে আত্মাকে; তখন স্বাদের বিশেষত্ব আর থাকে না এবং তখন এটা কেবল প্রকৃতির নিয়মে কাজ করে যায়।

প্রকৃতির সাথে এই একাত্মতা অর্জনের জন্য যত পরীক্ষা-নিরীক্ষাই করা হোক তা অপ্রতুল এবং এর জন্য কোনো ত্যাগই খুব বড় নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আজকাল এর বিপরীতমুখী স্রোত প্রবলতর হচ্ছে। নশ্বর দেহকে সাজাতে এবং এর অস্তিত্বকে অপসৃয়মান আরো কয়েক মুহূর্ত দীর্ঘায়িত করতে আমরা অসংখ্য জীবহত্যায় লজ্জিত হই না, যার ফল স্বরূপ আমরা নিজেদের দেহ ও আত্মা উভয়কেই হত্যা করি। পুরাতন একটা রোগ সারাতে নতুন একশত রোগের জন্ম দেই, ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগের জন্য আমরা শেষ পর্যন্ত উপভোগের ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলি। আমাদের চোখের সামনেই এসব ঘটছে, কিন্তু যারা তা দেখে না তাদের মতো অন্ধ আর কে আছে!

পথ্যবিদ্যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার লক্ষ্য স্থির করা এবং যেসব ধারণা এ কাজে সহায়ক হয়েছে তা বর্ণনার পর এখন আমি এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা দেব।

www.pathagar.com

আঠাশ

কস্তুরবাই এর সাহসিকতা

আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে তিনবার মৃত্যুর দুয়ার থেকে কোনোরকমে বেঁচে এসেছে। টোটকা চিকিৎসায় সে আরোগ্য লাভ করেছিল। প্রথমবার সে অসুস্থ হয়েছিল যখন সত্যাগ্রহ চলছিল বা শুরু হতে যাচ্ছিল। তার ঘন ঘন রক্তস্রাব হতো। এক ডাক্তার বন্ধু অপারেশনের পরামর্শ দিলেন। কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর সে এতে রাজী হলো। সে অতিরিক্ত শুকিয়ে গিয়েছিল এবং দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ফলে ক্লোরোফর্ম ছাড়াই ডাক্তার অপারেশন করতে বাধ্য হলেন। অপারেশন সফল হলো কিন্তু তার প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছিল। সে অবশ্য আশ্চর্য সাহসিকতার সাথে ব্যথা সহ্য করে যাচ্ছিল। ডাক্তার ও তার স্ত্রী, যে নার্সের মতো সেবা করেছিল, তারা উভয়ে রুগীর যত্ন নিতে ত্রুটি করেনি। এ ঘটনা ঘটেছিল ডারবানে। ডাক্তার আমাকে জোহান্সবার্গ যাওয়ার জন্য ছুটি দিয়ে দিলেন এবং রুগীর সম্পর্কে কোনোরকম দুঃশ্চিন্তা করতে নিষেধ করলেন।

অল্প ক'দিনের মধ্যে আমি এই মর্মে একটি চিঠি পেলাম যে, কস্তুরবাই এর অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে, দুর্বলতা এত বেশী যে বিছানায় উঠে বসতে পারছে না এবং একবার জ্ঞানও হারিয়ে ফেলেছিল। ডাক্তার জানতেন যে, আমার অনুমতি ছাড়া তিনি তাকে মদ বা মাংস খেতে দিতে পারেন না। তাই তিনি আমার কাছে জোহান্সবার্গে টেলিফোন করে তাকে গো-মাংস, চা খাওয়ানোর অনুমতি চাইলেন। আমি জবাবে জানালাম যে, "আমি এই অনুমতি দিতে পারি না, তবে যদি তার অবস্থা এমন থাকে যে সে তার নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করতে পারে তাহলে তার সাথেই আলোচনা করে দেখতে পারেন এবং সে তার পছন্দের ব্যাপারে স্বাধীন।" ডাক্তার বললেন, "কিন্তু এ বিষয়ে আমি রুগীর সাথে কোনো আলোচনা করতে চাই না। আপনার নিজেকেই আসতে হবে। রুগীকে আমার ইচ্ছামতো পথ্য দেয়ার স্বাধীনতা যদি আমার না থাকে তাহলে আপনার স্ত্রীর জীবনের জন্য আমি দায়ী থাকব না।"

সেই দিনই আমি ডারবানের ট্রেন ধরলাম এবং ডাক্তারের সাথে দেখা করলাম। তিনি শান্তভাবে আমাকে খবরটি দিলেন : "আমি আপনাকে যখন টেলিফোন করি তখনই তাকে গো-মাংস, চা খাইয়ে দিয়েছি।"

আমি বললাম, "তাহলে ডাক্তার সাহেব আমি বলব আপনি প্রতারণা করেছেন।"

"রুগীকে ওষুধ বা পথ্য প্রেসক্রাইব করার ব্যাপারে প্রতারণার প্রশ্নই আসে না। রুগীদের প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে তাদেরকে বা তাদের আত্মীয়দেরকে মিথ্যা বলাটাকে আমরা ডাক্তাররা ধর্মীয় গুণ বলে মনে করি।" ডাক্তার দৃঢ়তার সাথে বললেন।

আমি মর্মাহত হলাম কিন্তু শান্ত থাকলাম। ডাক্তারটি অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন এবং তিনি আমার ব্যক্তিগত বন্ধুও। তিনি এবং তার স্ত্রী আমাকে

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু তার চিকিৎসা শাস্ত্রের এ নীতিকথা আমি মানতে রাজী ছিলাম না।

"ডাক্তার, এখন বলুন আপনি কি করতে চান। আমি কখনওই আমার স্ত্রীকে মাংস বা গো-মাংস খাবার অনুমতি দেব না, এ নিষেধের কারণে যদি তার মৃত্যু ঘটে তবুও না। অবশ্য সে যদি নিজে থেকে খেতে চায়, তাহলে অন্য কথা।"

"আপনার দর্শন নিয়ে আপনি খুশী থাকুন। আমি বলে রাখছি যে, যতক্ষণ আপনার স্ত্রীকে আমার চিকিৎসাধীন রাখবেন তাকে কি খেতে দেব সে ব্যাপারে অবশ্যই আমার স্বাধীনতা থাকবে। আপনার যদি তা পছন্দ না হয়, তাহলে দুঃখের সাথে বলছি তাকে নিয়ে যেতে পারেন। আমার ছাদের নিচে তিনি মারা যাবেন সেটা আমি দেখতে পারব না।"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমি এখনই তাকে নিয়ে যাব?"

"আমি কি আসলে আপনাকে তাকে নিয়ে যেতে বলেছি? আমি শুধু তার ব্যাপারে স্বাধীনতা চাচ্ছিলাম। সেটা যদি আপনি দেন তাহলে আমি এবং আমার স্ত্রী তার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করব এবং আপনি সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত হয়ে কর্মস্থলে ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি এই সোজা বিষয়টি বুঝতে না চান, তাহলে আমি বাধ্য হয়ে বলব, আপনার স্ত্রীকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যান।"

আমার মনে হয় তখন আমার সাথে আমার এক ছেলেও ছিল। সে আমার সাথে সম্পূর্ণ একমত হলো এবং বলল তার মাকে গো-মাংস, চা খাওয়ানো উচিত হবে না। এরপর আমি কস্তুরবাইকেও জিজ্ঞেস করলাম। সে এত দুর্বল ছিল যে এ বিষয়ে আলোচনা করা কঠিন ছিল। তা সত্ত্বেও আমি আলোচনা করা বেদনাদায়ক কর্তব্য বলে মনে করলাম। ডাক্তারের সাথে কি কথা হয়েছে তা আমি তাকে বললাম। সে দৃঢ় মতামত দিল, "আমি গো-মাংস-চা খাব না। পৃথিবীতে মানব জন্ম লাভ করা একটা দুর্লভ ঘটনা। গো-মাংস, চা এর মতো ঘৃনিত বস্তু দ্বারা আমার মানবদেহ দূষিত করার চাইতে আমি তোমার কোলে মৃত্যুবরণ করব, সেটাও শ্রেয়।"

আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। আমার নীতি তাকে মানতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা তার নেই। আমি আমার হিন্দু বন্ধু ও পরিচিতজনদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলাম যারা ওষুধ হিসেবে মদ ও মাংস খাবার বিষয়ে বাছবিচার করে না। কিন্তু সে তার সিদ্ধান্তে অটল। তার কথা হলো, "না, আমাকে এক্ষুনি এখান থেকে নিয়ে যাও।"

আমি শুনে খুশী হলাম। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি তাকে সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি ডাক্তারকে তার সিদ্ধান্ত জানালাম। সে ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, "আপনি কেমন অবিবেচক লোক! তার শরীরের যে অবস্থা, এ সময়ে তার সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে আপনার লজ্জা হওয়া উচিত ছিল। আমি বলে দিচ্ছি আপনার স্ত্রী এখান থেকে সরিয়ে নেয়ার মতো অবস্থায় নেই। সামান্যতম নড়াচড়াও সে সহ্য করতে পারবে না। তাকে সরিয়ে নিলে যদি পথে তার মৃত্যু হয়

www.pathagar.com

তাতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। তা সত্ত্বেও আপনি যদি জেদ করেন তাহলে নিয়ে যেতে পারেন। আপনি যদি তাকে গো-মাংস, চা দিতে আপত্তি করেন, আমি তাকে আমার এখানে একদিনও রাখার ঝুঁকি নিতে চাই না।

সুতরাং আমরা তক্ষুনি চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল, স্টেশনও ছিল খানিকটা দূরে। আমাদেরকে ডারবান থেকে ট্রেনে ফিনিক্স এবং সেখান থেকে আমাদের বসতিতে যেতে সড়কপথে আড়াই মাইল যেতে হবে। নিঃসন্দেহে আমি একটা বড় ঝুঁকি নিচ্ছিলাম। কিন্তু ঈশ্বরের উপর আমার ভরসা ছিল এবং আমি আমার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম। আমি একটা পত্রসহ ফিনিক্সে একজন লোক আগেই পাঠিয়ে দিলাম। পত্রে ওয়েস্টকে লিখলাম স্টেশনে আমাদেরকে রিসিভ করতে এবং একটা দোলনা-বিছানা, এক বোতল গরম দুধ আর এক বোতল গরম পানি সাথে আনতে এবং দোলনা-বিছানায় কস্তুরবাইকে বয়ে নিয়ে যেতে ছয়জন লোক রাখতে। পরবর্তী ট্রেন ধরার জন্য একটি রিক্সা আনালাম, তাতে কস্তুরবাইকে বিপজ্জনক অবস্থায় উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলাম।

কস্তুরবাইকে সাহস দেবার প্রয়োজন ছিল না। উল্টো সে-ই আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "আমার কিছু হবে না। কোনো চিন্তা ক'রো না।"

দিনের পর দিন পুষ্টিহীন অবস্থায় থেকে সে একেবারে অস্থিচর্মসার হয়ে গিয়েছিল। স্টেশনের প্লাটফরমটা ছিল খুব বড়। যেহেতু রিক্সা প্লাটফরমে প্রবেশ নিষেধ সেজন্য বেশ কিছুটা হেঁটে গিয়ে ট্রেনে উঠতে হয়। অতএব আমি তাকে আমার দুইহাতে তুলে নিলাম এবং ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে নিয়ে উঠালাম। ফিনিক্স থেকে আমরা তাকে দোলনা-বিছানায় বয়ে নিলাম এবং সেখানে পানি চিকিৎসার মাধ্যমে সে শরীরের শক্তি ধীরে ধীরে ফিরে পেল।

আমাদের ফিনিক্সে পৌঁছার দু'তিন দিনের মধ্যে একজন স্বামী (সাধু) আমাদের বসতিতে এলেন। আমরা কিভাবে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ উপেক্ষা করে চলে এসেছি তিনি তা শুনেছিলেন এবং সহানুভূতিশীল হয়ে তিনি আমাদেরকে বোঝাতে চাইলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে যখন স্বামী (সাধু) আসেন তখন আমার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র মনিলাল ও রামদাস হাজির ছিল। মনু থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি যুক্তি দেখালেন যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মাংস খাওয়া ক্ষতিকর নয়। আমার স্ত্রীর সামনে তিনি এ বিতর্কিত বিষয়ের আলোচনা অব্যাহত রাখুন আমি তা চাচ্ছিলাম না, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে তাকে বারণ করতে পারলাম না। আমি এ সম্পর্কিত মনুস্মৃতির শ্লোকগুলো জানতাম, কিন্তু আমার বিশ্বাসের জন্য ওগুলোর প্রয়োজন ছিল না। আমি এটাও জানতাম যে, পণ্ডিতদের মধ্যে একদল আছেন যারা ঐ শ্লোকগুলোকে প্রক্ষেপণ বলে মনে করেন। তা যদি সত্য নাও হয় তাহলেও আমি নিরামিষ ভোজনের মতবাদ ধর্মগ্রন্থ থেকে আলাদাভাবেই পোষণ করি এবং এতে কস্তুরবাই এর বিশ্বাসও ছিল অবিচল। তার কাছে ধর্মগ্রন্থ ছিল অপরিবর্তনীয় পুস্তক কিন্তু তার পূর্ব পুরুষদের ধর্মই তার জন্য যথেষ্ট ছিল।

www.pathagar.com

ছেলেরা তাদের ধর্মের দোহাই দিয়ে স্বামীজির আলোচনার গুরুত্ব কমিয়ে দিল কিন্তু কস্তুরবাই তার আলোচনা একেবারেই থামিয়ে দিল। সে বলল, "স্বামীজি, আপনি যাই বলুন না কেন আমি গো-মাংস-চা খেয়ে সুস্থ হতে চাই না। আমার অনুরোধ, আপনি আমাকে নিয়ে আর চিন্তা করবেন না। ইচ্ছে করলে আপনি এ বিষয়ে আমার স্বামী ও ছেলেদের সাথে কথা বলতে পারেন। কিন্তু আমি আমার মন স্থির করে ফেলেছি।"

উনত্রিশ

ঘরোয়া সত্যাগ্রহ

আমার জেল জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা হয় ১৯০৮ সালে। আমি দেখলাম যে কয়েদীদেরকে এমন কতকগুলো নিয়ম মানতে হয় যা একজন ব্রহ্মচারী তথা আত্ম-সংযম অনুশীলনে ইচ্ছুক ব্যক্তি কর্তৃক স্বেচ্ছায় পালন করা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, নিয়মের একটা ছিল সূর্যাস্তের পূর্বে দিনের শেষ আহার গ্রহণ। ভারতীয় ও আফ্রিকান কয়েদীদেরকে চা বা কফি দেয়া হতো না। রান্না করা খাবারের সাথে তারা ইচ্ছে করলে লবণ মিশিয়ে নিতে পারত, তবে স্বাদ বাড়ানোর জন্য আর কিছু নিতে পারত না। আমি যখন জেলের মেডিকেল অফিসারকে আমাদের জন্য কারি পাউডার (মশলার গুড়া) দিতে বললাম এবং রান্নার সময় তরকারীতে লবণ মিশিয়ে দিতে বললাম, তিনি বললেন, "এখানে রসনা তৃপ্তির জন্য তোমাদের আনা হয়নি। স্বাস্থ্য রক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে কারি পাউডারের প্রয়োজন নেই এবং তরকারীতে লবণ রান্নার সময়ে মেশানো আর পরে মেশানোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।"

যদিও অনেক কষ্টের পরে অবশেষে নিয়ম-কানুনগুলো সংশোধন করা হয়েছিল, কিন্তু উভয় নিয়মই আত্ম-সংযমের জন্য উপকারী ছিল। বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া দমননীতি খুব একটা সফল হয় না কিন্তু যখন তা স্ব-আরোপিত হয়, নিশ্চিতভাবে তার ফল হয় হিতকর। সুতরাং জেল থেকে বের হবার পর অনতিবিলম্বে আমি নিজের ওপর দুটি নিয়ম চাপিয়ে দিলাম। তখন থেকে যতটা সম্ভব আমি চা পান বন্ধ করা এবং সূর্যাস্তের পূর্বে দিনের শেষ আহার সমাপ্ত করার অভ্যাস করলাম। উভয় নিয়ম পালনে এখন আর চেষ্টা করতে হয় না। একটা দুর্ঘটনা আমাকে পুরোপুরিভাবে লবণ ত্যাগ করতে বাধ্য করল এবং এ নিয়ন্ত্রণ অবিচ্ছিন্নভাবে আমি দশ বছর ধরে পালন করেছিলাম। নিরামিষ ভোজনের ওপর কিছু বইতে আমি পড়েছিলাম যে মানুষের খাবারের উপাদান হিসেবে লবণের প্রয়োজনীয়তা নেই, বরং উল্টো লবণহীন খাবার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে ব্রহ্মচারীর জন্য লবণহীন খাবার উপকারী। আমি আরো পড়েছিলাম এবং উপলব্ধি করেছিলাম যে যাদের শরীর দুর্বল তাদের ডাল না খাওয়া ভালো। বিভিন্ন প্রকার ডাল আমার প্রিয় খাবার ছিল।

www.pathagar.com

কস্তুরবাই তার অপারেশনের পর কিছুদিন ভালো থাকল, কিন্তু আবার তার রক্তস্রাব শুরু হলো এবং অসুখটা নাছোড়বান্দার মতো তাকে পেয়ে বসল। জল-চিকিৎসায় কোনো কাজ হলো না। আমার টোটকা চিকিৎসায় তার বেশী বিশ্বাস ছিল না, যদিও এতে সে বাধা দিত না। অসুখ বিসুখে সে কখনওই বাইরের সাহায্য চাইত না। সুতরাং যখন আমার সকল চিকিৎসা ব্যর্থ হলো আমি তাকে লবণ ও ডাল খাওয়া ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলাম। আমার যুক্তির সমর্থনে বিভিন্ন প্রামাণিক দলিল উদ্ধৃতি করে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে রাজী হলো না। অবশেষে সে আমাকে এই বলে চ্যালেঞ্জ করল যে আমাকে কেউ বললে আমিও ওগুলো খাওয়া ছেড়ে দিতে পারব না। আমি ব্যথিত হলেও খুশী হলাম, খুশী এ কারণে যে আমি তার প্রতি আমার ভালোবাসা বর্ষণের একটা সুযোগ পেলাম। তাকে বললাম, "তুমি ভুল করছ। আমি যদি অসুস্থ হতাম, আর ডাক্তার আমাকে ওগুলো বা অন্য যা কিছু খেতে বারণ করত আমি নির্দ্বিধায় তা পালন করতাম। তুমি কর আর না কর আমি কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই এক বছর যাবৎ লবণ ও ডাল খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।"

সে খুব মানসিক আঘাত পেল এবং গভীর দুঃখের সাথে বলে উঠল, "দয়া করে আমাকে ক্ষমা ক'রো। তোমার সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তোমাকে আঘাত দেয়া আমার উচিত হয়নি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি ওগুলো খাব না। ঈশ্বরের দোহাই তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর। তোমার প্রতিজ্ঞা আমার জন্য অসহ্য।"

"লবণ ও ডাল ছেড়ে দেয়া তোমার জন্য খুবই উত্তম। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে ওগুলো না খেলে তুমি ভালো থাকবে। আমার ব্যাপার হলো, গুরুত্বপূর্ণ মনে করে কোনো প্রতিজ্ঞা করলে তা থেকে ফিরে আসতে পারি না। আর এটা আমার জন্য উপকারী। যে প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই হোক না কেন, সংযম পালন মানুষের জন্য উপকারী। সুতরাং আমাকে আমার মতো চলতে দাও। এটা আমার জন্য একটি পরীক্ষা আর তোমার সিদ্ধান্ত পালনের প্রতি নৈতিক সমর্থন।"

সুতরাং সে তর্কে ক্ষান্ত দিল। "তুমি বড়ই জেদী। কারো কথাই তুমি শুনবে না" বলে সে অশ্রুপাতের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজল।

এ ঘটনাকে আমি সত্যাগ্রহের একটা উদাহরণ স্বরূপ গণ্য করতে চাই এবং এটা আমার জীবনের মধুরতম স্মৃতিগুলোর একটি।

এরপর থেকে কস্তুরবাই দ্রুত আরোগ্য লাভ করতে থাকল- সেটা কি লবণ-ডাল বিহীন পথ্যের কারণে, নাকি খাবারের অন্যান্য পরিবর্তনের কারণে; জীবনের অন্যান্য নিয়ম পালনে আমার কড়া সতর্কতা, নাকি ঐ ঘটনায় সৃষ্ট মানসিক উৎফুলতার কারণে এবং যদি তাই হয় তাহলে কোনটির জন্য কি পরিমাণে, তা আমি বলতে পারি না। কিন্তু সে দ্রুত স্বাস্থ্য শক্তি ফিরে পেল, রক্তস্রাব একবারে বন্ধ হলো এবং হাতুড়ে বৈদ্য হিসেবে আমার খ্যাতি কিছুটা বাড়ল।

www.pathagar.com

আমার ব্যাপারে বলতে পারি খাবারে সংযম পালন করে আমি ভালো থেকেছি। যেগুলো আমি ত্যাগ করেছি সেগুলোর জন্য কখনো লালায়িত হইনি, বছর পার হয়ে গেল এবং আমি আগের চাইতে বেশী ইন্দ্রিয় দমনে সফল হলাম। এ পরীক্ষা নিরীক্ষা আত্মসংযমের প্রবণতা আরো উদ্দীপ্ত করল এবং ভারতে ফিরে আসার পরেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত লবণ-ডাল বর্জন অব্যাহত ছিল। ১৯১৪ সালে কেবলমাত্র একবার ঐ দুটি জিনিস খেতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু সে ঘটনা এবং কিভাবে তা ঘটল সে সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বলব।

আমি দক্ষিণ আফ্রিকাতে লবণ ও ডালবিহীন পথ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমার সহকর্মীদের অনেকের ওপর চালিয়েছি এবং তার ফলাফল ভালো পেয়েছি। চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিতে এ পথ্যের ব্যাপারে দ্বিমত থাকতে পারে, কিন্তু নৈতিক দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে সকল আত্ম-বঞ্চনা আত্মার জন্য কল্যাণকর। আত্ম-সংযমী মানুষের খাবার ভোগ বিলাসী মানুষের থেকে অবশ্যই আলাদা হবে, তাদের জীবন যাপনও যেমন ভিন্ন হয়। ব্রহ্মচর্যের সাধক ভোগ বিলাসী মানুষের খাবার গ্রহণের মাধ্যমে প্রায়ই তার থেকে বিচ্যুত হয়।

ত্রিশ
আত্ম-সংযমের পথে

পূর্বের অধ্যায়ে আমি বর্ণনা করেছি কিভাবে কস্তুরবাই এর অসুস্থতা আমার খাবারের অভ্যাসে পরিবর্তন এনেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে ব্রহ্মচর্যের সমর্থনে আরো পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছিল।

এগুলোর মধ্যে প্রথম ছিল দুধ পান ছেড়ে দেয়া। রায়চাঁদ ভাই এর কাছ থেকে জেনেছিলাম যে দুধ পাশবিক কামনাকে জাগ্রত করে। নিরামিষ ভোজন সংক্রান্ত বই এ ধারণাকে সমর্থন করে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত ব্রহ্মচার্য ব্রত গ্রহণ করিনি ততদিন দুধপান ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে মনস্থির করতে পারিনি। আমি অনেক আগেই বুঝেছি যে, শরীরকে টিকিয়ে রাখতে দুধের প্রয়োজন নেই, কিন্তু এটা ছেড়ে দেয়া সহজ নয়। আত্ম-সংযমের স্বার্থে যখন দুধপান ত্যাগ করার প্রয়োজনীয়তা বেশী করে অনুভব হচ্ছিল, এ সময়ে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত কিছু লেখা পড়লাম যাতে গরু-মহিষের ওপর তাদের মালিকেরা যে অত্যাচার করে তার বর্ণনা ছিল। আমার ওপর এর আশ্চর্য প্রভাব পড়ল। আমি এ নিয়ে মি. ক্যালেনবাজের সাথে আলোচনা করলাম।

যদিও আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের ইতিহাস এর পাঠকের সাথে মি. ক্যালেনবাচ এর পরিচয় করিয়ে দিয়েছি এবং পূর্ববর্তী অধ্যায়েও তার উল্লেখ করেছি, তার সম্পর্কে এখানে আরো কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি। দৈবক্রমে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি ছিলেন মি. খানের বন্ধু এবং মি. খান যেহেতু তার মধ্যে গভীর পরলৌকিক মানসিকতার সন্ধান পেয়েছিলেন, তাই আমার সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

আমি যখন তার সাথে পরিচিত হলাম বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতার প্রতি তার আকর্ষণ দেখে আমি চমকে গেলাম। কিন্তু আমাদের প্রথম দেখাতেই ধর্মীয় ব্যাপারে তিনি অনুসন্ধিৎসু প্রশ্ন করলেন। প্রসঙ্গক্রমে আমরা গৌতম বুদ্ধের ত্যাগ নিয়ে কথা বললাম। আমাদের পরিচয় অতি শীঘ্রই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হলো এবং তা এতটাই গভীর হলো যে আমরা একই রকম চিন্তা করতে থাকলাম এবং আমি আমার জীবনে যে পরিবর্তন এনেছি তার জীবনেও একই পরিবর্তন সাধনে তিনি সম্মত হলেন।

প্রথমে তিনি একা ছিলেন এবং বাড়ী ভাড়া বাদে প্রতি মাসে ১২০০ রুপি নিজের জন্য ব্যয় করতেন। এখন তিনি তার জীবন যাত্রা এতটা সহজ করে ফেললেন যে তার ব্যয় প্রতি মাসে ১২০ রুপিতে নেমে এলো। আমার বাসা ছেড়ে দেয়া এবং জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আমরা একত্রে বাস করতে লাগলাম। আমাদের জীবনযাত্রা মোটামুটি কঠিন ছিল।

এই সময়ে আমরা দুধ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। মি. ক্যালেনবাচ বললেন, "আমরা সর্বক্ষণ দুধের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে কথা বলে যাচ্ছি। তাহলে আমরা এটা পান করা ছেড়ে দিচ্ছি না কেন? নিশ্চয়ই দুধ পানের কোনো প্রয়োজন নেই।" এই পরামর্শে আমি আশ্চর্য হয়ে সম্মত হলাম এবং একে স্বাগত জানালাম। আমরা দু'জনেই তৎক্ষণিক দুধ পান ত্যাগ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম। এ ঘটনাটা ঘটল টলস্টয় ফার্মে ১৯১২ সালে।

কিন্তু দুধ পানে অস্বীকৃতি আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। এর পরই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম বিশুদ্ধ ফল খেয়ে জীবন ধারণের এবং যথা সম্ভব সস্তা ফল খেয়ে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল সবচেয়ে দরিদ্র লোকের মতো জীবন যাপন। ফলাহার খুব উপযোগী বলে প্রমাণিত হলো। প্রকৃতপক্ষে রান্নার কাজ পরিত্যক্ত হলো। কাঁচা বাদাম, কলা, খেজুর, লেবু এবং জলপাই তেল হলো আমাদের খাবারের সাধারণ উপাদান।

আমি এখানে ব্রহ্মচর্য সাধকের জন্য একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই। যদিও আমি খাদ্য ও ব্রহ্মচর্যের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছি, এটা নিশ্চিত মানুষের মন হলো প্রধান বস্তু। যে মন সচেতনভাবে অপরিস্কার, উপোসের মাধ্যমে তাকে পরিষ্কার করা যায় না। খাবারে পরিবর্তন এর ওপর কোনো প্রভাব ফেলে না। মনের মধ্যেকার কাম-প্রবৃত্তি কঠোর আত্ম-পরীক্ষা, ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ এবং সর্বশেষ ঈশ্বরের করুণা ব্যতীত মূলোৎপাটন করা যায় না। তবে শরীর ও মনের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে এবং কামুক মন সর্বদা সুস্বাদু খাবার ও বিলাসিতা কামনা করে। এ প্রবণতা দূর করতে খাবারে সংযমী হওয়া ও উপোষ করা প্রয়োজন। কামুক মন ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রনের পরিবর্তে তার দাসে পরিণত হয়। আর সেজন্যই শরীরের সর্বদা প্রয়োজন উত্তেজনা প্রশমনকারী পরিষ্কার খাবার এবং মাঝে মাঝে উপোষ।

খাবারের সংযম ও উপোষকে যারা হালকাভাবে দেখেন তারা তাদের মতোই ভুল করেন যারা এটাকেই সব কিছু বলে মনে করেন। অভিজ্ঞতা আমাকে শিক্ষা

www.pathagar.com

দিয়েছে যে যাদের মন আত্ম-সংযমের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে তাদের জন্য খাবারের সংযম ও উপোষ খুবই সহায়ক। প্রকৃতপক্ষে এগুলোর সাহায্য ছাড়া মনের কাম-প্রবৃত্তি সমূলে উপড়ে ফেলা যায় না।

একত্রিশ
উপোষ

যে সময়ে আমি দুধ ও তরল খাবার ত্যাগ করলাম এবং ফলাহারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলাম প্রায় ঐ সময়েই আমি আত্ম-সংযমের উপায় হিসেবে উপোষ করতে শুরু করলাম। এতে মি. ক্যালেনবাচ আমার সঙ্গী হলেন। মাঝে মধ্যে আমি উপোষ করতাম কিন্তু তা ছিল সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যগত কারণে। একজন বন্ধুর কাছ থেকে জানলাম যে আত্ম-সংযমের জন্যও উপোষ করা প্রয়োজন।

বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম এবং যে মা সকল প্রকার কঠিন ব্রত পালনে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ তাঁর সন্তান হিসেবে ভারতে থাকতে আমি একাদশী ও অন্যান্য তিথিতে উপোষ পালন করতাম। তবে তা ছিল শুধুমাত্র আমার মায়ের অনুকরণ এবং পিতামাতার সন্তুষ্টির জন্য।

সে সময়ে আমি উপোসের কার্যকারিতা সম্পর্কে বুঝিনি, বিশ্বাসও করিনি। কিন্তু যখন দেখলাম যে আমার ঐ বন্ধু উপোষ করে উপকৃত হচ্ছেন, ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনে সহায়ক হবে–এ আশা নিয়ে বন্ধুটির অনুসরণে আমিও একাদশীর উপোষ শুরু করলাম। নিয়মনুযায়ী হিন্দুরা উপোসের দিনে দুধ ও ফলাহার করতে পারে। কিন্তু সে ধরনের উপোষ তো আমি প্রতিদিনই করছি। তাই আমি শুধুমাত্র পানি পানসহ সম্পূর্ণ উপোষ শুরু করলাম।

আমি যখন এ পরীক্ষা শুরু করলাম তখন হিন্দুমতে শ্রাবণ মাস এবং ইসলামীমতে রমজান মাস একই সময়ে পড়ল। গান্ধী পরিবার শুধুমাত্র বৈষ্ণব ব্রত নয় শৈবব্রতও পালন করত এবং বিষ্ণু ও শিব মন্দির দর্শন করত। পরিবারের কেউ কেউ পুরো শ্রাবণ মাস ধরে প্রদোষ (সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপোষ) পালন করত। আমিও তা পালনের সিদ্ধান্ত নিলাম।

এ গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলো চলছিল যখন আমি ও মি. ক্যালেনবাচ যুবক ও শিশুসহ কয়েকটি সত্যাগ্রহী পরিবারের সাথে টলস্টয় ফার্মে থাকতাম। এখানকার শিশুদের জন্য আমরা একটা স্কুল খুলেছিলাম। এদের মধ্যে চার-পাঁচজন মুসলমান ছিল। আমি তাদের সকল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে সর্বদা সাহায্য করতাম এবং উৎসাহ দিতাম। তারা যাতে দৈনিক নামাজ পড়তে পারে সে বিষয়ে আমি খেয়াল রাখতাম। সেখানে খৃষ্টান ও পার্সী যুবকরাও ছিল, তাদেরকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে সহায়তা করাকে আমার কর্তব্য বলে মনে করতাম।

সুতরাং এ মাসে আমি মুসলমান যুবকদেরকে রমজানের রোযা রাখতে উদ্বুদ্ধ করলাম। আমি নিজেও প্রদোষ পালনের সিদ্ধান্ত নিলাম এবং হিন্দু, পার্সী ও খৃষ্টান যুবকদেরকে আমার সাথে উপোসে যোগ দিতে বললাম। আমি তাদেরকে ব্যাখ্যা

www.pathagar.com

করে বোঝালাম যে আত্ম-ত্যাগের যে কোনো উদ্যোগে অন্যের সাথী হওয়া সর্বদাই উত্তম কাজ। ফার্মের অনেকেই আমার প্রস্তাবকে স্বাগত জানাল। হিন্দু ও পার্সী যুবকেরা মুসলমানদেরকে পুরোপুরি অনুসরণ করল না, করার প্রয়োজনও ছিল না। মুসলমান যুবকদেরকে রোযা ভঙ্গ করার জন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। অন্যদেরকে সেটা করতে হলো না। এবং মুসলমান বন্ধুদের জন্য তারা মুখরোচক খাবার তৈরী করে পরিবেশন করল। হিন্দু ও অন্য যুবকরা সূর্যোদয়ের পূর্বে মুসলমানদের শেষ আহারেও শামিল হলো না। অবশ্য মুসলমান ছাড়া অন্য সবার জন্য পানি পানের অনুমতি ছিল।

এ পরীক্ষার ফলে উপোসের উপকারিতা সম্পর্কে সবাই বুঝতে পারল এবং তাদের মধ্যে দলবদ্ধভাবে ত্যাগের মনোভাব গড়ে উঠল।

টলস্টয় ফার্মে আমরা সবাই নিরামিষভোজী ছিলাম। এখানে সবাই আমার অনুভূতির প্রতি সম্মান জানাতে সদা প্রস্তুত ছিলেন। সেজন্য তাদের সবাইকে আমার ধন্যবাদ। মুসলমান যুবকরা রমজান মাসে তাদের মাংস খাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে কিন্তু তাদের কেউ আমাকে তা জানতে দেয়নি। তারা সানন্দে নিরামিষ খাবারের স্বাদ উপভোগ করেছে এবং হিন্দু যুবকরা ফার্মের সরল জীবন যাপনের সাথে সঙ্গতি রেখে নিজেদের জন্য নানা পদের নিরামিষ খাবার রাঁধত।

উপোষ সম্পর্কিত এ অধ্যায়ের মূল বিষয় থেকে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সরে গিয়েছি, কারণ এসব সুখ-স্মৃতির কথা আর কোথাও বর্ণনা করতে পারতাম না এবং পরোক্ষভাবে আমি আমার একটা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছি, তা হলো ভালো কাজে আমার সহকর্মীদেরকে সাথে নেয়া সর্বদাই আমার পছন্দ। উপোষ করা তাদের জন্য নতুন ছিল কিন্তু প্রদোষ ও রমজানকে ধন্যবাদ, কারণ এ সময়ের আত্ম-সংযমকে উপলক্ষ্য করে অন্যদেরকে উপোষে আগ্রহী করা আমার জন্য সহজ হয়েছিল।

এভাবে ফার্মে আত্ম-সংযমের একটা স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে উঠল। ফার্মের সকল অধিবাসী এখন আংশিক ও পূর্ণ উপোষ পালনে আমাদের সাথে যোগ দিল, আমি নিশ্চিত যে এতে সবার মঙ্গল হয়েছিল। এ আত্ম-সংযম তাদের হৃদয়কে কতটা স্পর্শ করেছিল এবং দৈহিক কামনাকে পরাভূত করতে করতে কতটা সহায়ক হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলতে পারিনা। অবশ্য আমার নিজের ব্যাপারে বলতে পারি যে শারীরিক ও নৈতিকভাবে আমি এ থেকে প্রভূত উপকার পেয়েছি। কিন্তু আমি জানি যে উপোষ বা এ ধরনের শৃঙ্খলা সকলের জন্য সমভাবে ফলপ্রসূ হবে এমন কোনো কথা নেই।

উপোষ পাশবিক কামনাকে দমন করতে পারে যদি তা আত্ম-সংযমের উদ্দেশে নিয়ে পালন করা হয়। আমার কতিপয় বন্ধু প্রকৃতপক্ষে উপোষের ফলে তাদের দৈহিক কামনা ও রসনা তৃপ্তির বাসনা বেড়ে গেছে বলে জানিয়েছে। তাহলে বলা যায় যে আত্ম-সংযমের অবিরাম আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত উপোষ করা বৃথা। এ প্রসঙ্গে ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিখ্যাত শ্লোকটি উল্লেখযোগ্য-

www.pathagar.com

"বাহ্যিকভাবে যে জন ইন্দ্রিয় দমনে উপোষ করে
বস্তুগত কামনা তিরোহিত হয় কিন্তু পাওয়ার ব্যাকুলতা রয়ে যায়
কিন্তু যখন সে লাভ করে উচ্চতমের দর্শন
তখন পাওয়ার ব্যাকুলতাও তিরোহিত হয়।"

অতএব আত্ম-সংযমের লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপোষ ও এ ধরনের শৃঙ্খলা একটি উপায় মাত্র, তবে তা সবকিছু নয় এবং শরীরের উপোষের সাথে যদি মনের উপোষ না থাকে তাহলে তা হবে ভণ্ডামী এবং এর ফলাফলও হবে ধ্বংসাত্মক।

বত্রিশ

স্কুল মাস্টারের ভূমিকায়

আশা করি পাঠকদের মনে আছে যে, আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের ইতিহাস বইতে যে ঘটনাগুলোর উল্লেখ করিনি অথবা খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি এ অধ্যায়গুলোতে শুধু তারই বর্ণনা করছি। এটা মনে থাকলে পাঠক সাম্প্রতিক অধ্যায়গুলোর মধ্যে সংযোগ সহজে বুঝতে পারবেন।

ফার্মের বেড়ে ওঠার সাথে সাথে এখানকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন দেখা দিল। এদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, পার্সী ও খৃষ্টান ছেলে এবং কয়েকজন হিন্দু মেয়ে ছিল। এদের জন্য বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব ছিল না, আর তা প্রয়োজন বলেও আমি মনে করতাম না। এটা সম্ভব ছিল না, কারণ উপযুক্ত ভারতীয় শিক্ষকের অভাব ছিল, আর যদিও পাওয়া যেত স্বল্প বেতনে জোহান্সবার্গ থেকে ২১ মাইল দূরে কেউ যেতে রাজী হতো না। আমাদের অর্থের প্রাচুর্যও ছিল না। ফার্মের বাইরে থেকে শিক্ষক আমদানীর প্রয়োজন আছে বলেও আমি ভাবিনি। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর আমার আস্থা ছিল না এবং আমার ইচ্ছা ছিল অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক শিক্ষা ব্যবস্থা খুঁজে বের করার। আমি শুধু এটুকু জানতাম যে, আদর্শ অবস্থায় কেবল পিতামাতাই সত্যিকার শিক্ষা দিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বাইরের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা হবে ন্যূনতম। জানতাম যে টলস্টয় ফার্ম ছিল একটা পরিবার যেখানে আমি ছিলাম এর অভিবাবক এবং যতদূর সম্ভব এখানকার শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব আমার গ্রহণ করা উচিত।

নিঃসন্দেহে আমার ধারণা ত্রুটিহীন ছিল না। সকল ছেলেমেয়ে শিশুকাল থেকে আমার সাথে বাস করেনি, তারা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ও পরিবেশে গড়ে উঠেছে এবং তারা সবাই এক ধর্মের অনুসারীও নয়। এমতাবস্থায় আমি তাদের পরিবার প্রধান হলেও কিভাবে তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করব?

তবে আমি সর্বদা হৃদয়বৃত্তির চর্চা বা চরিত্র গঠনের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছি আর যেহেতু আমার আত্মবিশ্বাস ছিল যে তাদের সবাইকে সমভাবে নৈতিক শিক্ষা দেয়া যেতে পারে, তাদের বয়স ও লালন-পালনের পার্থক্য যাই হোক না কেন।

www.pathagar.com

তাদের অভিভাবক হিসেবে আমি তাদের মাঝে চব্বিশ ঘন্টাই থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। চরিত্র গঠনকে আমি তাদের সঠিক শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করলাম এবং আমি নিশ্চিত ছিলাম যে যদি তাদের এ ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় তাহলে তারা নিজেরাই অথবা বন্ধুদের সাহায্যে অন্য সকল বিষয় শিখতে পারবে।

কিন্তু যেহেতু আমি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পুরোপুরি উপলব্ধি করছিলাম তাই মি. ক্যালেনবাচ ও শ্রীযুক্ত প্রাগজী দেশাই এর সহায়তায় ক্লাশ করানো শুরু করলাম। শিশুদের শরীর গঠনকে অবহেলা করলাম না। তাদের দৈনন্দিন রুটিনেই শরীর গঠনের শিক্ষা পাচ্ছিল। কারণ ফার্মে কোনো চাকর ছিল না এবং রান্না করা থেকে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার পর্যন্ত সব কিছুই বাসিন্দাদের নিজেদেরকে করতে হতো। অনেক ফলের গাছ ছিল যেগুলোর যত্ন নিতে হতো এবং যথেষ্ট পরিমাণে বাগানের কাজও করতে হতো। বাগান করা মি. ক্যালেনবাচের প্রিয় শখ ছিল এবং একটি সরকারী আদর্শ বাগান থেকে এ কাজের অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছিলেন। যারা রান্নার কাজ করত না তাদের মধ্যে ছেলে-বুড়ো সকলকেই কিছু সময় বাধ্যতামূলকভাবে বাগানে কাজ করতে হতো। একাজের বেশিরভাগ করত ছেলেরা, যার মধ্যে ছিল গর্ত খোঁড়া, গাছ কাটা এবং বোঝা বহন করা। এতে তাদের পর্যাপ্ত ব্যায়াম হতো। তারা সানন্দে কাজ করত আর তাই সাধারণত তাদের অন্য ব্যায়াম বা খেলাধুলার প্রয়োজন হতো না। অবশ্য তাদের কয়েকজন এবং মাঝে মধ্যে সবাই, অসুস্থতার ভান করে কাজে ফাঁকি দিত। কোনো কোনো সময় আমি তাদের ছলনা দেখেও না দেখার ভান করতাম, তবে প্রায়ই আমি তাদের ওপর কঠোর হতাম। তাদেরকে যুক্তি দিয়ে বুঝাতাম যে কাজ নিয়ে খেলা করা উচিত নয়। তাদের এ বুঝ প্রায়ই ক্ষণস্থায়ী হতো এবং পরক্ষণেই কাজ ফেলে আবার তারা খেলায় মেতে উঠত। এভাবেই আমরা চালিয়ে যাচ্ছিলাম এবং তা সত্ত্বেও তারা সুন্দর শারীরিক গঠন অর্জন করল। ফার্মে অসুস্থতার ঘটনা প্রায় ছিল না যদিও বলা যায় যে এর জন্য মুক্ত বাতাস, পানি ও নিয়মিত খাবার গ্রহণের অবদান কম ছিল না।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্পর্কে একটা কথা আছে। আমার ইচ্ছে ছিল প্রত্যেক বালক-বালিকাকে কিছু প্রয়োজনীয় হাতের কাজ শিক্ষা দেয়া। এ কাজের জন্য মি. ক্যালেনবাচ একটা ট্রাপিস্টদের (মৌনব্রত পালনকারী সাধুদের) গীর্জায় গেলেন এবং জুতা তৈরীর কৌশল জেনে এলেন। আমি তার কাছ থেকে বিদ্যাটা জেনে নিলাম এবং যারা এটা শিখতে আগ্রহী তাদেরকে শিক্ষা দিলাম। মি. ক্যালেনবাচের ছুতারের কাজেরও কিছু অভিজ্ঞতা ছিল, আরো একজন বাসিন্দা কাজটা জানত। তাই আমরা ছুতারের কাজের ওপর একটা ক্লাশ নিলাম। রান্না তো প্রায় সকল যুবকই জানত।

এসব বিষয় তাদের কাছে ছিল নতুন। তারা স্বপ্নেরও ভাবেনি যে তাদেরকে একদিন এসব শিখতে হবে। এর কারণ, সাধারণত দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় শিশুদেরকে "তিনটি আর" (Three R's) সম্পর্কে পড়ানো হতো।

www.pathagar.com

টলস্টয় ফার্মে নিয়ম করা হয়েছিল যে, শিক্ষকরা যা করেননি, ছাত্রদেরকে তা করতে বলা হবে না। সে কারণে যখনই তাদেরকে কোনো কাজ করতে বলা হতো তখনই তাদের সাথে একজন শিক্ষক সহযোগিতা করতেন এবং বাস্তবে তাদের সাথে কাজ করতেন। সুতরাং ছাত্ররা যা শিখত, তা তারা আনন্দের সাথে শিখত।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ওপর পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হবে।

তেত্রিশ
প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

টলস্টয় ফার্মে কিভাবে শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল তার বর্ণনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে বৃত্তিমূলক শিক্ষার কথাও বলা হয়েছে। যদিও শিক্ষার ব্যবস্থা এমনভাবে করা হয়েছে যে তা আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, তবে তা মোটামুটি সফল হয়েছিল বলে দাবী করা যেতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অবশ্য আরো কঠিন বিষয় ছিল। এর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ ও যন্ত্রপাতি আমার ছিল না। আমি যে শারীরিক পরিশ্রম করছিলাম তা সারাদিনের শেষে আমাকে একেবারে ক্লান্ত করে ফেলতো এবং তখনই ক্লাশ নিতে হতো যখন আমার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন বিশ্রাম। সুতরাং ক্লাশ নেয়ার জন্য নিজেকে চাঙ্গা রাখার পরিবর্তে অনেক কষ্টে কোনোরকমে নিজেকে জাগিয়ে রাখতাম। সকালের সময়টাতে ফার্মের কাজ ও ঘরোয়া কর্তব্যে মনোযোগ দিতে হতো, সুতরাং স্কুলের সময় রাখা হয়েছিল মধ্যাহ্ন ভোজের পর। স্কুলের জন্য আর কোনো উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করা যায়নি।

আমরা সর্বোচ্চ তিন পিরিয়ড ক্লাশের ব্যবস্থা করেছিলাম। হিন্দী, তামিল, গুজরাটী ও উর্দু সবই শেখানো হতো এবং ছেলেমেয়েদের আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষা দেয়া হতো। ইংরেজীও শেখানো হতো। গুজরাটী হিন্দু শিশুদেরকে কিছুটা সংস্কৃত ভাষা শেখানোর এবং সকল শিশুকেই ইতিহাস, ভূগোল ও অংকের প্রাথমিক পাঠদানের প্রয়োজন ছিল। আমি নিজে তামিল ও উর্দু পড়ানোর দায়িত্ব নিলাম। আমি অল্প যেটুকু তামিল জানতাম তা সমুদ্রপথে জাহাজে এবং জেলে বসে শিখেছিলাম। আমার বিদ্যা পোপের লেখা "উত্তম তামিল শিক্ষা" বই এর বেশী ছিল না। উর্দু বর্ণমালায় আমার জ্ঞান ছিল একবার সমুদ্রযাত্রায় যা অর্জন করেছিলাম সেটুকু এবং এ ভাষায় আমার জ্ঞান পরিচিত কিছু ফার্সী ও আরবী শব্দ যা মুসলমান বন্ধুদের সংস্পর্শে থেকে শিখেছিলাম তার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আর সংস্কৃতের জ্ঞান হাই স্কুলে যতটা শিখেছিলাম ততটাই এবং গুজরাটীর জ্ঞানও হাইস্কুলে যা শেখানো হয় তার বেশী ছিল না।

এই ছিল আমার বিদ্যার বহর যা নিয়ে আমাকে চালিয়ে যেতে হচ্ছিল। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের বিষয়ে আমার সহকর্মীরা আমার

www.pathagar.com

চেয়ে ভালো ছিল। তবে স্বদেশী ভাষার প্রতি আমার ভালোবাসা, শিক্ষক হিসেবে আমার নিজের ওপর আস্থা, আর আমার ছাত্রদের অজ্ঞতা এবং সর্বোপরি তাদের উদারতা ইত্যাদি মিলিয়ে আমার অবস্থান মোটামুটি ভালোই ছিল।

তামিল শিশুদের সবারই জন্ম হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়, আর তাই তারা তামিল ভাষা তেমন জানত না এবং অক্ষর চিনত না মোটেই। সুতরাং আমি তাদেরকে বর্ণমালা ও প্রাথমিক ব্যাকরণ শিক্ষা দিতাম। এগুলো শেখানো বেশ সহজ ছিল। আমার ছাত্ররা জানত যে তারা যে কোনো সময় তামিল ভাষায় কথোপকথনে আমাকে ছাড়িয়ে যাবে এবং যখন ইংরেজী না জানা তামিলরা আমার সাথে দেখা করতে আসত, তারা আমার দোভাষীর কাজ করত। আমি সানন্দেই শিক্ষকতা চালিয়ে যাচ্ছিলাম, কারণ আমি কখনোই ছাত্রদের থেকে আমার অজ্ঞতা লুকাবার চেষ্টা করতাম না। আমি সর্বদাই সকল বিষয়ে আমার প্রকৃত রূপ ছেলেদের নিকট তুলে ধরতাম। মুসলমান ছেলেদেরকে উর্দু শেখানো তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল। তারা উর্দু বর্ণমালা চিনত, আমাকে শুধু তাদের মধ্যে পড়ার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হতো এবং হাতের লেখা উন্নত করাতে হতো।

এসব ছেলেমেয়ের বেশিরভাগ ছিল অক্ষর জ্ঞানহীন এবং তারা স্কুলে যায়নি। কিন্তু কাজ করতে করতে দেখলাম যে আলস্য ত্যাগ করানো এবং তাদের পড়ার ওপর নজর রাখা ছাড়া তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার বেশি কিছু ছিল না। যেহেতু আমি এটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম, তাই একটা ক্লাশরুমে বিভিন্ন বয়সের ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা চালিয়ে যেতে অসুবিধা হচ্ছিল না।

পাঠ্যবই সম্পর্কে আমরা অনেক কথা শুনে থাকি তবে এর অভাব বোধ করিনি। যেসব পাঠ্যবই পাওয়া যাচ্ছিল সেগুলোরও খুব বেশি ব্যবহার হয়েছে বলে মনে পড়ে না। ছাত্রদের ওপর বেশি বই এর বোঝা চাপানো মোটেই যুক্তিযুক্ত নয় বলে আমার ধারণা। আমি সর্বদা অনুভব করেছি যে ছাত্রদের জন্য সত্যিকার পাঠ্যবই হলো তাদের শিক্ষক। মনে পড়ে আমার শিক্ষকরা পাঠ্যবই থেকে আমাকে খুব অল্পই পড়িয়েছেন, তবে বই এর বাইরে থেকে তারা যা শিক্ষা দিয়েছেন তা এখনো পরিস্কার মনে আছে।

শিশুরা দেখে শেখার চাইতে শুনে বেশি শেখে। আমার ছাত্রদেরকে কোনো বই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে হয়েছে বলে মনে পড়ে না। কিন্তু আমি বিভিন্ন বই পড়ে যা আত্মস্থ করেছি নিজের ভাষায় তা ছাত্রদেরকে দিয়েছি এবং আমি বলতে পারি যে, তারা এখনো সেগুলো মনে রেখেছে। বই পড়ে মনে রাখা তাদের জন্য বেশ পরিশ্রমের কাজ কিন্তু মুখে বলে তাদেরকে যা শিখিয়েছি তা তারা অতি সহজে পুনরাবৃত্তি করেছে। পড়া তাদের জন্য কঠিন কাজ ছিল, কিন্তু আমার মতে শোনা আনন্দের, যদি বিষয়টাকে আনন্দদায়ক করতে ব্যর্থতার কারণে একঘেঁয়ে না করা হয়। এবং আমার পড়ানোর সময়ে তারা যে সব প্রশ্ন করত তা থেকে তাদের বোঝার ক্ষমতার পরিমাপ করতে পারতাম।

www.pathagar.com

চৌত্রিশ
আত্মার শিক্ষা

ছেলেমেয়েদের আত্মিক শিক্ষা প্রদান তাদের দৈহিক ও মানসিক শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ছিল। আত্মার প্রশিক্ষণের জন্য আমি ধর্মগ্রন্থসমূহের ওপর কমই নির্ভর করেছি। অবশ্য আমি বিশ্বাস করতাম যে প্রত্যেক ছাত্রের উচিত তার নিজ ধর্মের মূল বিষয়বস্তু জানা এবং নিজ ধর্মগ্রন্থের বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা উচিত। সে কারণে যতটা সম্ভব এ বিষয়ে জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা রেখেছিলাম। কিন্তু আমার মতে সেটা ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণের অংশ। টলস্টয় ফার্মের শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব নেবার অনেক আগেই বুঝেছিলাম যে আত্মার শিক্ষা আলাদা একটি বিষয়। আত্মার উন্নতি হলো চরিত্র গঠন এবং মানুষকে ঈশ্বরের জ্ঞান ও আত্ম-উপলব্ধি অর্জনে সক্ষম করে তোলা এবং আমি মনে করতাম এটা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার একটি অপরিহার্য অংশ এবং আত্মার উন্নতির চর্চা ছাড়া সকল শিক্ষাই অর্থহীন, এমনকি তা ক্ষতিকরও হতে পারে।

শুধুমাত্র জীবনের চতুর্থ স্তর অর্থাৎ সন্ন্যাস (আত্মত্যাগ) স্তরে গিয়ে আত্মোপলব্ধি সম্ভব এ ভুল ধারণা সম্পর্কে আমি জানি। কিন্তু এটা একটা সাধারণ জ্ঞানের বিষয় যে যারা এ অমূল্য অভিজ্ঞতা লাভের প্রস্তুতি জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত বিলম্বিত করে তারা আত্মোপলব্ধি নয়, বরং বৃদ্ধ বয়সে করুণাযোগ্য দ্বিতীয় শৈশব অবস্থায় পৃথিবীতে বোঝা হয়ে বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা লাভ করে। আমার পুরোপুরি মনে আছে যে ১৯১১-১৯১২ সালে আমি যখন শিক্ষকতা করছিলাম তখনো আমার এই অভিমত ছিল, যদিও তখন তা এখনকার মতো একই ভাষায় প্রকাশ করিনি।

তাহলে আত্মার এ শিক্ষা কিভাবে দেয়া যায়? আমি বাচ্চাদেরকে ভক্তিগীতি মুখস্থ ও আবৃত্তি করালাম এবং নৈতিক শিক্ষার বই পড়ে শোনালাম। কিন্তু এগুলো আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। আমি তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে দেখলাম যে বই এর মাধ্যমে আত্মার শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। শারীরিক শিক্ষা যেমন শরীর চর্চার মাধ্যমে দিতে হয়, এবং বুদ্ধিবৃত্তিক শিক্ষা দিতে হয় বুদ্ধির অনুশীলনের মাধ্যমে তেমনি আত্মার অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মার শিক্ষা দেয়া সম্ভব। আর আত্মার অনুশীলন পুরোপুরি শিক্ষকের জীবন ও চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল। শিক্ষক তার ছাত্রদের মাঝে থাকুন আর বাইরে থাকুন তাকে সর্বদা শালীনতা ক্ষুণ্ন না করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

একজন শিক্ষক তার জীবন যাত্রার মাধ্যমে মাইলের পর মাইল দূরে থেকেও ছাত্রদের আত্মাকে প্রভাবিত করতে পারেন। আমি নিজে মিথ্যাবাদী হয়ে ছাত্রদেরকে সত্য কথা বলার শিক্ষা দিলে তা কার্যকর হবে না। একজন ভীতু শিক্ষক তার ছাত্রদেরকে কখনোই সাহসী করে গড়ে তুলতে সফল হবেন না এবং নিজে আত্মসংযম না জেনে কোনো শিক্ষক তার ছাত্রদেরকে

www.pathagar.com

আত্মসংযমের গুরুত্ব শেখাতে পারেন না। তাই আমি দেখলাম যে আমার সাথে বসবাসকারী ছেলেমেয়েদের জন্য আমাকে চিরস্থায়ী শিক্ষণীয় আদর্শ হতে হবে। এভাবে তারা হয়ে গেল আমার শিক্ষক, এবং আমি শিখলাম অন্তত তাদের জন্য হলেও আমাকে সৎ ও সরল-সোজা জীবন যাপন করতে হবে। আমি বলতে পারি যে টলস্টয় ফার্মে আমি নিজের ওপর যে ক্রমবর্ধমান শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিলাম তা আমার অধীনস্থ এসব ছাত্রের জন্যই সম্ভব হয়েছিল।

ছাত্রদের একজন ছিল উচ্ছৃঙ্খল, অবাধ্য, মিথ্যুক ও ঝগড়াটে। একদিন সে ভীষণ ক্ষেপে উঠল। আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। আমি কখনো ছাত্রদেরকে সাজা দেইনি, কিন্তু এবারে আমি খুব রেগে গেলাম। আমি তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে ছিল অবাধ্য এবং আমাকেও পরাজিত করতে চেষ্টা করল। অবশেষে আমি হাতের কাছে থাকা বেত তুলে নিলাম এবং তার হাতে বাড়ি দিলাম। তাকে বাড়ি দেবার সময় আমি কাঁপছিলাম। সেও তা লক্ষ্য করল। এটা ছিল তাদের সবার জন্য সম্পূর্ণ নতুন একটা অভিজ্ঞতা। ছেলেটা চিৎকার করে কাঁদল এবং মাফ চাইল। পিটুনীর ব্যথার কারণে সে কেঁদেছিল তা নয়, ইচ্ছে করলে সে আমাকেও উল্টো মার দিতে পারত, কারণ সে ছিল সতের বছরের সুঠাম ও বলিষ্ঠ যুবক। কিন্তু বেপরোয়া এ পদক্ষেপ নিতে গিয়ে আমার মনের ব্যথা সে উপলব্ধি করল। এ ঘটনার পরে আর কখনো সে আমার অবাধ্য হয়নি। কিন্তু আমি আমার সে উগ্রতার জন্য আজো অনুতপ্ত। আমি শংকিত সেদিন তার সামনে আমার আত্মা নয়, আমার ভিতরের পশু বেরিয়ে এসেছিল।

আমি সর্বদাই দৈহিক শাস্তির বিরোধী। মনে পড়ে আমার ছেলেদের একজনকে কেবলমাত্র একবার দৈহিক শাস্তি দিয়েছিলাম। সুতরাং আজ পর্যন্তও আমি নিশ্চিত হতে পারিনি যে সেদিন বেত ব্যবহার করা সঠিক ছিল নাকি ভুল হয়েছিল। সম্ভবত কাজটা ঠিক হয়নি, কারণ যদি আমার ভিতরের কষ্টের বহিঃপ্রকাশ হতো তাহলে তা যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করা যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে মিশ্র অনুভূতি কাজ করেছিল।

এ ঘটনা আমাকে চিন্তায় ফেলেছিল এবং ছাত্রদের সংশোধনের আরো ভালো পদ্ধতি শিক্ষা দিল। আমি জানি না সে পদ্ধতি এ ঘটনায় ফলপ্রসু হতো কিনা। ছেলেটা ঐ ঘটনা ভুলে গেল এবং আমার মনে হয় না তার বড় ধরনের কোনো উন্নতি হয়েছে। কিন্তু ঘটনাটি ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকের দায়িত্ব কি তা আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিল।

এর পরেও ছাত্ররা প্রায়ই অসদাচারণ করেছে, কিন্তু আমি আর কখনো দৈহিক শাস্তি দেইনি। এভাবে আমার অধীনস্থ ছেলেমেয়েদেরকে আত্মিক শিক্ষা দিতে গিয়ে আত্মার শক্তি সম্পর্কে আরো ভালো করে বুঝতে পারলাম।

www.pathagar.com

পঁয়ত্রিশ

গমের ক্ষেতে আগাছা

মি. ক্যালেনবাচ টলস্টয় ফার্মে একটা সমস্যার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যা আমার চোখে ধরা পড়েনি। আমি আগেই উল্লেখ করেছি ফার্মের কয়েকটি ছেলে খারাপ ও উচ্ছৃঙ্খল ছিল। তারা বদমায়েশ ছিল। আমার তিন ছেলে প্রতিদিন ওদের সাথে মিশত, আমার ছেলেদের মতো অন্য ছেলেরাও মিশত। এতে মি. ক্যালেনবাচ চিন্তিত হলেন, তবে তার মনোযোগের কেন্দ্রে ছিল এটা যে ঐ উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদের সাথে আমার ছেলেদের মেশা ঠিক হচ্ছে না।

একদিন তিনি বলেই ফেললেন, "আপনি আপনার ছেলেদেরকে খারাপ ছেলেদের সাথে মিশতে দিচ্ছেন, এটা আমার ভালো লাগছে না। এর ফলাফল একটাই হতে পারে, আর তা হলো খারাপ সংসর্গে মিশে তাদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটবে।"

বিষয়টি ঐ মুহূর্তে আমাকে হতবিহ্বল করেছিল কিনা তা মনে নেই, তবে আমি তাকে কি বলেছিলাম তা মনে আছে। "আমার ছেলে ও বদমায়েশদের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করব? উভয়ের দায়িত্বই যে আমার কাঁধে। ছেলেরা এসেছে, কারণ আমি ওদের আসতে বলেছি। আমি যদি কিছু টাকা দিয়ে ওদের তাড়িয়ে দেই, এক্ষুনি ওরা জোহান্সবার্গে ছুটে যাবে এবং পুরনো পথে ফিরে যাবে। সত্যি বলতে কি, ওরা এবং ওদের অভিভাবকদের পক্ষে এটা ভাবা খুবই সম্ভব যে, আমার এখানে এসে ওরা আমাকে ঋণী করেছে। আপনি ও আমি ভালো করেই জানি যে এখানে ওদেরকে অনেক অসুবিধা মেনে নিতে হবে। কিন্তু আমার কর্তব্য পরিষ্কার। আমি ওদেরকে এখানেই রাখব এবং আমার ছেলেদেরকেও ওদের সাথেই বাস করতে হবে। আর এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে আজ থেকে আমার ছেলেরা অন্য ছেলেদের থেকে নিজেদেরকে উৎকৃষ্টতর ভাবুক তা আপনি চান না। তাদের মাথায় এরূপ উৎকৃষ্টতার ধারণা ঢুকিয়ে দেয়ার অর্থ হলো তাদেরকে গোল্লায় যেতে দেয়া। অন্য ছেলেদের সাথে তাদের এই মেলামেশা তাদের মধ্যে ভালো শৃংখলাবোধ এনে দেবে। তারা নিজে থেকেই ভালো ও মন্দের পার্থক্য বুঝতে শিখবে। আমরা কেন বিশ্বাস করছি না যে তাদের মধ্যে যদি ভালো কিছু থেকে থাকে তাহলে তার প্রভাব সঙ্গীদের ওপর অবশ্যই পড়বে। ফলাফল যাই হোক, আমি ওদেরকে এখানে না রেখে পারি না এবং এতে যদি ঝুঁকি থাকেও সে ঝুঁকি আমাদের নিতে হবে।"

মি. ক্যালেনবাচ মাথা নাড়লেন।

আমার মনে হয় এর ফলাফল খারাপ হয়েছিল বলা যাবে না। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আমার ছেলেরা অন্যদের চেয়ে খারাপ হয়েছে বলে আমি মনে করি না। আমি দেখতে পাচ্ছি উল্টো তারা অনেক কিছু লাভ করেছে। তাদের মধ্যে

www.pathagar.com

যদি উৎকৃষ্টতার মনোভাবের লেশমাত্র থাকত, তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং তারা সব ধরনের ছেলেদের সাথে মিশতে শিখেছিল। তারা পরীক্ষিত ও সুশৃংখল হয়েছিল।

যে শিশুদেরকে জন্মের পর থেকে তুলা ও পশমী বস্ত্রে আবৃত করে রাখা হয় প্রলোভন বা সংক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে না। তবে এটা সত্য যে সব-ধরনের পরিবেশে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েদেরকে যখন একত্রে রাখা হয় এবং শিক্ষা দেয়া হয় তখন অভিভাবক ও শিক্ষকদেরকে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখী হতে হয়। তাদেরকে সর্বক্ষণ সতর্ক থাকতে হয়।

ছত্রিশ

উপোষের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত

দিনকে দিন ক্রমশ আমার নিকট পরিষ্কার হলো ছেলে ও মেয়েদেরকে সঠিকভাবে লালন-পালন ও শিক্ষা দেওয়া কত কঠিন। আমি যদি তাদের সত্যিকার শিক্ষক ও অভিভাবক হতে চাই তাহলে আমাকে তাদের হৃদয় স্পর্শ করতে হবে। আমাকে অবশ্যই তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে হবে। তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে এবং তাদের যৌবনের উদ্বেলিত আশা-আকাঙ্খা সঠিক পথে প্রবাহিত করতে হবে।

জেল থেকে কিছু সংখ্যক সত্যাগ্রহী ছাড়া পাওয়ার পর টলস্টয় ফার্ম প্রায় বসতিহীন হয়ে পড়ল। যে দু'একজন রইল তারা ফিনিক্স থেকে আসা। তাই আমি তাদেরকে সেখানে পাঠিয়ে দিলাম। এখানে আমাকে অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে চলতে হলো।

সে সময়ে আমাকে জোহান্সবার্গ ও ফিনিক্সের মধ্যে যাতায়াত করতে হতো। জোহান্সবার্গে অবস্থানকালে একদিন খবর পেলাম আশ্রমের দু'জন বাসিন্দার নৈতিক অধঃপতন হয়েছে। সত্যাগ্রহ সংগ্রামের ব্যর্থতার খবরে আমি মর্মাহত হতাম না, কিন্তু এ খবরটা আমার কাছে বজ্রপাতের মতো আঘাত করল। সে দিনই আমি ফিনিক্সের ট্রেন ধরলাম। মি. ক্যালেনবাচ আমার সাথে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তিনি আমার অবস্থা লক্ষ্য করছিলেন। আমার একা যাবার চিন্তা তার সহ্য হচ্ছিল না কারণ যে খবর পেয়ে আমি এতটা অস্থির হয়েছিলাম, তিনিই সে খবরটা এনেছিলেন।

যাত্রাপথে আমার করণীয় কি হবে তা স্পষ্ট হয়ে উঠল বলে মনে হলো। অনুভব করলাম যে কিছুটা হলেও অভিভাবক বা শিক্ষক তার অধীনস্থ ছেলেমেয়ে বা ছাত্রদের স্খলনের জন্য দায়ী। সুতরাং আলোচ্য ঘটনায় আমার দায়িত্ব দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমার স্ত্রী এ বিষয়ে আমাকে আগেই সতর্ক করেছিলেন কিন্তু আমার বিশ্বাসপ্রবণ মন সে সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করেছিল। আমার মনে হলো অপরাধীদেরকে আমার কষ্ট ও তাদের অধঃপতনের গভীরতা বোঝানোর একমাত্র পথ হচ্ছে আমার প্রায়শ্চিত্ত করা। সুতরাং আমি নিজের ওপর

www.pathagar.com

শাস্তিস্বরূপ সাত দিনের উপোষ ও সাড়ে চার মাস ধরে দিনে একবার মাত্র আহারের প্রতিজ্ঞা আরোপ করলাম। মি. ক্যালেনবাচ আমাকে বিরত রাখার বৃথা চেষ্টা করলেন। অবশেষে তিনি প্রায়শ্চিত্তের যৌক্তিকতা স্বীকার করলেন এবং আমার সাথে যোগ দিতে জিদ করলেন। আমি তার নির্মল ভালোবাসার দাবী প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না।

আমি অতিশয় ভারমুক্ত বোধ করলাম, কারণ আমার সিদ্ধান্তটা যেন মনের ওপর থেকে বিরাট বোঝা নামিয়ে দিল। অপরাধীদের ওপর রাগ প্রশমিত হলো, রাগের পরিবর্তে তাদের ওপর করুণা হলো। এভাবে অনেকটা সহজ হয়ে ফিনিক্সে পৌঁছলাম, আরো অনুসন্ধান করে ঘটনা সম্পর্কে যা কিছু জানা প্রয়োজন তা জেনে নিলাম।

আমার প্রায়শ্চিত্ত সকলকে ব্যথিত করল, কিন্তু এতে সেখানকার গুমোটভাব কেটে গেল। প্রত্যেকেই বুঝতে পারল পাপ করা কি জঘন্য অপরাধ এবং বালক বালিকাদের সাথে আমার যে বন্ধন তা আরো দৃঢ় ও সত্য হলো।

অল্প কিছু সময় পরে এ ঘটনা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করল চৌদ্দ দিনের উপোষ করতে যার ফলাফল আমার প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেল। এ ঘটনা দ্বারা এটা বুঝানো আমার উদ্দেশ্য নয় যে ছাত্রদের অপকর্ম ধরা পড়লেই শিক্ষকের কর্তব্য হবে উপোষ করা। অবশ্য আমার মতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরূপ কঠোর প্রতিবিধানের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এর পূর্বশর্ত হতে হবে স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মিক উপযুক্ততা। যেখানে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সত্যিকার ভালোবাসা নেই, যেখানে ছাত্রদের অপকর্ম শিক্ষকের মর্মমূলে আঘাত করেনা এবং যেখানে শিক্ষকের প্রতি ছাত্রদের সম্মানবোধ নেই সেখানে উপোষ করা বেমানান, এমন কি তা ক্ষতিকরও হতে পারে। যদিও এ ধরনের ঘটনায় উপোসের যৌক্তিকতা নিয়ে সন্দেহ থাকতে পারে কিন্তু ছাত্রের ভুলের জন্য শিক্ষকের দায়িত্বের বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে না।

প্রথম প্রায়শ্চিত্ত আমাদের কারো জন্য কঠিন হলো না। আমার দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজকর্মের কোনটাই বন্ধ রাখতে হয়নি। স্মরণ করা যেতে পারে যে প্রায়শ্চিত্তের এ পুরো সময় ধরেই আমি কঠোরভাবে ফলাহারী ছিলাম। দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ দিকের উপোষ আমার জন্য বেশ কঠিন হলো। তখন পর্যন্ত রামনামের আশ্চর্য ক্ষমতা আমি পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারিনি এবং সে অনুপাতে আমার কষ্টসহিষ্ণুতার মাত্রাও কম ছিল। তাছাড়া আমি উপোষ করার কৌশলও জানতাম না, বিশেষ করে প্রচুর পরিমাণে পানি পান করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তা যতই বিস্বাদ বা বমনউদ্রেককারী হোক না কেন। এ ছাড়া প্রথম উপোষ সহজ হওয়াতে দ্বিতীয় উপোষ সম্পর্কে অবহেলার ভাব ছিল। সে কারণে প্রথম উপোসের সময় প্রতিদিন আমি "কুনের স্নান" করেছিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় উপোসের সময় দুই তিন দিন পরে স্নান ছেড়ে দিলাম, এবং খুব অল্প পরিমাণে পানি পান করলাম, বিস্বাদ লাগত আর বমির ভাব হতো বলে। গলা

www.pathagar.com

শুকিয়ে দুর্বল হয়ে গেল এবং শেষের কয়েকদিন আমি কেবল খুব আস্তে কথা বলতে পারলাম। তা সত্ত্বেও আমার লেখালেখির প্রয়োজনীয় কাজগুলো ডিকটেশনের মাধ্যমে চলতেই থাকল। আমি নিয়মিত রামায়ণ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের পাঠ শুনতাম। সকল জরুরী বিষয়ে আলোচনার ও পরামর্শ দেবার যথেষ্ট শক্তিও আমার ছিল।

সাইত্রিশ
গোখলের সাথে দেখা করতে

দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক স্মৃতির উল্লেখ আমাকে বাদ দিতে হচ্ছে।

১৯১৪ সালে সত্যাগ্রহ সংগ্রামের শেষে আমি গোখলের নির্দেশ পেলাম লন্ডন হয়ে দেশে ফেরার জন্য। সুতরাং জুলাই মাসে কস্তুরবাই, ক্যালেনবাচ ও আমি ইংল্যান্ডের পথে যাত্রা করলাম।

সত্যাগ্রহের সময়কালে আমি তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করা শুরু করেছিলাম। সুতরাং এ যাত্রাতেও আমি তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট নিলাম। কিন্তু এই পথে জাহাজের তৃতীয় শ্রেণী ও ভারতীয় উপকূলীয় জাহাজ বা রেলওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে। ভারতীয় তৃতীয় শ্রেণীগুলোতে বসার জন্য যথেষ্ট জায়গা নেই, শোবার জন্য তো আরো নেই, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও কম। অপরদিকে লন্ডনের পথে সমুদ্র যাত্রায় জাহাজে যথেষ্ট জায়গা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ছিল এবং জাহাজ কোম্পানী আমাদের জন্য বিশেষ সুবিধা দিয়েছিল। কোম্পানী আমাদের জন্য সংরক্ষিত কক্ষ রেখেছিল এবং আমরা যেহেতু ফলাহারী ছিলাম তাই স্টুয়ার্ডকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল আমাদেরকে ফল ও বাদাম পরিবেশন করতে। নিয়মানুযায়ী তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেরকে ফল বা বাদাম খুব কমই দেয়া হয়। এসব সুবিধার কারণে জাহাজে আমাদের আঠারো দিন আরামেই কাটল।

এ সমুদ্র যাত্রাকালে কিছু ঘটনা এখানে উল্লেখ করার মতো। বাইনোকুলার মি. ক্যালেনবাচের খুব প্রিয় ছিল এবং এর এক বা দুজোড়া তার কাছে ছিল। এগুলো নিয়ে প্রতিদিন আমাদের কথা হতো। আমি তাকে বোঝাতে চাইতাম যে আমরা যে সরল জীবন যাপনের চেষ্টা করছি তার আদর্শের সাথে এ বস্তু বেমানান। একদিন কেবিনের জানালার পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় আলোচনা ঝগড়ায় পরিণত হলো।

আমি বললাম, "এ জিনিসটা আমাদের মধ্যে ঝগড়ার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে. এর থেকে মুক্তি পেতে ওটা জলে ফেলে দিচ্ছি না কেন?"

মি. ক্যালেনবাচ বললেন, "নিশ্চয়ই এ বিচ্ছিরি জিনিসটা ফেলে দিন।"

আমি বললাম, "আমি কিন্তু সত্যি সত্যি বলছি।"

দ্রুত জবাব এলো, "আমিও তাই।"

www.pathagar.com

এবং সাথে সাথেই আমি ওটা সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। ওটার দাম ছিল ৭ পাউন্ড। কিন্তু এর গুরুত্ব নিহিত ছিল দাম নয়, এটার প্রতি মি. ক্যালেনবাচের মোহগ্রস্ততায়। যাহোক এটা হারিয়ে সে কখনো এর জন্য দুঃখবোধ করেনি।

এ ছিল মি. ক্যালেনবাচ ও আমার মধ্যেকার বহু ঘটনার মাত্র একটি। এভাবে প্রতিদিন আমরা নতুন কিছু শিখতাম, কারণ আমরা উভয়েই চেষ্টা করছিলাম সত্যের পথে চলতে। সত্যের পথে অগ্রযাত্রায় ক্রোধ, স্বার্থপরতা, ঘৃণা ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়ে যায়, অন্যথায় সত্যকে অর্জন করা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি আবেগ দ্বারা চালিত হয় তার উদ্দেশ্য ভালো হতে পারে, কথায় সত্যবাদী হতে পারে কিন্তু সে কখনো পরম সত্যকে পাবে না। সফল সত্যানুসন্ধানের অর্থ হলো ভালোবাসা ও ঘৃণা, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি দ্বৈত অনুভূতির ভীড় থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি।

আমার উপোষপর্ব শেষ হওয়ার পর বেশি দিন না যেতেই আমরা এ সমুদ্র যাত্রা শুরু করেছিলাম। আমি আমার স্বাভাবিক শক্তি তখনো ফিরে পাইনি। হালকা ব্যায়াম করতে এবং যা খেয়েছি তা হজম করে ক্ষুধার উদ্রেক করতে আমি ডেকের ওপর পায়চারি করতাম। কিন্তু এ ব্যায়ামও ছিল আমার সহ্যের বাইরে, পায়ের ডিমে ব্যথা হতো। সে ব্যথা এতটা বেশি হলো যে লন্ডনে পৌছে দেখলাম আমার অবস্থা ভালো হওয়ার পরিবর্তে আরো খারাপ হয়েছে। সেখানে ডা. জীবরাজ মেহতার সাথে আমার পরিচয় হলো। আমি তাকে আমার উপোষ ও পরবর্তী ব্যথার ইতিবৃত্ত জানালাম। তিনি বললেন, "যদি কয়েকদিন পূর্ণ বিশ্রাম না নেন তাহলে আপনার পা-গুলো চিরদিনের জন্য অকেজো হয়ে যেতে পারে।"

এ থেকে আমি শিখলাম যে দীর্ঘ উপোষের পরে হারানো শক্তি পেতে দ্রুত চেষ্টা করা উচিত নয় এবং ক্ষুধাকেও নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। উপোষ করার চেয়ে উপোষ ভাঙার সময়ে আরো বেশী সতর্ক থাকা, সম্ভবত আরো বেশী সংযমী হওয়া প্রয়োজন।

নাদেরি জাহাজে থাকতেই আমরা শুনতে পেলাম যে কোনো মূহুর্তে মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে। আমরা ইংলিশ চ্যানেলে প্রবেশের সাথে সাথেই শুনতে পেলাম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমাদেরকে কিছু সময় থামিয়ে রাখা হলো। পুরো ইংলিশ চ্যানেলে সাবমেরিন মাইন পাতা হয়েছিল এবং এর মধ্যে দিয়ে জাহাজ টেনে নিয়ে যাওয়া কঠিন কাজ ছিল এবং সাউদাম্পটনে পৌছতে আমাদের দু'দিন লেগে গেল।

আগস্ট মাসের ৪ তারিখে যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো। আমরা লন্ডনে পৌছলাম ৬ তারিখে।

www.pathagar.com

আটত্রিশ

যুদ্ধে আমার ভূমিকা

ইংল্যান্ডে পৌঁছে আমি জানতে পারলাম যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে গোখলে প্যারিস গেছেন এবং যেহেতু প্যারিস ও লন্ডনের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তিনি কখন ফিরবেন তাও জানা যাচ্ছিল না। তার সাথে দেখা না করে আমি বাড়ী ফিরতে চাচ্ছিলাম না, কিন্তু তিনি কখন ফিরবেন তা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারছিল না।

তাহলে ইত্যবসরে আমি কি করব? যুদ্ধের ব্যাপারে আমার কর্তব্য কি? জেলে আমার সহকর্মী ও সত্যাগ্রহী সেরাবজী আদাজানিয়া তখন লন্ডন বারের জন্য পড়াশুনা করছিল। সর্বোৎকৃষ্ট সত্যাগ্রহীদের একজন হিসেবে তাকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়েছিল ব্যারিস্টারী পাশ করতে যাতে সে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে আমার স্থান পূরণ করতে পারে। ডা. প্রাণজীবন দাস মেহতা তার পড়াশুনার ব্যয়ভার বহন করছিলেন। তার মাধ্যমে এবং তাকে সাথে নিয়ে আমি ডা. জীবরাজ মেহতা ও অন্যান্য যারা ইংল্যান্ডে পড়াশুনা করছিলেন তাদের সাথে দেখা করলাম। তাদের সাথে আলোচনা করে গ্রেট বৃটেন ও আয়ারল্যান্ডে বসবাসকারী ভারতীয়দের একটি সভা আহ্বান করা হলো। আমি তাদের সামনে আমার মতামত তুলে ধরলাম।

আমি উপলব্ধি করলাম যে ইংল্যান্ডে বাসরত ভারতীয়দের যুদ্ধের ব্যাপারে যথাসাধ্য কাজ করা উচিত। ইংরেজ ছাত্ররা সেনাবাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দিয়েছে এবং ভারতীয়রাও তাদের থেকে পিছিয়ে থাকতে পারে না। এ ধরনের যুক্তির বিপক্ষে অনেকগুলো আপত্তি উত্থাপন করা হলো। যুক্তি দেখানো হলো যে ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে। আমরা কৃতদাস ওরা মনিব। দাস হয়ে আমরা মনিবকে তার প্রয়োজনের সময় কিভাবে সহযোগিতা করব? যে দাস স্বাধীন হওয়ার সুযোগ খুঁজছে, মনিবের দুর্বলতাকে কি তার সুযোগ বলে গণ্য করা কর্তব্য নয়? তখন এই যুক্তি আমার নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। একজন ভারতীয় ও একজন ইংরেজের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য আমি জানতাম কিন্তু আমি বিশ্বাস করতাম না যে আমাদেরকে একেবারে দাসের পর্যায়ে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। তখন আমি অনুভব করতাম যে বৃটিশ শাসনব্যবস্থা নয়, এর জন্য কিছু বৃটিশ অফিসার ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ছিল। এবং আমরা ভালোবাসা দিয়ে তাদের মনোভাব পরিবর্তন করতে পারতাম। তাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় যদি আমরা আমাদের মান-মর্যাদা উন্নত করতে চাই, তাহলে প্রয়োজনের সময় তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহায্য জয় করে নেয়া আমাদের কর্তব্য। যদিও শাসন ব্যবস্থায় ত্রুটি ছিল তথাপি আজকের মতো সেদিনও তা আমার কাছে অসহনীয় বলে মনে হয়নি। কিন্তু শাসন ব্যবস্থার ওপর আস্থা হারিয়ে আমি যদি আজ বৃটিশ গভর্নমেন্টের সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করি,

www.pathagar.com

তাহলে ঐ বন্ধুরা শুধু শাসন ব্যবস্থায় নয়, বৃটিশ অফিসারদের ওপরও আস্থা হারিয়ে কিভাবে তারা সহযোগিতা করবে? বিরোধী বন্ধুরা অনুভব করল যে ভারতীয়দের দাবীর বলিষ্ঠ ঘোষণা দেয়া এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির এটাই উপযুক্ত সময়।

আমি ভাবলাম যে ইংল্যান্ডের দুঃসময়কে আমাদের সুযোগে পরিণত করা উচিত নয় বরং যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন আমাদের দাবী আদায়ের জন্য চাপ না দেয়াই যুক্তিযুক্ত এবং দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। সুতরাং আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকলাম এবং যারা ইচ্ছুক তাদেরকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে আহ্বান জানালাম। এতে ভালো সাড়া পাওয়া গেল এবং বাস্তবে স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে সকল প্রদেশের ও সকল ধর্মের প্রতিনিধিত্ব ছিল।

এ ঘটনা জানিয়ে লর্ড ক্রুকে একটা পত্র দিলাম এবং জানালাম যে অ্যাম্বুলেন্সের কাজের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণে আমরা প্রস্তুত আছি যদি তা আমাদের প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বশর্ত বলে গণ্য করা হয়।

কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর লর্ড ক্রু আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং সংকটময় মূহুর্তে সাম্রাজ্যের সেবায় এগিয়ে আসার জন্য আমাদেরকে ধন্যবাদ জানালেন।

স্বেচ্ছাসেবকরা সুপরিচিত ডা. ক্যান্টলির অধীনে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করল। এটা ছিল ছয় সপ্তাহের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্স কিন্তু এতে প্রাথমিক চিকিৎসার সম্পূর্ণ কোর্স অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আমাদের প্রশিক্ষণ ক্লাশে প্রায় আশি জন ছিলাম। ছয় সপ্তাহ পরে আমাদের পরীক্ষা নেয়া হলো এবং একজন ছাড়া সবাই পাশ করল। এদের জন্য গভর্নমেন্ট থেকে এখন সৈন্যদের কুচকাওয়াজ ও অন্যান্য ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হলো। এ কাজের জন্য কর্নেল বেকারকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

এ দিনগুলোতে লন্ডন দেখার মতো দৃশ্যে পূর্ণ ছিল। কোন আতঙ্ক ছিল না, সবাই ব্যস্ত যার যার সাধ্যমতো সাহায্য করতে। শারীরিকভাবে সক্ষম যুবকেরা সম্মুখযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ, অসমর্থ ও মহিলারা কি করবে? করতে চাইলে তাদের জন্য অনেক কাজই ছিল। সুতরাং তারা নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখল আহতদের কাপড় কাটা ও ড্রেসিং তৈরী করায়।

দি লাইসিয়াম নামের মহিলা ক্লাব সৈনিকদের জন্য যত বেশি সম্ভব কাপড় তৈরী করে দিল। শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু এ ক্লাবের সদস্যা ছিলেন এবং নিজেকে পুরোপুরি এ কাজে আত্ম-নিবেদিত করলেন। তার সাথে এটাই ছিল আমার প্রথম পরিচয়। তিনি আমার সামনে মাপমতো কাটা কাপড়ের স্তূপ রেখে আমাকে তা সেলাই করিয়ে তার কাছে ফেরৎ দিতে বললেন। আমি তার এ চাওয়াকে স্বাগত জানালাম এবং প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে বন্ধুদের সহায়তায় যত বেশি সম্ভব কাপড় তৈরী করে দিলাম।

www.pathagar.com

উনচল্লিশ

আত্মার উভয় সংকট

আমি অন্যান্য ভারতীয়দের নিয়ে যুদ্ধের জন্য সেবা প্রদানের প্রস্তাব করেছি এ খবরটা দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছার সাথে সাথেই আমি দুটো তারবার্তা পেলাম। এর একটা পেলাম মি. পোলাকের কাছ থেকে যে অহিংসা প্রচারের সাথে আমার যুদ্ধে জড়িত হওয়ার সামঞ্জস্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

এ ধরনের আপত্তি উঠতে পারে তা আমি আগেই কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলাম। কারণ আমি বিষয়টির ওপর আমার "হিন্দ স্বরাজ" (ভারতীয় স্ব-শাসন) বইতে আলোকপাত করেছি এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যাপারটি নিয়ে দিন-রাত বন্ধুদের সাথে আলোচনা করেছি। আমরা সকলেই যুদ্ধের নীতিহীনতা সম্পর্কে বুঝতে পেরেছি। আমি যদি আমাকে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে মামলা করতে রাজী না হয়ে থাকি তাহলে যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে আমার আরো কম আগ্রহী হওয়ার কথা, বিশেষ করে আমি যখন উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে কিছুই জানি না। বন্ধুরা অবশ্য জানত যে ইতিপূর্বে বোয়ার যুদ্ধে আমি সেবা করেছি, কিন্তু তারা ধরে নিয়েছিলেন যে তারপর থেকে আমার মনোভাব পরিবর্তন হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে যে যুক্তি আমাকে বোয়ার যুদ্ধে যোগদান করতে রাজী করিয়েছিল এ ক্ষেত্রেও তা আমার সিদ্ধান্তের পাল্লা ভারী করল। আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ কখনই অহিংসার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না। কিন্তু মানুষ নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সর্বদা সমভাবে আগাম ও পরিষ্কার ধারণা করতে পারে না। সত্যের সাধককে প্রায়ই অন্ধকারে হাতড়াতে হয়।

অহিংসা হলো একটি সমন্বিত নীতি। আমরা মরণশীল মানুষ অসহায়ভাবে হিংসার দাবানলে ধরা পড়ে যাই। জীবন জীবনকে খেয়ে বাঁচে এ কথার মধ্যে গূঢ় অর্থ লুকিয়ে আছে। বাহ্যিকভাবে মানুষ জেনে হোক বা না জেনে হোক, হিংসার কাজ না করে এসবের মধ্যে বাঁচতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে তার বেঁচে থাকা খাওয়া, পান করা, ঘোরাফেরা–এসবের মধ্যে আবশ্যিকভাবে কিছু হিংসা জড়িয়ে আছে, প্রতিমুহূর্তে জীবনের ধ্বংস সাধিত হচ্ছে। সুতরাং একজন অহিংসার পূজারী তার বিশ্বাসে অবিচল থাকবে যদি তার সকল কাজের মূলে থাকে দয়া, যদি সে সাধ্যমতো চেষ্টা করে ক্ষুদ্রতম প্রাণীরও ধ্বংস এড়িয়ে তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে, আর এভাবে হিংসার ভয়াবহ বৃত্ত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার অবিরাম চেষ্টা করে। তার দয়া ও আত্ম-সংযম ক্রমাগত বাড়তে থাকবে, তবে সে বাহ্যিক হিংসা থেকে কখনো পুরোপুরি মুক্ত হতে পারবেনা।

আবার যেহেতু অহিংসার মূলে আছে সকল জীবনের ঐক্য, একজনের ভুল সকলকে প্রভাবিত না করে পারে না, আর সে কারণে মানুষ হিংসা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না। যতদিন সে সামাজিক জীবন যাপন করবে ততদিন সমাজের অস্তিত্বের সাথে জড়িত হিংসায় অংশগ্রহণ না করে পারবে না। যখন দুটি জাতি

www.pathagar.com

যুদ্ধ করে অহিংসার পূজারীর উচিত যুদ্ধ বন্ধ করা। যে ঐ কর্তব্য পালনের জন্য যোগ্য নয়, যার যুদ্ধ বন্ধ করার ক্ষমতা নেই, যার যুদ্ধ বন্ধ করার যোগ্যতাও নেই, সে যুদ্ধে অংশ নিতে পারে এবং আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে পারে নিজেকে ও তার জাতিকে এবং সমগ্র পৃথিবীকে যুদ্ধ থেকে মুক্ত রাখতে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের আনুকূল্যে আমি আমার ও আমার দেশবাসীর মর্যাদা উন্নত করার আশা করেছিলাম। ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে আমি বৃটিশ নৌবহরের নিরাপত্তাধীনে ছিলাম এবং যেহেতু আমি এর সশস্ত্র আশ্রয়ে ছিলাম সেহেতু আমি সম্ভাব্য সহিংসতায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলাম। সুতরাং আমি যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের সাথে আমার যোগসূত্র রাখতে চাই এবং এর পতাকাতলে বাঁচতে চাই তাহলে তিনটি পথের মধ্যে একটি আমার জন্য খোলা ছিল– খোলাখুলি যুদ্ধের বিরোধীতা করা এবং সত্যাগ্রহের নীতি অনুসারে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সামরিক নীতির পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত সাম্রাজ্যকে বয়কট করা; অথবা যেসব নাগরিক আইন অমান্য করা চলে সেসব আইন অমান্য করে জেলে যাওয়া; অথবা সাম্রাজ্যের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করা এবং এর মাধ্যমে যুদ্ধের সহিংসতা রোধ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অর্জন করা। আমার যুদ্ধ রোধ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতার অভাব ছিল, তাই যুদ্ধে সেবা প্রদান ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিল না।

অহিংসার দৃষ্টিকোণ থেকে আমার কাছে সম্মুখ যোদ্ধা ও অন্য যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য নেই। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় একটা ডাকাতদলের সেবা করতে যায়, তাদের তল্পিবাহক হয়, ডাকাতির সময়ে তাদের পাহারাদার হিসেবে কাজ করে, বা ডাকাতরা আহত হলে তাদের সেবা করে, সেও ডাকাতির জন্য ডাকাতদের সাথে সমানভাবে দোষী। একইভাবে যারা নিজেদেরকে যুদ্ধে আহতদের সেবায় নিয়োজিত করে তারাও অপরাধ থেকে মুক্ত নয়।

পোলাকের তারবার্তা পাওয়ার আগে এভাবে আমি পুরো ব্যাপারটি নিয়ে নিজের মনে যুক্তিতর্ক করলাম এবং তারবার্তা পাওয়ার পরপরই এসব মতামত নিয়ে কয়েকজন বন্ধুর সাথে আলোচনা করলাম এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে যুদ্ধে সেবাদান করাই আমার কর্তব্য। তখনকার মতো এখনো আমি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অনুকূলে মত পোষণ করার জন্য আমার উপরোক্ত যুক্তিসমূহের ত্রুটি দেখি না এবং আমার কাজের জন্য অনুতপ্ত নই।

আমি জানি আমার অবস্থানের সঠিকতা আমার অনেক বন্ধুকেই বোঝাতে পারিনি। বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এতে দ্বিমত পোষণের সুযোগ আছে এবং যারা অহিংসায় বিশ্বাসী এবং জীবনের প্রতিপদে অহিংসার বাস্তবায়নে কঠোর চেষ্টা করে যাচ্ছে তাদের জন্য আমার যুক্তিগুলো যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করে তুলে ধরেছি। সত্যের সাধক প্রচলিত রীতি মেনে কাজ নাও করতে পারে। তার নিজেকে সর্বদা সংশোধনের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে এবং যখনই নিজের কোনো ভুল ধরা পড়বে যে কোনো মূল্যে তা স্বীকার করতে হবে এবং এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

www.pathagar.com

চল্লিশ
ক্ষুদ্রাকারে সত্যাগ্রহ

যদিও এভাবে আমি কর্তব্য হিসেবে যুদ্ধে জড়িত হলাম, কিন্তু ঘটনাক্রমে আমি এতে শুধু সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারলাম না তাই নয়, বরং এই সংকটময় মূহূর্তে এমন কাজ করতে বাধ্য হলাম যাকে বলা যেতে পারে ক্ষুদ্র পরিসরে সত্যাগ্রহ।

আমি আগেই বলেছি আমাদের নাম তালিকাভুক্ত ও অনুমোদনের পরপরই একজন অফিসার নিয়োগ করা হয়েছিল আমাদের প্রশিক্ষণের জন্য। আমাদের সবার ধারণা ছিল যে এই কমান্ডিং অফিসার শুধুমাত্র কৌশলগত বিষয়ে আমাদের প্রধান হিসেবে পরিচালিত করবেন, অন্যসব ব্যাপারে আমি হবো কোরের (দলের) প্রধান এবং দলের সবাই অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলার জন্য আমার কাছে দায়ী থাকবে অর্থ্যাৎ কমান্ডিং অফিসার আমার মাধ্যমে দলকে পরিচালনা করবেন। কিন্তু প্রথম থেকেই এই অফিসার আমাদের সে ভুল ধারণা ভেঙে দিলেন।

মি. সোরাবজী আদাজনীয়া ছিল বেশ চালাক-চতুর। সে আমাকে সতর্ক করল।

সে বলল, "এ লোকের সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন, মনে হচ্ছে সে আমাদের ওপর প্রভুত্ব ফলাতে চায়। আমরা তার কোনো আদেশ মানব না। আমরা তাকে আমাদের প্রশিক্ষক হিসেবে মানতে রাজী আছি। কিন্তু তিনি যে ছোকরাদেরকে আমাদের প্রশিক্ষণের জন্য নিয়োগ দিয়েছেন তারাও এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন আমাদের মনিব।"

অক্সফোর্ডের কিছু ছাত্রকে এই কমান্ডিং অফিসার আমাদের সেকশন লিডার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

কমান্ডিং অফিসারের প্রভুসুলভ আচারণ আমারও দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু আমি সোরাবজীকে দুশ্চিন্তা না করে শান্ত থাকতে বললাম। কিন্তু সে সহজে মেনে নেয়ার পাত্র ছিল না। সে হাসতে হাসতে বলল, "আপনি বড় বেশি বিশ্বাসপ্রবণ। লোকে আপনাকে বাজে কথা বলে ভুল বুঝবে এবং শেষে যখন আপনি ভুল বুঝতে পারবেন তখন আমাদেরকে সত্যাগ্রহের আশ্রয় নিতে বলবেন এবং নিজে দুর্দশায় পড়বেন আর আপনার সাথে আমাদের সকলকেও দুর্দশায় ফেলবেন।"

আমি বললাম, "আমার সাথে তোমাদের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলায় তোমরা দুর্দশায় পড়া ছাড়া আর কি আশা করতে পারো? ধোঁকায় পড়ার জন্যই সত্যাগ্রহীর জন্ম। কমান্ডিং অফিসার আমাদেরকে ধোকা দিতে থাকুক। আমি তোমাদেরকে অসংখ্যবার বলিনি যে, যে ব্যক্তি অন্যকে ধোঁকা দিবে, সে নিজেই ধোঁকায় পড়বে?"

সোরাবজী একটা অট্টহাসি দিয়ে বলল, "বেশ, তাহলে ধোঁকা খেতেই থাকুন। সত্যাগ্রহ করতে করতে যে কোনোদিন আপনি নিজে মারা পড়বেন আর আমার মতো হতভাগাদেরকেও আপনার পেছনে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যাবেন।"

www.pathagar.com

এ কথাগুলো আমাকে অসহযোগ প্রসঙ্গে প্রয়াত মিস এমিলি হবহাউজ তার পত্রে যা লিখেছিলেন তা মনে করিয়ে দিল। কোনোদিন যদি শুনি যে সত্যের জন্য আপনাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছে তাহলে আমি অবাক হব না। ইশ্বর আপনাকে সঠিক পথ দেখান এবং নিরাপদে রাখুন।"

সোরাবজীর সাথে এসব কথা হয়েছিল কমান্ডিং অফিসার নিয়োগের পরপরই। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তার সাথে আমাদের সম্পর্ক ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়াল। চৌদ্দ দিন উপোষের দুর্বলতা কাটিয়ে না উঠতেই আমি কুচকাওয়াজে অংশ নিতে শুরু করলাম। আমি তাও প্রায় দিনই পায়ে হেঁটে বাড়ী থেকে দুই মাইল দূরে গিয়ে কুচকাওয়াজে অংশ নিতাম। এতে আমার প্লুরিসি (ফুসফুসের প্রদাহ) দেখা দিল এবং আমাকে শয্যাশায়ী করে ফেলল। এ অবস্থাতেও আমাকে সপ্তাহ শেষের ক্যাম্পিং-এ যেতে হচ্ছিল। অন্যেরা সেখানে ক্যাম্পে অবস্থান করলেও আমি বাড়ি ফিরে এলাম। আর এখানেই সত্যাগ্রহ পালনের পরিস্থিতি তৈরী হলো।

কমান্ডিং অফিসার মোটামুটি স্বাধীনভাবেই তার ক্ষমতা ব্যবহার করতে থাকল। সে আমাদেরকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল যে সামরিক-অসামরিক সব ব্যাপারেই সে আমাদের প্রধান এবং সেই সাথে তার ক্ষমতার বাহদুরীও দেখাতে ছাড়ল না। সোরাবজী তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে চলে এলো। এ কর্তৃত্ব মেনে নিতে সে মোটেই রাজী ছিল না। বলল, "আমরা চাই সব আদেশ আপনার মাধ্যমেই আসতে হবে। আমরা এখনো ট্রেনিং ক্যাম্পে আছি এবং যতসব অযৌক্তিক আদেশ জারী করা হয়েছে। আমাদের প্রশিক্ষণের জন্য নিয়োগকৃত যুবকদের সাথে আমাদের বিদ্বেষমূলক বৈষম্য তৈরী করা হচ্ছে। কমান্ডিং অফিসারের সাথে আমাদের কোরে যোগদানকারী ভারতীয় ছাত্র ও অন্যান্যরা আর কোনো অযৌক্তিক আদেশ মানবে না। আত্মসম্মান বাড়বে বলে যে কাজে যোগ দিয়েছি সে কাজে আত্মসম্মান আরো হারাতে হবে তা মেনে নেয়ার কথা চিন্তাই করা যায় না।"

আমি কমান্ডিং অফিসারের সাথে দেখা করে যে সব অভিযোগ পেয়েছি সেগুলোর প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। সে আমাকে অভিযোগগুলো লিখিতভাবে জানানোর জন্য পত্র লিখল, সেই সাথে আমাকে বলল, "অভিযোগকারীদেরকে বোঝাও যে অভিযোগ করার সঠিক পদ্ধতি হলো তারা তাদের অভিযোগ সদ্য নিয়োজিত সেকশন কমান্ডারকে জানাবে, সেকশন কমান্ডাররা সে অভিযোগ ইন্সট্রাকটরদের মাধ্যমে আমাকে জানাবে।"

এর জবাবে আমি বললাম যে, আমি কোনো ক্ষমতা দাবী করিনি, সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি বেসামরিক ব্যক্তিদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেউ নই, তবে আমার বিশ্বাস ছিল যে স্বেচ্ছাসেবক কোরের চেয়ারম্যান হিসেবে অনানুষ্ঠানিকভাবে হলেও তাদের প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে কাজ করতে দেওয়া উচিত। যে সব অভিযোগ ও অনুরোধ আমার গোচরে আনা হয়েছিল তা আমি তুলে ধরলাম যার মধ্যে ছিল কোরের সদস্যদের অনুভূতির তোয়াক্কা না করেই

www.pathagar.com

সেকশন লিডারদের নিয়োগ দেওয়ার ফলে গুরুতর অসন্তোষ, তাদেরকে প্রত্যাহার ও কমান্ডারের অনুমোদনক্রমে কোরের সদস্য সেকশন লিডার নির্বাচন করার আহ্বান জানানো ইত্যাদি।

এসব প্রস্তাব কমান্ডারের মনপুতঃ হলো না। সে বলল, "কোরের সদস্যরা সেকশন লিডার নিয়োগ করবে এটা সকল সামরিক শৃঙ্খলার পরিপন্থি এবং ইতিমধ্যেই যে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তা প্রত্যাহার করা শৃঙ্খলা ভঙ্গের সামিল।

অতএব আমরা একটা সভা করে নিজেদেরকে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলাম। সকল সদস্যকে আমি সত্যাগ্রহের গুরুতর পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দিলাম। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য সিদ্ধান্তের পক্ষে সমর্থন জানাল, যার মর্মকথা হলো ইতিমধ্যে যে সব কর্পোরোলের নিয়োগ দেয়া হয়েছে তা যদি বাতিল না করা হয় এবং কোরের সদস্যদের নিজেদের কর্পোরোল নির্বাচনের সুযোগ দেয়া না হয় তাহলে সদস্যরা কুচকাওয়াজ ও সপ্তাহ শেষের ক্যাম্পিং থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হবে।

আমার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে সে যে পত্র দিয়েছে তা কি প্রচন্ড হতাশার জন্য দিয়েছে তার বর্ণনা দিয়ে আমি কমান্ডিং অফিসারকে একটা পত্র দিয়েছিলাম। আমি তাকে আশ্বাস দিলাম যে ক্ষমতার ব্যবহারে আমার কোন আগ্রহ নেই বরং আমি সেবা দিতেই বেশী আগ্রহী। অতীত উদাহরণের প্রতিও তার মনোযোগ আকর্ষণ করলাম। উল্লেখ করলাম যে বোয়ার যুদ্ধের সময় যদিও আমি আনুষ্ঠানিকভাবে সাউথ আফ্রিকান ইন্ডিয়ান এ্যাম্বুলেন্স কোরে পদস্থ কোনো কর্মকর্তা ছিলাম না কিন্তু কর্নেল গলওয়ে ও কোরের মধ্যে কোনো সংঘাত ঘটেনি এবং কোরের ইচ্ছা অনিচ্ছা নির্ধারণ করতে কর্নেল আমাকে না জানিয়ে কখনো কোনো পদক্ষেপ নিতেন না। আগের দিন সন্ধ্যায় আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তার একটা কপিও পত্রের সাথে সংযুক্ত করলাম।

কমান্ডিং অফিসারের উপর এর প্রভাব ইতিবাচক হলো না। তার মতে মিটিং করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় গুরুতর শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হয়েছে।

এরপর আমি সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া বরাবরে একটা পত্র লিখে যা কিছু ঘটেছে তার সবই জানালাম এবং আমাদের সিদ্ধান্তের একটা কপি সংযুক্ত করলাম। জবাবে তিনি জানালেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা ছিল অন্য রকম এবং বিধি মোতাবেক কমান্ডিং অফিসার সেকশন কমান্ডার নিয়োগ দিয়েছে। তবে তিনি আশ্বাস দিলেন ভবিষ্যতে যখন সেকশন কমান্ডার নিয়োগ করা হবে তখন কমান্ডিং অফিসার আমার সুপারিশ বিবেচনা করবেন।

এরপরেও আমাদের মধ্যে অনেক পত্র বিনিময় হয়েছে কিন্তু আমি সে তিক্ত কাহিনীর দীর্ঘ বর্ণনা দিতে চাই না। এটুকু বলাই যথেষ্ট যে ভারতে আমরা প্রতিদিন যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকি এখানকার অভিজ্ঞতাও ছিল সেগুলোর মতোই। ভয় দেখিয়ে এবং সুকৌশলে কমান্ডিং অফিসার আমাদের কোরে ভাঙন ধরাতে সমর্থ হলো। যারা সিদ্ধান্তের পক্ষে ভোট দিয়েছিল তাদের কিছু সংখ্যক

www.pathagar.com

কমান্ডারের ভয় বা প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং তাদের প্রতিজ্ঞা ভুলে গেল।

প্রায় এ সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে নেটলি হাসপাতালে আহত সৈন্যদের একটি বড় দল এলো এবং আমাদের কোর-কে সেবার জন্য তলব করা হলো। কমান্ডিং অফিসার যাদেরকে রাজী করাতে পারল তাদেরকে নেটলি পাঠানো হলো। অন্যেরা যেতে রাজী হলো না। আমি ছিলাম শয্যাগত তবে কোরের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রাখছিলাম। আন্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট মি. রবার্টস ঐ সময়ে আমাকে অনেকবার দেখতে এসে সম্মানিত করেছেন। তিনি পরামর্শ দিলেন একটি আলাদা কোর গঠন করে নেটলি হাসপাতালে পাঠানো উচিত যেখানে তারা কেবল কমান্ডিং অফিসারের নিকট দায়ী থাকবে যাতে আত্মসম্মান খোয়াতে না হয়, গভর্নমেন্ট আশ্বস্ত হয় এবং সেই সাথে হাসপাতালে আগত বিপুল সংখ্যক আহতের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা যায়। এ পরামর্শ আমার সহকর্মীদের পছন্দ হলো এবং এর ফলে যারা কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল তারাও কাজে যোগ দিতে নেটলিতে গেল।

কেবল আমিই রয়ে গেলাম, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম কিভাবে খারাপ অবস্থাকে ভালো কাজে লাগাবো।

একচল্লিশ
গোখলের উদারতা

ইংল্যান্ডে আমার প্লুরিসিতে আক্রান্ত হবার কথা আগেই বলেছি। অল্পদিন পরেই গোখলে লন্ডনে ফিরে এলেন। ক্যালেনবাচ ও আমি নিয়মিত তার কাছে যেতাম। আমাদের বেশির ভাগ কথাবার্তা হতো যুদ্ধ নিয়ে এবং যেহেতু জার্মানীর ভৌগলিক বৃত্তান্ত ক্যালেনবাচের নখদর্পণে ছিল এবং সে ইউরোপে ব্যাপক ভ্রমণ করেছিল তাই সে যুদ্ধের প্রসঙ্গে ম্যাপে বিভিন্ন স্থান দেখিয়ে দিত।

আমার যখন প্লুরিসি হলো তখন এটাও আলোচনার একটা বিষয় হয়ে দাঁড়াল। আমার খাবারে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে ছিল চীনাবাদাম, কাঁচা ও পাকা কলা, লেবু, অলিভ অয়েল, টমাটো ও আঙ্গুর। দুধ ও অন্যান্য পানীয়, ডাল এবং আরো কিছু খাবার আমি সম্পূর্ণ বর্জন করলাম।

ডা. জীবরাজ মেহতা আমার চিকিৎসা করলেন। তিনি আমাকে দুধ ও অন্যান্য পানীয় গ্রহণের জন্য খুব পীড়াপীড়ি করলেন কিন্তু আমি অনমনীয় রইলাম। বিষয়টা গোখলের কানে গেল। ফলাহারের পক্ষে যে সব যুক্তি দেখানো হয় তাতে তাঁর তেমন বিশ্বাস ছিল না এবং তিনি চাচ্ছিলেন আমার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ডাক্তার যে পথ্য দেন আমি তাই খাই।

গোখলের কথার অবাধ্য হওয়া আমার জন্য সহজ ছিলনা। আমার অস্বীকৃতিকে যখন তিনি আমল দিলেন না, এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার জন্য আমি ২৪ ঘন্টা সময় প্রার্থনা করলাম। সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরার পথে আমি ও

www.pathagar.com

ক্যালেনবাচ আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করলাম। আমার পরীক্ষা নিরীক্ষায় সে সর্বদা আমার সঙ্গী ছিল। পথ্যের ব্যাপারে আমার সাথে সে একমত কিন্তু আমার স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে আমার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করার বিষয়ে সে রাজী ছিল। সুতরাং অন্তরের নির্দেশমতো আমার সিদ্ধান্ত আমাকেই নিতে হলো।

সারারাত ধরে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করলাম। এ ব্যাপারে পরীক্ষায় ক্ষান্ত দেয়ার অর্থ এ বিষয়ে আমার এ যাবৎ লালিত সকল ধারণা পরিত্যাগ করা যদিও সেগুলোতে আমি কোনো খুঁত পাইনি। প্রশ্নটা দাঁড়াল গোখলের সস্নেহ দাবীর কাছে কতটা নতিস্বীকার করব, আর তথাকথিত স্বাস্থ্যের স্বার্থে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা কতটা সংশোধন করব। অবশেষে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে ধর্মীয় উদ্দেশে যতটা প্রয়োজন ততটুকু পরীক্ষা-নিরীক্ষা অব্যাহত রাখব, আর মিশ্র উদ্দেশের ব্যাপারে ডাক্তারের পরামর্শ মানব। দুধপান ত্যাগ করার পেছনে মূল প্রেরণা ছিল ধর্মীয় বিবেচনা। কোলকাতায় গোয়ালারা যে নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে গাভী ও মহিষের শেষ বিন্দু পর্যন্ত দুধ দোহন করে নিত তার চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠত। আমার এটাও মনে হতো যে মাংস যেমন মানুষের খাদ্য নয় তেমনি অন্য প্রাণীর দুধও মানুষের খাদ্য হতে পারে না। সুতরাং সকালবেলা আমি দুধপানে বিরত থাকার সিদ্ধান্তে অটল থাকার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে শয্যা ত্যাগ করলাম। এতে আমি খুব চিন্তামুক্ত হলাম। গোখলের কাছে যেতে ভয় হচ্ছিল, কিন্তু আমার সিদ্ধান্তের প্রতি তিনি সম্মান দেখাবেন এ বিশ্বাসও ছিল।

সন্ধ্যায় ক্যালেনবাচ ও আমি গোখলের সাথে দেখা করতে ন্যাশনাল লিবারেল ক্লাবে গেলাম। তিনি প্রথম আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন তা হলো-"তুমি কি ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ?"

আমি নম্র কিন্তু দৃঢ়ভাবে জবাব দিলাম, "আমি আপনার সব কথা মানতে রাজী আছি কিন্তু একটি ব্যাপারে আমাকে দয়া করে চাপ দিবেন না। আমি দুধ, দুধের তৈরী খাবার ও মাংস খাব না। এগুলো না খেলে যদি আমার মৃত্যু হয় তাও আমি বরণ করতে রাজী আছি।"

গোখলে জিজ্ঞেস করলেন, "এটাই কি তোমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত?"

আমি বললাম, "এ ছাড়া আমার আর কোনো সিদ্ধান্ত নেই। আমি জানি আমার এ সিদ্ধান্ত আপনাকে পীড়া দেবে, কিন্তু আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।"

মনে ব্যথা ও গভীর স্নেহ নিয়ে গোখলে বললেন, "আমি তোমার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করছি না। এর সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে আমি তোমাকে কোন চাপ দেব না।" এ কথাগুলো বলে তিনি ডা. জীবরাজ মেহতার দিকে ফিরলেন এবং বললেন, "দয়া করে তাকে আর চিন্তায় ফেলবেন না। সে নিজের জন্য যে সীমা নির্ধারণ করেছে তার মধ্যে যা খুশি আপনি বিধান দিন।"

ডাক্তার দ্বিমত পোষণ করলেন, কিন্তু তার কিছু করার ছিল না। তিনি আমাকে মুগডালের সুপ খেতে বললেন এক চিমটি হিং (asafoetida) মিশিয়ে। এতে আমি রাজী হলাম। আমি এক দু'দিন তা খেলাম, কিন্তু তাতে ব্যথা আরো বাড়ল।

www.pathagar.com

এটা যেহেতু আমার সহ্য হচ্ছিল না তাই আমি বাদাম ও ফলাহারে ফিরে গেলাম। ডাক্তার অবশ্য তার বাহ্যিক চিকিৎসা চালিয়ে গেলেন। তাতে ব্যথা কিছুটা কমল কিন্তু পথ্যের উপর আমার নিয়ন্ত্রণ তার জন্য বড় বাধা ছিল।

ইত্যবসরে মি. গোখলে অক্টোবর মাসে লন্ডনের কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া সহ্য করতে না পেরে স্বদেশে ফিরে গেলেন।

বিয়াল্লিশ
প্লুরিসির চিকিৎসা

প্লুরিসি অব্যাহত থাকায় কিছুটা দুঃশ্চিন্তায় পড়লাম। কিন্তু আমি জানতাম যে শুধু ওষুধ খেলেই এটা সারবে না এর জন্য প্রয়োজন পথ্যের পরিবর্তন ও সহায়ক হিসেবে বাহ্যিক চিকিৎসা।

নিরামিষ পথ্যের জন্য খ্যাত ডা. আলিনসনকে আমি ডেকে পাঠালাম যিনি পথ্যের পরিবর্তন করে রোগের চিকিৎসা করতেন এবং যার সাথে ১৮৯০ সালে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি আমাকে পুরোপুরি পরীক্ষা করলেন। কি কারণে আমি দুধ পান না করার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তা তাকে খুলে বললাম। তিনি আমাকে সাহস দিয়ে বললেন, "তোমার দুধ পানের প্রয়োজন নেই। আসলে আমি চাই কিছুদিন তুমি চর্বিযুক্ত খাবার খাবে না।" তিনি আমাকে লাল আটার রুটি, কাঁচা সব্জি যেমন– বিট, মুলা, পিয়াজ ও অন্যান্য কন্দমূল ও সবুজ শাক এবং তার সাথে তাজা ফল, বিশেষত কমলা খেতে পরামর্শ দিলেন। সব্জিগুলো রান্না করতে হবে না তবে যদি চিবাতে না পারি তাহলে চিকন করে কেটে নিতে হবে।

আমি প্রায় তিনদিন এগুলো খেলাম, কিন্তু কাঁচা সব্জি আমার মোটেও সহ্য হলো না। আমার শরীরের অবস্থা এ পরীক্ষা-নিরীক্ষাতে যথাযথ সাফল্য দিতে পারল না। কাঁচা সব্জি খেতে আমি ভয় পাচ্ছিলাম।

ডা. আলিনসন আমাকে আরো উপদেশ দিলেন আমার ঘরের সব জানালা রাতদিন চব্বিশ ঘন্টা খোলা রাখতে, কুসুম গরম পানিতে স্নান করতে, শরীরের আক্রান্ত স্থানগুলোতে তেল মালিশ করতে এবং খোলা জায়গায় পনের থেকে ত্রিশ মিনিট হাঁটতে। এসব উপদেশ আমার পছন্দ হয়েছিল।

আমার ঘরের জানালাগুলো ছিল ফ্রেঞ্চ উইন্ডো যা পুরো খুলে রাখলে ঘরে বৃষ্টির পানি ঢুকে। জানালার ওপরের ফ্যান লাইট (ফ্যানের মতো জানালা) খোলা যায় না। সুতরাং আমি ফ্যান লাইটের কাঁচ ভেঙে ফেললাম যাতে ঘরে মুক্ত বাতাস ঢুকে এবং জানালাগুলো আধা খোলা রাখলাম যাতে বৃষ্টির পানি না ঢুকে।

এসব ব্যবস্থা নেয়াতে আমার স্বাস্থ্যের সামান্য উন্নতি হলো, কিন্তু তা আমাকে পুরোপুরি আরোগ্য করল না।

www.pathagar.com

লেডি সিসিলিয়া রবার্টস আমাকে মাঝে মাঝে দেখতে আসতেন। আমরা বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে দুধপানে রাজী করাতে খুব চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমি অটল রইলাম। তিনি দুধের বিকল্প খুঁজে বেড়ালেন। তার কয়েকজন বন্ধু মলটেড মিল্ক এর কথা বললেন। তারা না জেনেই তাকে আশ্বাস দিলেন এটা সম্পূর্ণরূপে দুধমুক্ত এবং দুধের সকল গুণাবলিসহ রাসয়নিক উপাদানে তৈরী। আমি জানতাম আমার ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি লেডি সিসিলিয়ার খুব শ্রদ্ধা আছে। সে কারণেই আমি তাকে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেছিলাম। আমি ঐ গুড়া দুধ পানিতে গুলে খেয়ে দেখতে পেলাম যে এর স্বাদ হুবহু দুধের মতোই। আমি বোতলের গায়ে লেবেলটা পড়ে জানলাম যে এটা দুধের তৈরী, কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরী হয়ে গেছে। অতএব আমি এটা খাওয়া ছেড়ে দিলাম।

আমার এ আবিষ্কার সম্পর্কে লেডি সিসিলিয়াকে জানালাম এবং এ নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করতে নিষেধ করলাম। তিনি কতটা দুঃখিত হয়েছেন তা বলার জন্য তৎক্ষণাৎ আমার কাছে ছুটে এলেন। তার বন্ধু বোতলের গায়ে লেবেলটা পড়েইনি। এ নিয়ে দুঃশ্চিন্তা না করতে তাকে অনুরোধ করলাম এবং এত কষ্ট করে যে জিনিস তিনি যোগাড় করেছেন তা খেতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম। আমি তাকে আরো আশ্বাস দিলাম যে ভুলবশত দুধ খেয়ে ফেলায় আমি মোটেই মর্মাহত হইনি বা অপরাধবোধে ভুগছি না।

লেডি সিসিলিয়ার সাথে আমার আরো অনেক মধুর স্মৃতিচারণ বাদ দিয়ে যেতে হবে। অনেক বন্ধুর কথাই মনে পড়ছে যারা ছিলেন আমার জীবনের কঠিন ও হতাশার সময়ে শান্তনার উৎস। যারা বিশ্বাসী তারা এ বন্ধুদের মাঝে ঈশ্বরের দয়ার প্রকাশ দেখতে পাবেন। তিনি এভাবেই খোদ দুঃখকেও মধুময় করে তোলেন।

ডা. আলিনসন পরবর্তীতে যখন এলেন তখন তার নিয়ন্ত্রণ শিথিল করলেন এবং আমাকে চর্বির জন্য চীনা বাদামের মাখন বা অলিভ অয়েল খাওয়ার অনুমতি দিলেন এবং আমার ইচ্ছা হলে ভাতের সাথে রান্না করা সব্জি খেতে বললেন। পথ্যের এ পরিবর্তনে আমি খুশি হলাম কিন্তু তা আমাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করতে ব্যার্থ হলো। এখন খুব যত্নসহ সেবার প্রয়োজন হচ্ছিল এবং বাধ্য হচ্ছিলাম অধিকাংশ সময় বিছানায় শুয়ে থাকতে।

ডা. মেহতা মাঝে মাঝে এসে আমাকে পরীক্ষা করতেন এবং আমি যদি তার উপদেশমতো চলি তাহলে তিনি আমাকে রোগমুক্ত করতে পারবেন বলে প্রস্তাব দিলেন।

এভাবে সময় কেটে যাচ্ছিল। একদিন মি. রবার্টস আমাকে দেখতে এলেন এবং খুব জোর দিয়ে আমাকে দেশে যেতে বললেন। "শরীরের এই অবস্থা নিয়ে তুমি সম্ভবত নেটলিতে যেতে পারবে না। সামনে আরো কঠিন শীত আসছে। আমি তোমাকে ভারতে ফিরে যাবার জন্য জোর উপদেশ দিচ্ছি। কারণ সেখানে গেলেই কেবল তুমি পুরোপুরি আরোগ্য লাভ করবে। তোমার আরোগ্য লাভের পর

www.pathagar.com

যদি দেখো যুদ্ধ তখনো চলছে, সেখান থেকেও তুমি তোমার সেবা প্রদানের অনেক সুযোগ পাবে। এ যাবৎ তুমি যে অবদান রেখেছ আমার বিবেচনায় তা মোটেই নগণ্য নয়।"

আমি তার পরামর্শ গ্রহণ করলাম এবং ভারতে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিতে লাগলাম।

তেতাল্লিশ
স্বদেশের পথে

মি. ক্যালেনবাচ আমার সাথে ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন সেখান থেকে ভারতে যাবার ইচ্ছে নিয়ে। আমরা একই সঙ্গে থাকতাম এবং আমাদের একই জাহাজে যাত্রা করার ইচ্ছে ছিল। তবে জার্মানদের উপর এমন কড়া নজরদারী চলছিল যে মি. ক্যালেনবাচ পাসপোর্ট পাবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ ছিল। আমি তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম এবং মি. রবার্টস যিনি তার পাসপোর্ট পাওয়ার পক্ষে ছিলেন, তিনি এ ব্যাপারে ভাইসরয়ের কাছে একটা বার্তা পাঠালেন। কিন্তু লর্ড হার্ডিঞ্জ এর সোজাসাপ্টা জবাব এলো, "দুঃখিত ভারতীয় গভর্নমেন্ট এ ধরনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়।" এ জবাবের গুরুত্ব আমরা সবাই বুঝলাম।

আমার পক্ষে মি. ক্যালেনবাচের সাথে বিচ্ছেদ বেদনা ছিল হৃদয় বিদারক, কিন্তু দেখলাম তার বেদনা আরো বেশী। তিনি যদি ভারতে আসতে পারতেন তাহলে আজ তিনি একজন কৃষক বা তাঁতীর সহজ সরল সুখী জীবন যাপন করতেন। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় আছেন, সেই পুরনো জীবন যাপন করছেন এবং স্থপতি হিসেবে ছোটখাটো ব্যবসাও করছেন।

আমরা জাহাজে তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু পিএন্ডও জাহাজে তা না পাওয়ায় আমাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে হলো।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আনা শুকনো ফলগুলো আমাদের সাথে নিলাম কারণ জাহাজে এগুলো কিনতে পাওয়া যাবেনা। জাহাজে কেবল তাজা ফল পাওয়া যায়।

ডা. জীবরাজ মেহতা আমার পাঁজরের হাড়ের ওপর "মিডিস প্লাস্টার" দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছিলেন এবং লোহিত সাগরে পৌঁছার আগে তা খুলতে নিষেধ করেছিলেন। দু'দিন পর্যন্ত আমি এটার অস্বস্তি সহ্য করলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অসহ্য বোধ হলো। অনেক কষ্টে প্লাস্টার খুলে ফেলতে সমর্থ হলাম এবং স্নান ও ধোয়ামোছার স্বাধীনতা আবার ফিরে পেলাম।

আমার পথ্য ছিল প্রধানত বাদাম ও ফল। দেখতে পেলাম প্রতিদিন আমার উন্নতি হচ্ছে এবং সুয়েজ খাল পৌঁছানো পর্যন্ত সময়ে অনেকটা ভালো বোধ করলাম। আমি দুর্বল ছিলাম তবে সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত বোধ করলাম এবং ক্রমান্বয়ে ব্যায়াম বাড়াতে লাগলাম। স্বাস্থ্যের এ উন্নতির কারণ আমি মনে করি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মুক্ত বাতাস।

www.pathagar.com

জানি না আমার অতীত অভিজ্ঞতা নাকি অন্য কারণে আমি এই জাহাজের ইংরেজ ও ভারতীয় যাত্রীদের মধ্যে একটা দূরত্ব দেখতে পেলাম যা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে যাত্রাসহ অন্যান্য যাত্রায় দেখিনি। আমি কয়েকজন ইংরেজ যাত্রীর সাথে কথা বললাম, কিন্তু তা অধিকাংশই দায়সারা, আন্তরিক নয়। দক্ষিণ আফ্রিকাগামী জাহাজগুলোতে যেরকম আন্তরিক আলোচনা হতো এবারে তা হলো না। আমার মনে হয় এর কারণ ইংরেজদের সচেতন বা অবচেতন মনে এ ধারণা রয়েছে যে তারা শাসকের জাত আর ভারতীদের মনে ধারণা রয়েছে যে তারা প্রজার জাত।

আমি বাড়ী পৌঁছতে এবং এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। এডেন পৌঁছার পর আমরা কিছুটা স্বচ্ছন্দ্য বোধ করলাম। ডারবানে মি. কেকোবাদ কাভাসজী দীনশ এর সাথে সাক্ষাত এবং তার ও তার স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুবাদে আমরা এডেনবাসীদের সম্পর্কে ভালো করে জানতাম।

আরো কয়েকদিন পরে আমরা বোম্বে পৌঁছলাম। দীর্ঘ দশ বছর প্রবাসে কাটিয়ে দেশে ফেরার কি যে আনন্দ তা অবর্ণনীয়।

গোখলের উৎসাহে বোম্বেতে আমাকে স্বাগত জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যেখানে অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি উপস্থিত ছিলেন। আমি ভারতে ফিরলাম এ আন্তরিক আশা নিয়ে যে তাঁর মাঝে আমি নিজেকে বিলীন করে দেবো এবং নিজে ভারমুক্ত হব। কিন্তু ভাগ্যের লিখন ছিল অন্য রকম।

চুয়াল্লিশ
বারের কিছু স্মৃতিচারণ

ভারতে আমার জীবনের গতিপথ সম্পর্কে বর্ণনা করার আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার কিছু অভিজ্ঞতার বর্ণনা ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ রেখেছিলাম তা এখানে বলার প্রয়োজন বলে মনে করছি। কিছু আইনজীবী বন্ধু বারের স্মৃতিচারণ করতে অনুরোধ করেছেন। এসব স্মৃতি সংখ্যায় এত বেশী যে তার সবগুলো বর্ণনা করতে গেলে ওগুলোতেই একটা বড় বই হয়ে যাবে এবং তা আমাকে মূল বিষয় থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। তবে সত্য অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কতিপয় স্মৃতির উল্লেখ সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

যতদূর মনে পড়ে আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে আমার পেশায় কখনো অসত্যের আশ্রয় নেইনি এবং আমার আইন ব্যবসার একটা বড় অংশ ছিল গণকাজের স্বার্থে যার জন্য আমি পকেট খরচার অতিরিক্ত চার্জ নেইনি এবং সে খরচাও অনেক সময় নিজেই বহন করেছি। ভেবেছিলাম ইতিপূর্বে যা বলেছি তার মাধ্যমে আমার আইন ব্যবসা সম্পর্কে সব কিছুই বলা হয়ে গেছে। কিন্তু বন্ধুরা আমাকে দিয়ে আরো কিছু বলাতে চান। মনে হয় তারা ভাবছেন আমি যখন সত্য

www.pathagar.com

থেকে বিচ্যুত হতে অস্বীকার করেছি সেসব ঘটনা যত সংক্ষেপেই হোক, বর্ণনা করা হলে আইন পেশা তা থেকে উপকৃত হতে পারে।

ছাত্র জীবনে শুনেছিলাম যে লইয়ারের (আইনজীবীর) পেশা হলো লায়ারের (মিথ্যুকের) পেশা। কিন্তু আমার ওপর এ প্রবাদের কোনো প্রভাব পড়েনি, কারণ মিথ্যা বলে খ্যাতি ও অর্থ উপার্জনের কোনো অভিপ্রায় আমার ছিল না।

আমার এ নীতি দক্ষিণ আফ্রিকাতে বহুবার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। আমি প্রায়ই জানতে পারতাম যে বিরোধী পক্ষ সাক্ষীদেরকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে এসেছে এবং আমি যদি শুধু আমার মক্কেলকে মিথ্যা বলতে উৎসাহ দিতাম তাহলেই আমরা কেসে জিততে পারতাম। কিন্তু আমি সর্বদাই সে লোভ সংবরণ করেছি। কেবলমাত্র একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যখন একটা কেস জিতে যাওয়ার পর আমার সন্দেহ হলো যে আমার মক্কেল আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে। আমি সর্বদাই অন্তরের অন্তঃস্থল হতে চাইতাম যে আমার মক্কেলের কেস যদি ন্যায় হয় তাহলে যেন আমি জিতি। আমার ফি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও মনে পড়ে না কখনো আমি কেসে জিতিয়ে দেয়ার শর্ত আরোপ করেছি। আমার মক্কেল জিতুক আর হারুক আমি আমার ফি এর চেয়ে বেশী বা কম আশা করতাম না।

প্রত্যেক নতুন মক্কেলকে আমি প্রথমেই সতর্ক করে দিতাম যে সে যেন আশা না করে যে আমি মিথ্যা কেস নেব এবং সাক্ষীদেরকে মিথ্যা বলা শেখাব। এর ফল হয়েছিল এই যে, আমার এমন একটা সুনাম হয়ে গেল যে কোনো মিথ্যা মামলা সাধারণত আমার কাছে আসতো না। প্রকৃতপক্ষে আমার কিছু মক্কেল তাদের ন্যায্য দাবীর কেসগুলো আমার জন্য রাখত এবং সন্দেহজনক কেসগুলো অন্য উকিলদের কাছে নিয়ে যেত।

একটা মামলায় কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। মামলাটি ছিল আমার শ্রেষ্ঠ মক্কেলদের একজনের। এটি ছিল জটিল হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত এবং দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলছিল। কয়েকটি কোর্টে ভাগ করে এর শুনানি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মামলার হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত অংশটি কোর্ট কর্তৃক কয়েকজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একাউন্ট্যান্টের শালিসে ন্যাস্ত করা হয়েছিল। এ সিদ্ধান্তটি আমার মক্কেলের পক্ষে ছিল। কিন্তু সালিশকারীরা অসাবধানতাবশত হিসেবে একটা ভুল করলেন। ভুল যত ছোটই হোক তা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এ কারণে যে একটি এন্ট্রি ডেবিটের ঘরে না লিখে ক্রেডিটের ঘরে লেখা হয়েছিল। বিরোধীপক্ষ অন্য কারণে সালিসের সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করেছিল। আমি আমার মক্কেলের জুনিয়র উকিল ছিলাম। সিনিয়র উকিল যখন ভুলের ব্যাপারে জানতে পারলেন তিনি মত প্রকাশ করলেন যে আমাদের মক্কেল এটা স্বীকার করতে বাধ্য নয়। তিনি পরিষ্কার মতামত দিলেন যে কোনো উকিলই তার মক্কেলের বিপক্ষে যায় এমন কিছু স্বীকার করতে বাধ্য নন। আমি বললাম ভুলটা আমাদের স্বীকার করা উচিত।

কিন্তু সিনিয়র উকিল যুক্তি দেখালেন, "সেক্ষেত্রে পুরো সালিসের সিদ্ধান্তটাই বাতিল হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভবনা রয়েছে এবং কোনো সুস্থ মস্তিস্কের উকিল তার

www.pathagar.com

মক্কেলের কেস এরকম ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাবে না। যে কোনো মূল্যে হোক এরকম ঝুঁকি নেয়ার ব্যাপারে আমি সর্বশেষ ব্যক্তি। নতুন করে এ কেসের শুনানীর জন্য পাঠানো হলে আমাদের মক্কেলের আরো কত টাকা ব্যয় করতে হবে আর তার শেষ ফলাফল কি হবে তা কেউ বলতে পারে না!"

যখন এ কথাবার্তা হচ্ছিল আমাদের মক্কেল তখন সেখানে উপস্থিত ছিল। আমি বললাম, "আমি মনে করি মক্কেল ও আমাদের উভয়ই ঝুঁকিটা নেয়া উচিত। আমরা স্বীকার না করলেও একটা ভুল সালিস যে আদালত গ্রহণ করবে তার নিশ্চয়তা কি? যদি ধরে নেই যে স্বীকারোক্তিটা মক্কেলকে ক্ষুব্ধ করবে, তাতেই বা ক্ষতি কি?"

সিনিয়র উকিল বললেন, "কিন্তু স্বীকারোক্তিটা আমরা আদৌ কেন করতে যাব?" আমি বললাম, "আমাদের বিপক্ষ ভুলটা আবিষ্কার করে ফেলবে না বা আদালত তা ধরতে পারবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়?"

সিনিয়র উকিল তার সিদ্ধান্ত জানালেন, "ঠিক আছে। তুমি কি তাহলে এ কেসে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করতে চাও? তোমার শর্ত মেনে আমি এ কেসে লড়ব না।"

আমি বিনীতভাবে বললাম, "আপনি যদি আর্গুমেন্ট না করেন, তাহলে আমাদের মক্কেল চাইলে আমি আর্গুমেন্ট করতে প্রস্তুত আছি। ভুলটা যদি স্বীকার না করা হয় তাহলে এ কেসে আমার কিছুই করার থাকবে না।"

এ কথা বলে আমি মক্কেলের দিকে তাকালাম। সে কিছুটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ল। আমি প্রথম থেকেই কেসটির সাথে জড়িত ছিলাম। মক্কেল আমার ওপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করল এবং আমার সম্পর্কে ভালো করে জানত। সে বলল, "ঠিক আছে, তাহলে আপনি কেসে আর্গুমেন্ট করুন এবং ভুল স্বীকার করুন। ভাগ্যে থাকলে আমরা হারব। যারা সঠিক পথে আছে ঈশ্বর তাদেরকে রক্ষা করুন।"

আমি খুশী হলাম। মক্কেলের কাছ থেকে আমি এছাড়া অন্য কিছু আশা করিনি। সিনিয়র উকিল আমাকে আবারো সতর্ক করলেন, আমার অনমনীয়তার জন্য করুণাবোধ করলেন, আবার সেই সাথে আমার মনোভাবকে অভিনন্দনও জানালেন।

আদালতে কি ঘটেছিল পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তা দেখব।

পঁয়তাল্লিশ
অসাধু প্রাকটিস

আমার উপদেশের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আমার কোনোই সন্দেহ ছিল না কিন্তু এ কেসে লড়ার জন্য যোগ্যতা আমার আছে কিনা তা নিয়ে খুব বেশি সন্দেহ ছিল। বুঝলাম যে সুপ্রীম কোর্টে এরকম জটিল কেসের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করা খুবই বিপজ্জনক কাজ এবং আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বিচারকদের সামনে হাজির হলাম।

www.pathagar.com

আমি হিসেবে ভুল থাকার বিষয়টি উলেখ করার সাথে সাথেই একজন বিচারক বলে উঠলেন, "এটা কি অসাধু প্রাকটিস নয়, মি. গান্ধী?"

এ অভিযোগ শুনে আমার ভেতরটা রাগে টগবগ করে ফুটতে থাকল। যেখানে অসততার চিহ্নমাত্র নেই সেখানে অসাধু প্রাকটিসের অভিযোগ অসহ্য।

আমি নিজে নিজে বললাম, "প্রথম থেকেই বিচারক যদি এরকম বিদ্বেষপরায়ণ হয় তাহলে এ জটিল কেসে জেতার সম্ভবনা খুবই ক্ষীণ।" কিন্তু আমি আমার চিন্তাকে সংহত করে জবাবে বললাম, "আমি অবাক হচ্ছি যে মহামান্য আদালত আমার কথা শেষ পর্যন্ত না শুনেই আমাকে অসাধু প্রাকটিসের জন্য সন্দেহ করছেন।"

বিচারক বললেন, "অভিযোগের প্রশ্নই নেই। এটা কেবলমাত্র পরামর্শ।"

"এ পরামর্শ আমার কাছে অভিযোগের সামিল বলে মনে হচ্ছে। মহামান্য আদালতের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা আগে আমার কথা শেষ পর্যন্ত শুনুন, তারপর যদি এতে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার মতো কিছু থাকে তবে তা করবেন।"

বিচারক জবাব দিলেন, "আপনাকে থামিয়ে দেয়ার জন্য দুঃখিত। দয়াকরে কি ভুল আছে তা ব্যাখ্যা করে যান।"

আমার বক্তব্যের সমর্থনে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ ছিল। এ প্রসঙ্গ উপস্থাপনের জন্য বিচারককে ধন্যবাদ। প্রথম থেকেই আমি পুরো আদালতের পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছি। আমি খুব উৎসাহ পেলাম এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ গ্রহণ করলাম। আদালত ধৈর্যসহকারে আমার কথা শুনলেন এবং আমি বিচারকগণকে বুঝাতে সক্ষম হলাম যে হিসেবে গড়মিলটা সম্পূর্ণরূপে অসাবধানতার জন্য হয়েছে। সুতরাং তারা সালিসের সিদ্ধান্ত, যার পেছনে প্রচুর শ্রম দেওয়া হয়ে গেছে, বাতিল করতে রাজী ছিলেন না।

বিপক্ষের উকিল এই বিশ্বাস নিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করলেন যে ভুলটা স্বীকার করার পরে বেশি যুক্তিতর্কের প্রয়োজন হবে না কিন্তু বিচারকগণ যেহেতু মেনে নিয়েছিলেন যে ভুলটা দৈবক্রমে হয়েছে এবং তা সহজেই সংশোধনযোগ্য। প্রতিপক্ষের উকিল সালিসের রায়কে আক্রমণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন কিন্তু যে বিচারক প্রথমেই আমাকে সন্দেহ করেছিলেন তিনি এখন নিশ্চিন্তভাবে আমার পক্ষ নিলেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ধরা যাক, যদি মি. গান্ধী ভুলটা স্বীকার না করতেন তাহলে আপনি কি করতেন?"

"আমরা যে একাউন্টটেন্ট নিয়োগ করেছি তার চেয়ে যোগ্য, সৎ ও বিশেষজ্ঞ একাউন্টটেন্ট নিয়োগ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।"

বিচারক বললেন, "আদালত অবশ্যই ধরে নেবে যে আপনার কেস সম্পর্কে আপনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। কোনো বিশেষজ্ঞ একাউন্টটেন্ট ভুল করতে পারে কিন্তু আপনি যদি তা ধরতে না পারেন তাহলে আদালত একটা স্পষ্ট ভুলের

www.pathagar.com

কারণে মামলার পক্ষগণকে নতুন করে মামলা করতে ও ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য করবে না। ভুলটা যখন সহজেই সংশোধন করা যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা নতুন করে শুনানির আদেশ দিতে পারি না।"

সুতরাং প্রতিপক্ষের উকিলের আপত্তি অগ্রাহ্য করা হলো। আদালত ভুল সংশোধন সহ সালিসের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছিলেন নাকি সালিসকারীদেরকে ভুল সংশোধনের আদেশ দিয়েছিলেন তা আজ আর মনে নেই।

আমি আনন্দিত হয়েছিলাম। আমার মক্কেল ও সিনিয়র উকিলও খুশী হয়েছিলেন এবং আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ়তর হলো যে সত্যের সাথে সমঝোতা না করেও আইনের ব্যবসা করা অসম্ভব নয়।

তবে মনে রাখা উচিত যে সত্যবাদীতাও আইন পেশাকে তার মজ্জাগত ত্রুটি থেকে মুক্ত করতে পারবে না।

ছেচল্লিশ
মক্কেলরা সহকর্মীতে পরিণত হলো

নাটাল ও ট্রান্সভালে আইন ব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল যে নাটালে ছিল যৌথ বার অর্থাৎ একজন ব্যারিস্টার যখন এ্যাডভোকেট হিসেবে স্বীকৃতি পেত তখন সে এ্যাটর্নি হিসেবেও প্রাকটিস করতে পারত; কিন্তু বোম্বের মতো ট্রান্সভালে এ্যাটর্নি আর এ্যাডভোকেটদের কর্মপরিধি আলাদা ছিল। একজন ব্যারিস্টারের নির্বাচন করার অধিকার ছিল, সে এ্যাডভোকেট হিসেবে প্রাকটিস করুক কিংবা এ্যাটর্নির দায়িত্ব পালন করুক। সুতরাং নাটালে আমি এ্যাডভোকেট হিসেবে তালিকাভুক্ত হলেও ট্রান্সভালে এ্যাটর্নি হিসেবে অন্তর্ভুক্তির আবেদন করলাম। কারণ একজন এ্যাডভোকেট হিসেবে আমি ভারতীয়দের সাথে সরাসরি সংস্পর্শে আসতে পারব না, আর দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা এ্যাটর্নিরাও আমাকে ব্রীফ দেবে না।

কিন্তু ট্রান্সভালেও এটর্নিরা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হতে পারতেন। একবার যখন আমি জোহান্সবার্গে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কেস পরিচালনা করছিলাম হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে আমার মক্কেল আমার সাথে প্রবঞ্চণা করেছে। সাক্ষীর কাঠগড়ায় আমি তাকে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়তে দেখলাম। সুতরাং কোনো যুক্তিতর্ক ছাড়াই আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে মামলা খারিজ করে দিতে বললাম। বিপক্ষের উকিল অবাক হলেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট খুশি হলেন। আমি আমার মক্কেলকে বকাঝকা করলাম আমার কাছে মিথ্যা কেস নিয়ে আসার জন্য। আমি কখনো মিথ্যা মামলা নেইনি সে তা জানত এবং আমি বিষয়টা তাকে বোঝানোর পরে সে তার ভুল স্বীকার করল এবং আমার ধারণা ম্যাজিস্ট্রেটকে তার বিরুদ্ধে রায় দিতে বলায় সে আমার ওপর রাগ করেনি। আমার এ আচরণ কোনোভাবেই আমার প্রাকটিসের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেনি বরং আমার কাজ আরো সহজ করেছে। আমি আরো দেখলাম যে সত্যের প্রতি আমার অনুরাগ আইন পেশার সদস্যদের মধ্যে আমার

www.pathagar.com

সুনাম বাড়িয়ে দিল এবং আমার কালো বর্ণের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমি তাদের ভালোবাসা অর্জনে সমর্থ হলাম।

আমার পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে আমার অভ্যাস ছিল যে আমি কখনো মক্কেল বা সহকর্মীদের কাছ থেকে আমার অজ্ঞতা লুকাইনি। যখনই আমি অনুভব করেছি যে আমি মামলাটি পরিচালনায় অপরাগ আমার মক্কেলকে বলেছি অন্য কোনো উকিলের পরামর্শ নিতে অথবা যদি সে আমাকে দিয়েই মামলা করাতে চাইত তাহলে আমি তাকে বলতাম যে আমাকে সিনিয়র উকিলের সাহায্য নিতে দিতে হবে। আমার অকপটতার ফলে আমি মক্কেলদের অসীম ভালোবাসা ও আস্থা অর্জন করতে পেরেছি। যখন সিনিয়র উকিলের সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন হয়েছে তারা স্বেচ্ছায় সিনিয়রির উকিলের ফি দিয়ে দিয়েছে। এই ভালোবাসা ও আস্থা আমার গণকাজের খুব সহায়ক হয়েছে।

আগের অধ্যায়গুলোতে আমি বলেছি যে দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমার আইন ব্যবসার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সম্প্রদায়ের সেবা করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষের আস্থা অর্জন ছিল অপরিহার্য শর্ত। হৃদয়বান ভারতীয়রা অর্থের বিনিময়ে পেশাগত দায়িত্ব পালনকে মহান সেবা বলে গণ্য করেছিল এবং যখন আমি তাদেরকে অধিকার আদায়ের জন্য কারাবরণের কষ্ট স্বীকার করতে পরামর্শ দিলাম তখন তাদের অনেকেই তা সানন্দে মেনে নিল, এ কাজ তারা করেছিল যৌক্তিকতা বিচার করে যতটা নয় তার চেয়ে বেশি আমার ওপর তাদের আস্থা ও ভালোবাসার খাতিরে।

এসব লিখতে গিয়ে অনেক মধুর স্মৃতি আমার মনে পড়ছে। শত শত মক্কেল জনসেবার কাজে আমার বন্ধু ও প্রকৃত সহকর্মীতে পরিণত হয়েছিল এবং তাদের সাহচর্য আমার কঠিন ও বিপদশঙ্কুল জীবনকে মধুময় করে তুলেছিল।

সাতচল্লিশ
যেভাবে একজন মক্কেল রক্ষা পেলেন

ইতিপূর্বের বর্ণনা থেকে পাঠক পার্সী রুস্তমজীর সাথে ভালো করেই পরিচিত হয়েছেন। তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি একই সাথে আমার মক্কেল ও সহকর্মী অথবা এটা বলাই হয়তো বেশি সত্য হবে যে তিনি প্রথমে সহকর্মী ও পরে আমার মক্কেল হয়েছিলেন। আমি তার এতই আস্থাভাজন হয়েছিলাম যে ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া ব্যাপারে তিনি আমার পরামর্শ নিতেন ও সেভাবে কাজ করতেন। এমনকি অসুস্থ হলেও তিনি আমার সাহায্য নিতেন এবং যদিও আমাদের মধ্যে জীবন যাত্রার বিস্তর পার্থক্য ছিল তবুও তিনি আমার হাতুড়ে চিকিৎসা নিতে দ্বিধাবোধ করতেন না।

এই বন্ধু একদা কঠিন সমস্যায় পড়লেন। যদিও তিনি তার প্রায় সকল বিষয় আমাকে জানাতেন, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে একটা বিষয় গোপন রেখেছিলেন। তিনি বোম্বে ও কোলকাতা থেকে বিপুল পরিমাণ মালামাল আমদানী করতেন এবং

www.pathagar.com

প্রায়ই তিনি চোরাচালানের আশ্রয় নিতেন। কিন্তু যেহেতু কাস্টমস কর্মকর্তাদের সাথে তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল তাদের কেউই তাকে সন্দেহ করতেন না। কাস্টমস শুল্ক ধার্য করার ক্ষেত্রে তার ইনভয়েস সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা হতো না। তার চোরাকারবারের সাথে কাস্টমস কর্মকর্তাদের কেউ কেউ হয়তো সহাযোগীও ছিলেন।

গুজরাটী কবি আখো'র একটি উপমা এখানে উল্লেখ করার মতো-চুরি হলো পারদের মতো যা লুকিয়ে রাখা যায় না এবং পার্সী রুস্তমজীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। বন্ধুটি চোখের পানিতে ভাসতে ভাসতে আমার কাছে ছুটে এলো। বলল, "ভাই, আমি আপনার সাথে প্রতারণা করেছি। আজ আমি ধরা পড়ে গেছি। চোরাচালান করে আমি নিজের ধ্বংস ডেকে এনেছি। অবশ্যই আমার জেল হবে এবং সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। কেবল আপনিই আমাকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতে পারেন। আপনার কাছে আমার কোনো কিছুই গোপন রাখিনি, কিন্তু ভেবেছিলাম এ ধরনের ব্যবসায়িক কৌশলের বিষয়ে আপনাকে বিরক্ত করা উচিত হবে না, আর তাই আমি এ চোরাচালান সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলিনি। কিন্তু এখন আমি কি অনুতপ্তই না হচ্ছি!"

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "আপনাকে রক্ষা করা না করা সব তাঁরই হাতে। আমার সম্পর্কে আপনি তো জানেন। আমি আপনার দোষ স্বীকার করানোর মাধ্যমে বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারি।"

ভালোমানুষ পার্সী রুস্তমজী গভীর লজ্জায় মরে যাচ্ছিলেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কাছে স্বীকারোক্তি করাই কি যথেষ্ট নয়?"

আমি নম্রভাবে জবাব দিলাম, "আপনি আমার কাছে দোষ করেননি, গভর্নমেন্টের কাছে করেছেন। আমার কাছে স্বীকারোক্তি করলে তাতে লাভ কি?"

পার্সী রুস্তমজী বললেন,"আপনি যা বলবেন আমি অবশ্য তাই করব, কিন্তু আমার পুরনো উকিল মি. অমুকের সাথে আলোচনা করে নিলে কি ভালো হতো না? সেও তো আমার শুভাকাঙ্খী বন্ধু।"

তদন্তে দেখা গেল দীর্ঘদিন ধরেই চোরাচালান চলে আসছিল, কিন্তু বর্তমান ধরা পড়া ঘটনায় তুচ্ছ অংকের টাকা জড়িত। আমরা তার উকিলের কাছে গেলাম। তিনি কাগজপত্র পড়ে বললেন, "এ কেসের বিচার করবেন নাটালের জুরীরা এবং তারা একজন ভারতীয়কে কিছুতেই ছাড়বে না। কিন্তু আমি আপনাকে নিরাশ করছি না।"

আমি এই উকিলকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতাম না। পার্সী রুস্তমজী তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আপনাকে ধন্যবাদ। এ কেসে আমি মি. গান্ধীর পরামর্শমতো কাজ করতে চাই। তিনি আমাকে ভালো করে চেনেন। তবে আপনিও তাকে প্রয়োজনমতো পরামর্শ দেবেন।"

এভাবে উকিলের পরামর্শ ভুলে রেখে আমরা পার্সী রুস্তমজীর দোকানে ফিরে গেলাম।

www.pathagar.com

এখন আমার মতামত ব্যাখ্যা করে তাকে বললাম, "আমার এ কেস আদৌ কোর্টে ওঠা উচিত নয়। আপনাকে শাস্তি দেয়া বা ছেড়ে দেয়া কাস্টমস অফিসারের এখতিয়ার এবং এ ব্যাপারে তিনি এটর্নি জেনারেলের পরামর্শ নিতে পারেন। আমি এদের দু'জনের সাথেই দেখা করতে রাজী আছি। আমার অভিমত হলো তারা যে জরিমানা ধার্য করবে আপনি তা দিয়ে দিতে রাজী হবেন, তবে সমস্যা হলো তারা তা গ্রহণে রাজী হবে কিনা। যদি তারা রাজী না হয় তাহলে আপনাকে জেলে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকতেই হবে। আমার মতে, জেলে যাবার চেয়ে অপরাধ করার মধ্যে লজ্জা বেশি। আসল লজ্জার কাজ করা হয়ে গেছে। জেলে যাওয়াটা এখন প্রায়শ্চিত্ত করা। সত্যিকার প্রায়শ্চিত্ত হলো আর কখনো চোরাচালান না করার শপথ নেয়া।"

পার্সী রুস্তমজী এসব কথা ভালোভাবে মেনে নিয়েছিলেন কিনা তা বলতে পারি না। তিনি সাহসী ছিলেন বটে, কিন্তু ঐ সময়ে তার সাহস হারিয়ে গিয়েছিল। তার সুনাম-সুখ্যাতি বিপন্ন হয়েছিল এবং এত যত্ন ও পরিশ্রমে গড়ে তোলা তার খ্যাতির প্রাসাদ ভেঙে চুরমার হয়ে গেলে তার অবস্থা কি হবে ভেবে অস্থির হয়ে উঠছিলেন।

তিনি বললেন, "ঠিক আছে, আমি তো বলেছি, আমি এখন সম্পূর্ণ আপনার হাতের মুঠোয়। আপনি যা খুশী করতে পারেন।"

এ কেসে আমি মানুষকে বুঝিয়ে রাজী করানোর জন্য আমার সর্বোচ্চ ক্ষমতা কাজে লাগালাম। আমি কাস্টমস অফিসার এর সাথে দেখা করে নির্ভয়ে পুরো ঘটনা তাকে খুলে বললাম। আমি তাকে কথা দিলাম এ সংক্রান্ত সকল খাতাপত্র তাকে দেয়া হবে এবং পার্সী রুস্তমজী এ কাজের জন্য কতটা গভীরভাবে অনুতপ্ত তাও তাকে বললাম।

কাস্টমস অফিসার বললেন, "আমি বুড়ো পার্সীকে পছন্দ করি। তার এ বোকামীর জন্য আমার দুঃখ হয়। আপনি জানেন আমার কর্তব্য কি। আমাকে অবশ্যই এটর্নি জেনারেলের নির্দেশনামতো কাজ করতে হবে। সুতরাং আমার পরামর্শ হচ্ছে তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে রাজী করানো।"

আমি বললাম, "আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব যদি আপনি কেসটা কোর্ট পর্যন্ত টেনে নিতে জেদ না করেন।"

তার নিকট হতে এ প্রতিশ্রুতি আদায় করে আমি এটর্নি জেনারেলের সাথে যোগাযোগ করলাম এবং তার সাথে দেখাও করলাম। আমি আনন্দের সাথে উল্লেখ করছি যে তিনি আমার খোলাখুলি সবকিছু স্বীকার করার প্রশংসা করলেন এবং বুঝলেন যে আমি কোনো কিছুই গোপন করিনি।

এখন মনে করতে পারছি না এই কেসে নাকি অন্য কোনো কেসের ব্যাপারে আমার অধ্যবসায় ও সত্যবাদীতার জন্য তিনি এ মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন, "দেখতে পাচ্ছি, তোমাকে 'না' জবাব দেবার কোনো উপায় নেই।"

www.pathagar.com

পার্সী রুস্তমজীর কেস সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছিল। যত টাকার মালামাল চোরাচালানের কথা তিনি স্বীকার করেছিলেন তার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড তাকে দিতে হয়েছিল। রুস্তমজী পুরো কেসের বিবরণ সংক্ষেপে লিখে তার অফিসে ঝুলিয়ে রাখলেন উত্তরাধিকারী ও ব্যবসায়ী বন্ধুদের জন্য চিরস্থায়ী সতর্কবাণী হিসেবে।

রুস্তমজীর ব্যবসায়ী বন্ধুরা আমাকে সতর্ক করে বললেন তার এ ক্ষণস্থায়ী অনুশোচনায় বিশ্বাস করবেন না। এ সতর্কবাণী সম্পর্কে রুস্তমজীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "আপনার সাথে প্রতারণা করলে আমার ভাগ্যে কি ঘটবে তা কি আমি জানি না?"

www.pathagar.com

আত্মার আত্মজীবনী

[পঞ্চম পর্ব]

।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এক
প্রথম অভিজ্ঞতা

আমি বাড়ি পৌঁছার আগেই ফিনিক্স থেকে যে দলটি রওনা হয়েছিল তারা পৌঁছে গেল। মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের আগেই আমার পৌঁছার কথা, কিন্তু ইংল্যান্ডে যুদ্ধের কারণে আমার ব্যস্ততা সব হিসাব ভণ্ডুল করে দিল এবং যখন আমি দেখলাম যে ইংল্যান্ডে আমাকে অনির্দিষ্টকাল অবস্থান করতে হবে তখন আমার সামনে প্রশ্ন দেখা দিল, ফিনিক্স থেকে আগত দলটি কোথায় থাকবে? আমি চেয়েছিলাম সম্ভব হলে তারা ভারতে একত্রে থাকবে এবং ফিনিক্সে তারা যে জীবন যাপন করেছে এখানেও তাই করবে। এমন কোনো আশ্রমের কথা আমার জানা ছিল না যেখানে তাদেরকে যেতে বলব, সুতরাং তাদেরকে তারবার্তা করে জানালাম মি. এন্ড্রুজ এর সাথে দেখা করতে এবং তিনি যেভাবে বলেন সেভাবে চলতে।

অতএব তাদেরকে প্রথমে কাংরীর গুরুকুল আশ্রমে উঠানো হলো যেখানে প্রয়াত স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী তাদের সাথে নিজ সন্তানের মতো ব্যবহার করলেন। এরপর তাদেরকে শান্তি নিকেতন আশ্রমে যেতে হলো। সেখানেও কবি ও তার লোকজন তাদের একই রকম ভালোবাসায় সিক্ত করলেন। এ দু'জায়গাতে তারা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করল তা তাদের ও আমার খুব কাজে লেগেছিল।

আমি এন্ড্রুজকে বলতাম কবি, শ্রদ্ধানন্দজী ও অধ্যক্ষ সুশীল রুদ্র-এ তিনজন মিলে ত্রিরত্ন তৈরি করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে সে এই ত্রিরত্ন সম্পর্কে বলতে গিয়ে কখনো ক্লান্তিবোধ করত না। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার মধুর স্মৃতিগুলোর মধ্যে এ ত্রিরত্ন সম্পর্কে দিনে রাতে এন্ড্রুজের কথাবার্তা সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মি. এন্ড্রুজ স্বাভাবিকভাবেই ফিনিক্স দলকে সুশীল রুদ্রর কাছে নিয়ে এলেন। অধ্যক্ষ রুদ্রের কোনো আশ্রম ছিল না, কিন্তু তার একটা বাড়ি ছিল। তিনি সেটাকে সম্পূর্ণরূপে ফিনিক্স পরিবারের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিলেন। এখানে পৌঁছার একদিনের মধ্যে তারা এতই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল যে ফিনিক্স ছেড়ে আসার দুঃখবোধ একেবারেই থাকল না।

আমি বোম্বেতে নামার পরেই কেবল জানতে পারলাম যে ফিনিক্স দল শান্তি নিকেতনে আছে। সুতরাং গোখলের সাথে দেখা করার পরেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের সাথে দেখা করার জন্য আমি অস্থির হয়ে উঠলাম।

বোম্বেতে আমার অভ্যর্থনা ছোট আকারে সত্যাগ্রহ পালনের সুযোগ করে দিল।

www.pathagar.com

মি. জাহাঙ্গীর পেটিট এর প্রাসাদে আমার সম্মানে আয়োজিত পার্টিতে আমি গুজরাটী বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না। ঐ চোখ ঝলসানো প্রাসাদোপম পরিবেশে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের মধ্যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কাটানো ব্যক্তি হিসেবে আমার নিজেকে একেবারে গেঁয়ো মনে হলো। কাথিয়াওয়াড়ী পোষাক, ধুতী ও পাগড়ীতে আমাকে কিছুটা ভদ্র দেখাচ্ছিল, কিন্তু মি. পেটিট এর প্রাসাদের জাঁকজমক ও চাকচিক্য আমাকে সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি করে ফেলল। তবে স্যার ফিরোজশাহ্‌র নিরাপদ আশ্রয়ে আমি নিজেকে মোটামুটি মুক্ত বলে ভাবতে পারলাম।

এরপর সেখানে গুজরাটী অনুষ্ঠান হলো। গুজরাটীরা আমাকে অভ্যর্থনা না জানিয়ে ছাড়বে না, যার আয়োজক ছিলেন প্রয়াত উত্তমলাল ত্রিবেদী। এখানকার কর্মসূচী আমার আগেই জানা ছিল। একজন গুজরাটী হিসেবে মি. জিন্নাহও উপস্থিত ছিলেন, তবে সভাপতি না প্রধান বক্তা হিসেবে তা ভুলে গেছি। তিনি ইংরেজিতে সংক্ষিপ্ত, মধুর ছোট বক্তৃতা দিলেন। আমার যতদূর মনে পড়ে বক্তৃতাগুলোর বেশিরভাগই ছিল ইংরেজিতে। আমার পালা এলে আমি গুজরাটী ও হিন্দুস্থানী ভাষার প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করে গুজরাটী ভাষায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম এবং গুজরাটীদের অনুষ্ঠানে ইংরেজী ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে আমার ভদ্র প্রতিবাদ জানালাম।

মনে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে আমি স্বদেশী ভাষা ব্যবহার করেছিলাম, কারণ আমার ভয় হচ্ছিল যে এটাকে দীর্ঘ প্রবাস জীবনের পর ঘরে ফেরা একজন অনভিজ্ঞ লোকের অসৌজন্যমূলক আচরণ এবং প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধাচরণ বলে গণ্য করা হতে পারে। কিন্তু মনে হলো আমার জবাব দেবার অটল মনোভাবকে গুজরাটীদের কেউ ভুল বোঝেননি। প্রকৃতপক্ষে আমি দেখে খুশী হলাম যে প্রত্যেকেই আমার প্রতিবাদে মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন।

এভাবে এ সভা আমাকে এই চিন্তা করতে সাহসী করল যে আমার নতুন গজিয়ে উঠা ধ্যান-ধারণা আমার দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা আমার পক্ষে কঠিন কাজ হবে না।

বোম্বেতে অল্প দিনের অবস্থান শেষে এসব প্রাথমিক অভিজ্ঞতা ঝুলিতে পুরে আমি পুনা গেলাম, যেখানে গোখলে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

দুই
গোখলের সাথে পুনায়

বোম্বেতে পৌছার পর মুহূর্তে গোখলে আমাকে খবর পাঠালেন যে গভর্নর আমার সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করছেন এবং পুনার পথে যাত্রার পূর্বেই তার সাথে দেখা করা উচিত। তদনুযায়ী আমি মহামান্য গভর্নরের সাথে দেখা করলাম। স্বাভাবিক কুশল বিনিময়ের পর তিনি বললেন, "আমি তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব। আশা করি যখনই তুমি গভর্নমেন্ট সম্পর্কিত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করবে আমার সাথে আগে দেখা করবে।"

www.pathagar.com

আমি জবাব দিলাম, "খুব সহজেই আমি এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, কেননা একজন সত্যাগ্রহী হিসেবে আমার নীতি হলো আমি যে দলের সাথে বোঝাপড়া করতে চাই সে দলের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা এবং যতদূর সম্ভব তাদের সাথে একমত হওয়ার চেষ্টা করা। আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় এ নিয়ম পালন করেছি এবং এখানেও তা করতে চাই।"

লর্ড উইলিংডন আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, "তোমার যখন ইচ্ছা আমার কাছে চলে আসবে, আর দেখবে আমার গভর্নমেন্ট যেন ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ভুল না করে।"

এর জবাবে আমি বললাম, "এটাই সেই বিশ্বাস যা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।"

অতঃপর আমি পুনা গেলাম। এই মূল্যবান সময়ের সকলের স্মৃতিকথা লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। গোখলে এবং সার্ভেন্টস অব ইন্ডিয়া সোসাইটির সদস্যগণ তাদের স্নেহ বর্ষণ করে আমাকে অভিভূত করলেন। যতদূর মনে পড়ে, গোখলে তাদের সকলকেই ডেকে এনেছিলেন আমার সাথে দেখা করার জন্য। তাদের সকলের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমার খোলামেলা আলোচনা হলো।

গোখলে খুব আগ্রহী ছিলেন যাতে আমি সার্ভেন্টস অব ইন্ডিয়া সোসাইটিতে যোগদান করি, আমারও সেরকমই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সোসাইটির সদস্যরা বুঝলেন যে, যেহেতু তাদের ও আমার আদর্শ ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে তাই এতে আমার যোগদান ঠিক হবে না। গোখলে বিশ্বাস করতেন নিজের নীতির উপর অটল থেকেও আমি তাদের আদর্শ গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি এবং তা মেনে নিতে সক্ষম হব।

তিনি বললেন, "কিন্তু সোসাইটির সদস্যরা জানে না যে তুমি তাদের নীতির সাথে মানিয়ে নিতে প্রস্তুত আছ। তারা তাদের নীতি আঁকড়ে আছে এবং এ ব্যাপারে তারা স্বাধীন। আমি আশা করছি তারা তোমাকে গ্রহণ করবে, কিন্তু যদি তা নাও করে তুমি এক মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করবে না যে তোমার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা কম আছে। তারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছে যাতে তোমার প্রতি তাদের গভীর শ্রদ্ধা কোনোভাবেই ক্ষুণ্ন না হয়। কিন্তু তুমি আনুষ্ঠানিকভাবে এর সদস্য হও বা না হও, আমি তোমাকে সদস্য বলেই গণ্য করব।"

আমি গোখলেকে আমার অভিপ্রায় জানালাম। আমাকে সদস্য করা হোক বা না হোক, আমি চাই একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে যেখানে আমি আমার ফিনিক্স পরিবার নিয়ে বসতি গড়তে পারব এবং সেটা গুজরাটের কোথাও হলে ভালো হয়, কারণ একজন গুজরাটী হিসেবে আমার ধারণা গুজরাটের সেবা করার মাধ্যমে আমি দেশের সর্বোত্তম সেবা করতে পারব। গোখলে ধারণাটা পছন্দ করলেন। বললেন, "তুমি অবশ্যই সেটা করবে। সদস্যদের সাথে আলোচনার ফলাফল যাই হোক না কেন, তুমি আশ্রমের খরচের জন্য কত টাকার প্রয়োজন তা আমাকে জানাবে কারণ আশ্রমটাকে আমি নিজের বলে মনে করি।"

www.pathagar.com

আমার হৃদয়ের আনন্দ উপচে পড়ল। তহবিল সংগ্রহের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া এবং এটা বুঝতে পারা যে কাজটা শুরু করার বাধ্যবাধকতা কেবল আমার একার নয়, বরং অসুবিধায় পড়লে একজন নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতা আমার সাথে আছেন এসব ভেবে বেশ আনন্দ হচ্ছিল। এর ফলে আমার মনের ওপর থেকে বড় বোঝা নেমে গেল।

সুতরাং প্রয়াত ডা. দেবকে ডেকে আনা হলো এবং তাকে বলা হলো সোসাইটির হিসাবের খাতায় আমার নামে একটা একাউন্ট খুলতে এবং আশ্রমের জন্য ও গণকাজের ব্যয়বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ আমাকে দিতে।

এবারে আমি শান্তি নিকেতন যাবার প্রস্তুতি নিলাম। আমার বিদায়ের আগের দিন সন্ধ্যায় গোখলে নির্বাচিত বন্ধুদের একটি পার্টির আয়োজন করলেন, এতে যত্নসহকারে আমার পছন্দের খাবার অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের ফল ও বাদামের ব্যবস্থা করলেন। তার রুম থেকে কয়েক পা দূরে পার্টি চলছিল তা সত্ত্বেও কয়েক পা হেঁটে এসে পার্টিতে যোগদান করার মতো শারীরিক অবস্থা তার ছিল না। কিন্তু আমার প্রতি ভালোবাসার টানে তার অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলো এবং তিনি পার্টিতে যোগ দিতে জিদ করলেন। তিনি আসলেন কিন্তু অজ্ঞান হয়ে পড়লেন এবং তাকে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁর এরকম জ্ঞান হারানো নতুন নয়, তাই জ্ঞান ফিরলেই তিনি বলে পাঠালেন আমরা যেন অবশ্যই পার্টি চালিয়ে যাই।

এ পার্টির উদ্দেশ্য ছিল গেস্ট হাউজের উল্টোদিকে খোলা জায়গায় বসে কথোপকথন, যেখানে হালকা খাবার যেমন বাদাম, খেজুর ও মৌসুমী ফল-ফলাদী খেতে খেতে আমন্ত্রিত বন্ধুরা একে অপরের সাথে মন খুলে খোশগল্পে মেতে ওঠা।

কিন্তু পার্টিতে কারো অজ্ঞান হয়ে যাবার ঘটনা আমার জীবনে তেমন সাধারণ নয়।

তিন
এটা কি হুমকি ছিল?

পুনা থেকে আমি রাজকোট ও পোরবন্দর গেলাম এবং আমার বিধবা বৌদি ও অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে দেখা করলাম।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের সময় আমি আমার পোষাক পরিবর্তন করেছিলাম যাতে তা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের সাথে মানানসই হয় এবং ইংল্যান্ড গিয়ে ঘরোয়া পোষাক হিসেবে এগুলি পরতাম। বোম্বেতে অবতরণের সময় পরার জন্য আমি এক সেট কাথিয়াওয়াড়ী পোষাক তৈরি করেছিলাম যার মধ্যে ছিল ভারতীয় কাপড়ের তৈরি একটা শার্ট, একটা ধুতী, একটা আলখেল্লা, একটা সাদা স্কার্ফ। কিন্তু আমি যেহেতু বোম্বে থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তাই স্কার্ফ ও আলখেল্লাটাকে অতিরিক্ত বোঝা বলে মনে হলো এবং স্কার্ফগুলো বাদ দিয়ে আট থেকে দশ আনা দামের একটা কাশ্মিরী টুপি কিনলাম। এ

www.pathagar.com

ধরনের পোষাক পরে যেকোনো ব্যক্তি নিঃসন্দেহে দরিদ্র লোক হিসেবে উৎরে যাবে।

ঐ সময়ে প্লেগ চলতে থাকায় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণকে বিরামগাঁও নাকি ওয়াধওয়ায়, সঠিক মনে নেই কোথায়, ডাক্তারী পরীক্ষা করা হচ্ছিল। আমার সামান্য জ্বর ছিল। স্বাস্থ্য পরিদর্শক আমার জ্বর দেখে আমাকে রাজকোটে মেডিকেল অফিসারের সাথে দেখা করতে বললেন এবং আমার নাম লিখে রাখলেন।

কেউ হয়তো আগাম খবর পাঠিয়েছিল যে আমি ওয়াধওয়ার ওপর দিয়ে যাচ্ছি, সে কারণে সেখানকার বিখ্যাত গণকর্মী দর্জি মতিলাল আমার সাথে দেখা করতে স্টেশনে এসেছিলেন। তিনি আমাকে বিরামগাঁও কাস্টমস-এ রেলওয়ে যাত্রীদের অসুবিধা ও দুর্ভোগের কথা বললেন। জ্বরের কারণে আমার কথা বলার মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না এবং সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে কথা শেষ করতে চাইলাম যার প্রকাশ ঘটল একটি প্রশ্নের আকারে, "আপনি কি জেল খাটতে প্রস্তুত আছেন?"

আমি মতিলালকে সেসব যুবকের মতো ভেবেছিলাম যারা অগ্রপশ্চাদ না ভেবেই কথা বলে। কিন্তু মতিলাল তা নয়। সে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে উত্তর দিল, "আমরা অবশ্যই জেলে যেতে প্রস্তুত আছি, যদি আপনি নেতৃত্ব দেন। কাথিয়াওয়াড়ী হিসেবে আপনার ওপর প্রথম দাবি আমাদের। আমরা অবশ্যই এখন আপনাকে দেরী করাব না, কিন্তু ফেরত পথে আপনি এখানে বিরতি করবেন এ প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। আমাদের যুবকদের কাজ ও মনোবল দেখে আপনি আনন্দিত হবেন এবং আপনি আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারেন যে যখনই ডাকবেন আমাদের থেকে সাড়া পাবেন।

মতিলালের ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করল। একজন সহকর্মী তার প্রশংসা করে বলল, "আমাদের বন্ধু একজন দর্জি হতে পারে, কিন্তু পেশাগত কাজে সে এতই দক্ষ যে সে দৈনিক এক ঘন্টা কাজ করেই মাসে পনের রুপী অতি সহজেই আয় করে, যেটা তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট। বাকী সময় সে ব্যয় করে গণকাজে। আমাদের মতো শিক্ষিত লোকদের লজ্জা দিয়ে সে নেতৃত্ব দেয়।"

পরে আমি মতিলালের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলাম এবং দেখলাম যে তার প্রশংসার মধ্যে কোনো অতিরঞ্জন ছিল না। নতুন স্থাপিত আশ্রমে সে প্রতিমাসে কয়েক দিন করে কাটানোর নিয়ম করে নিয়েছিল। এ সময়ে সে আশ্রমে ছেলেদেরকে দর্জির কাজ শিক্ষা দিত এবং নিজেও আশ্রমে দর্জির কাজ করে দিত। সে প্রতিদিন আমাকে বিরামগাঁও-এ যাত্রীদের দুর্দশার কথা বলত যেটা তার জন্য অসহনীয় হয়ে উঠছিল। যৌবনের প্রারম্ভেই হঠাৎ অসুস্থতায় তার মৃত্যু হয়েছিল এবং ওয়াধওয়াতে তার অভাবে জনসেবার কাজ ব্যাহত হয়েছিল।

রাজকোট পৌঁছে পরের দিন সকালে আমি মেডিকেল অফিসারের নিকট রিপোর্ট করলাম। আমি সেখানে অপরিচিত ছিলাম না। ডাক্তার লজ্জিত হলেন এবং স্বাস্থ্য পরিদর্শকের ওপর রাগ করলেন। এর কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ

www.pathagar.com

পরিদর্শক কেবল তার কর্তব্য পালন করেছিল। সে আমাকে চিনত না, আর যদি চিনত তাহলেও সে অন্য রকম কিছু করত না। মেডিকেল অফিসার আমাকে আবার তার কাছে যেতে দিলেন না, তার পরিবর্তে আমার কাছে একজন পরিদর্শক পাঠানোর নির্দেশ দিলেন। এরকম পরিস্থিতিতে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা অত্যাবশ্যক। যদি বড় লোকেরা ইচ্ছে করে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন, সমাজে তাদের পদমর্যাদা যাই হোক না কেন তাদের অবশ্য কর্তব্য হলো নিজে থেকেই সেসব নিয়ম পালন করা যা গরিবদের পালন করতে হয় এবং সরকারী কর্মচারীদেরও এ ব্যাপারে পক্ষপাতহীন হওয়া উচিত। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা হলো যে সরকারী কর্মচারীরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেরকে তাদের মতো মানুষ হিসেবে গণ্য করার পরিবর্তে তাদেরকে ভেড়ার পাল মনে করে। তারা তাদের সাথে কথা বলে অবজ্ঞার সাথে এবং কোনো জবাব বা যুক্তিতর্ক সহ্য করে না। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সরকারী কর্মচারীকে এমনভাবে মান্য করতে হয় যেন তারা তার চাকর, আর সরকারী কর্মচারী কোনো রকম শাস্তির ঝুঁকি ছাড়াই তাদেরকে নির্দয়ভাবে প্রহার করতে এবং ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে পারেন এবং ট্রেন ফেল করানো সহ সম্ভাব্য সর্বোচ্চ অসুবিধায় ফেলার পরে তাদেরকে টিকেট দিতে পারেন। এসব আমি নিজের চোখে দেখেছি। এসব অনিয়মের সংস্কার সম্ভব নয় যদি না কিছু শিক্ষিত ও ধনী লোক দরিদ্রদের মর্যাদায় নেমে আসেন, তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন, দরিদ্রদেরকে দেয়া হয় না এমন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং পরিহারযোগ্য দুর্ভোগ, অসম্মান ও অন্যায় সহ্য করার পরিবর্তে যথানিয়মে সেগুলো দূর করার জন্য সংগ্রাম করেন।

যখনই আমি কাথিয়াওয়াড় গিয়েছি প্রতিবারই বিরামগাঁও কাস্টমসের দুর্ভোগের কথা শুনেছি। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিলাম যে অবিলম্বে আমি লর্ড উইলিংডন কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করব। এ বিষয়ে যত লেখালেখি হয়েছে তার সবগুলি সংগ্রহ করে পড়লাম, নিজে নিশ্চিত হলাম যে অভিযোগগুলোর দৃঢ় ভিত্তি রয়েছে এবং বোম্বে গভর্নমেন্টের সাথে পত্র যোগাযোগ শুরু করলাম। আমি লর্ড উইলিংডনের প্রাইভেট সেক্রেটারীর সাথে দেখা করলাম এবং মহামান্য লর্ড উইলিংডনের সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। তিনি তার সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। কিন্তু এর জন্য দিল্লীকে দায়ী করলেন, "আমাদের এখতিয়ারে থাকলে আমরা এ কর্ডন (পুলিশের বেষ্টনি) অনেক আগেই তুলে নিতাম। তুমি ভারতীয় গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করে দেখতে পার।"

আমি ভারতীয় গভর্নমেন্টের সাথে পত্র যোগাযোগ করলাম, কিন্তু প্রাপ্তি স্বীকার ছাড়া কোনো জবাব পেলাম না। অবশেষে যখন আমি লর্ড চেমসফোর্ডের সাথে দেখা করার একটা সুযোগ পেলাম তখন এ ব্যাপারে প্রতিকার পেলাম। আমি যখন বিষয়টি তথ্যসহ তার কাছে উপস্থাপন করলাম তিনি অবাক হলেন। তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না। তিনি আমার কথা ধৈর্য্য সহকারে শুনলেন, তৎক্ষণাৎ টেলিফোনে বিরামগাঁও সম্পর্কিত কাগজপত্র চাইলেন এবং প্রতিশ্রুতি

www.pathagar.com

দিলেন যদি কর্তৃপক্ষ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে না পারে বা আত্মপক্ষ সমর্থনযোগ্য কিছু না থাকে তাহলে কর্ডন তুলে দেবেন। এ সাক্ষাৎকারের কয়েকদিন পরেই খবরের কাগজে পড়লাম যে বিরামগাঁও কাস্টমসের কর্ডন তুলে নেয়া হচ্ছে।

এ ঘটনাকে আমি ভারতে সত্যাগ্রহের আগমন হিসেবে গণ্য করলাম। কারণ আমি যখন বোম্বে গভর্নমেন্টের সাথে দেখা করি তখন কাথিয়াওয়াড়ের বংগাশ্রায় দেয়া আমার এক বক্তৃতায় সত্যাগ্রহের উল্লেখ করেছিলাম। তার প্রতি ইঙ্গিত করে সেক্রেটারী অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এটা কি হুমকি দেয়া নয়? এবং তুমি কি মনে কর কোনো শক্তিশালী গভর্নমেন্ট হুমকির কাছে মাথা নত করবে?"

আমি উত্তর দিয়েছিলাম, "এটা কোনো হুমকি নয়। এটা জনগণকে শিক্ষা দেয়া। আমার কর্তব্য হলো অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সকল বৈধ প্রতিকারের উপায় জনগণের সামনে তুলে ধরা। যে জাতি স্বাধীন হতে চায় স্বাধীনতা লাভের সকল উপায় ও পথ তার জানা উচিত। সাধারণত এসব উপায়ের মধ্যে সর্বশেষ হলো সহিংসতা। অপরদিকে সত্যাগ্রহ হলো সম্পূর্ণরূপে অহিংস অস্ত্র। আমি মনে করি এর অনুশীলন ও সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করে বুঝানো আমার কর্তব্য। বৃটিশ গভর্নমেন্ট একটা শক্তিশালী গভর্নমেন্ট তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যাগ্রহ যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার পাওয়ার একটি সার্বভৌম উপায় এতেও আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

চতুর সেক্রেটারী মাথা নেড়ে বললেন, "সেটা আমরা বিবেচনা করে দেখব।"

চার
শান্তি নিকেতন

রাজকোট থেকে আমি শান্তি নিকেতন যাত্রা করলাম। সেখানকার শিক্ষক ও ছাত্রদের ভালোবাসা আমাকে অভিভূত করল। অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানটি ছিল আড়ম্বরহীনতা, শৈল্পিক সৌন্দর্য ও ভালোবাসার সমন্বিত রূপ। এখানে প্রথমবারের মতো কাকা সাহেব কালেলকারের সাথে আমার সাক্ষাত হলো।

তখন আমি জানতাম না কালেলকারকে কেন "কাকাসাহেব" নামে ডাকা হতো। কিন্তু পরে আমি জেনেছিলাম যে শ্রীযুক্ত কেশবরাও দেশপাণ্ডে যিনি আমার সমসাময়িক এবং ইংল্যান্ডে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং যিনি বরোদা রাজ্যে গঙ্গানাথ বিদ্যালয় নামে একটি স্কুল পরিচালনা করতেন, বিদ্যালয়ে একটা পারিবারিক পরিবেশ তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষকদেরকে তিনি পারিবারিক নাম দিতেন। শ্রীযুক্ত কালেলকার সেখানকার শিক্ষক ছিলেন, তাকে ডাকা হতো "কাকা" (শাব্দিক অর্থে পিতার ভাই), পাধকেকে মামা (মায়ের ভাই) এবং হরিহর শর্মাকে 'আন্না' (ভাই)। অন্যদেরকেও অনুরূপ নাম দেয়া হয়েছিল। কাকার বন্ধু আনন্দানন্দ (স্বামী) এবং মামার বন্ধু পাতবর্ধন (আন্না) পরে এই পরিবারে যোগ

www.pathagar.com

দেন এবং কালক্রমে সবাই একে একে আমার সহকর্মীতে পরিণত হন। শ্রীযুক্ত দেশপাণ্ডের নিজের নাম ছিল 'সাহেব'। যখন বিদ্যালয়টি বিলুপ্ত হলো, পরিবারটাও ভেঙে গেল, কিন্তু তাদের মধ্যেকার আত্মার বন্ধন বা তাদের গৃহীত নাম তারা কখনো ত্যাগ করেননি।

কাকাসাহেব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখছিলেন এবং আমি যখন শান্তি নিকেতনে গেলাম সে সময়ে তিনিও সেখানে এলেন। একই ভ্রাতৃদলের সদস্য চিন্তামনশাস্ত্রীও সেখানে ছিলেন। তারা উভয়েই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় সহায়তা করতেন।

শান্তি নিকেতনে ফিনিক্স পরিবারের জন্য পৃথক বাসা বরাদ্দ করা হয়েছিল। মগনলাল গান্ধী তাদের প্রধান ছিলেন এবং ফিনিক্স আশ্রমের নিয়ম-কানুন যাতে এখানেও বিচক্ষণতার সাথে পালিত হয় তার তদারকী করা তার কর্তব্য বলে তিনি ধরে নিয়েছিলেন। আমি দেখলাম যে তার ভালোবাসা, জ্ঞান ও অধ্যবসায়ের ফলে তার সুনাম পুরো শান্তি নিকেতনে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এন্ড্রুজ আর পিয়ারসনও সেখানে ছিল। বাঙালী শিক্ষকদের মধ্যে যাদের সাথে আমাদের মোটামুটি ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তারা হলেন জগদানন্দবাবু, নেপালবাবু, সন্তোষবাবু, ক্ষীতিমোহনবাবু, নগেনবাবু, শারদবাবু এবং কালীবাবু।

আমার অভ্যাস মতো শিক্ষক ও ছাত্রদের সাথে আমি দ্রুত মিশে গেলাম এবং তাদের নিয়ে স্বাবলম্বন এর উপর একটি আলোচনার আয়োজন করলাম। আমি শিক্ষকদের বললাম যে যদি তারা নিজেরা ও ছাত্ররা বেতনভুক পাচককে বাদ দিয়ে নিজেদের খাবার নিজেরাই রান্না করে তাহলে ছেলেদের শারীরিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ হতে শিক্ষকরা রান্নাঘর নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হবেন এবং এতে ছাত্ররা স্বাবলম্বনের বাস্তব শিক্ষাও লাভ করবে। তাদের দু'একজন অসম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন, কয়েকজন প্রস্তাবের পক্ষে জোরালো সমর্থন জানালেন। ছেলেরা একে স্বাগত জানাল, তবে সম্ভবত তা নতুনত্বের প্রতি তাদের স্বভাবজাত আকর্ষণের কারণে। সুতরাং আমরা এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলাম। আমি যখন কবিকে তার মতামত জানাতে আমন্ত্রণ করলাম, তিনি বললেন যে শিক্ষকরা প্রস্তাবের পক্ষে থাকলে তার কোনো আপত্তি নেই। ছাত্রদেরকে তিনি বললেন, "এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে স্বরাজের চাবি রয়েছে।"

এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল করতে পিয়ারসন তার শরীর ক্ষয় করে ফেলল। প্রবল আগ্রহ নিয়ে সে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল। একটা দল গঠন করে দেয়া হলো যারা সবজি কাটবে, আরেকদল চাল-ডাল পরিষ্কার করবে এবং অন্য দলগুলো তাদের কাজ করবে। নগেনবাবু ও তার সাথে আরো কয়েকজন রান্নাঘর ও এর পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা তদারকির দায়িত্বে ছিলেন। কোদাল হাতে তাদেরকে কাজ করতে দেখে আমার বড় আনন্দ হলো।

কিন্তু একশত পঁচিশজন ছাত্রকে তাদের শিক্ষকসহ এ ধরনের কায়িক শ্রমে নিয়োজিত রাখা ছিল অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। প্রতিদিন তাদের নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান হতো। কেউ কেউ অল্পতেই ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ল। কিন্তু পিয়ারসন

www.pathagar.com

ক্লান্ত হবার পাত্র নন। তাকে সর্বদাই দেখা যেত হাসিমুখে রান্নাঘরে বা তার আশপাশে কিছু একটা করতে। রান্নার বড় পাত্রগুলো পরিষ্কারের দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। ছাত্রদের একদল ধোয়া-মোছার কাজে নিয়োজিতদের সামনে সেতার বাজাতে থাকল কাজের একঘেঁয়েমি দূর করার জন্য। সবাই প্রবল আগ্রহে কাজে নামল এবং শান্তি নিকেতন মৌচাকের মতো কর্মব্যস্ত হয়ে উঠল।

এ ধরনের পরিবর্তন একবার শুরু হলে ক্রমশ তার উন্নতি ঘটে। ফিনিক্স পার্টির রান্নাঘর শুধু স্ব-পরিচালিত ছিল তাই নয়, এখানে রান্না করা খাবারও ছিল সবচেয়ে সাদামাটা। মশলার ব্যবহার বর্জন করা হয়েছিল। ভাত, ডাল, সবজি এবং গমের আটা পর্যন্ত সবকিছু একসঙ্গে একটা স্টীম কুকারে রান্না করা হতো। শান্তি নিকেতনের ছেলেরাও বাঙালী রান্নাঘরের সংস্কারের জন্য একই ধরনের রান্না শুরু করল। একজন বা দু'জন শিক্ষক আর কয়েকজন ছাত্র মিলে এ রান্নাঘর পরিচালনা করত।

কিছুদিন পর অবশ্য এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাদ দেয়া হয়েছিল। আমার মতে অল্প সময়ের জন্য এ পরীক্ষা-নরীক্ষা চালিয়ে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটির কোনো ক্ষতি হয়নি এবং যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল তার কিছু কিছু অবশ্যই শিক্ষকদের কাজে লেগেছে।

আমি শান্তি নিকেতনে কিছুকাল থাকতে চেয়েছিলাম কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। আমি এখানে একসপ্তাহ থাকতে না থাকতেই গোখলের মৃত্যু সংবাদসহ পুনা থেকে টেলিগ্রাম পেলাম। শান্তি নিকেতন শোকে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সকল সদস্য তাদের শোক প্রকাশ করতে আমার কাছে এলেন। জাতীয় ক্ষতিতে শোক প্রকাশের জন্য আশ্রমের মন্দিরে একটি বিশেষ সভা আহ্বান করা হলো। এটা ছিল একটা ভাব গম্ভীর অনুষ্ঠান। ঐ দিনই আমি আমার স্ত্রী ও মগনলালকে সাথে নিয়ে পুনা রওনা হলাম। আর সবাই শান্তি নিকেতনে থাকলেন।

এন্ড্রুজ আমার সাথে বর্ধমান পর্যন্ত গেলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি মনে করেন যে ভারতে সত্যাগ্রহ পালনের সময় আসবে? যদি সে সময় আসে তবে আপনার কি ধারণা আছে তা কখন আসবে?"

আমি বললাম, "তা বলা মুশকিল। এক বছর পর্যন্ত আমার কিছু করার নেই। কারণ গোখলে আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেছেন যে আমাকে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতে হবে এবং আমার প্রশিক্ষণকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমার মতামত প্রকাশ করা যাবে না। এমন কি এক বছর পার হলেও আমার মতামত প্রকাশে আমি তাড়াহুড়ো করব না। আর সে কারণে আমার মনে হয় না আগামী পাঁচ বছর বা এরকম সময়ের মধ্যে সত্যাগ্রহের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে।"

এ প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, গোখলে আমার "হিন্দু স্বরাজ" (ইন্ডিয়ান হোম রুল) বইতে বর্ণিত কতিপয় ধারণা নিয়ে উপহাস করতেন এবং বলতেন, "ভারতে এক বছর থাকার পর তোমার ধারণা নিজে নিজেই সংশোধন হবে।"

www.pathagar.com

পাঁচ

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুঃখ

একজন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীকে টিকেট সংগ্রহ করতে গেলেও যে কি কষ্ট করতে হয় বর্ধমানে আমরা তা সামনাসামনি দেখলাম। আমাদেরকে বলা হলো, "তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট এত আগে বিক্রী করা হয় না।" আমি স্টেশন মাস্টারের নিকট গেলাম, সেটাও ছিল কঠিন কাজ। তিনি কোথায় আছেন কয়েকজন দয়া করে তা দেখিয়ে দিলেন এবং আমি তার কাছে আমার অসুবিধার কথা তুলে ধরলাম। তিনিও একই জবাব দিলেন। টিকেট বিক্রীর জানালা খোলার সাথে সাথে আমি টিকেট কিনতে গেলাম। কিন্তু টিকেট পাওয়া অতো সহজ ছিল না। এখানে ছিল জোর যার মুল্লুক তার, আর যেসব যাত্রী সামনে ছিল তারা অন্যদের প্রতি উদাসীন, আমাকে বাইরের দিকে ঠেলে দিয়ে তারা একের পর এক টিকেট নিয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং দলের প্রথমে থেকেও টিকেট পাওয়ার জন্য আমি প্রায় শেষ ব্যক্তি হলাম। ট্রেন এলো এবং ট্রেনের ভিতরে ঢুকা আরেক পরীক্ষার ব্যাপার। যেসব যাত্রী ইতিমধ্যেই ট্রেনের ভিতরে আছে এবং যারা ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে তাদের মধ্যে অবারিত গালিগালাজ আর ধাক্কাধাক্কি বিনিময় হচ্ছে। আমরা প্লাটফরমের এমাথা থেকে ওমাথা দৌড়াদৌড়ি করলাম কিন্তু সবখানেই একই কথা, "এখানে জায়গা নেই।" আমি গার্ডের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, "অবশ্যই আপনাকে নিজের চেষ্টায় উঠতে হবে, না হলে পরের ট্রেনে যেতে হবে।"

"কিন্তু আমার খুব জরুরি কাজ আছে" আমি সম্মানের সাথে বললাম। আমার কথা শোনার সময় তার ছিল না। আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। আমি মগনলালকে বললাম যেখানে পারো উঠে যাও এবং আমি স্ত্রীকে সাথে নিয়ে ইন্টার ক্লাশ কম্পার্টমেন্টে উঠলাম। গার্ড আমাদেরকে ওঠার সময় দেখলেন। আসানসোল স্টেশনে তিনি আমাদের থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করতে এলেন। আমি তাকে বললাম, "আমাদের জায়গা করে দেয়া আপনার কর্তব্য ছিল। আমরা চেষ্টা করেও জায়গা পাইনি এবং সে কারণেই আমরা এখানে বসেছি। আপনি যদি যেকোনো তৃতীয় শ্রেণীর কম্পার্টমেন্টে আমাদের জায়গা করে দিতে পারেন আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে সেখানে চলে যাব।"

"আপনি আমার সাথে তর্ক করবেন না", গার্ড বললেন। "আমি আপনার জায়গা করে দিতে পারব না। আপনাকে অবশ্যই অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হবে অথবা বের হয়ে যেতে হবে।"

যে কোনো উপায়ে আমি পুনা পৌঁছাতে চাচ্ছিলাম। আমি গার্ডের সাথে ঝগড়া করতে প্রস্তুত ছিলাম না। সুতরাং তার দাবি অনুযায়ী পুনা পর্যন্ত অতিরিক্ত ভাড়া পরিশোধ করলাম। কিন্তু আমি এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করলাম।

সকালে আমরা মোগলসরাই পৌঁছলাম। মগনলাল তৃতীয় শ্রেণীতে একটা সীট দখল করতে পেরেছিল সেখানে আমি চলে এলাম। আমি টিকেট পরীক্ষককে সমস্ত ঘটনা জানালাম এবং তাকে এই মর্মে একটা সার্টিফিকেট দিতে বললাম যে

www.pathagar.com

আমি মোগলসরাই স্টেশনে তৃতীয় শ্রেণীতে বদলী হয়ে এসেছি। তিনি তা দিতে অস্বীকার করলেন। আমি অতিরিক্ত ভাড়া ফেরৎ পাবার জন্য রেলওয়ের কর্তৃপক্ষকে লিখলাম এবং এ মর্মে একটা জবাব পেলাম, "সার্টিফিকেট দাখিল করা ছাড়া অতিরিক্ত ভাড়া ফেরৎ প্রদানের আমাদের নিয়ম নেই, কিন্তু আপনার কেসটি আমরা ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচনা করছি। তবে বর্ধমান থেকে মোগলরাই পর্যন্ত অতিরিক্ত ভাড়া ফেরৎ প্রদান সম্ভব নয়।"

এ সময় থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করে আমার যত অভিজ্ঞতা হয়েছে তার সবই যদি লিখতে যাই সেগুলোতেই পুরো একটা ভলিউম হয়ে যাবে। কিন্তু আমি শুধু অনিয়মিতভাবে কিছু ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ অধ্যায়গুলোতে উল্লেখ করব। এটা আমার জন্যে গভীর দুঃখের বিষয় যে শারীরিক অসামর্থ্য আমাকে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দুঃখের জন্য নিঃসন্দেহে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের উদ্ধত মনোভাব দায়ী। যাত্রীদের নিজেদের নোংরা অভ্যাস, স্বার্থপরতা এবং অজ্ঞতাও কম দায়ী নয়। দুঃখের বিষয় হলো তারা প্রায়ই বুঝে না যে তারা খারাপ, নোংরা ও স্বার্থপরের মতো ব্যবহার করছে। তারা বিশ্বাস করে যে তারা যা কিছু করছে সবই স্বাভাবিক নিয়মে করছে। এসবের মূলে আছে তাদের প্রতি আমাদের মতো শিক্ষিত লোকদের অবহেলা।

আমরা কল্যাণ স্টেশনে পৌছলাম ভীষণ ক্লান্ত হয়ে। মগনলাল ও আমি স্টেশনের পানির পাইপ থেকে কিছু পানি পেয়ে স্নান করলাম। আমি যখন আমার স্ত্রীকে স্নানের ব্যবস্থা করতে নিয়ে যাচ্ছি, সার্ভেন্টস অব ইন্ডিয়া সোসাইটির শ্রীযুক্ত কাউল আমাদের চিনতে পেরে এগিয়ে এলেন। তিনিও পুনা যাচ্ছিলেন। তিনি আমার স্ত্রীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বাথরুমে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিলেন। এই সৌজন্যমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করতে আমি দ্বিধাবোধ করছিলাম। আমি জানতাম যে আমার স্ত্রীর দ্বিতীয় শ্রেণীর বাথরুম ব্যবহারের অধিকার নেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি এ অনুচিত কাজে মৌন সম্মতি দিলাম। আমি জানি সত্যের পূজারীকে এটা মানায় না। আমার স্ত্রী বাথরুম ব্যবহারে আগ্রহী ছিল তা নয়, তবে স্ত্রীর প্রতি একজন স্বামীর পক্ষপাতিত্ব তার সত্যের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ওপর জয়ী হলো। উপনিষদে বলা হয়েছে সত্যের মুখ লুকিয়ে আছে মায়ার সোনালী পর্দার পেছনে।

ছয়

সমর্থন লাভের চেষ্টা

পুনায় পৌছে আমরা দেখলাম যে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। এরপর আমরা সোসাইটির ভবিষ্যৎ নিয়ে এবং আমি এতে যোগদান করব কি না সে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করলাম। এই সদস্যপদের প্রশ্ন আমার কাছে খুব স্পর্শকাতর বিষয় হয়ে দাঁড়াল। গোখলে যতদিন ছিলেন ততদিন সদস্য পদ লাভের আবেদন করতে হয়নি। আমাকে শুধু তার নির্দেশমতো চলতে হয়েছে, সে অবস্থানটা আমিও পছন্দ করতাম। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ভারতীয় রাজনীতির সমুদ্রে যাত্রা শুরু করতে আমার

www.pathagar.com

একজন দক্ষ পাইলটের প্রয়োজন ছিল। গোখলের মধ্যে সেই পাইলট ছিল এবং তার আশ্রয়ে আমি নিরাপদে ছিলাম। এখন তিনি নেই, আমাকে নিজের চেষ্টায় চলতে হবে এবং আমি অনুভব করলাম যে এখন সমিতিতে সদস্যপদের আবেদন করা আমার কর্তব্য। আমার মনে হলো এতে গোখলের আত্মাও খুশী হবে। সুতরাং নির্দ্বিধায় এবং দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে আমি সমর্থন আদায়ের চেষ্টায় নেমে পড়লাম।

এ সন্ধিক্ষণে সোসাইটির অধিকাংশ সদস্যই পুনাতে ছিলেন। আমি তাদেরকে বোঝানো শুরু করলাম এবং আমার সম্পর্কে তাদের ভীতি দূর করতে সচেষ্ট হলাম। কিন্তু দেখলাম তারা দ্বিধাবিভক্ত। একদল আমার অন্তর্ভুক্তির পক্ষে, অন্যদল ঘোর বিরোধী। আমি জানতাম আমার প্রতি ভালোবাসায় তারা কেউ কারো চেয়ে কম যায় না। কিন্তু সম্ভবত সোসাইটির প্রতি তাদের আনুগত্য ছিল আরো বেশি, আমার প্রতি তাদের ভালোবাসার চেয়ে তা কোন অংশে কম নয়। সুতরাং আমাদের সব আলোচনা ছিল তিক্ততা মুক্ত এবং পুরোপুরি নীতি নির্ধারণের বিষয়ে সীমাবদ্ধ। যে দল আমার অন্তর্ভুক্তির বিরোধী তাদের মত হলো বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে তাদের ও আমার অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে এবং তাদের ধারণা যে আমাকে সদস্যপদ দেয়া হলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ধ্বংসের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এটা তারা মেনে নিতে পারবে না।

দীর্ঘ আলোচনার পরে আমরা যে যার মতো চলে গেলাম, পরবর্তী আলোচনার দিন পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রইল। আমি বেশ উত্তেজিত অবস্থায় ঘরে ফিরলাম। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট নিয়ে আমাকে সোসাইটির সদস্যপদ পেতে হবে এটা কি ঠিক হচ্ছে? সেটা কি গোখলের প্রতি আমার আনুগত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম, সোসাইটিতে আমার অন্তর্ভুক্তি নিয়ে যখন সদস্যদের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছে, আমার জন্য সর্বোত্তম কাজ হবে আমার আবেদন প্রত্যাহার করা এবং যারা আমার অন্তর্ভুক্তির বিরোধীতা করছে তাদেরকে বিব্রতকর অবস্থা থেকে রক্ষা করা। এর মাধ্যমেই কেবল আমি সোসাইটি ও গোখলের প্রতি আমার আনুগত্য প্রকাশ করতে পারি। সিদ্ধান্তটি হঠাৎ করেই আমার মনে উদয় হলো, তৎক্ষণাৎ স্থগিত ঘোষিত সভা আর আহ্বান না করার অনুরোধ জানিয়ে মি. শাস্ত্রীকে পত্র লিখলাম। যারা আমার আবেদনের বিরোধীতা করেছিলেন তারা আমার এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন। এটা তাদেরকে বিব্রতকর অবস্থা থেকে রক্ষা করল এবং আমাদেরকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের আরো দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করল। আমার আবেদন প্রত্যাহারের মাধ্যমে আমি সোসাইটির সত্যিকার সদস্য হয়ে গেলাম।

অভিজ্ঞতা থেকে এখন প্রমাণিত হচ্ছে যে, আমি আনুষ্ঠানিকভাবে সদস্য না হওয়ায় ভালো হয়েছে এবং যারা আমার বিরোধীতা করেছিল তারাই সঠিক ছিল। অভিজ্ঞতা থেকে আরো দেখা যাচ্ছে যে নীতির প্রশ্নে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিরাট

www.pathagar.com

ব্যবধান রয়েছে। কিন্তু মতপার্থক্য স্বীকার করে নেয়ার অর্থ আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ বা তিক্ততা সৃষ্টি নয়।

আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্ক অটুট রয়েছে এবং পুনায় সোসাইটির বাড়িটি আমার জন্য একটা তীর্থস্থান হয়ে আছে।

যদিও এটা সত্য যে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে সোসাইটির সদস্য হইনি, কিন্তু আত্মার দিক থেকে আমি এর স্থায়ী সদস্য। দৈহিক সম্পর্কের অর্থ হলো আত্মাহীন দেহ।

সাত
কুম্ভমেলা

এর পর আমি ডা. মেহতার সাথে দেখা করতে রেংগুন গেলাম এবং পথে কোলকাতায় যাত্রা বিরতি করলাম। আমি প্রয়াত বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসুর অতিথি হয়েছিলাম। বাঙালী আতিথেয়তা এখানে পূর্ণতা পেয়েছিল। সে সময়ে আমি ছিলাম সম্পূর্ণরূপে ফলাহারী, তাই কোলকাতায় যত ফল ও বাদাম পাওয়া যায় তার সবই কেনার আদেশ দেয়া হয়েছিল। বাড়ির মহিলারা রাত জেগে বিভিন্ন প্রকার বাদামের খোসা ছাড়ালেন। ভারতীয় পদ্ধতিতে ফল পরিবেশন করতে সম্ভাব্য সব রকম যত্ন নেয়া হয়েছিল। আমার সহযাত্রীদের মধ্যে আমার পুত্র রামদাসও ছিল। তাদের জন্য অসংখ্য পদের সুস্বাদু খাবার তৈরি করা হয়েছিল। আমি এই আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করি, কিন্তু দু'তিনজন অতিথিকে আপ্যায়নের জন্য সারা বাড়ির লোকজন ব্যস্ত হয়ে উঠবে এ চিন্তাটা আমার কাছে অসহনীয়। কিন্তু এ ধরনের বিব্রতকর খাতির-যত্ন থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায়ও ছিল না।

রেংগুনগামী জাহাজে আমি ডেকের যাত্রী ছিলাম। শ্রীযুক্ত বসুর বাড়িতে যদি যত্নের আধিক্য আমাদের বিব্রত করে থাকে, এখানে তার উল্টো। এ জাহাজে আমাদের ভাগ্যে জুটল সবচেয়ে বিশ্রী অমনোযোগ, এমন কি ডেক যাত্রীদের ন্যূনতম মৌলিক সুযোগ-সুবিধাও না থাকা। বাথরুম অসহ্য রকমের নোংরা, পায়খানাগুলো দুর্গন্ধযুক্ত ময়লার পাত্র হয়ে আছে। এর জন্য কর্তৃপক্ষের কি অজুহাত থাকতে পারে আমার জানা নেই। পায়খানা ব্যবহার করতে মূত্র ও মলের নদীর মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে হবে অথবা তা লাফিয়ে পার হতে হবে।

এসব রক্ত-মাংসের মানুষের সহ্যের বাইরে। আমি চীফ অফিসারের কাছে আবেদন জানালাম, কিন্তু কাজ হলো না। দুর্গন্ধ ও ময়লার চিত্রকে পূর্ণতা দিতে যদি কিছু বাকী থেকে থাকে যাত্রীদের বদ-অভ্যাস তাকে পূর্ণতা দিয়েছিল। তারা যেখানে বসতো সেখানেই থু থু ফেলত, খাবারের উচ্ছিষ্ট, তামাক ও পানের পিক ফেলে চারপাশ নোংরা করত। কোলাহলের অন্ত ছিল না এবং প্রত্যেকে যত বেশি সম্ভব জায়গা দখল করে নিতে ব্যস্ত ছিল। তাদের নিজেদের চেয়ে লাগেজের জায়গা বেশি লাগছিল। এভাবে আমরা সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে দু'দিন পার করলাম।

www.pathagar.com

রেংগুনে পৌঁছে জাহাজ কোম্পানীর এজেন্টকে পত্র লিখে জাহাজের অবস্থা বিস্তারিত জানালাম। এ পত্রের সুবাদে এবং এ ব্যাপারে ডা. মেহতার চেষ্টায় ডেকযাত্রী হিসেবে ফেরৎ যাত্রায় কষ্টটা কম হয়েছিল।

রেংগুনে আমার ফলাহার আমার আতিথ্যকর্তার জন্য অতিরিক্ত বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু যেহেতু ডা. মেহতার বাড়ি ছিল আমার নিজের বাড়ির মতো, মেনু কাটছাট করে অপব্যয় কিছুটা কমাতে পারলাম। তবে আমি যেহেতু কয়টা পদ খাব তা নির্ধারণ করে দেইনি, বিভিন্ন প্রকার ফলের স্বাদ গ্রহণ থেকে জিহ্বা এবং চোখকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হলো না। খাবার গ্রহণের নির্ধারিত কোনো সময় ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে দিনের শেষ খাবার আমি সন্ধ্যার আগেই খেতে পছন্দ করতাম। তা সত্ত্বেও প্রচলিত অভ্যাসবশত রাত আটটা বা নয়টার আগে খাওয়া হতো না।

এ বছর, ১৯১৫ সাল ছিল কুম্ভমেলার বছর, যা হরিদ্বারে প্রতি বারো বছরে একবার অনুষ্ঠিত হয়। আমি কোনোভাবেই মেলায় যেতে আগ্রহী ছিলাম না, কিন্তু আমি মহাত্মা মুন্সীরামজীর সাথে সাক্ষাতের জন্য খুব আগ্রহী ছিলাম। তিনি ছিলেন তাঁর গুরুকুলে। গোখলের সোসাইটি কুম্ভমেলায় একটি বড় স্বেচ্ছাসেবক দল পাঠিয়েছিল। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জুরু ছিলেন দলের প্রধান এবং প্রয়াত ডা. দেব ছিলেন মেডিকেল অফিসার। তাদের সাহায্য করতে আমার ফিনিক্স পার্টি পাঠাতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সুতরাং মগনলাল গান্ধী আমার আগেই সেখানে চলে গিয়েছিল। রেংগুন থেকে ফিরে আমিও তাদের সাথে যোগ দিলাম।

কোলকাতা থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত ভ্রমণ ছিল বিশেষভাবে যন্ত্রণাদায়ক। কখনো কখনো কম্পার্টমেন্টে বাতি ছিল না। সাহারানপুর থেকে মালামাল বা গবাদিপশুর গাড়িতে আমাদেরকে গাদাগাদি করে ঢোকানো হলো। এ গাড়িগুলোর কোনো ছাদ ছিল না এবং মাথার ওপর ঝলসানো মধ্যাহ্ন সূর্যের তাপ আর পায়ের নিচে উত্তপ্ত লোহার মেঝে—এ দু'য়ের মাঝখানে আমরা সবাই পুড়ে কাবাব হয়ে গেলাম। এহেন ভ্রমণেও তৃষ্ণার যন্ত্রণা গোঁড়া হিন্দুদেরকে পানি পান করতে রাজি করাতে পারল না, যদি সে পানি মুসলমানদের দেয়া হয়। তারা অপেক্ষা করল যতক্ষণ না হিন্দু পানি পাওয়া যায়। মনে রাখা প্রয়োজন এই হিন্দুরাই অসুস্থতার সময়ে যখন ডাক্তার তাদেরকে মদ খেতে দেয় বা গো-মাংস-চা পানের বিধান দেয় অথবা মুসলমান বা খৃষ্টান কম্পাউন্ডার তাদেরকে পানি দেয় তখন কিন্তু তারা ওগুলো খেতে বা পান করতে অতটা দ্বিধা করে না বা প্রশ্ন তোলে না। শান্তি নিকেতনে আমাদের অবস্থান আমাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছে যে ভারতে আমাদের বিশেষ দায়িত্ব হবে পচা ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা। এখন হরিদ্বারে একটা ধর্মশালায় স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য তাবু খাটানো হলো এবং ডা. দেব পায়খানা হিসেবে ব্যবহারের জন্য কিছু গর্ত খুঁড়লেন। এগুলোর দেখাশুনার জন্য তাকে বেতনভূক মেথরের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল। এখানেই ফিনিক্স পার্টির কাজ ছিল। আমরা মাটি দিয়ে মল ঢেকে দেয়ার এবং অপসারণের ব্যবস্থা নেয়ার প্রস্তাব

www.pathagar.com

করলাম এবং ডা. দেব সানন্দে আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রস্তাবটা ছিল আমার, কিন্তু তা কার্যকর করতে হয়েছিল মগনলাল গান্ধীকে। আমার কাজ ছিল প্রধানত তাবুতে বসে থেকে দর্শন দেয়া এবং আমার সাথে দেখা করতে আসা অসংখ্য তীর্থ যাত্রীদের সাথে ধর্মীয় ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করা। এর ফলে আমার নিজের জন্য এক মিনিট সময়ও রইল না। দর্শনার্থীরা স্নানঘাট পর্যন্ত আমার পিছু নিত, এমনকি খাবার সময়েও তারা আমাকে একা থাকতে দেয়নি। এভাবে হরিদ্বারে এসে আমি বুঝতে পারলাম দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমার ক্ষুদ্র সেবা সমগ্র ভারতে কতটা গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

কিন্তু এ ঈর্ষণীয় অবস্থান আমার কাম্য ছিল না। আমার মনে হলো যেন আমি উভয় সংকটে পড়ে গেছি। যেখানে আমাকে কেউ চিনতে পারেনি, সেখানে এদেশের লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্যে যে দুর্ভোগ থাকে আমাকে তাই পোহাতে হয়েছে, যেমনটা রেল ভ্রমণে হয়েছে। আমার সম্পর্কে শুনেছে এমন লোকেরা যখন আমাকে ঘিরে ধরেছে আমি তাদের দর্শনের হুজুগের শিকার হয়েছি। আমি প্রায়ই চিন্তা করে স্থির করতে পারি না এ দু'অবস্থার মধ্যে কোনটি আমার জন্য বেশি করুণাযোগ্য। আমি এটা অন্তত জানি যে দর্শনওয়ালাদের অন্ধ ভালোবাসা আমাকে প্রায়ই রাগান্বিত করেছে, তার চেয়ে বেশি হৃদয়ে ক্ষত তৈরি করেছে। অপরদিকে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ যদিও যন্ত্রণাদায়ক ছিল তা আমার নৈতিক উন্নতি সাধন করেছে এবং তা আমাকে রাগান্বিত করেনি।

তখনকার দিনগুলোতে আমি প্রচুর হেঁটে বেড়ানোর মতো যথেষ্ট শক্ত সমর্থ ছিলাম এবং সৌভাগ্যবশত এতটা বেশি পরিচিত ছিলাম না যে হৈ চৈ না বাঁধিয়ে রাস্তায় চলাফেরা করতে পারব না। এ ধরনের ঘোরাফেরার সময়ে আমি তীর্থ যাত্রীদের ধর্মানুরাগের চেয়ে বেশি লক্ষ্য করেছি তাদের অন্যমনস্কতা, ভণ্ডামি ও নোংরামী। সেখানে মাছির মতো ভীড় জমানো সাধুর দল দেখে মনে হতো জীবনের ভালো সবকিছু উপভোগের জন্যই যেন তাদের জন্ম হয়েছে।

এখানে আমি পাঁচ পা-ওয়ালা একটা গরু দেখলাম! আমি অবাক হয়েছিলাম, কিন্তু মানুষের স্বভাব জানার পর আমার ভ্রান্তি নিরসন হলো। বেচারা পাঁচ পা-ওয়ালা গরুটি ছিল দুষ্ট লোকের লোভের বলি। আমি জানতে পারলাম যে পঞ্চম পা-টি হলো একটা জীবন্ত বাছুরের পা কেটে নিয়ে ঐ গরুটির কাঁধের ওপর মাংস কেটে বসিয়ে দেয়া! এই দ্বিগুণ নিষ্ঠুরতার ফল হলো নির্বোধ লোকদের থেকে টাকা খসিয়ে নেয়া। এমন কোনো হিন্দু ছিল না যে পাঁচ পা-ওয়ালা গরুর প্রতি আকৃষ্ট হয়নি, আর এমন কোনো হিন্দু নেই যে এমন অলৌকিক গরুর জন্য দরাজ হাতে দান করেনি।

মেলার দিন ঘনিয়ে এলো। আমার জন্য এটি স্মরণীয় দিন ছিল। তীর্থ যাত্রীর ধর্মীয় আবেগ নিয়ে আমি হরিদ্বারে যাইনি। পুণ্য লাভের জন্য আমি কখনো তীর্থস্থানে ভ্রমণের চিন্তা করিনি। বলা হয়েছিল মেলায় সতের লক্ষ লোক এসেছিল, তাদের সবাই তো আর ভণ্ড বা দর্শক হতে পারে না। আমার সন্দেহ ছিল না যে

www.pathagar.com

তাদের মধ্যে অসংখ্য লোক ছিল যারা সেখানে গিয়েছিল আত্মার উৎকর্ষতা অর্জন ও আত্মশুদ্ধির জন্য। এ ধরনের বিশ্বাস আত্মাকে কতটা উন্নত করে তা বলা অসম্ভব না হলেও বেশ কঠিন।

অতএব আমি গভীর চিন্তায় মগ্ন থেকে সারাটা রাত কাটিয়ে দিলাম। সেখানে পুণ্যাত্মারাও ছিলেন, ভণ্ডামীর মাঝে চারদিকে ভণ্ড বেষ্টিত হয়ে। পাপমুক্ত হয়ে তারা স্রষ্টার সামনে হাজির হবে। কেউ যদি বলেন হরিদ্বারে যাওয়াটাই পাপ, তাহলে আমি প্রকাশ্যে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাব এবং কুম্ভের দিনেই হরিদ্বার ত্যাগ করব। হরিদ্বারে তীর্থযাত্রা এবং কুম্ভমেলায় গমন যদি পাপের কাজ না হয়ে থাকে তাহলে সেখানকার বিদ্যমান অসাম্য ও নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমি নিজের ওপর কিছু আত্মত্যাগ আরোপ করব। এটা আমার জন্য খুবই স্বাভাবিক। শৃঙ্খলাপূর্ণ প্রতিজ্ঞার ওপর আমার জীবন প্রতিষ্ঠিত। কোলকাতা ও রেংগুনে আমার আতিথ্যকারীদের অকারণে যে কষ্ট দিয়েছি এবং তারা আমাকে যে অপরিমেয় আপ্যায়ন করেছেন সে কথা ভেবে আমার দৈনন্দিন আহার্য বস্তু সীমিত করার এবং দিনের শেষে সূর্যাস্তের আগে একবেলা আহারের সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার দৃঢ় প্রত্যয় হলো যে নিজের ওপর যদি এসব নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করি তাহলে ভবিষ্যতে আমার আতিথ্যকর্তাদেরকে আমি বেশ অসুবিধায় ফেলব এবং আমি তাদের সেবা করার পরিবর্তে তাদেরকেই আমার সেবায় নিয়োজিত করব। সুতরাং আমি প্রতিজ্ঞা করলাম ভারতে আমি কখনো চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচটি পদের বেশি আহার করব না এবং কখনো অন্ধকার হয়ে যাবার পর খাব না। এতে আমার কি কি অসুবিধা হতে পারে তা পুরোপুরি ভেবে দেখলাম। কিন্তু আমি কোনো ত্রুটি রাখতে চাইনি। আমি নিজের কাছেই পুনরাবৃত্তি করলাম অসুস্থ হয়ে পড়লে কি হবে, পাঁচটি পদের মধ্যে যদি ওষুধও একটা ধরি এবং বিশেষ পথ্যের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম না করি। অবশেষে আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম যে কোনো কারণেই ব্যতিক্রম করা উচিত হবে না।

এখন পর্যন্ত তের বছর যাবত আমি এসব প্রতিজ্ঞা পালন করে আসছি। এগুলো আমাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছে কিন্তু আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে সেগুলো আমার বর্ম হিসেবেও কাজ করেছে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ওগুলো আমার জীবনে কয়েকটি বছর যুক্ত করেছে এবং আমাকে অনেক অসুখ থেকে বাঁচিয়েছে।

আট

লক্ষ্মণ ঝুলা

গুরুকুলে পৌঁছার পর বিপুল খ্যাতিমান মহাত্মা মুন্সীরামজীর সাথে সাক্ষাতের সম্ভাবনায় স্বস্তি অনুভব করলাম। সেখানে পৌঁছেই আমি গুরুকুলের শান্ত পরিবেশ ও হরিদ্বারের কোলাহলের মধ্যে আশ্চর্য বৈপরীত্য লক্ষ্য করলাম।

মহাত্মার সস্নেহ ব্যবহারে আমি অভিভূত হলাম। সকল ব্রহ্মচারীরা আমার যত্ন নিতে তৎপর ছিল। এখানে আমাকে আচার্য রামদেবজীর সাথে পরিচয় করিয়ে

www.pathagar.com

দেয়া হলো এবং তৎক্ষণাৎ আমি বুঝতে পারলাম তার ভিতরে কি অসীম ক্ষমতা ও শক্তি লুকিয়ে আছে। কিছু বিষয়ে আমাদের মধ্যে মত পার্থক্য ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের পরিচিতি খুব শিগগীরই বন্ধুত্বে পরিণত হলো।

গুরুকূলে শিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গে আচার্য রামদেবজী ও অন্যান্য পণ্ডিতদের সাথে আমার দীর্ঘ আলোচনা হলো। যখন বিদায়ের পালা এলো তা আমার জন্য ছিল হৃদয় বিদারক।

আমি হৃষিকেশ থেকে কিছুটা দূরে লক্ষণ ঝুলার (গঙ্গা নদীর ওপর ঝুলন্ত সেতু) অনেক প্রশংসা শুনেছিলাম এবং আমার অনেক বন্ধু অন্তত ঐ সেতু পর্যন্ত না গিয়ে হরিদ্বার ত্যাগ না করতে আমাকে বিশেষভাবে বলেছিল। এ তীর্থযাত্রা আমি পদব্রজে সম্পন্ন করতে চেয়েছিলাম এবং তা দুই ধাপে শেষ করেছিলাম।

হৃষিকেশে অনেক সন্ন্যাসী আমার সাথে দেখা করতে এলেন। এদের একজন আমার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন। আমার সাথে ফিনিক্স পার্টি ছিল এবং তাদের নিয়ে স্বামীজীর অনেক কৌতূহল ছিল।

আমরা ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করলাম এবং তিনি বুঝলেন যে ধর্ম বিষয়ে আমার গভীর অনুরাগ ছিল। আমি গঙ্গা-স্নান সেরে ফেরার পথে তিনি আমাকে খালি মাথা ও খালি গায়ে দেখেছিলেন। তিনি আমার মাথায় শিখা (চুলের গুচ্ছ, টিকি) এবং গলায় পবিত্র সুতা (পৈতা) না দেখে ব্যথিত হলেন এবং বললেন, "হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও আপনি পৈতা ও শিখা (টিকি) বিহীন আছেন এতে আমি অন্তরে ব্যথিত হচ্ছি। এ দুটো হচ্ছে হিন্দুত্বের বাহ্যিক চিহ্ন এবং প্রতিটি হিন্দুর তা ধারণ করা উচিত।"

আমি এ দুটো কিভাবে ত্যাগ করেছিলাম, এখন সে কাহিনী বলছি। আমি যখন দশ বছরের দুরন্ত বালক তখন ব্রাহ্মণ বালকদের পৈতার সাথে চাবির গোছা বেঁধে ঘুরে বেড়ানো দেখে হিংসে হতো এবং ভাবতাম আমিও যদি ওদের মতো করতে পারতাম। তখন কাথিয়াওয়াড়ে বৈশ্যদের মধ্যে পৈতা পরার চল ছিল না। কিন্তু তখন সবেমাত্র প্রথম তিন বর্ণের হিন্দুদের জন্য পৈতা পরা বাধ্যতামূলক করার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এর ফল স্বরূপ গান্ধী গোষ্ঠীর কতিপয় সদস্য পৈতা নিতে শুরু করেছিল। যে ব্রাহ্মণ আমাদের দু'তিনজনকে রামরক্ষা শিক্ষা দিতেন তিনি আমাদেরকে পৈতা পরিয়ে দিলেন এবং যদিও চাবির গোছা এর সাথে বাঁধার কোনো উপলক্ষ ছিল না, তথাপি আমি এক গোছা চাবি যোগাড় করে পৈতায় বেঁধে তা প্রদর্শন করতাম। পরে যখন পৈতা ছিঁড়ে গিয়েছিল তখন আমার এর জন্য বেশি দুঃখ হয়েছিল বলে মনে পড়ে না। কিন্তু আমার মনে আছে যে নতুন করে আর পৈতা নেইনি।

আমি বড় হওয়ার সাথে সাথে ভারতে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়েকবার আমাকে পৈতা পরানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তা সফল হয়নি। আমি যুক্তি দেখাতাম যদি শূদ্ররা এটা পরতে না পারে তাহলে অন্য বর্ণের লোকেরা কোন্ অধিকারে এটা পরবে? এবং অপ্রয়োজনীয় রীতি গ্রহণের পক্ষে আমি কোনো

www.pathagar.com

যুক্তিও দেখতে পাইনি। পৈতা পরতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু এটা পরার পেছনে কোনো যুক্তি ছিল না।

একজন বৈষ্ণব হিসেবে আমি গলায় কণ্ঠী পরতাম এবং বয়স্কদের জন্য শিখা (টিকি) রাখা ছিল বাধ্যতামূলক। আমার ইংল্যান্ডে যাত্রার প্রাক্কালে অবশ্য আমি শিখা থেকে মুক্তি পেলাম। যাতে খালি মাথায় বের হলে হাসি-তামাশার খোরাক না হতে হয় এবং ইংরেজদের চোখে আমাকে বর্বর-অসভ্য না দেখায়। প্রকৃতপক্ষে এ কাপুরুষোচিত চিন্তা আমাকে এতটা পেয়ে বসেছিল যে দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমার চাচাতো ভাই ছগনলাল গান্ধী ধর্মীয় কারণে টিকি রেখেছিল, সেটাও আমি কাটিয়ে দিয়েছিলাম। আমার ভয় ছিল যে এটা তার গণকাজে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর তাই সে দুঃখ পেলেও টিকি কেটে ফেলতে আমি তাকে বাধ্য করেছিলাম।

সুতরাং স্বামীজীর কাছে আমি পুরো বিষয়টি তুলে ধরে বললাম, "আমি পৈতা পরব না কারণ অগণিত হিন্দু যখন এটা ছাড়াই হিন্দু থাকছে তখন আমি এর কোনো প্রয়োজন দেখি না। তদুপরি পৈতা হওয়া উচিত আধ্যাত্মিক পুনর্জন্মের প্রতীক যার মাধ্যমে পৈতা ধারণকারী ব্যক্তি নিরলস চেষ্টা করবে তার জীবনকে আরো উন্নত ও বিশুদ্ধ করতে। ভারতে হিন্দু ধর্মের বর্তমান অবস্থায় এই অর্থে হিন্দুদের পৈতা পরার যথার্থ অধিকার আছে কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এ অধিকার আসতে পারে কেবল হিন্দু ধর্ম তার অস্পৃশ্যতা, উঁচু-নিচু জাতের ভেদাভেদ এবং আরো অনেক কুপ্রথা ও ভণ্ডামী ঝেড়ে ফেলার পর। তাই আমার মন পবিত্র পৈতা পরার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে টিকি সম্পর্কে আপনার উপদেশ বিবেচনাযোগ্য। আমি একসময় টিকি রাখতাম, কিন্তু লজ্জা পাওয়ার মিথ্যা ধারণার বশে আমি টিকি ফেলে দিয়েছি। এবং এখন আমি অনুভব করি যে আবার টিকি রাখা শুরু করা উচিত। বিষয়টি নিয়ে আমি আমার সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে দেখব।"

পৈতা সম্পর্কে আমার মতামত স্বামীজীর পছন্দ হলো না। যে কারণে আমি পৈতা পরা ছেড়ে দিয়েছি, তার মতে সেই কারণেই তা পরা উচিত। এ ব্যাপারে হৃষিকেশে থাকতে আমার যে মনোভাব ছিল তা আজো বদলায়নি। যতদিন পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম থাকবে তাদের ভিন্ন ভিন্ন বাহ্যিক প্রতীকেরও প্রয়োজন থাকবে। কিন্তু যখন ঐ প্রতীক বদ্ধমূল সংস্কারে রূপ নেয় এবং এর দ্বারা অন্য ধর্মের ওপর নিজ ধর্মের প্রধান্য প্রমাণের হাতিয়ারে পরিণত হয় তখন তা পরিত্যাজ্য। পৈতাকে আজো আমার কাছে হিন্দু ধর্মের মহিমা বর্ধনের উপায় বলে মনে হয় না। সুতরাং এর প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই।

টিকি রাখা যেহেতু আমি ভীরুতার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলাম, বন্ধুদের সাথে আলোচনার পর আমি তা আবার রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এবারে লক্ষণ ঝুলা প্রসঙ্গে ফিরে আসি। হৃষিকেশ ও লক্ষণ ঝুলার চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হলাম এবং প্রকৃতির মধ্যে তাদের সৌন্দর্য বোধ

www.pathagar.com

এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রকাশকে ধর্মীয় তাৎপর্যমণ্ডিত করার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে এলো।

কিন্তু মানুষ যেভাবে এ স্থানগুলোকে ব্যবহার করছিল তা দেখে আমি মোটেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। যেমন হরিদ্বারে, তেমনি হৃষিকেশে সুন্দর রাস্তা ও গঙ্গার তীর মানুষ নোংরা করে ফেলছিল। তারা গঙ্গার পবিত্র জলকে অপবিত্র করতেও দ্বিধা করেনি। খোলা জায়গায় এবং নদীর তীরে মানুষকে প্রাকৃতিক কর্ম সারতে দেখে আমি খুব ব্যথিত হলাম, অথচ তারা অতি সহজেই এ কাজটা লোকের আনাগোনার স্থান থেকে সামান্য দূরে গিয়েও করতে পারত।

দেখতে পেলাম লক্ষণ ঝুলা গঙ্গা নদীর ওপর লোহার তৈরি একটা ঝুলন্ত সেতু ছাড়া আর কিছু নয়। একজন আমাকে বলেছিল এখানে আগে একটা সুন্দর দড়ির সেতু ছিল। কিন্তু জনহিতৈষী এক মারওয়াড়ী দড়ির সেতুটি ভেঙে দিয়ে সেখানে বিপুল ব্যয়ে লোহার তৈরি সেতু স্থাপন করলেন এবং এর চাবি গভর্নমেন্টের হাতে তুলে দিলেন। দড়ির সেতু সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারছি না, কারণ আমি সেটা দেখিনি কিন্তু লোহার সেতু এ পরিবেশে একেবারেই বেমানান এবং তা এখানকার সৌন্দর্যের হানি করেছে। তীর্থ যাত্রীদের ব্যবহৃত সেতুর চাবি গভর্নমেন্টের হাতে তুলে দেয়াটা সেই সময়ে আমার মতো ইংরেজ অনুগত লোকের কাছেও বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছে।

এ সেতুর ওপর দিয়ে যেতে হয় স্বর্গাশ্রমে, যা একটা বাজে জায়গা কারণ সেখানে কয়েকটি জরাজীর্ণ টিনের তৈরি শেড ছাড়া আর কিছুই নেই। সেখানকার লোকজন বলেছিল যে ঐ শেডগুলো সাধকদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। সেই মুহূর্তে ওখানে কোনো সাধক ছিল না। যারা তখন মূল বিল্ডিং-এ ছিল তারাও আমার মনে ভালো ধারণার সৃষ্টি করতে পারেনি।

তবে হরিদ্বারে আমার অভিজ্ঞতা অপরিসীম মূল্যবান বলে প্রমাণিত হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে আমি কোথায় থাকব, কি করব সে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছে।

নয়
আশ্রম প্রতিষ্ঠা

কুম্ভমেলায় যোগদানের উপলক্ষে হরিদ্বারে আমার দ্বিতীয়বার ভ্রমণ করা হলো। সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলো ২৫শে মে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে। শ্রদ্ধানন্দজী চেয়েছিলেন আমি হরিদ্বারে বসতি স্থাপন করি। আমার কোলকাতার কিছু বন্ধু বৈদ্যনাথ ধামে স্থায়ী হওয়ার সুপারিশ করেছিলেন। অন্য একদল রাজকোটের পক্ষে জোর অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আমি যখন আহমেদাবাদ অতিক্রম করছিলাম তখন অনেক বন্ধু আমাকে আহমেদাবাদে বসতি স্থাপনে রাজি করতে চেষ্টা করলেন এবং তারা স্বেচ্ছায় আশ্রমের ব্যয় বহনের এবং আমাদের বাসগৃহের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দিলেন।

www.pathagar.com

আহমেদাবাদের প্রতি আমার বিশেষ দুর্বলতা ছিল। নিজে গুজরাটি হওয়ায় ভাবলাম যে গুজরাটী ভাষার মাধ্যমেই আমি দেশের সর্বোত্তম সেবা করতে পারব। তাছাড়া আহমেদাবাদ হস্তচালিত তাঁত শিল্পের প্রাচীন কেন্দ্র হওয়ায় সেখানে হাতে তৈরি সুতার কুটির শিল্পের পুনর্জাগরণের অনুকূল ক্ষেত্র তৈরির প্রবল সম্ভবনা ছিল। তদুপরি এ আশাও ছিল যে এটা গুজরাটের রাজধানী শহর হওয়ায় অন্য জায়গার তুলনায় বিত্তশালী নাগরিকদের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা এখানেই বেশি পাওয়া যাবে।

আহমেদাবাদের বন্ধুদের সাথে আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই অস্পৃশ্যতার বিষয়টি উত্থাপিত হলো। আমি পরিষ্কার বলে দিলাম যে সুযোগ পেলেই একজন অস্পৃশ্যকে আশ্রমের সদস্য করে নেয়া হবে, যদি তার অন্যান্য যোগ্যতা থাকে।

একজন বৈষ্ণব বন্ধু আত্মতুষ্টির সাথে বললেন, "তোমার শর্ত পূরণ করতে পারবে এমন অস্পৃশ্য লোক তুমি কোথায় পাবে?"

অবশেষে আমি আহমেদাবাদে আশ্রম স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলাম।

বাসস্থানের ব্যাপারে আহমেদাবাদের ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত জীবনলাল দেশাই আমার প্রধান সাহায্যকারী হিসেবে এগিয়ে এলেন। তিনি তাঁর কোচবার বাংলো ভাড়া দিতে রাজি হলেন এবং আমরাও সেটা ভাড়া নিতে রাজি হলাম।

সর্বপ্রথম আমাদেরকে আশ্রমের নাম নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। বন্ধুদের সাথে আলোচনা করলাম। যেসব নামের প্রস্তাব পাওয়া গেল তাঁর মধ্যে ছিল "সেবাশ্রম (সেবা গৃহ), তপোবন (কৃচ্ছতা গৃহ)" ইত্যাদি। "সেবাশ্রম" নামটি আমার পছন্দ হলো, কিন্তু এর মধ্যে সেবার পদ্ধতি সম্পর্কিত ধারণা গুরুত্ব পায়নি। "তপোবন" নামের মধ্যে কিছুটা আত্ম-শ্লাঘা আছে বলে মনে হলো, কারণ যদিও "তপ" (তপস্যা) আমাদের প্রিয়, কিন্তু আমরা নিজেদেরকে তাপস (কৃচ্ছ সাধনায় সিদ্ধি লাভকারী) বলে দাবি করতে পারি না। আমাদের মূলমন্ত্র হলো সত্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং আমাদের কাজও হচ্ছে সত্যের সন্ধান ও সত্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা। আমার ইচ্ছে ছিল আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় যে পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছি ভারতবাসীকে তার সাথে পরিচিত করা এবং ভারতে তা কতটা প্রয়োগ করা সম্ভব তা যাচাই করে দেখা। সুতরাং আমি ও আমার সহকর্মীরা মিলে "সত্যাগ্রহ আশ্রম" নামটা নির্বাচন করলাম, যেহেতু তা আমাদের উদ্দেশ্য এবং সেবার পদ্ধতির ইঙ্গিতবহ।

আশ্রমের পরিচালনার জন্য একটি আচরণ বিধি থাকা এবং তা মেনে চলা উচিত। অতএব এর একটি খসড়া প্রস্তুত করা হলো এবং এর ওপর বন্ধুদের মতামত চাওয়া হলো। অনেকগুলো মতামত পাওয়া গেল, তার মধ্যে স্যার গুরুদাস ব্যানার্জির অভিমত এখনো আমার মনে আছে। বিধিগুলো তার পছন্দ হয়েছিল, তবে তিনি নম্রতাকে একটি পালনীয় নীতি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে নতুন প্রজন্মের মধ্যে দুঃখজনকভাবে নম্রতার অভাব রয়েছে। আমি যদিও এ ত্রুটি লক্ষ্য করেছিলাম, কিন্তু আমার ভয় ছিল যে

www.pathagar.com

যখনই নম্রতার শপথ গ্রহণ করা হবে সে মুহূর্ত থেকে তা আর নম্রতা থাকবে না। নম্রতার প্রকৃত অর্থ হলো আত্ম-বিলুপ্তি। আর আত্ম-বিলুপ্তি হলো মোক্ষ (মুক্তি) এবং তা এমন একটা আধ্যাত্মিক অবস্থা যা পালন করার বিষয় নয় বরং অন্যান্য আচার অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে তা অর্জন করতে হয়। মোক্ষলাভের জন্য আগ্রহী সাধক বা সেবায়েত এর আচরণে যদি নম্রতা বা আত্ম-বিমুখতা না থাকে সেখানে মোক্ষলাভ বা সেবার প্রত্যাশা থাকতে পারে না। নম্রতাবিহীন সেবা স্বার্থপরতা এবং আত্ম-অহমিকা ছাড়া আর কিছু নয়।

আমাদের দলে এ সময়ে প্রায় তের জন তামিল সদস্য ছিল। পাঁচজন তামিল যুবক দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আমার সাথে এসেছিল, অবশিষ্টরা দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে এসেছিল। পুরুষ-মহিলা সব মিলে আমরা প্রায় পঁচিশ জন ছিলাম।

এভাবেই আশ্রমের শুরু হয়েছিল। সবার জন্য এক হাঁড়িতে রান্না হতো এবং সবাই মিলে একান্নবর্তী পরিবারের মতো বাস করার চেষ্টা করত।

দশ
কামারের নেহাই এর ওপর (রূপকার্থে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন)

আশ্রমের বয়স অল্প কয়েকমাস হতে না হতেই আমাদেরকে অপ্রত্যাশিত পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হলো। আমি অমৃতলাল ঠাক্কার এর কাছ থেকে এ মর্মে একটা পত্র পেলাম, "একটা সৎ ও নিরীহ অস্পৃশ্য পরিবার আপনার আশ্রমে যোগ দিতে চায়। আপনি কি তাদেরকে গ্রহণ করবেন?"

আমি বিব্রতকর অবস্থায় পড়লাম। আমি কখনো আশা করিনি যে এত তাড়াতাড়ি কোনো অস্পৃশ্য পরিবার আশ্রমে যোগদান করতে চাইবে, তাও আবার যেন তেন কেউ নয়, ঠাক্কার বাপার মতো লোকের সুপারিশ নিয়ে। পত্রটি নিয়ে সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করলাম। তারা প্রস্তাবটাকে স্বাগত জানাল।

আমি অমৃতলাল ঠাক্কারকে পত্র লিখে ঐ পরিবারকে গ্রহণ করতে আমাদের ইচ্ছার কথা জানালাম, তবে শর্ত হলো যে তাদের সবাইকে আশ্রমের নিয়ম নীতি মেনে চলতে হবে।

ঐ পরিবারের সদস্যরা হলেন দুদাভাই, তার স্ত্রী দানিবেন এবং হামাগুড়ি দেয়া কন্যা লক্ষ্মী। দুদাভাই বোম্বেতে শিক্ষকতা করতেন। তারা সবাই নিয়ম-কানুন মানতে রাজি হলো এবং আশ্রমে তাদেরকে গ্রহণ করা হলো।

কিন্তু আশ্রমে তাদের অন্তর্ভুক্তিতে যারা আশ্রমকে সাহায্য করে আসছিলেন তাদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হলো। প্রথম অসুবিধা দেখা দিল পানির কুয়ার ব্যবহার নিয়ে, যা বাড়ির মালিক আংশিক নিয়ন্ত্রণ করতেন। পানি তোলার দায়িত্বে নিয়োজিত লোকটা এই বলে আপত্তি জানাল যে আমাদের বালতির পানির ছিটা তাকে অপবিত্র করবে। সুতরাং সে আমাদেরকে গালিগালাজ করতে শুরু করল এবং দুদাভাইকে নিগৃহীত করতে থাকল। আমি সবাইকে বলে দিলাম গালি সহ্য করে কোনোরকমে পানি সংগ্রহ করতে। যখন সে দেখল আমরা তার গালির উত্তর দিচ্ছি না, তখন সে লজ্জিত হলো এবং আমাদেরকে বিরক্ত করা ছেড়ে দিল।

www.pathagar.com

তবে সকল আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। যে বন্ধু জিজ্ঞেস করেছিলেন এমন কোনো অস্পৃশ্য আছে কি যে আশ্রমের নিয়ম-কানুন মানতে পারবে, তিনি কখনো আশা করেননি যে এরকম কাউকে সত্যি সত্যি পাওয়া যাবে।

আর্থিক সাহায্য বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে সামাজিকভাবে আমাদেরকে বয়কট করার প্রস্তাব সম্পর্কিত গুজব শোনা গেল। আমরা এসবের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। আমি আমার সঙ্গীদেরকে বলেছিলাম যে যদি আমাদেরকে বয়কট করা হয় এবং স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে আমরা আহমেদাবাদ ত্যাগ করব না। বরং আমরা এখান থেকে গিয়ে অস্পৃশ্যদের কোয়ার্টারে উঠব এবং কায়িক পরিশ্রম করে যা উপার্জন করতে পারি তা দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করব।

অবস্থা এমন দাঁড়াল যে একদিন মগনলাল গান্ধী আমাকে জানিয়ে দিল—আমাদের তহবিল শেষ এবং পরের মাসের জন্য কিছুই অবশিষ্ট নেই।"

আমি শান্তভাবে জবাব দিলাম, "তাহলে আমরা অস্পৃশ্যদের কোয়ার্টারে চলে যাব।"

এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া আমার জন্য এবারই প্রথম নয়। এরকম অবস্থা যতবার হয়েছে প্রতিবারেই ঈশ্বর শেষ মুহূর্তে সাহায্য পাঠিয়েছেন। মগনলাল আমাদের আর্থিক অবস্থার ঘোষণা দেয়ার দু'এক দিন পরই এক সকালে একটা ছেলে এসে বলল আশ্রমের বাইরে একজন শেঠ গাড়ির মধ্যে বসে অপেক্ষা করছেন আমার সাথে দেখা করার জন্য। আমি বের হয়ে তার কাছে গেলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আমি আশ্রমে কিছু সাহায্য দিতে চাই। আপনি তা নেবেন?"

আমি বললাম, "অবশ্যই নেব। আর আমি স্বীকার করছি যে এই মুহূর্তে আমাদের রসদ ফুরিয়ে এসেছে।"

তিনি বললেন, "আমি আগামীকাল এই সময়ে আসব। আপনি এখানে থাকবেন তো?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।" এরপর তিনি চলে গেলেন।

পরদিন ঠিক নির্ধারিত সময়ে গাড়িটি আমাদের বাসস্থানের নিকট এলো এবং হর্ন বাজাল। ছেলেরা এই সংবাদ নিয়ে এলো। শেঠ ভিতরে এলেন না। আমি তার সাথে দেখা করতে বাইরে গেলাম। তিনি আমার হাতে ১৩,০০০/- টাকার নোট ধরিয়ে দিলেন এবং গাড়ি চালিয়ে চলে গেলেন।

আমি এরকম সাহায্য আশাই করিনি। আর কি আশ্চর্যভাবে তা এলো! ঐ ভদ্রলোক আগে কখনো আশ্রমে আসেননি। যতদূর মনে পড়ে আমি তাকে মাত্র একবারই দেখেছিলাম। আগে থেকে কোনো আসা-যাওয়া নেই, কোনো জিজ্ঞাসাবাদ নেই, শুধুমাত্র সাহায্য দিয়েই চলে যাওয়া। এটা আমার জন্য এক

www.pathagar.com

অনন্য অভিজ্ঞতা। এ সাহায্য সদলবলে আমাদের অস্পৃশ্যদের কোয়ার্টারে গমন স্থগিত করল। আমরা এক বছরের জন্য পুরোপুরি নিরাপদ বোধ করলাম।

বাইরে যেমন ঝড় বইছিল, তেমনই আশ্রমের ভেতরেও ঝড় বইছিল। যদিও দক্ষিণ আফ্রিকাতে অস্পৃশ্য বন্ধুরা আমার বাড়িতে আসত, আমাদের সাথে বাস করত, খাবার খেত তথাপি আমার স্ত্রী ও অন্য মহিলারা আশ্রমে অস্পৃশ্যদের প্রবেশে খুশি হতে পারছিল না। আমার চোখ-কান দানিবেনের প্রতি তাদের অপছন্দ ধরতে না পারলেও অবহেলা ঠিকই ধরতে পারছিল। আর্থিক সমস্যা আমাকে উদ্বিগ্ন করতে পারেনি কিন্তু অভ্যন্তরীণ এ ঝড় সহ্য করা কঠিন ছিল। দানিবেন একজন সাধারণ মহিলা ছিল। দুদাভাই অল্প শিক্ষিত হলেও বোধশক্তি ছিল প্রখর। আমি তার ধৈর্য পছন্দ করতাম। কখনো কখনো সে রেগে উঠত, তবে মোটের ওপর আমি তার আত্মসংযম দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমি তাকে বুঝিয়ে বলতাম ছোটখাটো অপমান সহ্য করতে। সে নিজে তো তা করতই, তার স্ত্রীকেও করতে বাধ্য করত।

আশ্রমে এ পরিবারের অন্তর্ভুক্তি ছিল আশ্রমের জন্য একটা মূল্যবান শিক্ষা। প্রথমেই আমরা সারা পৃথিবীর কাছে ঘোষণা করে দিয়েছিলাম যে আশ্রম অস্পৃশ্যতা সমর্থন করবে না। সুতরাং আশ্রমকে যারা সাহায্য করবে তারা জেনে শুনেই করবে এবং এর ফলে এ ব্যাপারে আশ্রমের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে গিয়েছিল। প্রধানত প্রকৃত গোঁড়া হিন্দুরাই মূলত আশ্রমের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার বহন করেছে এ সত্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে অস্পৃশ্যতার ভিত নড়ে গেছে। এর স্বপক্ষে আরো অনেক প্রমাণ আছে, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুরা এমন একটা আশ্রমকে সাহায্য করতে দ্বিধা করছে না যেখানে আমরা অস্পৃশ্যদের সাথে বসে একসঙ্গে আহার করছি—এটাও একটা বড় প্রমাণ।

আমি দুঃখিত যে এ বিষয়ের ওপর অনেক কিছু বর্ণনা আমাকে বাদ দিয়ে যেতে হবে। মূল বিষয় থেকে উঠে আসা স্পর্শকাতর বিষয়গুলো আমরা কিভাবে সামলে নিলাম, কিছু অপ্রত্যাশিত অসুবিধা কিভাবে কাটিয়ে উঠলাম এবং আরো অনেক বিষয় যেগুলো সত্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বর্ণনার সাথে সম্পর্কিত। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতেও একই ক্রটি থাকবে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিবরণও আমাকে বাদ দিতে হবে, কারণ এ নাটকের পাত্র-পাত্রীরা প্রায় সাবই এখনো জীবিত এবং তাদের অনুমতি ছাড়া যে সব ঘটনার সাথে তারা সম্পৃক্ত, তা বর্ণনা করতে গিয়ে তাদের নাম উল্লেখ করা ঠিক হবে না। তাদের অনুমতি নেয়া অথবা যে সব অধ্যায়ের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা আছে তা বার বার সংশোধন করা বাস্তব সম্মত নয়। তাছাড়া, এ পদ্ধতি অত্র আত্ম-জীবনীর পরিসীমার বাইরে। সুতরাং আমার ভয় হচ্ছে যে এ কাহিনীর অবশিষ্টাংশ যদিও আমার মতো সত্যানুসন্ধানীদের কাছে মূল্যবান, বাধ্য হয়েই তাতে অনেক কিছু বর্জন করতে হবে। তথাপি ঈশ্বর চাইলে আমার ইচ্ছে ও প্রত্যাশা আছে এ কাহিনীকে অসহযোগের সময় পর্যন্ত এগিয়ে নেবার।

www.pathagar.com

এগার

চুক্তিবদ্ধ দেশান্তরের অবলুপ্তি

কিছুক্ষণের জন্য আমরা আশ্রম ত্যাগ করব, যাকে প্রথমেই অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ঝড় সফলভাবে মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং অন্য একটি বিষয়ে দৃষ্টি দেব যা আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিল।

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ছিল তারাই যারা পাঁচ বছর বা তার কম মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করতে ভারত থেকে দেশান্তর হয়েছিল। ১৯১৪ সালের স্মুটস-গান্ধী সমঝোতার আওতায় নাটালে চুক্তিবদ্ধ প্রবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ৩ পাউন্ড ট্যাক্স বিলুপ্ত হয়েছিল, কিন্তু ভারত থেকে সাধারণ ইমিগ্রেশন (দেশান্তর) এর বিষয়ে আরো করণীয় বাকী ছিল।

১৯১৬ সালের মার্চে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যজী ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে চুক্তিবদ্ধ প্রথা রহিত করার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করলেন। প্রস্তাবটি গ্রহণকালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন যে তিনি এ প্রথা যথাসময়ে রদ করা হবে মর্মে মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেন্টের প্রতিশ্রুতি লাভ করেছেন। তবে আমি অনুভব করলাম যে ভারতীয়রা এত অস্পষ্ট আশ্বাসে সন্তুষ্ট হতে পারে না বরং তাৎক্ষণিকভাবে রদ করার জন্য আন্দোলন করা উচিত। ভারতীয়রা এ ব্যবস্থাকে সহ্য করে এসেছে শুধুমাত্র উদাসীনতার কারণে এবং আমার বিশ্বাস, এখন সময় এসেছে সফল সংগ্রামের মাধ্যমে এর প্রতিকার লাভ করার। আমি কয়েকজন নেতার সাথে দেখা করলাম, খবরের কাগজে লিখলাম এবং দেখলাম যে জনমত পুরোপুরি এখনই এটা বিলুপ্তির পক্ষে। এটা কি সত্যাগ্রহের বিষয় হতে পারে না? এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না, কিন্তু কিভাবে শুরু করব তা আমার জানা ছিল না।

ইতিমধ্যে ভাইসরয় তার ভাষায় "পরিশেষে বিলুপ্ত করা হবে" কথার অর্থ খোলাসা করলেন যা হলো উক্ত প্রথা "এমন যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে রদ করা হবে যাতে এর বিকল্প কোনো ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা যায়।"

সুতরাং ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে পণ্ডিত মালব্যজী অনুমতি চাইলেন এ প্রথা দ্রুত রহিতকরণের জন্য একটি বিল উত্থাপনের। লর্ড চেমসফোর্ড অনুমতি দিলেন না। আমার জন্য সারা দেশ ভ্রমণ করে পুরো ভারত জুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলার এটাই ছিল উপযুক্ত সময়।

ভাবলাম আন্দোলন শুরুর পূর্বে ভাইসরয়ের সাথে এ ব্যাপারে দেখা করা উচিত। সুতরাং আমি সাক্ষাৎ চেয়ে আবেদন করলাম। সাথে সাথেই তিনি তা মঞ্জুর করলেন। মি. মাফি, এখন স্যার জন মাফি, তখন ভাইসরয় এর প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। লর্ড চেমসফোর্ড এর সাথে আমার সন্তোষজনক আলোচনা হলো। তিনি নির্দিষ্ট কোনো কথা না দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

আমি বোম্বে থেকে ভ্রমণ শুরু করলাম। ইম্পেরিয়াল সিটিজেনশীপ এসোসিয়েশনের সহযোগীতায় মি. জাহাঙ্গীর পেটিট সভা আহ্বানের দায়িত্ব

www.pathagar.com

নিলেন। এসোসিয়েশনের এক্সিকিউটিভ কমিটি প্রথমে নিজেদের মধ্যে মিটিং করে সভায় কি প্রস্তাব নেয়া হবে তার খসড়া তৈরি করল। কমিটির মিটিং এ ডা. স্ট্যানলি রীড, শ্রীযুক্ত (এখন স্যার) লালুভাই শ্যামলদাস, শ্রীযুক্ত নটরাজন এবং মি. পেটিট উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার মূল বিষয় ছিল একটা সময় নির্ধারণ করা যার মধ্যে গভর্নমেন্টকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রথা বাতিল করতে বলা হবে। তিনটি প্রস্তাব পাওয়া গেল যা "যতশ্রীঘ্র সম্ভব" "৩১শে জুলাই এর মধ্যে" এবং "এখনই" বিলোপ সাধন করতে হবে। আমি একটা নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সময় দেয়ার পক্ষে ছিলাম, কারণ তাহলে ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গভর্নমেন্ট আমাদের অনুরোধ রাখতে ব্যর্থ হলে আমরা কি করব সে সিদ্ধান্ত নিতে পারব। শ্রীযুক্ত লালুভাই "এখনই" বিলোপ সাধনের পক্ষে ছিলেন। তিনি বললেন, "এখনই" বলতে তিনি ৩১শে জুলাই এর চেয়ে আরো কম সময় বুঝাচ্ছেন। আমি ব্যাখ্যা করে বললাম যে, জনগণ "এখনই" শব্দের অর্থ বুঝবে না। আমরা যদি তাদের দিয়ে কিছু করাতে চাই তাহলে তাদের কাছ থেকে আরো নির্দিষ্ট করে প্রতিশ্রুতি আদায় করতে হবে। প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছেমতো "এখনই" কথার অর্থ করবে গভর্নমেন্ট একভাবে, জনগণ অন্যভাবে। ৩১শে জুলাই বললে ভুল বুঝাবুঝির কোনো অবকাশ থাকে না। আর ঐ তারিখের মধ্যে যদি কিছুই না করা হয় তাহলে আমরা আরো অগ্রসর হতে পারি। ডা. রীড বুঝালেন আমার যুক্তিই জোরালো এবং অবশেষে লালুভাইও আমার সাথে একমত হলেন। ৩১শে জুলাইকে আমরা সর্বশেষ তারিখ বলে গ্রহণ করলাম যার মধ্যেই বিলুপ্তির ঘোষণা দিতে হবে, জনসভাতেও এ মর্মে একটা প্রস্তাব পাশ হলো এবং পুরো ভারত জুড়ে অনুষ্ঠিত সভায় অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হলো।

ভাইসরয়ের সাথে দেখা করার জন্য একটি মহিলা প্রতিনিধি দল সংগঠিত করতে মিসেস জয়জী পেটিট তার সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। বোম্বে থেকে যারা মহিলা প্রতিনিধিদলের সদস্য হয়েছিলেন তাদের মধ্যে লেডি টাটা ও প্রয়াত দিলশাদ বেগমের নাম আমার মনে আছে। এ প্রতিনিধিদলের দেখা করার ফল হয়েছিল ব্যাপক। ভাইসরয় আশাব্যঞ্জক জবাব দিয়েছিলেন।

আমি করাচী, কোলকাতা ও অন্যান্য অনেক জায়গায় ভ্রমণ করলাম। প্রতিটি স্থানেই আমি সফলভাবে সভা করলাম এবং সব স্থানেই অসীম উদ্দীপনা লক্ষ্য করলাম। যখন আন্দোলন শুরু করি তখন এতটা সাড়া পাওয়া যাবে তা আশা করিনি।

ঐ দিনগুলোতে আমি একাই ভ্রমণ করতাম এবং তাতে আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। সিআইডি'র লোকেরা সর্বক্ষণ আমার পিছু নিয়েছে। কিন্তু আমার যেহেতু লুকানোর কিছু ছিল না তারা আমাকে উত্যক্ত করত না, আমিও তাদের কোনো সমস্যা করিনি। সৌভাগ্যক্রমে তখনও আমার গায়ে মহাত্মা নামের ছাপ পড়েনি, তবে যেখানে লোকজন আমাকে চিনতে পেরেছে সেখানে ঐ নামের ধ্বনি ছিল সাধারণ ব্যাপার।

www.pathagar.com

একবার গোয়েন্দারা কয়েকটি স্টেশনে আমাকে বিরক্ত করল, আমার টিকেট চাইল এবং নম্বর লিখে নিল। আমি অবশ্য তাদের প্রতিটি প্রশ্নের তাৎক্ষণিক জবাব দিয়েছি। আমার সহযাত্রীরা ধরে নিয়েছিলেন যে আমি একজন সাধু বা ফকির। যখন তারা দেখল প্রতিটি স্টেশনে আমাকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে, তখন তারা উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং গোয়েন্দাদেরকে গালিগালাজ করল। প্রতিবাদের সুরে তারা বলল, "তোমরা কেন বিনা কারণে এই বেচারা সাধুকে বিরক্ত করছ?" আমাকে সম্বোধন করে বলল, "এ বদমাইসদেরকে আপনি টিকেট দেখাবেন না।"

আমি তাদেরকে ভদ্রভাবে বললাম, "তাদেরকে টিকেট দেখানো আমার জন্য কষ্টের কিছু নয়। তারা তাদের কর্তব্য পালন করছে।" যাত্রীরা এতে সন্তুষ্ট হলো না। তাদের ব্যবহারে আরো বেশি বেশি সহানুভূতি প্রকাশ পেল এবং নিরীহ লোকের সাথে এ ধরনের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানাল।

কিন্তু গোয়েন্দাদের দুর্ব্যবহারতো কিছুই নয়। আসল কষ্ট ছিল তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের। আমার সবচেয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল লাহোর থেকে দিল্লী ভ্রমণকালে। করাচী থেকে লাহোর হয়ে কোলকাতা যাচ্ছিলাম, লাহোরে ট্রেন বদল করে। ট্রেনে জায়গা পাওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার। ট্রেন ছিল যাত্রীতে ঠাসা, যারা ভেতরে ঢুকতে পারল তারা শুধুমাত্র গায়ের জোরেই তা করল, আর কিছু দরজা বন্ধ থাকায় জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। আমাকে মিটিং এর জন্য নির্ধারিত তারিখে কোলকাতা পৌঁছতে হবে এবং আমি যদি এ ট্রেন ফেল করি তাহলে যথাসময়ে পৌঁছতে পারব না। আমি ভেতরে ঢোকার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম, কেউই আমাকে জায়গা দিতে রাজি হচ্ছিল না। এমন সময়ে একজন পোর্টার আমার অবস্থা দেখে এগিয়ে এসে বলল, "আমাকে বার আনা দিন, আমি আপনাকে একটা সীট করে দেব। আমি বললাম, "হ্যাঁ, দেব। আমাকে একটা সীট দিতে পারলে তোমাকে বারো আনাই দেব।" যুবকটি এক কোচ থেকে আরেক কোচে যাত্রীদেরকে অনুনয় বিনয় করে যাচ্ছিল, কিন্তু কেউই তার কথায় কর্ণপাত করল না। ট্রেন যখন ছেড়ে দেবে এমন সময়ে কয়েকজন যাত্রী বলল, "এখানে কোনো জায়গা নেই, তবে ইচ্ছে করলে তাকে জোর করে ঠেলে ঢুকিয়ে দিতে পার। তাকে দাঁড়িয়ে যেতে হবে।" পোর্টার যুবকটি জিজ্ঞেস করল, "যাবেন এভাবে?" আমি সাথে সাথে রাজি হলাম এবং সে আমার শরীরটাকে জানালা দিয়ে ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। এভাবে আমি ট্রেনের ভেতরে ঢুকলাম আর পোর্টারটি বারো আনা আয় করল।

ট্রেনে ভ্রমণের রাতটা ছিল কঠিন পরীক্ষার। অন্য যাত্রীরা কোনোমতে বসে যাচ্ছিল। আমি আপার বাংকের শিকল ধরে দু'ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকলাম। ইতিমধ্যে যাত্রীদের কয়েকজন আমাকে অবিরাম বিরক্ত করছিল। তারা জিজ্ঞেস করছিল, "আপনি বসছেন না কেন?" আমি তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এই বলে যে বসার মতো জায়গা নেই, কিন্তু তারা আমার দাঁড়িয়ে থাকা সহ্য করতে পারছিল না, যদিও তারা নিজেরা আপার বাংকে লম্বা হয়ে শুয়ে ছিল। আমাকে

www.pathagar.com

বিরক্ত করতে তাদের ক্লান্তি ছিল না, আমিও ভদ্রভাবে তাদের জবাব দিতে ক্লান্ত হচ্ছিলাম না। অবশেষে তারা শান্ত হলো। তাদের কয়েকজন আমার নাম জিজ্ঞেস করল এবং যখন আমার নাম বললাম তারা লজ্জিত হলো। তারা ক্ষমা চেয়ে আমার জন্য জায়গা করে দিল। এভাবে ধৈর্যের প্রতিদান পেলাম। আমি চরমভাবে ক্লান্ত ছিলাম এবং আমার মাথা ঘুরছিল। যখন সাহায্যের প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি, তখনই ঈশ্বর সাহায্য পাঠালেন।

এভাবে কোনোরকমে আমি দিল্লী পৌঁছলাম এবং সেখান থেকে কোলকাতা। কাসিমবাজারের মহারাজা, কোলকাতার সভার সভাপতি আমার আতিথ্যকারী ছিলেন। করাচীর মতোই এখানেও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল। সভায় কয়েকজন ইংরেজও উপস্থিত ছিলেন।

৩১শে জুলাই এর পূর্বেই গভর্নমেন্ট ঘোষণা দিল যে ভারত থেকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে দেশান্তর বন্ধ করা হলো। ১৮৯৪ সালে এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আমার প্রথম আবেদনের মুসাবিদা করেছিলাম। তখন আমার আশা ছিল যে স্যার ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের ভাষায় এই "আধা ক্রীতদাস প্রথা" একদিন শেষ হবে।

১৮৯৪ সালে শুরু হওয়া এ আন্দোলনে অনেকেই সাহায্য করেছেন কিন্তু আমি এখানে উল্লেখ না করে পারছি না যে সম্ভাব্য সত্যাগ্রহ এর সমাপ্তিকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে।

এই আন্দোলনের আরো বিস্তারিত বিবরণ এবং এতে যারা অংশ নিয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে জানতে হলে আমি পাঠকদেরকে আমার "দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ" বইটি পড়ার অনুরোধ করছি।

বার
নীলের দাগ

রাজা জানক এর রাজ্য চাম্পারান। এখানে যেমন প্রচুর আম্রকুঞ্জ আছে তেমনি ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এ রাজ্য নীল চাষে ভরপুর ছিল। চাম্পারানের প্রজারা তাদের জমির বিশ ভাগের তিন ভাগ জমিতে ভূ-স্বামীর জন্য নীল চাষ করতে আইনত বাধ্য ছিল। এ পদ্ধতি "তিনকাঠিয়া" প্রথা নামে পরিচিত ছিল, কারণ বিশ কাঠার (২০ কাঠায় এক একর) মধ্যে তিন কাঠাতে নীল চাষ করতে হতো।

আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে তখন পর্যন্ত আমি চাম্পারানের নাম জানতাম না, এর ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে আরো কম জানতাম। আর নীল চাষ কি সে সম্পর্কেও আমার কোনো ধারণা ছিল না। আমি নীলের প্যাকেট দেখেছি কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি যে চাম্পারানের হাজার হাজার কৃষককে অমানুষিক কষ্ট দিয়ে তা উৎপাদন ও তৈরি করা হয়।

রাজকুমার শুক্লা ছিলেন এই নির্যাতিত কৃষকদের একজন, যিনি তার মতোই নির্যাতনের শিকার হাজার হাজার কৃষকদের পক্ষে নীলের দাগ মুছে ফেলার জন্য প্রবল আগ্রহী ছিলেন।

www.pathagar.com

এই ব্যক্তি লক্ষ্ণৌতে গিয়ে আমাকে ধরল, যেখানে আমি ১৯১৬ সালে কংগ্রেসের সভায় যোগদান করতে গিয়েছিলাম। সে আমাকে বলল, "উকিলবাবু আমাদের দুর্দশা সম্পর্কে আপনাকে বলবেন" এবং আমাকে চাম্পারান যাবার অনুরোধ করল। "উকিল বাবু"টি আর কেউ নন, তিনি বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ, যিনি চাম্পারানে আমার সম্মানিত সহকর্মী হয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন বিহারে গণকাজের প্রাণপুরুষ। রাজকুমার শুক্লা তাকে আমার তাবুতে নিয়ে এলো। তার পরনে ছিল কালো রং এর আলপাকা (ভেড়া সদৃশ প্রাণীর লোমের তৈরি) আচকান ও পায়জামা। ঐ সময়ে ব্রজকিশোর বাবু আমাকে আকৃষ্ট করতে পারেননি। আমি তাকে গরিব কৃষকদের শোষণকারী একজন সাধারণ উকিল ভেবেছিলাম। তার কাছে থেকে চাম্পারানের ঘটনাবলী কিছুটা শুনে আমি আমার স্বভাবসুলভ রীতিতে বলেছিলাম, "নিজ চোখে অবস্থা না দেখে আমি কোনো মন্তব্য করব না। কংগ্রেসে আপনি দয়া করে প্রস্তাব উত্থাপন করুন, আর এখন আমাকে একটু একা থাকতে দিন।" রাজকুমার শুক্লা অবশ্য কংগ্রেসের সাহায্য চেয়েছিল। বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ কংগ্রেসে চাম্পারানের কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন এবং তা সর্বসম্মতভাবে পাশ হয়ে গেল। রাজকুমার শুক্লা খুশী হলো কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারল না। সে চেয়েছিল আমি ব্যক্তিগতভাবে চাম্পারান যাই এবং সেখানকার রায়তদের দুর্দশা নিজ চোখে দেখি। আমি তাকে বললাম পরবর্তী সফরের যে চিন্তা-ভাবনা আছে তাতে চাম্পারান অন্তর্ভুক্ত করব এবং সেখানে এক দু'দিন থাকব। সে বলল, "একদিনই যথেষ্ট এবং আপনি স্বচক্ষে আমাদের অবস্থা দেখবেন।"

লক্ষ্ণৌ থেকে আমি কানপুরে গেলাম। রাজকুমার শুক্লা আমার সাথে সেখানে গেল। সে পীড়াপীড়ি করতে থাকল, "এখান থেকে চাম্পারান খুব কাছে। দয়া করে একটা দিন সময় দিন।" আমি আবারো প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললাম, "দয়া করে এবারে আমাকে রেহাই দাও। কথা দিচ্ছি আমি আসবই।"

আমি আশ্রমে ফিরে গেলাম। সর্বব্যাপী রাজকুমার আমার পিছে পিছে সেখানেও হাজির। সে বলল, "দয়া করে এখন দিনটা ঠিক করুন।" আমি বললাম, "বেশ, আমাকে অমুক অমুক দিন কোলকাতায় থাকতে হবে, তুমি সেখানে আমার সাথে দেখা করবে এবং সেখান থেকে আমাকে নিয়ে যাবে।" আমি জানতাম না কোথায় যেতে হবে, কি করতে হবে বা কি দেখতে হবে।

আমি কোলকাতায় ভূপেন বাবুর বাড়িতে পৌছার আগেই রাজকুমার শুক্লা সেখানে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে। এভাবে এই অশিক্ষিত, সহজ-সরল কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কৃষক আমাকে বশ করে ফেলল।

সুতরাং ১৯১৭ সালের প্রথম দিকে চাম্পারানের উদ্দেশে আমরা কোলকাতা ত্যাগ করলাম কৃষকের বেশে। কোন্ ট্রেনে যেতে হবে আমি তাও জানতাম না। সে আমাকে নিয়ে চলল এবং আমরা একসঙ্গে ভ্রমণ করলাম। পরদিন সকালে আমরা পাটনা পৌছলাম।

www.pathagar.com

পাটনাতে এটা আমার প্রথম সফর। এখানে আমার কোনো বন্ধু বা পরিচিতজন ছিল না যার বাড়িতে ওঠার চিন্তা করা যায়। আমার ধারণা ছিল যে, একজন সাধারণ কৃষক হিসেবে রাজকুমার শুক্লার পাটনাতে কিছুটা প্রভাব থাকবেই। ভ্রমণকালে আমি তার সম্পর্কে আরো একটু বেশি জানলাম এবং পাটনায় পৌঁছার পর তার সম্পর্কে আমার আর কোনো ভুল ধারণা রইল না। সে সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। যে উকিলদেরকে সে বন্ধু মনে করত তারা সেরকম ছিল না। বেচারা রাজকুমার তাদের কাছে ছিল চাকরের মতো। এসব কৃষক মক্কেল ও তাদের উকিলদের মধ্যে দূরত্ব ছিল বর্ষাকালে গঙ্গা নদীর এপার-ওপারের মতো।

রাজকুমার শুক্লা আমাকে পাটনায় রাজেন্দ্রবাবুর বাড়িতে নিয়ে গেল। রাজেন্দ্রবাবু তখন পুরি না কি অন্য কোথায় যেন গেছেন। তার বাংলোতে একজন কি দু'জন চাকর আছে, যারা আমাদেরকে পাত্তা দিল না। আমার সাথে কিছু খাবার ছিল। আমি খেজুর খেতে চাইলে আমার সঙ্গী বাজার থেকে তা কিনে আনল।

বিহারে কঠোর অস্পৃশ্যতা বিরাজমান ছিল। চাকরেরা যে কুয়ো ব্যবহার করছে আমাকে সে কুয়ো থেকে পানি নিতে দেয়া হলো না যাতে আমার বালতি থেকে পানির ছিটা তাদেরকে অপবিত্র না করে, যদিও ঐ চাকররা জানে না আমি কোন বর্ণের লোক। রাজকুমার আমাকে বাড়ির ভেতরের পায়খানা দেখিয়ে দিল, সাথে সাথেই চাকর আমাকে বাইরের পায়খানা দেখিয়ে দিল। এসব ব্যাপার আমার কাছে অবাক করার বা বিরক্তিকর কিছু ছিল না, কারণ আমি এসবে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। চাকরেরা তাদের কর্তব্য পালন করছিল মাত্র। তারা ভেবেছিল রাজেন্দ্রবাবু তাদেরকে দিয়ে যা করাতে চান তারা তাই করছে।

এই চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা রাজকুমার শুক্লার প্রতি আমার সমীহ বাড়িয়ে দিল এবং তাকে আরো ভালোভাবে জানার সুযোগ করে দিল। এতক্ষণে আমি বুঝলাম যে রাজকুমার শুক্লা আমাকে পরিচালনা করতে পারবে না এবং এ পরিস্থিতিতে আমার নিজেকেই হাল ধরতে হবে।

তের

ভদ্র বিহারী

আমি মাওলানা মাজহারুল হককে চিনতাম যখন তিনি লন্ডনে বারের জন্য পড়াশুনা করতেন এবং ১৯১৫ সালে যখন বোম্বে কংগ্রেসে তার দেখা পাই, সে বছরে তিনি মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট, তখন আমাদের পুরনো পরিচিতি ঝালাই হয় এবং যখনই আমার পাটনা যাওয়া পড়ে তার অতিথি হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখেন। আমি সেই আমন্ত্রণের কথা স্মরণ করে আমার সফরের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে তাকে একটা নোট পাঠালাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার গাড়ি নিয়ে হাজির হলেন এবং তার আতিথ্য গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। আমি তাকে ধন্যবাদ

www.pathagar.com

জানালাম এবং অনুরোধ করলাম আমি যাতে আমার গন্তব্যে যাবার প্রথম ট্রেনটা ধরতে পারি সে ব্যাপারে সাহায্য করতে, কারণ আমার মত আগন্তুকের কাছে তখন রেলওয়ের গাইড বইটি অচল। তিনি রাজকুমার শুক্লার সাথে আলোচনা করে বললেন প্রথমে আমার মুজাফ্ফরপুর যাওয়া উচিত। ওখান থেকে সেদিন বিকেলে আমার গন্তব্যে যাবার একটা ট্রেন পাওয়া যাবে এবং ঐ ট্রেনে তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

প্রিন্সিপাল কৃপালানী তখন মুজাফ্ফরপুরে ছিলেন। হায়দ্রাবাদ সফরের সময় থেকেই আমি তাকে চিনতাম। ড. চৈতরাম আমাকে তার মহান ত্যাগ, সরল জীবন যাত্রা এবং তার অর্থ সাহায্যে তিনি যে আশ্রম চালাচ্ছেন তার কথা আমাকে বলেছেন। তিনি মুজাফ্ফরপুর সরকারী কলেজের প্রফেসার ছিলেন এবং আমি যখন সেখানে যাই তখন তিনি চাকরীতে সদ্য ইস্তফা দিয়েছেন। আমার পৌছার সংবাদ জানিয়ে আমি তাকে টেলিগ্রাম করেছিলাম এবং তিনি ছাত্রদের এক বিরাট দল নিয়ে স্টেশনে আমার সাথে দেখা করলেন যদিও ট্রেন সেখানে পৌছাল মধ্যরাতে। তার নিজের কোনো বাসা ছিল না বলে প্রফেসার মালকানীই আমার আতিথ্যকারী হলেন। সেকালে সরকারী কলেজের একজন প্রফেসারের পক্ষে আমার মতো লোককে আশ্রয় দেয়া অত্যন্ত অস্বাভাবিক ঘটনা।

প্রফেসার কৃপালানী বিহারের অরাজক অবস্থা, বিশেষ করে তীর হাট ডিভিশনের অবস্থা নিয়ে আমার সাথে কথা বললেন এবং আমার কাজের সম্ভাব্য অসুবিধা সম্পর্কে ধারণা দিলেন। তিনি বিহারীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন এবং ইতিমধ্যেই আমার বিহারে আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদেরকে বলেছিলেন।

সকাল বেলায় উকিলদের একটি ছোট দল আমার সাথে দেখা করতে এলো। তাদের মধ্যে রামনবমী প্রসাদের কথা আজো মনে আছে, যে তার আন্তরিকতা দিয়ে আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

তিনি বলেছিলেন, "আপনি যে ধরনের কাজ করার জন্য এসেছেন, এখানে (প্রফেসার মালকানীর বাসায়) অবস্থান করে তা করা অসম্ভব। আপনাকে অবশ্যই আমাদের কারো সাথে থাকতে হবে। গয়াবাবু এখানকার একজন বিখ্যাত উকিল। আমি তার পক্ষ থেকে এসেছি আপনাকে তার সাথে থাকার আমন্ত্রণ জানাতে। আমি স্বীকার করছি যে আমরা সবাই গভর্নমেন্টের ভয়ে ভীত, কিন্তু আমরা আপনাকে সাধ্যমতো সাহায্য করব। রাজকুমার শুক্লা আপনাকে যা কিছু বলেছে তার প্রায় সবই সত্য। দুঃখের বিষয় আজ আমাদের নেতারা এখানে নেই। তবে আমি বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ ও বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ উভয়কেই টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। আশা করছি তারা অল্প সময়ের মধ্যেই চলে আসবেন এবং তারা নিশ্চয়ই আপনি যা জানতে চান সেসব তথ্য দিতে পারবেন এবং আপনাকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্যও করতে পারবেন। আপনাকে অনুরোধ করছি, দয়া করে গয়াবাবুর বাড়িতে চলে আসুন।"

www.pathagar.com

আমি এ অনুরোধ ফেলতে পারলাম না, যদিও গয়াবাবুকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে যাচ্ছি সে ভয়ে দ্বিধা করছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন এবং আমি তার সাথে তার বাড়িতে গেলাম। তিনি এবং তার লোকেরা আমাকে স্নেহ বর্ষণে সিক্ত করলেন। ব্রজকিশোর বাবু দ্বারভাঙা ও রাজেন্দ্রবাবু পুরী থেকে ফিরে এলেন। এ ব্রজকিশোরবাবু সেই বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ নন, যাকে আমি লক্ষ্ণৌতে দেখেছি। তিনি আমাকে তার বিনয়, সরলতা, সদগুণ এবং বিহারীদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অতুলনীয় বিশ্বস্ততা দ্বারা মুগ্ধ করলেন এবং আমার মন আনন্দে ভরে উঠল। তার প্রতি বিহারের উকিলদের আনুগত্য দেখে আমি আশ্চর্য বোধ করলাম।

শীগগিরই আমি তার বন্ধু মহলের সকলের সাথে আজীবন বন্ধুত্বের বন্ধনে বাঁধা পড়ে গেলাম বলে মনে হলো। ব্রজকিশোর বাবু আমাকে মামলার তথ্য প্রমাণের বিবরণ অবহিত করালেন। গরিব প্রজাদের মামলা নেয়া তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। আমি যখন সেখানে যাই তখন এরকম দুটো কেস অমীমাংসিত ছিল। তিনি যখন এ ধরনের কোনো কেস জিততেন, নিজেকে সান্ত্বনা দিতেন এই বলে যে গরিব লোকের জন্য তিনি কিছু করছেন। তিনি এসব গরিব কৃষকদের কাছ থেকে মামলার ফি নিতেন না তা নয়। আইনজীবীরা এ বিশ্বাস নিয়ে পরিশ্রম করেন যে তারা যদি ফি না নেন তাহলে তাদের সংসার চালানোর উপায় থাকবে না এবং এর ফলে তারা দরিদ্র লোকদের কার্যকরভাবে সাহায্য করতে পারবেন না। তাদের ফি এর অংক এবং বাংলা ও বিহারে ব্যারিস্টারের ফি এর মান আমাকে হতভম্ব করে দিল।

আমাকে বলা হলো, "আমরা অমুককে ১০,০০০ টাকা দিয়েছি তার মতামতের জন্য।" এখানে চার অংকের নিচে কোনো লেনদেন হয় না।

এ বন্ধুরা আমার মৃদু ভর্ৎসনা শুনলেন এবং আমাকে তারা ভুল বুঝেননি।

আমি বললাম, "এ কেসগুলো স্টাডি করে আমি এ সিদ্ধান্তে এসেছি যে আমাদের আদালতে যাওয়া উচিত হবে না। এ ধরনের কেস কোর্টে নেওয়াতে কোনো সুফল নেই। রায়তরা যেখানে এভাবে নির্যাতিত ও ভীতসন্ত্রস্ত সেখানে আইন-আদালত অকার্যকর। ভয় থেকে মুক্তি দিতে পারলেই তারা প্রকৃত প্রতিকার পাবে। যতদিন পর্যন্ত আমরা বিহার থেকে তিনকাঠিয়া প্রথা বিতাড়িত করতে না পারি ততদিন আমাদের স্থির হয়ে বসার অবকাশ নেই। ভেবেছিলাম দু'দিনেই এখান থেকে চলে যেতে পারব, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি এখানকার কাজে দু'বছরও লেগে যেতে পারে। প্রয়োজনে আমি সে সময় দিতেও রাজি আছি। আমি আমার পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলেছি, এখন আপনাদের সাহায্য দরকার।"

আমি দেখলাম ব্রজকিশোর বাবু ব্যতিক্রমী ধরনের ঠাণ্ডা মাথার লোক। তিনি শান্তভাবে বললেন, "আমরা আপনাকে সাধ্যমতো সাহায্য করব, কিন্তু আমাদেরকে দয়া করে বলুন কি ধরনের সাহায্য আপনার দরকার।" এভাবে আমরা মধ্যরাত পর্যন্ত আলোচনা করলাম।

www.pathagar.com

আমি তাদেরকে বললাম, "আপনাদের আইন সংক্রান্ত জ্ঞান আমার খুব একটা কাজে লাগবে না। আমি করণিক ও অনুবাদকের কাজের সাহায্য চাই। কারাবরণেরও প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু আপনারা সে ঝুঁকি নিলে আমি খুবই খুশী হব, তবে আপনারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবেন কে কতটা করতে পারবেন। আপনাদের পেশাগত কাজ অনির্দিষ্টকাল বন্ধ রেখে কেরানীর কাজ করাও কম কথা নয়। এখানকার আঞ্চলিক হিন্দি ভাষা বুঝতে আমার অসুবিধা হয় এবং কাইথি বা উর্দু সংবাদপত্রও আমি পড়তে পারব না। আমি চাই যে আপনারা আমার জন্য ওগুলো অনুবাদ করে দেবেন। এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদানের সামর্থ্য আমাদের নেই। এসব কাজ ভালোবাসা ও সেবার অনুপ্রেরণা নিয়ে করতে হবে।"

ব্রজকিশোর বাবু তৎক্ষণাৎ এসব বুঝলেন এবং তিনি পালাক্রমে আমাকে ও তার সঙ্গীদেরকে জেরা করতে থাকলেন। তিনি আমি যা বলেছি তার মর্মার্থ উদ্ধার করার চেষ্টা করলেন—কতদিন ধরে তাদের সেবা দরকার হবে, তাদের কতজনকে লাগবে, তারা পালাক্রমে কাজ করতে পারবে কিনা ইত্যাদি। তখন তিনি উকিলদের কাছে তাদের ত্যাগের সামর্থ্য সম্পর্কে জানতে চাইলেন।

অবশেষে তারা আমাকে এই আশ্বাস দিলেন, "আমাদের এতজন আপনি যা বলবেন তাই করবে। আমাদের কয়েকজন যতদিন প্রয়োজন ততদিন আপনার সাথে থাকবে। স্বেচ্ছায় কারাবরণের ধারণা আমাদের জন্য নতুন বিষয়। এটাও আমরা আত্মস্থ করতে চেষ্টা করব।"

চৌদ্দ
অহিংসার মুখোমুখি

আমার উদ্দেশ্য ছিল চাম্পারানের কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করা এবং নীলকরদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা। এ উদ্দেশে হাজার হাজার রায়তের সাথে দেখা করা আমার উচিত ছিল। কিন্তু আমার তদন্ত শুরুর পূর্বে নীলকরদের অবস্থা সম্পর্কেও জানা এবং ডিভিশনের কমিশনারের সাথে দেখা করা অত্যাবশ্যক বলে মনে করলাম। আমি তাদের সাথে সাক্ষাতের সময় চাইলাম এবং তা পেয়েও গেলাম।

নীলকর এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী বললেন যে আমি একজন বহিরাগত এবং তাদের ও তাদের প্রজাদের মধ্যে আমার নাক গলানো উচিত নয়। তবে আমার যদি কোনো বক্তব্য থাকে তা আমি লিখিত আকারে পেশ করতে পারি। আমি ভদ্রভাবে তাকে বললাম যে আমি নিজেকে বহিরাগত বলে ভাবছি না এবং প্রজারা চাইলে তাদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করার পূর্ণ অধিকার আমার আছে।

যে কমিশনারের সাথে আমি দেখা করলাম তিনি আমাকে ভয়ভীতি দেখালেন এবং আমাকে তৎক্ষণাৎ তীরহাট ত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন।

আমার সহকর্মীদেরকে এসব ঘটনা জানালাম এবং তাদেরকে বললাম যে, গভর্নমেন্ট আমাকে এ বিষয়ে আর এগোতে দেবে না সেরকম সম্ভাবনা দেখতে

www.pathagar.com

পাচ্ছি। তবে যদি আমাকে গ্রেফতার করতে চায় তাহলে মতিহারী বা সম্ভব হলে বেত্তিয়ায় গ্রেফতার হওয়াই উত্তম। সুতরাং আমার জন্য উচিত হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঐ স্থানগুলোতে চলে যাওয়া।

চাম্পারান তীরহাট ডিভিশনের একটি জেলা এবং মতিহারী এর সদর। রাজকুমার শুক্লার বাড়ি ছিল বেত্তিয়ার আশপাশে এবং তার পার্শ্ববর্তী কোথি এলাকার প্রজারা এ জেলার সবচেয়ে বেশি দরিদ্র জনগোষ্ঠী। রাজকুমার শুক্লার ইচ্ছে যে আমি তাদের অবস্থা নিজে গিয়ে দেখি এবং এ ব্যাপারে আমারও প্রবল আগ্রহ ছিল।

সুতরাং সেদিনই আমি সহকর্মীদের নিয়ে মতিহারীতে গেলাম। বাবু গোরাখ প্রসাদ আমাদেরকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিলেন, যা একটা সরাইখানায় পরিণত হলো। এখানে আমাদের সকলের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। একই দিন আমরা শুনতে পেলাম যে মতিহারী থেকে প্রায় পাঁচমাইল দূরে একজন প্রজাকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে বাবু ধরণীধর প্রসাদের সাথে আমি সেখানে যাব এবং পরদিন সকালে তার সাথে দেখা করব এবং তদনুযায়ী আমরা হাতীর পিঠে যাত্রা করলাম। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, গুজরাটে গরুর গাড়ির মতো চাম্পারানে হাতী সহজলভ্য। আমরা অর্ধেক পথ যেতে না যেতেই পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের একজন বার্তাবাহক আমাদেরকে ধরে ফেলল এবং বলল পুলিশ সুপার আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন। তিনি যা বুঝাতে চেয়েছেন তা আমি বুঝতে পারলাম। ধরণীধর বাবু ও অন্যদেরকে মূল গন্তব্যে যাবার জন্য রেখে আমি বার্তাবাহক যে গাড়ি নিয়ে এসেছিল তাতে উঠলাম। সে তখন আমাকে চাম্পারান ত্যাগ করার একটা নোটিশ হস্তান্তর করল এবং আমি যেখানে উঠেছি সেখানে নিয়ে গেল। সে যখন আমাকে নোটিশটার প্রাপ্তি স্বীকার করতে বলল তখন আমি লিখে দিলাম যে নোটিশের নির্দেশ আমি পালন করব না এবং আমার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি চাম্পারান ত্যাগ করব না। এর প্রেক্ষিতে আমি শমন পেলাম চাম্পারান ত্যাগের নির্দেশ অমান্য করার জন্য বিচারের সম্মুখীন হতে।

সেদিন আমি সারারাত জেগে চিঠিপত্র লিখলাম যার মাধ্যমে বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিলাম।

আমার ওপর নোটিশ ও সমন জারীর খবর দাবানলের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং আমি জানতে পারলাম মতিহারীতে সেদিন অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। গোরখ বাবুর বাড়ি ও আদালতে মানুষের ঢল নেমেছিল। সৌভাগ্যক্রমে রাতের মধ্যে আমার সব কাজ শেষ করে ফেলেছিলাম। সে কারণে জনতাকে সামাল দিতে সময় দিতে পেরেছিলাম। আমার সহকর্মীরা সবচেয়ে বড় সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। তারা জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে নিয়োজিত ছিলেন, কারণ আমি যেখানেই যাচ্ছিলাম, জনতাও আমার পিছু পিছু যাচ্ছিল।

www.pathagar.com

সরকারী কর্মকর্তা-কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার—এদের সাথে হঠাৎ করে আমার এক ধরনের সখ্যতা গড়ে উঠল। আমার ওপর জারীকৃত নোটিশের আইনী বিরোধীতা করতে পারতাম। তার পরিবর্তে আমি তা মেনে নিলাম এবং কর্মকর্তাদের প্রতি আমার ব্যবহার সঠিক ছিল। এতে তারা বুঝলেন যে আমি তাদের সাথে ব্যক্তিগত বিরোধে জড়াতে চাই না, কিন্তু আমি তাদের আদেশের বিরুদ্ধে নাগরিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাই। এভাবে তাদেরকে আশ্বস্ত করলাম এবং আমাকে হয়রানি করার পরিবর্তে তারা সানন্দে জনতাকে নিয়ন্ত্রণের কাজে আমার সহকর্মীদের সহযোগিতা গ্রহণ করতে থাকল। তবে তাদের কর্তৃত্ব যে নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে এটা ছিল তার চাক্ষুষ প্রমাণ। ঐ মুহূর্তে জনগণ শাস্তির ভয় হারিয়ে ফেলেছিল এবং তাদের নতুন বন্ধু যে ভালোবাসার চর্চা করত সে ভালোবাসার শক্তির কাছে আনুগত্য স্বীকার করেছিল।

মনে রাখা প্রয়োজন যে চাম্পারানে আমাকে কেউ চিনত না। কৃষকরা ছিল সবাই অশিক্ষিত। চাম্পারান গঙ্গা নদীর সুদূর উত্তরে এবং হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের নিকটে অবস্থিত হওয়ায় ভারতের বাকী অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। ঐ অঞ্চলের লোকজন কংগ্রেস সম্পর্কে বাস্তবে কিছুই জানত না। যারা কংগ্রেসের নাম শুনেছে তারাও ভয়ে এতে যোগদান করা থেকে পিছিয়ে গেছে, এমনকি তারা এর নামও উচ্চারণ করত না। আর এখন কংগ্রেস ও তার সদস্যরা এ অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, যদিও কংগ্রেসের নামে নয় তবু একেবারে বাস্তব ও প্রকৃত অর্থে।

আমার সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে কংগ্রেসের নামে কিছুই করা হবে না। আমরা নাম চাই না কাজ চাই, প্রকৃত বস্তু চাই বস্তুর ছায়া চাই না। কারণ গভর্নমেন্ট ও তার নিয়ন্ত্রক নীলকরদের নিকট কংগ্রেসের নাম ছিল খুবই অপ্রিয়। তাদের কাছে কংগ্রেস ছিল উকিলদের ঝগড়া-বিবাদের অপর নাম, আইনের ফাঁক-ফোকর বের করে আইন এড়িয়ে যাওয়া, বোমা, অরাজকতা, অপরাধ, কূট-কৌশল ও ছল-চাতুরীর নামান্তর। আমাদেরকে তাদের উভয়ের ভুল ভেঙে দিতে হবে। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম কংগ্রেসের নাম উল্লেখ করা হবে না এবং কৃষকদেরকে কংগ্রেস নামের কোনো সংগঠনের সাথে পরিচিত করা হবে না। ভাবলাম, কংগ্রেসের নাম অনুসরণ না করে যদি তার মূল নীতি অনুসরণ করা যায় তাহলেই যথেষ্ট।

সে কারণে আমাদের সেখানে পৌছার ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো আগাম দূত প্রেরণ করা হয়নি। রাজকুমার শুক্লার সাধ্য ছিল না হাজার হাজার কৃষকের কাছে গিয়ে বলার। তাদের মধ্যে কোনো প্রকার রাজনৈতিক কাজ করা হয়নি। চাম্পারানের বাইরের জগত সম্পর্কে তারা কিছুই জানত না। তা সত্ত্বেও তারা আমাকে এমনভাবে গ্রহণ করেছিল যেন আমরা যুগ যুগ ধরে পুরনো বন্ধু। যদি বলি কৃষকদের সাথে এ সাক্ষাতে আমি ঈশ্বরের, অহিংসার এবং সত্যের মুখোমুখি হয়েছি তাহলে বাড়িয়ে বলা হবে না, বরং সেটাই আক্ষরিক অর্থে সত্য।

www.pathagar.com

আমার এ উপলব্ধি দাবি করার অধিকার সম্পর্কে যখন খতিয়ে দেখি আমি জনগণের জন্য আমার ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না। এবং এটাও প্রকারান্তরে অহিংসার ওপর আমার অটল বিশ্বাসের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়।

সেদিনটা ছিল চাম্পারানের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ঘটনার দিন এবং সেখানকার কৃষকদের এবং আমার জীবনেও তা অবিস্মরণীয়।

আইনের দৃষ্টিতে আমার বিচার হওয়ার কথা, কিন্তু সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে গভর্নমেন্টের বিচার হওয়া উচিত ছিল। কমিশনার আমার জন্য যে ফাঁদ পেতেছিলেন, তাতে তিনি গভর্নমেন্টকেই জড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পনের
মামলা প্রত্যাহার

আমার বিরুদ্ধে মামলার বিচার শুরু হলো। সরকারী উকিল, ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা বুঝে উঠতে পারছিলেন না তারা কি করবেন। সরকারী উকিল ম্যাজিস্ট্রেটকে চাপ দিচ্ছিলেন মামলা স্থগিত করে দেয়ার জন্য। কিন্তু আমি বাধা দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ করলাম কেস স্থগিত না করতে, কারণ আমি চাই যে চাম্পারান ত্যাগের আদেশ অমান্য করে আমি দোষ করে থাকলে তা প্রমাণিত হোক এবং আমি নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পড়ে শোনালাম—

"বিজ্ঞ আদালতের অনুমতিক্রমে আমি একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিতে চাই। এতে আমি তুলে ধরতে চাই কেন আমি সেকশন ১৪৪ সিআরপিসি'র অধীনে প্রদত্ত আদেশ দৃশ্যত অমান্য করার মতো কঠিন পদক্ষেপ নিয়েছি। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসন ও আমার মধ্যে মতপার্থক্যের ব্যাপার। আমি দেশে এসেছি মানবতা ও জাতির সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে। আমি এখানে এসেছি এখানকার রায়তদের বিশেষ অনুরোধে, নীলকররা তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করছে না। সমস্যাটা সম্পর্কে সঠিকভাবে না জেনে আমি তাদেরকে সাহায্য করতে পারব না। সুতরাং আমি সমস্যা সম্পর্কে জানতে এখানে এসেছি, সম্ভব হলে এ বিষয়ে প্রশাসন ও নীলকরদের সাহায্যও নেব। আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই এবং আমি বিশ্বাস করি না যে আমার এখানে আসা কোনোভাবেই জনগণের শান্তি বিনষ্ট করতে পারে বা তাদের জীবনহানি ঘটাতে পারে। এসব বিষয়ে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে বলে দাবি করছি। স্থানীয় প্রশাসন অবশ্য এ বিষয়ে ভিন্ন মনোভাব গ্রহণ করেছে। আমি তাদের অসুবিধা পুরোপুরি উপলব্ধি করছি এবং স্বীকার করছি যে তারা আমার সম্পর্কে যে তথ্য পেয়েছেন তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আইনের প্রতি অনুগত একজন নাগরিক হিসেবে আমার প্রথম কর্তব্য হলো আমার ওপর প্রদত্ত আদেশ মান্য করা। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে আমি যাদের জন্য এসেছি তাদের প্রতি আমার কর্তব্যবোধকে বিসর্জন দিতে হবে। আমি অনুভব করছি যে আমি তাদের সেবা করতে পারি কেবল তাদের মধ্যে অবস্থান করে। সুতরাং আমি স্বেচ্ছায় তাদের ত্যাগ করে চলে যেতে পারি না। কর্তব্যবোধের এ

www.pathagar.com

সংঘাতের মাঝে আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দেবার দায়িত্ব প্রশাসনের ওপর বর্তায়। আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন যে ভারতের জনজীবনে আমার মতো অবস্থানের লোকের পক্ষে কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপনে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া উচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা বর্তমানে যে জটিল শাসন ব্যবস্থার অধীনে বাস করছি, তাতে একজন আত্ম-সম্মানবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য, বর্তমানে আমি যে অবস্থার সম্মুখীন সে অবস্থায় একমাত্র সম্মানজনক পথ হচ্ছে, আমি যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাই করা অর্থাৎ বিনা প্রতিবাদে আদেশ অমান্যের শাস্তি মেনে নেয়া।

আমি এ বিবৃতি দিচ্ছি আমার আসন্ন শাস্তি লাঘব করার জন্য নয়, বরং এটা প্রমাণ করতে যে আমার ওপর প্রদত্ত আদেশ আমি অমান্য করেছি আইনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নেই বলে নয়, বরং আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার উচ্চতর আইন তথা বিবেকের প্রতি আনুগত্যের তাগিদে।"

এখন শুনানী বন্ধ রাখার অবস্থা আর রইল না। যেহেতু ম্যাজিস্ট্রেট ও সরকারী উকিল উভয়েই আমার বক্তব্যে অবাক হয়েছিল, এ অবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেট রায় প্রদান স্থগিত রাখলেন। ইতিমধ্যে আমি ঘটনা প্রবাহের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে ভাইসরয়, পাটনার বন্ধুবর্গ, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ও অন্যান্যদেরকে তার বার্তা পাঠালাম।

আমি রায় শোনার জন্য কোর্টে হাজির হওয়ার আগেই ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে একটা লিখিত বার্তা পাঠালেন যে লেফটেন্যান্ট গভর্নর আমার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করার আদেশ দিয়েছেন এবং কালেক্টর আমাকে পত্র লিখে জানালেন যে আমি স্বাধীনভাবে আমার প্রস্তাবিত তদন্ত চালিয়ে যেতে পারি, এবং প্রয়োজনে কর্মকর্তাদের নিকট থেকে যে কোন সাহায্যও করা হবে। আমরা কেউই আশা করিনি যে এত দ্রুত এবং এভাবে বিষয়টির সন্তোষজনক সমাপ্তি ঘটবে।

আমি কালেক্টর মি. হেকক এর সাথে দেখা করলাম। তিনি একজন ভালো মানুষ বলে মনে হলো যিনি ন্যায়বিচারে আগ্রহী। তিনি আমাকে বললেন আমার যে কোনো কাগজপত্র দেখার প্রয়োজন হলে তিনি দেখাবেন এবং আমার ইচ্ছেমতো যেকোনো সময়ে তার সাথে দেখা করতে পারি।

এভাবে সারাদেশে নাগরিক আইন অমান্যের প্রথম নজির স্থাপিত হলো। এ ঘটনা স্থানীয়ভাবে এবং সংবাদপত্রে ব্যাপক আলোচিত হলো এবং আমার তদন্তের খবর ব্যাপকভাবে রটে গেল।

আমার তদন্তের স্বার্থে গভর্নমেন্টের নিরপেক্ষতার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তদন্তের প্রতি সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে রিপোর্টের মাধ্যমে সমর্থন জানানোর প্রয়োজন ছিল না। প্রকৃতপক্ষে চাম্পারানের অবস্থা এমন নাজুক ও জটিল ছিল যে অতিরঞ্জিত সমালোচনা বা রিপোর্ট আমি যে উদ্দেশে কাজ করছি তা সহজেই পণ্ড করে দিতে পারে। সুতরাং আমি প্রধান সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকদের কাছে পত্র

www.pathagar.com

দিয়ে কোনো রিপোর্টার না পাঠানোর অনুরোধ করলাম, কারণ কোনো সংবাদ ছাপানোর প্রয়োজন হলে আমি নিজেই তা পাঠাব এবং তাদেরকে অবহিত রাখব।

আমি জানতাম যে চাম্পারানে আমার অবস্থানের প্রতি সরকারের সমর্থনের ফলে সেখানকার নীলকররা নাখোশ হয়েছেন এবং সরকারী কর্মকর্তারা মুখ ফুটে বলতে না পারলেও তারাও ব্যাপারটা পছন্দ করেননি।

সুতরাং ভুল বা বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রকাশ তাদেরকে আরো উত্তেজিত করবে এবং তাদের রাগ আমার পরিবর্তে নিশ্চিতভাবেই নিরীহ ভীত-সন্ত্রস্ত রায়তদের ওপর নেমে আসবে আর তাতে আমার সত্যের অনুসন্ধান গুরুতরভাবে ব্যাহত হবে।

এসব সতর্কতা সত্ত্বেও নীলকররা আমার বিরুদ্ধে বিষাক্ত বিক্ষোভ ছড়াতে লাগল। সংবাদপত্রে আমার ও আমার সহকর্মীদের সম্পর্কে যতসব মিথ্যা রিপোর্ট প্রকাশ করা হলো। কিন্তু আমার সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং নিখুঁতভাবে সত্যের প্রতি নিষ্ঠা তাদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিল।

নীলকররা ব্রজকিশোর বাবুর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় কোনো প্রচেষ্টাই বাদ রাখল না। কিন্তু যতই তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা হতে থাকল, জনগণের শ্রদ্ধা তার প্রতি বাড়তে থাকল।

এরকম নাজুক অবস্থায় আমি অন্য প্রদেশের নেতৃবৃন্দকে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানানো সমীচীন মনে করলাম না। পণ্ডিত মালব্যজী কথা দিয়েছিলেন যখনই আমি চাইব তাকে একটা খবর পাঠালেই তিনি চলে আসবেন, কিন্তু আমি তাকে কষ্ট দিতে চাইনি। এভাবে আমি এখানকার ঘটনা প্রবাহের ওপর রাজনৈতিক রং চড়ানো এড়াতে সক্ষম হলাম। তবে আমি মাঝে মাঝে নেতৃবৃন্দের কাছে এবং প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে রিপোর্ট পাঠাতাম, সেগুলো ছাপার জন্য নয়, তাদের অবগতির জন্য। আমি দেখেছি যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অরাজনৈতিক পন্থা অবলম্বন করলেও রাজনৈতিক রং চড়ানো উদ্দেশ্য সাধনকে ব্যর্থ করে দিতে পারে, আবার রাজনৈতিক ভাবমূর্তি বজায় রাখা গেলে তা উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়ে থাকে। চাম্পারানের সংগ্রাম এটাই প্রমাণ করে, যে কোনো পরিবেশে জগগণের নিঃস্বার্থ সেবা পরিশেষে দেশের জন্য নৈতিক সুফল বয়ে আনে।

ষোল
কাজের পদ্ধতি

চাম্পারান তদন্তের পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে ঐ সময়ে চাম্পারান রায়তদের ইতিহাস বর্ণনা করতে হবে, এসব অধ্যায়ে যা সম্ভব নয়। চাম্পারান তদন্ত সত্য ও অহিংসার একটি বলিষ্ঠ পরীক্ষণ এবং সে দৃষ্টিকোণ থেকে যতটুকু বিবরণ দেয়া উচিত বলে মনে হয়েছে ততটুকুই সপ্তায় সপ্তায় দিয়ে যাচ্ছি। আরো বিশদভাবে জানতে হলে পাঠককে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদের হিন্দী ভাষায় লিখিত "চাম্পারানে

www.pathagar.com

সত্যাগ্রহের ইতিহাস" বইটি পড়তে হবে যার ইংরেজি অনুবাদ এখন প্রেসে আছে। ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেছে এস. গনেশন, ট্রিপলিকেন, মাদ্রাজ।

এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুতে ফিরে আসা যাক। গোরাখবাবুর বাড়ি খালি না করিয়ে বাস্তবে তার বাড়িতে তদন্ত অনুষ্ঠান সম্ভব হচ্ছিল না। আর মতিহারীর লোকজন তাদের ভয় ভীতি এতটা ঝেড়ে ফেলতে পারেনি যে আমাদেরকে বাড়ি ভাড়া দেবে। যাহোক, ব্রজ কিশোরবাবু কৌশলে যথেষ্ট পরিমাণ খালি জায়গা সহ একটি বাড়ি ভাড়া করলেন এবং আমরা সেখানে চলে গেলাম।

টাকা ছাড়া কাজ চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। এতদিন পর্যন্ত এ ধরনের কাজের জন্য জনগণের কাছে টাকা চেয়ে আবেদন জানানোর কোনো রীতি ছিল না। ব্রজকিশোর বাবু এবং তার বন্ধুদের মধ্যে বিশেষ করে উকিল বন্ধুরা হয় নিজেরা চাঁদা দিয়েছে অথবা সুযোগ মতো তাদের বন্ধুদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে অর্থের সংস্থান করছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা এবং তাদের বন্ধুরা টাকার যোগান দিতে সমর্থ হচ্ছেন ততক্ষণ তারা কিভাবে জনগণের কাছে টাকা চাইবেন? তারা এরকম যুক্তিই দেখালেন। আমি চাম্পারান রায়তদের কাছ থেকে কিছু নেব না বলে মনস্থির করে ফেলেছিলাম। নিলে অবশ্যই সেটার ভুল ব্যাখ্যা করা হবে। একইভাবে এ তদন্তের জন্য দেশবাসীর কাছে টাকার আবেদন না জানাতেও আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম। কারণ তাতে এ তদন্তের ওপর সর্বভারতীয় এবং রাজনৈতিক রূপ দেয়া হবে। বোম্বের বন্ধুরা ১৫,০০০ টাকা দেয়ার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু আমি ধন্যবাদের সাথে তা ফিরিয়ে দিলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম ব্রজকিশোর বাবুর সাহায্যে যতটা সম্ভব চাম্পারানের বাইরের ধনাঢ্য বিহারীদের কাছ থেকে টাকা তুলব এবং যদি আরো বেশি প্রয়োজন হয় তাহলে আমার রেংগুনের বন্ধু ডা. পি.জে মেহতার শরণাপন্ন হব। ডা. মেহতা আমার প্রয়োজন অনুযায়ী টাকা পাঠাতে তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন। এ বিষয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা এভাবেই দূর হলো। আমাদের খুব বেশি টাকা প্রয়োজন হবে এমন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ আমরা চাম্পারানের দারিদ্র্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সর্বোচ্চ ব্যয় সংকোচ করে যাচ্ছিলাম। আসলেই শেষে গিয়ে দেখা গেল আমার বড় অংকের টাকার প্রয়োজন হয়নি। আমার ধারণা হলো যে আমরা সর্বমোট তিন হাজার টাকার বেশি ব্যয় করিনি এবং যতদূর মনে পড়ে, আমরা যা সংগ্রহ করেছিলাম তা থেকে কয়েকশত টাকা বেঁচে গিয়েছিল।

প্রথম দিকে আমার সহকর্মীদের অস্বাভাবিক জীবন যাত্রা সার্বক্ষণিক বিদ্রূপের বিষয়বস্তুতে পরিণত হলো। প্রত্যেক উকিলের একজন করে পাচক ও চাকর ছিল, সুতরাং তাদের পৃথক রান্নার প্রয়োজন ছিল এবং তারা প্রায় মধ্যরাতে তাদের ডিনার খেত। যদিও তারা তাদের ব্যয় বহন করত তবু তাদের অনিয়ম আমাকে উদ্বিগ্ন করত, তবে যেহেতু আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম আমাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা ছিল না এবং তারা আমার উপহাস ভালোভাবেই গ্রহণ করল। অবশেষে স্থির হলো যে চাকরদের বিদায় করা হবে, রান্নার সব পৃথক আয়োজন

www.pathagar.com

একত্র করা হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে খাবার খাওয়া হবে। যেহেতু সবাই নিরামিষভোজী নয় এবং দুটো রান্নাঘর রাখাও ব্যয়বহুল সেহেতু সবার জন্য একটি নিরামিষ রান্নাঘর রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সাধারণ খাবারের ওপর জোর দেয়ার প্রয়োজনও অনুভূত হলো।

এসব ব্যবস্থার ফলে ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেল এবং আমাদের অনেক সময় ও শ্রম সাশ্রয় হলো এবং এ দুটোই আমাদের খুব দরকার ছিল। কৃষকরা দলে দলে তাদের লিখিত বক্তব্য পেশ করতে এলো, তাদের সঙ্গী হিসেবে আরো দলে দলে মানুষ এলো যাদের ভীড়ে বাড়ির আঙিনা ও বাগান উপচে পড়তে লাগল। আমাকে দর্শন প্রার্থীদের থেকে রক্ষা করার জন্য সহকর্মীদের প্রচেষ্টা প্রায় কোনো কাজেই এলো না এবং আমাকে দর্শনীয় বস্তু হিসেবে নির্দিষ্ট সময়ে খোলা জায়গায় দাঁড়াতে হলো। কমপক্ষে পাঁচ থেকে সাতজন স্বেচ্ছাসেবীর প্রয়োজন হলো বক্তব্য লিখে নেয়ার কাজে, তা সত্ত্বেও অনেকে বক্তব্য দিতে না পেরে বিকেলে ফেরৎ গেল। এসব বক্তব্যের সবগুলোই অত্যাবশ্যক ছিল না, অনেকগুলোই ছিল পুনরাবৃত্তি, কিন্তু বক্তব্য না দিয়ে লোকে সন্তুষ্ট হচ্ছিল না এবং এ ব্যাপারে আমি তাদের মনোভাব সমর্থন করি।

যারা বক্তব্য লিখে নিচ্ছিল তাদেরকে কিছু নিয়ম পালন করতে বলা হয়েছিল। প্রত্যেক কৃষককে ভালো করে জেরা করতে হবে এবং যার জবাব সন্তোষজনক হবে না তাকে বাদ দিতে হবে। এতে অনেকটা অতিরিক্ত সময় লাগল কিন্তু এর ফলে বক্তব্যগুলো অবিতর্কিত হলো।

বক্তব্য রেকর্ড করার সময় সর্বদা একজন সিআইডি উপস্থিত থাকত। আমরা তাদেরকে প্রতিরোধ করতে পারতাম, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে প্রথম থেকেই সিআইডি অফিসারের উপস্থিতিতে আমরা আপত্তি করব না। শুধু তাই নয়, তাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করব এবং আমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব সব তথ্য তাদেরকে জানাব। এতে আমাদের কোনো ক্ষতিই হলো না, বরং উল্টো সিআইডি অফিসারের সামনে বক্তব্য নেয়া হচ্ছে এতে কৃষকরা নির্ভয়ে তাদের বক্তব্য দিল। একদিকে তাদের উপস্থিতির কারণে স্বাভাবিকভাবেই অতিরঞ্জনের প্রবণতা কমে গেল। অতিরঞ্জিত বক্তব্য ধরে ফেলার দায়িত্ব ছিল সিআইডি বন্ধুদের এবং কৃষকদের স্বাভাবিকভাবেই সতর্কভাবে বক্তব্য দিতে হচ্ছিল।

আমি যেহেতু নীলকরদের অসন্তুষ্ট করতে চাইনি বরং ভালো ব্যবহার দ্বারা তাদের মন জয় করতে চেয়েছিলাম, তাই যাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে তাদের সাথে দেখা করতে পত্র লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি নীলকর এসোসিয়েশনের সাথেও দেখা করলাম, তাদের সামনে রায়তদের অভিযোগ তুলে ধরলাম এবং তাদের মতামত জেনে নিলাম। নীলকরদের অনেকেই আমাকে ঘৃণা করল, অনেকে ঔদাসীন্য দেখাল, আর অল্প কয়েকজন সৌজন্যমূলক ব্যবহার করল।

www.pathagar.com

সতের

আমার সহকর্মীরা

ব্রজকিশোর বাবু ও রাজেন্দ্র বাবু দু'জনে ছিলেন অতুলনীয় জুটি। তাদের একাগ্রতা এমনই ছিল যে তাদের সাহায্য ছাড়া এক পা এগুনোও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাদের শিষ্য বা সতীর্থ—শম্ভুবাবু, অনুগ্রহবাবু, ধরণীবাবু, রামনবমীবাবু ও অন্যান্য উকিলরা সর্বদা আমাদের সাথে ছিলেন। বিন্ধ্যবাবু ও জনকধারীবাবুও মাঝে মাঝে আমাদের সাহায্য করেছেন। তাঁরা সবাই বিহারী, তাদের প্রধান কাজ ছিল রায়তদের বক্তব্য লিখে নেয়া।

প্রফেসার কৃপালানী তার ভাগ্য আমাদের সাথে না জড়িয়ে পারলেন না। একজন সিন্ধী হয়েও তিনি জন্মসূত্রে বিহারীদের চেয়েও বেশি বিহারী। আমি অল্প ক'জন কর্মীকে দেখেছি যারা নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে আত্মীকৃত হতে পেরেছেন। কৃপালানী তাদেরই একজন। তিনি যে অন্য কোনো প্রদেশ থেকে এসেছেন তাকে দেখে কারো পক্ষে তা বোঝা অসম্ভব। তিনি আমার প্রধান দ্বাররক্ষক ছিলেন। সাময়িকভাবে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল দর্শনপ্রার্থীদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করা। তিনি কখনো অব্যর্থ রসিকতা করে, কখনো বা মৃদু ভয় ভীতি দেখিয়ে লোকজনকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। রাতের বেলা তিনি তার শিক্ষকের পেশা গ্রহণ করতেন এবং ইতিহাস পাঠ ও পর্যালোচনা করে সঙ্গীদের মনোরঞ্জন করতেন এবং ভীরু আগন্তুকদের সাহসীতে পরিণত করতেন।

মওলানা মাজহারুল হক সদা প্রস্তুত সাহায্যকারীদের তালিকায় তাঁর নাম লিখিয়ে ছিলেন যার কাছে প্রয়োজন হলেই সাহায্য চাইতে পারি এবং তিনি প্রতিমাসে একবার-দু'বার দেখা করতে আসার নিয়ম করে নিয়েছিলেন। তিনি তখন যে শান-শওকতে জীবন যাপন করতেন তার সাথে তাঁর আজকের জীবন যাপনের বৈপরীত্য লক্ষ্যণীয়। তিনি আমাদের সাথে যেভাবে মিশতেন তাতে আমরা ভাবতাম তিনি আমাদেরই একজন, যদিও তাঁর সৌখিন চালচলন দেখে যে কোনো আগন্তুক অন্য রকম ভাবত।

বিহারে আমার অভিজ্ঞতা বাড়ার সাথে সাথে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে সঠিক গ্রাম্য শিক্ষা ব্যতীত স্থায়ী প্রকৃতির কাজ করা অসম্ভব। রায়তদের অজ্ঞতা ছিল দুঃখজনক। তারা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে হয় ঘুরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দিত, না হয় দুটো তামার পয়সার জন্য সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নীল চাষের কাজ করতে বাধ্য করত। তখনকার দিনে একজন পুরুষ শ্রমিকের বেতন দশ পয়সা, নারী শ্রমিকের ছয় পয়সা এবং শিশু শ্রমিকের বেতন তিন পয়সার বেশি ছিল না। যে দিনে চার আনা আয় করতে পারত তাকে সবচেয়ে ভাগ্যবান মনে করা হতো।

আমার সঙ্গীদের সাথে আলোচনা করে ছয়টি গ্রামে প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলাম। গ্রামবাসীদের সাথে আমাদের একটা শর্ত থাকল যে তারা শিক্ষকদের থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব নেবে, বাকী খরচের বিষয় আমরা দেখব।

www.pathagar.com

গ্রামের লোকদের হাতে নগদ টাকা-পয়সা প্রায় থাকতই না, তবে তারা খাবারের ব্যবস্থা ভালোভাবেই করতে পারত। ইতিমধ্যেই তারা চাঁদাস্বরূপ শস্য ও অন্যান্য কাঁচামাল প্রদানের ইচ্ছে ব্যক্ত করেছে। শিক্ষক কোথায় পাওয়া যাবে তা একটা বড় সমস্যা ছিল। নিম্নতম ভাতায় বা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করবে এমন শিক্ষক স্থানীয়ভাবে পাওয়া কঠিন। আমার ধারণা ছিল শিশুদেরকে কখনোই আনাড়ী শিক্ষকের হাতে ছেড়ে দেয়া যাবে না। শিক্ষকের নৈতিকতা তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং আমি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শিক্ষকের জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানালাম। তাৎক্ষণিক সাড়াও পাওয়া গেল। শ্রীযুক্ত গঙ্গাধররাও দেশপাণ্ডে বাবাসাহেব সোমান ও পাণ্ডালিক নামে দু'জনকে পাঠালেন। শ্রীমতি অবন্তিকাবাই গোখলে এলেন বোম্বে থেকে এবং মিসেস আনন্দীবাই বৈশাম্পায়ন এলেন পুনা থেকে। আশ্রম থেকে আমি ছোটলাল, সুরেন্দ্রনাথ ও আমার পুত্র দেবদাসকে পাঠালাম। প্রায় এ সময়েই মাহদেব দেশাই ও নরহরি পারিখ তাদের স্ত্রীদের নিয়ে আমার সাথে তাদের ভাগ্য জড়িয়ে ফেললেন। এ কাজের জন্য কস্তুরবাইকেও ডাকা হলো। মোটামুটি শক্তিশালী একটা দল দাঁড়িয়ে গেল। শ্রীমতি অবন্তিকাবাই ও শ্রীমতি আনন্দীবাই যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন কিন্তু শ্রীমতি দুর্গা দেশাই ও মনিবেন পারিখ শুধুমাত্র গুজরাটী ছাড়া আর কিছু জানতেন না, আর কস্তুরবাই তাও জানতেন না। এসব মহিলারা শিশুদেরকে হিন্দী ভাষায় কিভাবে শিক্ষা দেবেন?

আমি তাদেরকে ব্যাখ্যা করে বোঝালাম যে তারা শিশুদেরকে ব্যাকরণ ও পড়ালেখা-অংক শেখানোর চেয়ে পরিচ্ছন্নতা ও ভালো ব্যবহার বেশি শেখাবেন সেটাই আশা করা হচ্ছে। তাদেরকে এটাও বোঝালাম যে গুজরাটী, হিন্দী ও মারাঠী ভাষার মধ্যে তারা যেমন ভাবছেন অতটা পার্থক্য নেই এবং প্রাইমারী ক্লাশগুলোতে প্রাথমিক অক্ষর জ্ঞান ও সংখ্যা শিক্ষা দেয়া মোটেই কঠিন কিছু নয়। এর ফলে দেখা গেল এ ক্লাশ নেয়া সবচেয়ে সফল হলো। এ অভিজ্ঞতা তাদেরকে তাদের কাজে আত্মবিশ্বাসসহ অনুপ্রেরণা ও আগ্রহ জাগাল। অবন্তিকাবাই এর স্কুল একটি আদর্শ স্কুলে পরিণত হলো। তিনি যে অসাধারণ উপহার সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন তার ফল পাওয়া গেল। এসব ভদ্রমহিলাদের মাধ্যমে আমরা কিছু পরিমাণে গ্রাম্য মহিলাদের কাছেও প্রবেশাধিকার পেলাম।

কিন্তু আমি প্রাইমারী শিক্ষার ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হতে চাইলাম না। গ্রামগুলো ছিল অস্বাস্থ্যকর, রাস্তাঘাট ময়লায় পূর্ণ, পানির কুয়োগুলোর চারপাশ কাদা ও দুর্গন্ধময় এবং বাড়ির আঙিনাগুলো অসহনীয়ভাবে অপরিষ্কার ও অগোছালো। বয়স্কদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা গ্রহণ অতি প্রয়োজন ছিল। তাদের সবাই নানা রকম চর্মরোগে ভুগছিল। সুতরাং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ যতটা সম্ভব করার এবং তাদের জীবনের প্রতিটি দিকে দৃষ্টি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো।

এ কাজের জন্য ডাক্তারদের প্রয়োজন ছিল। আমি সার্ভেন্টস অব ইন্ডিয়া সোসাইটিকে অনুরোধ করলাম প্রয়াত ডা. দেব এর সেবা ধার দিতে। আমরা অন্তরঙ্গ

www.pathagar.com

বন্ধু ছিলাম এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ছয় মাসের জন্য সেবা দিতে রাজি হলেন। সব নারী-পুরুষ ও শিক্ষকদেরকে তার অধীনে কাজ করতে হলো।

তাদের সবাইকে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া ছিল নিজেদেরকে রাজনীতি বা নীলকরদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে না জড়াতে। স্থানীয় লোকদের কেউ অভিযোগ জানাতে এলে তাকে আমার কাছে পাঠাতে বলা হলো। কেউ যেন তার নিজ নিজ সীমা অতিক্রম না করে। বন্ধুরা আশ্চর্য বিশ্বস্ততার সাথে এসব নির্দেশ পালন করল। শৃঙ্খলা ভঙ্গের একটি ঘটনাও ঘটেছে বলে আমার মনে পড়ে না।

আঠার
গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ

যতদূর সম্ভব আমরা একজন করে পুরুষ ও মহিলার ওপর এক একটা স্কুলের দায়িত্ব দিয়েছিলাম। এই স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর চিকিৎসা সেবা ও পরিচ্ছন্নতা দেখাশুনার দায়িত্বও দেয়া হয়েছিল। গ্রামের মহিলাদের সাথে মহিলাদের মাধ্যমেই যোগাযোগ করতে হতো।

চিকিৎসা সেবা ছিল খুবই সহজ ব্যাপার। স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে ওষুধ বলতে শুধু ক্যাস্টর অয়েল, কুইনিন আর সালফার অয়েন্টমেন্ট দেয়া হতো। কোনো রুগীর যদি জিভে ময়লা জমতো বা কোষ্ঠকাঠিন্যের কথা বলত তাকে ক্যাস্টর অয়েল দেয়া হতো, জ্বর হলে প্রথমে এক ডোজ ক্যাস্টর অয়েল তারপর কুইনিন, আর সালফার অয়েন্টমেন্ট দেয়া হতো ফোঁড়া, চুলকানি ইত্যাদি ভালোভাবে পরিষ্কার করে লাগানোর জন্য। কোন রুগীকে ওষুধ বাড়িতে নিয়ে যেতে দেয়া হতো না। যখন কোনো জটিলতা দেখা দিত তখন ডা. দেবের পরামর্শ নেয়া হতো। ডা. দেব সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে প্রতিটি সেন্টারে যেতেন।

অনেক লোকেই এই সাধারণ চিকিৎসা সেবা নিচ্ছিল। এ কর্মপদ্ধতি খারাপ মনে হবে না যদি মনে রাখা যায় যে প্রচলিত রোগ ছিল মাত্র অল্প কয়েকটি যা সহজ চিকিৎসাতেই নিরাময়যোগ্য এবং এতে বিশেষজ্ঞের চিকিৎসার প্রয়োজন হতো না। জনগণের দিক থেকে এ ব্যবস্থায় চমৎকার সাড়া পাওয়া গেল।

স্যানিটেশনের বিষয়টি কঠিন ছিল। লোকজন নিজেরা কিছু করতে রাজি ছিল না। এমন কি মাঠের শ্রমিকরাও তাদের নিজেদের মল-মূত্র নিজেরা পরিষ্কার করতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু ডা. দেব সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি স্বেচ্ছাসেবকদেরকে একত্র করলেন একটা গ্রামকে আদর্শরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে। তারা রাস্তাঘাট ও আঙিনা ঝাড়ু দিল, কুয়ো পরিষ্কার করল, বাড়ির পাশের গর্তগুলো ভরাট করল, এবং গ্রামবাসীদের নিজেদের মধ্যে থেকে স্বেচ্ছাসেবক তৈরির জন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করল। কোনো কোনো গ্রামে লোকজন লজ্জা পেয়ে নিজেরাই কাজে লেগে গেল, আবার কোনো কোনো গ্রামের লোকজন এত বেশি উদ্বুদ্ধ হলো যে তারা নিজেরা রাস্তাও তৈরি করে ফেলল যাতে আমি গাড়ি নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারি। এসব মধুর অভিজ্ঞতার সাথে

www.pathagar.com

কিছু মানুষের উদাসীনতার তিক্ত অভিজ্ঞতাও মিশ্রিত ছিল। আমার মনে আছে গ্রামের কিছু লোক এসব কাজের প্রতি খোলাখুলি তাদের অপছন্দের কথা প্রকাশ করেছিল।

এখানে একটা অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, যা অনেক সভায় আমি বলেছি। ভিটিহারবা একটা ছোট গ্রাম যেখানে আমাদের একটা স্কুল ছিল। আমি একবার এখান থেকে কাছেই একটা ছোট গ্রাম দেখতে গেলাম এবং কিছু মহিলাকে খুব ময়লা কাপড় পরা অবস্থায় দেখতে পেলাম। সুতরাং আমার স্ত্রীকে পাঠালাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে কেন তারা তাদের কাপড় ধোয় না। সে তাদের সাথে কথা বলল। একজন মহিলা তাকে তার কুঁড়েঘরে নিয়ে গেল এবং বলল, "দেখুন, এখানে কোনো বাক্স বা আলমারী নেই অন্য কোনো কাপড় রাখার জন্য। যে শাড়িটা আমি পরে আছি এটাই আমার একমাত্র কাপড়। এটা আমি ধুবো কিভাবে? মহাত্মাজীকে বলুন আমাকে আরেকটা শাড়ি দিতে, তাহলে আমি প্রতিদিন স্নান করতে ও পরিষ্কার শাড়ি পরার প্রতিশ্রুতি দেব।"

ঐ কুঁড়েঘর কোনো ব্যতিক্রম নয় বরং এটাই ভারতীয় অনেক গ্রামের সাধারণ চিত্র। ভারতের অসংখ্য গ্রামে মানুষ বাস করে আসবাবপত্র ছাড়া, বদলানোর মতো অতিরিক্ত কাপড় ছাড়া, লজ্জা ঢাকার জন্য কোনো রকমে একটা ছেঁড়া কাপড় পরে থাকে।

আরো একটি অভিজ্ঞতার উল্লেখ করব। চাম্পারানে বাঁশ ও ঘাসের অভাব ছিল না। ভিটাহারবার স্কুল ঘরটিও এগুলো দিয়েই তৈরি। কেউ একজন, সম্ভবত প্রতিবেশি নীলকরের কোনো লোক হবে, একরাতে স্কুলঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। পুনরায় বাঁশ-ঘাসের আরেকটা ঘর তৈরি করা উচিত হবে না বলে ভাবা হলো। স্কুলটির দায়িত্বে ছিলেন শ্রীযুক্ত সোমান ও কস্তুরবাই। শ্রীযুক্ত সোমান সিদ্ধান্ত নিলেন একটি পাকাঘর তোলা হবে এবং তার সংক্রামক পরিশ্রমকে ধন্যবাদ, অনেক লোক তাকে সহযোগিতা করলেন এবং অল্পদিনেই একটি ইটের ঘর তৈরি হয়ে গেল। এখন এ ঘরটিকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার ভয় আর থাকল না।

এভাবে স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের স্কুল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও চিকিৎসা সেবা নিয়ে গ্রামবাসীদের আস্থা ও সম্মান অর্জন করল এবং তাদের ওপর ভালো রকমের প্রভাব তৈরি করে ফেলল।

কিন্তু আমাকে দুঃখের সাথে স্বীকার করতে হচ্ছে এ গঠনমূলক কাজগুলো স্থায়ীকরণের আশা পূরণ হয়নি। স্বেচ্ছাসেবকরা এসেছিলেন অল্প সময়ের জন্য, বাইরে থেকে আমি আর কোনো স্বেচ্ছাসেবক আনতে পারিনি, এবং বিহার থেকে স্বেচ্ছাশ্রমে স্থায়ীভাবে কাজ করার জন্য লোক পাওয়া যায়নি। চাম্পারানে আমার কাজ শেষ হবার সাথে সাথে ইতিমধ্যে জমে থাকা বাইরের কাজ আমাকে এখান থেকে টেনে নিয়ে গেল। তবে চাম্পারানে অল্প কয়েকমাসের কাজ এমন প্রভাব ফেলেছিল যে তা কোনো না কোনো আকারে আজো দৃশ্যমান হয়ে আছে।

www.pathagar.com

উনিশ

একজন গভর্নর যখন ভালো হয়

একদিকে যখন পূর্ব অধ্যায়সমূহে বর্ণিত প্রকারের সামাজিক কর্মকাণ্ড চলছিল অপরদিকে রায়তদের বক্তব্য রেকর্ড করার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছিল। হাজার হাজার লোকের বক্তব্য নেয়া হয়েছিল এবং সেগুলোর কোনোটাই অহেতুক নয়। বক্তব্য দেয়ার জন্য আগত রায়তদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা দেখে নীলকরদের ক্রোধ বেড়ে গেল এবং তারা আমার তদন্ত প্রতিরোধ করতে আকাশ-পাতাল তোলপাড় করে ফেলল।

বিহার গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আমি একদিন এ মর্মে একটা চিঠি পেলাম, "আপনার তদন্ত যথেষ্ট দীর্ঘায়িত হয়েছে। এখন কি আপনার তদন্তের ইতি টেনে বিহার ত্যাগ করা উচিত নয়?" চিঠির ভাষা ভদ্র হলেও এর অর্থ বুঝতে অসুবিধা হলো না।

পত্রের জবাবে আমি লিখলাম যে তদন্ত অনিবার্যভাবেই দীর্ঘায়িত হচ্ছে এবং তদন্তের ফলে যতদিন পর্যন্ত নির্যাতন থেকে জনগণের মুক্তি না আসবে ততদিন পর্যন্ত আমার বিহার ত্যাগের কোনো ইচ্ছে নেই। এটাও উল্লেখ করলাম যে গভর্নমেন্ট ইচ্ছে করলেই রায়তদের অভিযোগগুলো সত্য বিবেচনা করে প্রতিকার করার মাধ্যমে আমার তদন্তের ইতি টেনে দিতে পারে অথবা রায়তদের অভিযোগগুলোকে পর্যাপ্ত প্রমাণ বলে স্বীকার করে অবিলম্বে সরকারীভাবে তদন্ত অনুষ্ঠান করতে পারে।

স্যার এডওয়ার্ড গেইট, লেফটেন্যান্ট গভর্নর আমাকে তার সাথে দেখা করতে বললেন এবং তদন্ত অনুষ্ঠানের ইচ্ছে ব্যক্ত করে আমাকে তদন্ত কমিটির একজন সদস্য হিসেবে কাজ করতে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি অন্য সদস্যদের নাম সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম এবং আমার সহকর্মীদের সাথে আলোচনার পর কমিটিতে কাজ করতে রাজি হলাম, তবে শর্ত দিলাম যে তদন্ত চলাকালে আমাকে সহকর্মীদের সাথে আলোচনার সুযোগ দিতে হবে, গভর্নমেন্টকে স্বীকার করতে হবে যে কমিটির সদস্য হওয়া সত্ত্বেও রায়তদের পক্ষে আমি ওকালতি করতে পারব, এবং তদন্তের ফলাফল আমাকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে আমি স্বাধীনভাবে রায়তদের তাদের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ ও নির্দেশনা দিতে পারব।

স্যার এডওয়ার্ড গেইট শর্তগুলো সঠিক ও ন্যায্য বলে মেনে নিলেন এবং তদন্তের ঘোষণা দিলেন। প্রয়াত স্যার ফ্রাংক স্লাইকে কমিটির চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হলো।

কমিটি রায়তদের সাক্ষ্য-প্রমাণ পেলেন এবং সুপারিশ করলেন যে নীলকররা রায়তদের কাছ থেকে বেআইনীভাবে যে টাকা গ্রহণ করেছে বলে কমিটি প্রমাণ পেয়েছে ঐ টাকার একাংশ ফেরৎ দিতে হবে এবং তিনকাঠিয়া পদ্ধতি আইন করে বিলুপ্ত করতে হবে।

কমিটিকে দিয়ে সর্বসম্মত রিপোর্ট প্রদান এবং কমিটির সুপারিশ মতে ভূমিস্বত্ব বিল পাশ করানোর পিছনে স্যার এডওয়ার্ড গেইট এর বিরাট অবদান

www.pathagar.com

ছিল। তিনি দৃঢ় অবস্থান না নিলে এবং সর্ব প্রকার কৌশল অবলম্বন না করলে রিপোর্ট সর্বসম্মত হতো না এবং ভূমিস্বত্ব আইনও পাশ হতো না। নীলকররা অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল। রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও তারা বিলের লাগাতার রিরোধীতা করেছিল কিন্তু স্যার এডওয়ার্ড গেইট শেষ পর্যন্তও অটল ছিলেন এবং কমিটির সুপারিশ পুরোপুরি কার্যকর করেছিলেন।

এভাবে প্রায় শতবর্ষব্যাপী বিদ্যমান তিনকাঠিয়া পদ্ধতির বিলুপ্তি ঘটল এবং এর সাথে সাথেই নীলকরদের রাজত্বের অবসান হলো। চির নির্যাতিত রায়তরা এবারে নিজ পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পেল এবং নীলের দাগ কখনো ধুয়ে মুছে যাবে না এ অন্ধ বিশ্বাস ভেঙে পড়ল।

আমার ইচ্ছে ছিল কয়েক বছর ধরে গঠনমূলক কাজ চালিয়ে যাওয়া, আরো স্কুল প্রতিষ্ঠা করা এবং গ্রামের গভীরে আরো কার্যকরভাবে প্রবেশ করা। এর ভিত্তি রচিত হয়েছিল কিন্তু তা ঈশ্বরকে খুশী করতে পারেনি এবং আগের অনেকবারের মতোই এবারেও তিনি আমার পরিকল্পনা পূর্ণ হতে দেননি। ভাগ্যের লিখন ছিল অন্য রকম এবং আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল অন্য কাজ হাতে নিতে।

বিশ
শ্রমিকদের সংস্পর্শে

যখন আমি কমিটিতে আমার কাজ গুছিয়ে আনছিলাম সে সময়ে আমি শ্রীযুক্ত মোহনলাল পাণ্ডিয়া ও শংকরলাল পারিখের কাছ থেকে একটা পত্র পেলাম যাতে খেদা জেলায় ফসলের অজন্মার কথা বলা হয়েছিল এবং কৃষকরা আমার দিক নির্দেশনা চেয়েছিল, তাদের খাজনা দেবার সামর্থ্য ছিল না। সরেজমিনে অবস্থার তদন্ত না করে পরামর্শ দেয়ার ইচ্ছে, ক্ষমতা বা সাহস কোনোটাই আমার ছিল না।

একই সময়ে শ্রীমতি অনুসূয়াবাই এর কাছ থেকে আহমেদাবাদে শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে একটা পত্র এলো। মজুরী ছিল কম, শ্রমিকরা তা বাড়ানোর জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে যাচ্ছিল এবং আমার ইচ্ছে ছিল তাদেরকে নির্দেশনা দেবার। কিন্তু তুলনামূলকভাবে ছোট এ বিষয়টি এত দূরে থেকে পরিচালনার অবস্থা আমার ছিল না। সুতরাং আমি আহমেদাবাদ যাবার প্রথম ট্রেন ধরলাম। আমার আশা ছিল দুটি বিষয়ই নিষ্পত্তি করতে সমর্থ হব এবং চাম্পারানে শুরু করা গঠনমূলক কাজের তদারকী করতে আবার ফিরে আসব।

কিন্তু আমি যতটা আশা করেছিলাম তত দ্রুত সবকিছু হলো না এবং আমি চাম্পারানে ফিরে যেতে পারলাম না, যার ফলে স্কুলগুলো একটার পর একটা বন্ধ হয়ে গেল। আমি ও সহকর্মীরা শূন্যের ওপর অনেক ঘর নির্মাণ করেছিলাম যা তখনকার মতো ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

এসব পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষা ও স্যানিটেশন ছাড়া আরো একটি ছিল চাম্পারানে গো-রক্ষার কাজ। আমার ভ্রমণকালে দেখেছি যে গো-রক্ষা এবং হিন্দী

www.pathagar.com

প্রচার মারোয়াড়ীদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। বেত্তিয়াতে অবস্থানকালে এক মারোয়াড়ী বন্ধু আমাকে ধর্মশালায় আশ্রয় দিয়েছিল। সেখানকার অন্য মারয়োড়ীরা আমাকে তাদের গোশালার প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল। গো-রক্ষা সম্পর্কে তখন আমার সুনির্দিষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছিল এবং ঐকাজের ধারণা তখন যা ছিল আজো তাই আছে। আমার মতে গো-রক্ষার মধ্যে গো-প্রজনন, জাত উন্নয়ন, ষাড়ের প্রতি সদয় ব্যবহার, আদর্শ দুগ্ধ খামার স্থাপন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। মারোয়াড়ী বন্ধুরা এ কাজে পূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু আমি যেহেতু চাম্পারানে নিজে স্থায়ী হতে পারলাম না, তাই ঐ পরিকল্পনাও আর অগ্রসর হলো না।

বেত্তিয়ার সে গোশালা আজো আছে, কিন্তু তা আদর্শ দুগ্ধ খামারে উন্নীত হয়নি, চাম্পারানের বলদগুলোকে আজো সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ করানো হয় এবং তথাকথিত হিন্দুরা আজো নিষ্ঠুরভাবে নিরীহ প্রাণীদের প্রহার করে এবং তাদের ধর্মের অসম্মান করে।

এ কাজটা অসম্পূর্ণ রয়ে যাওয়া আমার জন্য সার্বক্ষণিক পরিতাপের বিষয় এবং যখনই আমি চাম্পারানে যাই এবং মারোয়াড়ী ও বিহারী বন্ধুদের মৃদু তিরস্কার শুনি তখনই হঠাৎ করে যেসব পরিকল্পনা বাদ দিতে হয়েছে সেগুলোর কথা মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

শিক্ষার কাজ অনেক স্থানেই কোনো না কোনোভাবে চলছে। কিন্তু গো-রক্ষার কাজ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, সুতরাং এর কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতিও হয়নি।

খেদা কৃষকদের বিষয় নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছে তার আগেই আমি আহমেদাবাদের মিল শ্রমিকদের বিষয়টি হাতে নিয়েছি।

আমি খুবই স্পর্শকাতর অবস্থায় পড়লাম। মিল শ্রমিকদের মামলা খুব জোরালো ছিল। শ্রীমতি অনুসূয়াবাইকে লড়তে হলো তার ভাই শ্রীযুক্ত অম্বালাল সরাভাই এর বিরুদ্ধে, যিনি এ দ্বন্দ্বে মিল মালিকদের পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাদের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বসুলভ এবং এর ফলে তাদের সাথে লড়াই করা আরো বেশি কঠিন হয়ে উঠল। আমি তাদের সাথে আলোচনা করলাম এবং অনুরোধ করলাম সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে কিন্তু তারা সালিশের নীতিমালা মানতে রাজি হলো না।

সুতরাং শ্রমিকদেরকে আমি ধর্মঘটের পরামর্শ দিতে বাধ্য হলাম। তার পূর্বে আমি তাদের ও তাদের নেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশলাম এবং তাদেরকে সফল ধর্মঘটের শর্তগুলো ব্যাখ্যা করে বোঝালাম—

১. কখনোই সহিংসতার আশ্রয় নেয়া যাবে না।
২. যারা স্বেচ্ছায় কাজ করতে চায় তাদেরকে কখনো লাঞ্ছিত করা যাবে না।
৩. কখনো ভিক্ষা নেয়া যাবে না, এবং
৪. ধর্মঘট যতদিনই চলুক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকতে হবে এবং ধর্মঘট চলাকালে অন্য কোনো সৎ উপায়ে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।

www.pathagar.com

ধর্মঘটের নেতারা শর্তগুলো বুঝল ও মেনে নিল, আর শ্রমিকরা একটি সাধারণ সভায় শপথ নিল তাদের দাবি না মানা পর্যন্ত অথবা মিল মালিকরা এ বিরোধের সালিশ নিষ্পত্তিতে রাজি না হওয়া পর্যন্ত তারা কাজে ফিরে যাবে না।

এ ধর্মঘটের সময়েই আমি শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল ও শংকরলাল বংকর এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলাম। শ্রীমতি অনুসূয়া বাইকে আমি এর আগে থেকেই চিনতাম।

সবরমতি নদীর তীরে একটি গাছের নিচে প্রতিদিন ধর্মঘটীদের সাথে আমাদের সভা হতো। তারা হাজারে হাজারে সভায় যোগদান করত এবং আমি আমার বক্তৃতায় তাদের শপথের কথা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা ও আত্ম-সম্মান বজায় রাখার কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতাম। তারা প্রতিদিন শহরের রাস্তায় "এক টেক" (প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো) লেখা ব্যানার হাতে শান্তিপূর্ণ মিছিল করত।

ধর্মঘট একুশ দিন ধরে চলল। ধর্মঘট চলাকালে আমি মিল মালিকদের সাথে মাঝে মাঝে আলোচনা করে শ্রমিকদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে তাদেরকে অনুরোধ করলাম। তারা বললেন, "আমরাও শপথ নিয়েছি। আমাদের সাথে শ্রমিকদের সম্পর্ক হলো পিতা-পুত্রের। আমাদের মধ্যে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি আমরা সহ্য করব কেন? এখানে সালিসের স্থান কোথায়?"

একুশ
আশ্রমে ক্ষণিক দৃষ্টিপাত

শ্রমিক বিরোধের অগ্রগতি বর্ণনার আগে আশ্রমের দিকে ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করা অত্যাবশ্যক। যতক্ষণ আমি চাম্পারানে ছিলাম আশ্রমের কথা আমার মন থেকে কখনো দূর হয়নি এবং মাঝে মাঝে আমি ঝটিকা সফর করে এসেছি।

সে সময়ে আশ্রমটা ছিল কোচরাবে, আহমেদাবাদের পাশে একটা ছোট গ্রাম। এ গ্রামে প্লেগ দেখা দিল এবং আমি আশ্রমের ছেলেদের নিরাপত্তার জন্য স্পষ্ট হুমকি দেখতে পেলাম। আশ্রমের দেয়ালের মধ্যে আমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নীতি যত সতর্কভাবেই পালন করি না কেন পারিপার্শ্বিক অপরিচ্ছন্নতার প্রভাব থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখা অসম্ভব। আমরা তখন পরিচ্ছন্নতার নীতি পালনে কোচরাবের লোকদেরকে আমাদের সমপর্যায়ে আনতে পারছিলাম না, আর অন্য কোনোভাবেও গ্রামবাসীদের সেবা করতে পারছিলাম না।

আমাদের আদর্শ ছিল শহর ও গ্রাম থেকে নিরাপদ দূরত্বে, আবার উভয়ের থেকে যুক্তিসঙ্গত দূরত্বে আশ্রম স্থাপন করা। এবং আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে কোনো একদিন আমাদের নিজের জমিতে তা স্থাপিত হবে।

আমার মনে হলো কোচরাব ছেড়ে যাবার জন্য প্লেগ একটি যথার্থ সতর্কবার্তা। শ্রীযুক্ত পাঞ্জাভাই হিরাচান্দ, আহমেদাবাদের একজন ব্যবসায়ী, আশ্রমের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলেন এবং অনেক বিষয়ে বিশুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ মনোভাব নিয়ে আমাদের সেবা করতেন। আহমেদাবাদ সম্পর্কে তার ব্যাপক

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতা ছিল এবং তিনি স্বেচ্ছায় আমাদেরকে উপযুক্ত জমি কিনে দিতে চাইলেন। আমি তার সাথে জমির খোঁজে কোচরাবের উত্তর ও দক্ষিণে ঘুরলাম এবং তাকে পরামর্শ দিলাম তিন থেকে চার মাইল উত্তরে একখণ্ড জমি খুঁজে বের করতে। তিনি আশ্রমের বর্তমান স্থানটি খুঁজে বের করেছিলেন। এর অবস্থান সবরমতি কেন্দ্রীয় জেলের নিকটবর্তী হওয়ায় আমার জন্য বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। যেহেতু সত্যাগ্রহীদের সাধারণ পরিণতি জেলে যাওয়া বলে ধরে নেয়া হতো তাই আমি এ স্থানটিকে পছন্দ করেছিলাম। এবং আমি জানতাম যে জেলখানার জন্য নির্বাচিত স্থানের চারপাশ সাধারণত পরিষ্কার থাকে।

প্রায় আটদিনে জমিটা কেনা হলো। জমিতে কোনো বিল্ডিং বা গাছপালা ছিল না। কিন্তু এর বড় সুবিধা ছিল নদী তীরে অবস্থান ও নির্জনতা। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম স্থায়ী ঘর নির্মাণের আগে পর্যন্ত রান্নাঘরের জন্য একটি টিনশেড নির্মাণ ও নিজেরা তাবুতে থাকার মধ্য দিয়ে এখানে বসবাস শুরু করব।

আশ্রম ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকল। পুরুষ, নারী ও শিশু মিলে আমরা ছিলাম চল্লিশজন এবং আমাদের এক হাঁড়িতে রান্না হতো। স্থানান্তরের চিন্তাটা ছিল পুরোপুরি আমার, কিন্তু এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব ছিল বরাবরের মতোই মগনলালের ওপর।

স্থায়ী বাসগৃহের ব্যবস্থা করার আগে পর্যন্ত আমাদের বিরাট অসুবিধা ছিল। বৃষ্টির দিন আসন্ন ছিল এবং রসদপত্র সংগ্রহ করে আনতে হতো চার মাইল দূরের শহর থেকে। জমিটা পতিত জমি ছিল বিধায় এখানে সাপের উৎপাত ছিল এবং ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে এরকম অবস্থায় বসবাস করা কম বিপদের ব্যাপার ছিল না। সাধারণ নিয়ম ছিল যে সাপ মারা যাবে না, যদিও আমি স্বীকার করছি যে আমরা কেউই তখন সাপের ভয় থেকে মুক্ত হতে পারিনি, আর এখনো মুক্ত নই।

বিষাক্ত সাপ না মারার নীতি অনুসরণ করা হতো প্রধানত ফিনিক্স, টলস্টয় ফার্ম ও সবরমতিতে। এগুলোর প্রতিটি স্থানে পতিত জায়গায় আমাদের বসতি স্থাপন করতে হয়েছে। আমাদের অবশ্য সাপের কামড়ে কোনো জীবনহানির ঘটনা ঘটেনি। বিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমি দেখতে পাই এসব পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের দয়ার হাত আমাদের প্রতি প্রসারিত রয়েছে। কেউ যেন এমনটা বলে অহেতুক আপত্তি না তোলেন যে ঈশ্বর কখনো পক্ষপাতিত্ব করেন না এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যাপার নিয়ে তাঁর মাথা ঘামানোর সময় নেই। এ ব্যাপারে সত্য প্রকাশের অন্য কোনো ভাষা আমার জানা নেই যা দিয়ে আমার এসব অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে পারি। মানুষের ভাষা ঈশ্বরের কর্ম পদ্ধতির অসম্পূর্ণ বর্ণনা দিতে পারে মাত্র। ঈশ্বরের কর্মধারা যে অবর্ণনীয় ও অচিন্তনীয় এ সত্য সম্পর্কে আমি সচেতন। কিন্তু নশ্বর মানুষ যদি তার বর্ণনা দিতে সাহসী হয় তাহলে তার নিজের ভাষাহীন অভিব্যক্তির চাইতে ভালো কোনো মাধ্যম আর নেই। এটা বিশ্বাস করা যদি কুসংস্কার হয় যে পঁচিশ বছর যাবত বিষাক্ত সাপ না মারার নীতি মেনে চলা

www.pathagar.com

সত্ত্বেও ক্ষতির হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকা কোনো দৈব-দুর্ঘটনা নয়, বরং তা ঈশ্বরের অনুগ্রহ, তাহলে সে কুসংস্কারকেই আমি সাদরে লালন করব।

আহমেদাবাদ মিল শ্রমিকদের ধর্মঘটকালে আশ্রমে তাঁত ঘরের ভিত্তি স্থাপিত হচ্ছিল। কারণ তখন আশ্রমের প্রধান কর্মকাণ্ড ছিল তাঁতে কাপড় বুনন। সুতা কাটা তখনো আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

বাইশ
উপোষ

প্রথম দু'সপ্তাহ ধরে মিল শ্রমিকরা বিরাট সাহস ও আত্ম-সংযম প্রদর্শন করল এবং প্রতিদিন বিরাট বিরাট সভা করল। এসব সভায় আমি তাদেরকে তাদের শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিতাম এবং তারা চীৎকার করে আমাকে আশ্বাস দিত যে তারা মরে যাবে তবু কথার বরখেলাপ করবে না।

কিন্তু শেষের দিকে তারা নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল। মানুষের শারীরিক দুর্বলতা যেমন তার খিটখিটে মেজাজের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, ধর্মঘট দুর্বল হয়ে পড়ার সাথে সাথে ধর্মঘটে যোগ না দেয়া শ্রমিকদের প্রতি তাদের মনোভাব আরো বেশি বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠল এবং আমার ভয় হতে লাগল যে তারা গুণ্ডামি শুরু করে দিতে পারে। প্রতিদিন তাদের সভায় উপস্থিতি ক্রমান্বয়ে কমতে থাকল এবং যারা সভায় যোগদান করত তাদের চেহারায় নৈরাশ্য ও হতাশার স্পষ্ট ছাপ দেখা যেত। অবশেষে আমার কাছে খবর এলো যে ধর্মঘটীরা ধর্মঘট ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেছে। আমি ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম এবং উত্তেজিতভাবে চিন্তা করতে থাকলাম এ পরিস্থিতিতে আমার কি করা উচিত। দক্ষিণ আফ্রিকাতে বিরাট ধর্মঘটের অভিজ্ঞতা আমার ছিল কিন্তু, এখানে আমি যে পরিস্থিতির সম্মুখীন তা ভিন্ন ধরনের। মিল শ্রমিকরা আমার পরামর্শেই শপথ নিয়েছে। দিনের পর দিন আমার সামনে তারা সে শপথের পুনরাবৃত্তি করেছে এবং এখন তারা এর থেকে পিছু হটে যেতে পারে, এ ধারণাই আমি করতে পারছি না। আমার এ বিশ্বাসের পেছনে কারণ কি? এটা কি গর্ব, না কি শ্রমিকদের প্রতি আমার ভালোবাসা, না কি সত্যের প্রতি আমার প্রবল অনুরাগ? কে জানে কোনটা!

একদিন সকালে, আমি তখনো কি করব তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না এবং অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিলাম, শ্রমিকদের সভায় আমি আলোর রেখা দেখতে পেলাম। অনাহূত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথাগুলো আমার ঠোঁটে চলে এলো এবং আমি ঘোষণা করলাম, "একটি সন্তোষজনক সমাধানে না পৌঁছানো পর্যন্ত, অথবা শ্রমিকরা মিলের কাজ একেবারে ছেড়ে না দেয়া পর্যন্ত, প্রতিবাদ ও ধর্মঘট অব্যাহত না রাখলে আমি অন্ন গ্রহণ করব না।"

শ্রমিকরা যেন বজ্রাহত হলো। অনুসূয়াবেনের গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল। শ্রমিকরা গর্জে উঠল, "না, আপনি নন, আমরা অনশন করব। আপনাকে অনশন করতে দেয়া অন্যায়ের কাজ হবে। দয়া করে আমাদের ভুল ক্ষমা করুন, এখন থেকে আমরা বিশ্বস্ত থাকব এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের শপথ ভঙ্গ করব না।"

www.pathagar.com

আমি জবাব দিলাম, "তোমাদের উপোষ করার প্রয়োজন নেই। তোমরা তোমাদের প্রতিজ্ঞা পালন করলেই যথেষ্ট হবে। তোমরা জান, আমাদের কোনো তহবিল নেই এবং আমরা জনগণের দানের টাকায় বেঁচে থেকে ধর্মঘট চালিয়ে যেতে চাই না। সুতরাং তোমাদের উচিত বেঁচে থাকার জন্য অন্য কোনো উপায়ে খেটে যৎসামান্য উপার্জনের ব্যবস্থা করা যাতে তোমরা চিন্তামুক্ত হতে পার, ধর্মঘট যত দিনই চলুক ধর্মঘটের নিষ্পত্তি হওয়ার পরেই কেবল আমার উপোষ ভঙ্গ করব।"

ইতিমধ্যে বল্লভভাই মিউনিসিপ্যালটিতে ধর্মঘটীদের জন্য কাজ পেতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেখানে সাফল্যের আশা দেখা গেল না। মগনলাল গান্ধী পরামর্শ দিল যে যেহেতু আমাদের আশ্রমের উইভিং স্কুলের ভিত বালি ভরাট করতে হবে সেখানে বেশ কয়েকজনের কাজের ব্যবস্থা করা যাবে। শ্রমিকরা এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানাল। অনুসূয়াবেন বালিসহ একটি ঝুড়ি মাথায় নিয়ে নেতৃত্ব দিলেন এবং তার পিছে পিছে বালির ঝুড়ি মাথায় অগণিত শ্রমিকের অনন্ত স্রোত নদী গর্ভ থেকে উঠে আসতে লাগল। সেটা দেখার মতো একটা দৃশ্য ছিল। শ্রমিকরা নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত বোধ করল এবং তাদের পাওনা মজুরী মিটিয়ে দেয়ার কাজ বেশ কঠিন হয়ে উঠল।

আমার উপোসে গুরুতর ত্রুটি ছিল। কারণ, ইতিপূর্বে এক অধ্যায়ে যেমন উল্লেখ করেছি, মিল মালিকদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং আমার উপোষ তাদের সিদ্ধান্তের ওপরও প্রভাব ফেলতে বাধ্য। আমি জানি একজন সত্যাগ্রহী হিসেবে আমি তাদের বিরুদ্ধে উপোষ করতে পারি না বরং তাদেরকে মিল শ্রমিকদের ধর্মঘট দ্বারা প্রভাবিত হতে ছেড়ে দেয়া উচিত। আমার অনশন মিল মালিকদের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে নয় বরং মিল শ্রমিকদের ব্যর্থতার বিরুদ্ধে, যে ব্যর্থতার দায় তাদের প্রতিনিধি হিসেবে আমার ওপরও বর্তায়। মিল মালিকদেরকে আমি অনুরোধ করতে পারি, তাদের বিরুদ্ধে অনশন করা জবরদস্তির পর্যায়ে পড়বে। এতদসত্ত্বেও আমার অনশন তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করবেই এবং বাস্তবে তাই হয়েছিল, আমি সেটা অনুভব করেছিলাম কিন্তু তা রোধ করার কোনো উপায় ছিল না। অনশন করা যে আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা আমার কাছে পরিষ্কার।

আমি মিল মালিকদেরকে স্বস্তি দেয়ার চেষ্টা করলাম। তাদেরকে বললাম, "আপনাদের অবস্থান থেকে পিছিয়ে যাবার বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন নেই।" কিন্তু তারা আমার কথা অসৌজন্যের সাথে গ্রহণ করল, এমনকি তীক্ষ্ণ স্পর্শকাতর বিদ্রূপ আমার প্রতি ছুঁড়ে দিল, যেহেতু সে অধিকার তাদের পুরোমাত্রায় ছিল।

ধর্মঘটের প্রতি মিল মালিকদের অনড় মনোভাবের পেছনে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন শেঠ অম্বালাল। তার আশ্চর্য রকমের দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি ও স্বচ্ছ আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণও আনন্দের ব্যাপার ছিল। তাই আমার অনশনের ফলে বিরোধী পক্ষের প্রধান হিসেবে তার ওপর যে চাপ

www.pathagar.com

পড়েছিল তাতে আমার মনে কষ্ট হচ্ছিল। তদুপরি তার স্ত্রী সরলা দেবী, আমার সাথে যার সহোদর বোনের মতো স্নেহের সম্পর্ক, আমার অনশনের ফলে তার মানসিক যন্ত্রণা আমার কাছে অসহনীয় ছিল। অনুসূয়াবেন ও অন্যান্য বন্ধুরা এবং শ্রমিকদের অনেকেই আমার সাথে প্রথম দিন উপোষ করেছিল এবং অনশন আরো চালিয়ে যাওয়া থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে আমাকে কিছুটা বেগ পেতে হয়েছিল।

আমার উপোসের ফলে চারদিকে একটা সদিচ্ছার পরিবেশ তৈরি হলো। এটা মিল মালিকদের হৃদয় স্পর্শ করল এবং তারা বিরোধ নিস্পত্তির একটা উপায় বের করতে তৎপর হলেন। অনুসূয়াবেনের বাড়িটা তাদের আলোচনার স্থান হয়ে উঠল। শ্রীযুক্ত আনন্দশংকর ধ্রুব হস্তক্ষেপ করলেন এবং তাকেই শেষে সালিশকারী নিয়োগ করা হলো এবং আমি মাত্র তিন দিন অনশন করার পর ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হলো। ঘটনাটি স্মরণীয় করে রাখতে মিল মালিকরা শ্রমিকদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করলেন এবং এভাবে ২১ দিন ধর্মঘট চলার পরে বিষয়টি নিস্পত্তি হয়েছিল।

ধর্মঘটের নিস্পত্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় মিল মালিকগণ ও কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। এ উপলক্ষ্যে কমিশনার মিল শ্রমিকদেরকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা হলো, "আপনাদের সর্বদা মি. গান্ধীর পরামর্শ মতো কাজ করা উচিত।" এসব ঘটনার পরপরই এই ভদ্রলোকের সাথে আমাকে বিরোধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে নিয়েছিল এবং সেই সাথে তিনিও বদলে গিয়েছিলেন। তিনি তখন আমার পরামর্শ না শোনার জন্য খেদার পাটীদারদের সতর্ক করতে শুরু করেছিলেন।

এ অধ্যায়টি শেষ করার আগে একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। ঘটনাটি একই সঙ্গে হাস্যকর ও দুঃখজনক। এটি ঘটেছিল মিষ্টি বিতরণ নিয়ে। মিল-মালিকরা বিপুল পরিমাণ মিষ্টির অর্ডার দিয়েছিলেন, এবং হাজার হাজার শ্রমিকের মধ্যে তা বিতরণ করা একটি বড় সমস্যা ছিল। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, যে গাছের নিচে শপথ নেয়া হয়েছিল সেখানে খোলা জায়গায় এই মিষ্টি বিতরণের সবচাইতে উপযুক্ত স্থান, কারণ অন্যকোনো স্থানে এত লোকের একত্রিত হওয়া খুবই অসুবিধাজনক।

আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে দীর্ঘ ২১ দিন ধরে যে লোকগুলো কঠোর শৃঙ্খলা মেনে চলেছে, মিষ্টি বিতরণের সময় কোনো কষ্ট ছাড়াই তারা সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে এবং অধৈর্য হয়ে কাড়াকাড়ি করবেনা। কিন্তু যখন সময় এলো তখন শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে বিতরণের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলো। বিতরণ শুরুর এক দু'মিনিটের মধ্যেই বার বার লাইন ভেঙে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে থাকল। মিল-শ্রমিকদের নেতারা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন কিন্তু সবই বৃথা। শেষে বিশৃঙ্খলা, ঠেলাঠেলি ও কাড়াকাড়ি এতটাই বেড়ে গেল যে বিপুল পরিমাণ মিষ্টি পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে নষ্ট হলো এবং খোলা স্থানে বিতরণের চেষ্টা শেষ

www.pathagar.com

পর্যন্ত বাদ দেয়া হলো। অনেক কষ্টে অবশিষ্ট মিষ্টি আমরা মির্জাপুরে শেঠ অম্বালালের বাংলোতে নিতে সমর্থ হলাম। ঐ বাংলোর আঙিনার ভেতরে পরের দিন সুষ্ঠুভাবে মিষ্টি বিতরণ করা হলো।

এ ঘটনার হাস্যকর দিকটা তো স্পষ্ট দৃশ্যমান, কিন্তু বিষাদের দিকটাও উল্লেখ করার মতো। পরবর্তী তদন্তে এ সত্য বেরিয়ে এলো যে "এক টেক" গাছের নিচে মিষ্টি বিতরণ করা হবে এ সংবাদ পেয়ে আহমেদাবাদের বিপুল সংখ্যক ভিক্ষুক সেখানে উপস্থিত হয়েছিল এবং মিষ্টির জন্য তাদের ক্ষুধার্ত থাবাই এরকম বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল।

আমাদের দেশে দরিদ্র ও অনাহারের নিষ্পেষণ এতই বেশি যে প্রতি বছরে তা আরো বেশি বেশি লোককে ভিক্ষুকের কাতারে ঠেলে দেয়; খাবারের জন্য তাদের বেপরোয়া সংগ্রাম তাদের ভদ্রতা ও আত্মসম্মানের অনুভূতি নষ্ট করে দেয়। আর আমাদের মানবপ্রেমী লোকেরা তাদেরকে কাজের ব্যবস্থা করে দেয়া এবং তাদের খেটে খাওয়ার ওপর গুরুত্ব দেয়ার বদলে তাদেরকে ভিক্ষা দেন।

তেইশ
খেদায় সত্যাগ্রহ

আমার ভাগ্যে দম নেয়ার সময় ছিল না। আহমেদাবাদে মিল শ্রমিকদের ধর্মঘট শেষ হতে না হতেই আমাকে আবার খেদার সত্যাগ্রহ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হলো।

খেদা জেলায় ফসলের ব্যাপক অজন্মার কারণে দুর্ভিক্ষ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং খেদার পাটীদাররা এ বছরের খাজনা ধার্য করা স্থগিত করানোর বিষয় চিন্তা-ভাবনা করছিলেন।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঠাকুর ইতিমধ্যেই বিষয়টি তদন্ত করে সেখানকার পরিস্থিতির ওপর রিপোর্ট পেশ এবং আমি কৃষকদেরকে সুস্পষ্ট পরামর্শ দেয়ার আগেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে কমিশনারের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। শ্রীযুক্ত মোহনলাল পাণ্ডিয়া ও শংকরলাল পারিখ নিজেদেরকে এ সংগ্রামে জড়িয়ে ফেলেছিলেন এবং শ্রীযুক্ত বিথাল ভাই প্যাটেল ও প্রয়াত স্যার গোকুলদাস কাহানদাস পারেখ এর মাধ্যমে বোম্বে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এ ব্যাপারে একাধিক প্রতিনিধিদল গভর্নরের সাথে দেখাও করেছে।

এ সময়টাতে আমি গুজরাট সভার প্রেসিডেন্ট ছিলাম। এ সভার পক্ষ থেকে গভর্নমেন্ট এর বরাবরে আবেদন ও টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল এবং আমাদেরকে ধৈর্যসহকারে কমিশনারের অপমান ও হুমকি সহ্য করতে হয়েছিল। এই ঘটনায় কর্মকর্তাদের আচরণ এতই হাস্যকর ও মর্যাদাহীন ছিল যে বর্তমান সময়ে তা প্রায় অবিশ্বাস্য।

www.pathagar.com

কৃষকদের দাবি ছিল দিবালোকের মতো স্পষ্ট এবং এত ন্যায়সঙ্গত যে তা জোরালো যুক্তিপূর্ণ মামলা গ্রহণের উপযুক্ত। ভূমি রাজস্ব আইনের (ল্যান্ড রেভিনিউ রুল) অধীনে ফসল চার আনা বা তার কম হলে কৃষকরা ঐ বছরের খাজনা সম্পূর্ণ মওকুফের দাবি করতে পারতেন। সরকারী হিসেবে ফসল চার আনার বেশি ধরা হয়েছে। অপরদিকে কৃষকদের দাবি ছিল যে চার আনার কম হয়েছে। কিন্তু গভর্নমেন্ট কোনো কথা শুনতে রাজি নয়, বরং জনগণের পক্ষ হতে সালিসের দাবিকে রাজদ্রোহীতা বলে ধরে নিল। অবশেষে সকল আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হওয়ার পর সহকর্মীদের মতামত নিয়ে আমি পাটীদারদেরকে সত্যাগ্রহের আশ্রয় নিতে পরামর্শ দিলাম।

খেদার স্বেচ্ছাসেবকরা ছাড়াও এ সংগ্রামে আমার প্রধান সহকর্মীরা ছিলেন, শ্রীযুক্ত বল্লভভাই প্যাটেল, শংকরলাল বংকর, শ্রীমতি অনুসূয়াবেন, ইন্দুলাল ইয়াগনিক, মহাদেব দেশাই এবং আরো অনেকে। এ সংগ্রামে যোগদান করার ফলে বল্লভভাইকে বারের চমৎকার ও ক্রমবর্ধমান প্রাকটিস বন্ধ রাখতে হয়েছিল, যা তিনি বাস্তবে আর কখনো শুরু করতে পারেননি।

আমাদের সকলের স্থান সংকুলান হতে পারে এরকম আর কোনো স্থান না পেয়ে আমরা নড়িয়াড অনাথাশ্রমে আমাদের সদর দপ্তর স্থাপন করলাম।

সত্যাগ্রহীরা নিম্নোক্ত শপথনামায় স্বাক্ষর করলেন :

"আমাদের গ্রামের শস্য উৎপাদন চার আনার কম হয়েছে জেনে আমরা গভর্নমেন্টকে পরবর্তী বছর পর্যন্ত খাজনা আদায় স্থগিত রাখতে অনুরোধ করেছিলাম কিন্তু গভর্নমেন্ট আমাদের আবেদনে রাজি হননি। সুতরাং আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ এতদ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করছি যে আমরা নিজে থেকে গভর্নমেন্টকে পূর্ণ খাজনা বা এ বছরের অবশিষ্ট খাজনা পরিশোধ করব না। গভর্নমেন্ট উপযুক্ত বিবেচনায় যে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেন এবং খাজনা না দেয়ার শাস্তি আমরা সানন্দে ভোগ করব। স্বেচ্ছায় খাজনা প্রদান করে আমাদের দাবি মিথ্যা প্রমাণ করা অথবা সমঝোতার মাধ্যমে আত্মসম্মান খোয়ানোর চাইতে আমাদের জমি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়াই ভালো। তবে গভর্নমেন্ট যদি সমগ্র জেলায় দ্বিতীয় কিস্তির খাজনা আদায় স্থগিত করেন তাহলে আমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে তারা পূর্ণ খাজনা বা অবশিষ্ট খাজনা পরিশোধ করব। যারা খাজনা দিতে সমর্থ তারাও দেয়া বন্ধ রাখবে কারণ তারা খাজনা দিলে দরিদ্র রায়তরা ভীত হয়ে তাদের ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে দেবে অথবা ঋণ করবে এবং নিজেদের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি করবে। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি যে, যারা খাজনা প্রদানে সমর্থ দরিদ্রদের স্বার্থে তারাও খাজনা প্রদান স্থগিত রাখব।"

এ সংগ্রামের বিবরণ আমি আর বেশি দীর্ঘায়িত করতে পারছি না। সুতরাং এ সংগ্রামের অনেক ঘটনা থেকে কিছু মধুর স্মৃতির উল্লেখ করব। এ গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামের বিষয়ে যারা পূর্ণাঙ্গ ও গভীর অধ্যয়ন করতে চান তারা পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য তথ্য সমৃদ্ধ খেদা জেলার কাথলালের শ্রীযুক্ত শংকরলাল পারিখ এর লেখা "খেদা সত্যাগ্রহের ইতিহাস" বইটি পড়তে পারেন।

www.pathagar.com

চব্বিশ

পিঁয়াজ চোর

চাম্পারান ভারতের সুদূর এক প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় এবং সংবাদপত্রে সেখানকার সংবাদ প্রচার করতে না দেয়ায় এখানে বাইরের লোক তেমন আসেনি। কিন্তু খেদার অভিযানে তা হয়নি, এখানকার প্রতিদিনের ঘটনাবলী সংবাদপত্রের রিপোর্টে আসত।

এ লড়াই-এ গুজরাটীরা গভীরভাবে আগ্রহী ছিল, কারণ এটা ছিল তাদের জন্য নতুন এক পরীক্ষা। দাবি আদায়ে সাফল্যের জন্য তারা তাদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতেও প্রস্তুত ছিল। শুধুমাত্র অর্থ ব্যয় করলেই যে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করা যায় না তাদের জন্য এটা বুঝা সহজ ছিল না। সত্যাগ্রহের জন্য অর্থের প্রয়োজন সবচেয়ে কম। আমার আপত্তি সত্ত্বেও বোম্বের ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ পাঠালেন এবং অভিযান শেষে আমাদের হাতে কিছু টাকা অবশিষ্ট রইল।

সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকদেরকে একই সাথে সরল জীবন যাপনের শিক্ষাও নিতে হলো। আমি বলছি না যে তারা এটা পুরোপুরি আত্মস্থ করেছে, তবে তাদের জীবনযাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে পাল্টে ফেলেছে।

পাটীদার কৃষকদের বেলাতেও এ লড়াই ছিল সম্পূর্ণ নতুন বিষয়। সুতরাং আমাদেরকে সত্যাগ্রহের নীতিমালা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর জন্য গ্রাম-গ্রামান্তরে যেতে হয়েছে।

এক্ষেত্রে, প্রধান বিষয় ছিল গ্রামবাসীদের ভয় ভীতি দূর করার জন্য এটা বোঝানো যে সরকারী কর্মকর্তারা প্রভু নন, বরং জনগণের চাকর, কারণ জনগণের ট্যাক্স এর টাকাতেই তাদের বেতন হয়। অতঃপর নির্ভীকতার সাথে সভ্য আচরণের সমন্বয় ঘটানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। একবার যখন তারা ভয়-ভীতি ঝেড়ে ফেলেছে তখন ইতিপূর্বে তারা যে অপমানের শিকার হয়েছে তার প্রতিদান ঠেকানো যায় কিভাবে? তা সত্ত্বেও যদি তারা অসভ্যতার আশ্রয় নেয় তাহলে তাদের সত্যাগ্রহ পণ্ড হয়ে যাবে, একপাত্র দুধে এক ফোঁটা আর্সেনিক মিশলে যেমনটা হয়। পরবর্তীতে বুঝলাম যে আমি যতটা আশা করেছিলাম তারা সভ্যতার শিক্ষা তার চেয়ে অনেক কম পেয়েছিল। অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছি যে সত্যাগ্রহের সবচেয়ে কঠিন অংশ হলো সভ্য আচরণ। সভ্যতা বলতে এখানে শুধুমাত্র কোনো বিশেষ অবস্থার জন্য রপ্ত করা বাহ্যিক ভদ্র ব্যবহার বোঝায় না, বরং তা সহজাত ভদ্রতা এবং মানুষের ভালো করার সদিচ্ছাকে বোঝায়, এমন কি সে বিপক্ষের হলেও। সত্যাগ্রহীর প্রতিটি কাজের মধ্যে এর প্রকাশ থাকা উচিত।

যদিও প্রথম পর্যায়ে মানুষ যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছিল, গভর্নমেন্টকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে আগ্রহী বলে মনে হয়নি। কিন্তু জনগণের দৃঢ় অবস্থানের যখন কোনো নড়চড় হলো না তখন গভর্নমেন্ট বল প্রয়োগ করতে শুরু করল। ক্রোককারী কর্মকর্তারা মানুষের গবাদিপশু বিক্রি করে দিল এবং হাতের নাগালে যা কিছু পেল সব জব্দ করে নিয়ে গেল। জরিমানার নোটিশ দেয়া হলো এবং

www.pathagar.com

কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষেতের ফসল ক্রোক করা হলো। এতে কৃষকদের মনোবল ভেঙে পড়ল এবং তাদের কেউ কেউ খাজনা পরিশোধ করল, অন্যেরা তাদের অস্থাবর সম্পত্তি কর্মকর্তাদের সামনে এগিয়ে দিল যাতে সেগুলো ক্রোক করে পাওনা আদায় করা হয়। আবার কিছু লোক সর্বশেষ তিক্ত পরিণতি পর্যন্ত লড়াই করার প্রস্তুতি নিল।

এসব ঘটনা যখন ঘটেছিল শ্রীযুক্ত শংকরলালের একজন প্রজা তার জমির খাজনা পরিশোধ করল। এতে একটা নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। যে জমির খাজনা পরিশোধ করা হয়েছে তা দাতব্য কাজের জন্য দান করে দেয়ার মাধ্যমে শ্রীযুক্ত শংকরলাল পারিখ তার প্রজার ভুল সংশোধন করলেন। তিনি এভাবে তার সম্মান রক্ষা করলেন এবং অন্যদের জন্যও দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

যারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল তাদের মনে শক্তি যোগানোর জন্য আমি লোকদেরকে উপদেশ দিলাম, এবং শ্রীযুক্ত মোহনলাল পাণ্ডিয়ার নেতৃত্বে যেসব ক্ষেতের ফসল অন্যায়ভাবে ক্রোক করা হয়েছিল সেসব ক্ষেতের চাষ করা ফসল পিঁয়াজ তুলে নিতে বললাম। আমি এটাকে নাগরিক আইন অমান্য বলে মনে করিনি, আর যদি তা হয়েও থাকে, আমি বললাম যে এভাবে ক্ষেতের উৎপাদিত ফসল ক্রোক করা যতই আইন সম্মতভাবে করা হোক না কেন, নৈতিকভাবে অন্যায় এবং তা লুটপাট ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং ক্রোকের আদেশ থাকা সত্ত্বেও জনগণের কর্তব্য হলো তাদের পিঁয়াজ নিয়ে যাওয়া। এ ঘটনায় জনগণের জন্য জরিমানা দেয়া বা কারাবরণ করার শিক্ষা গ্রহণের ভালো একটা সুযোগ ছিল যা এ ধরনের আইন অমান্যের স্বাভাবিক পরিণতি। শ্রীযুক্ত মোহনলাল পাণ্ডিয়া মনেপ্রাণে সেটাই চাইছিলেন। তার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে সত্যাগ্রহের নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করার জন্য কারাবরণ বা অন্য কোনো কষ্ট ভোগ ছাড়া যেন এ সংগ্রাম শেষ না হয়। সুতরাং তিনি স্বেচ্ছায় ক্ষেতের ফসল পিঁয়াজ তুলে নেয়ার কাজে নেতৃত্ব দিলেন, সাত-আটজন সহযোগী একাজে তার সাথে যোগ দিলেন।

গভর্নমেন্টের পক্ষে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া সম্ভব ছিল না। শ্রীযুক্ত মোহনলাল ও তার সঙ্গীদের গ্রেফতার জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে চাঙ্গা করল। জেলের ভয় যখন থাকে না, তখন দমন-পীড়ন জনগণকে আরো সাহসী করে তোলে। শুনানীর দিনে দলে দলে লোক আদালত ভবন অবরোধ করল। পাণ্ডিয়া ও তার সহযোগীদেরকে অভিযুক্ত করে স্বল্প মেয়াদের জেল দেয়া হলো। আমার মতে তাদেরকে শাস্তি দেয়া অন্যায় হয়েছে, কারণ পিঁয়াজ ফসল ক্ষেত হতে অপসারণ পেনাল কোডের "চুরি"র সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। কিন্তু কোনো আপীল করা হলো না, কারণ আমরা আইন আদালত বর্জনের নীতি গ্রহণ করেছিলাম।

জনতার মিছিল সাজাপ্রাপ্তদেরকে জেল পর্যন্ত এগিয়ে দিল, এবং সেদিন শ্রীযুক্ত মোহনলাল পাণ্ডিয়া জনগণের কাছ থেকে সম্মানসূচক খেতাব পেলেন, "ডুংলিচোর" (পিঁয়াজ চোর) যা তিনি আজো সানন্দে উপভোগ করেন।

খেদা সত্যাগ্রহের সমাপ্তি টানব পরবর্তী অধ্যায়ে।

www.pathagar.com

পঁচিশ

খেদা সত্যাগ্রহের সমাপ্তি

খেদার সংগ্রাম অপ্রত্যাশিতভাবে শেষ হলো। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের অনমনীয়তাকে আরো ধ্বংসের পথে যেতে দিতে আমারও দ্বিধা হচ্ছিল। আমি সংগ্রাম শেষ করার জন্য একটি সম্মানজনক পথ খুঁজতেছিলাম যা একজন সত্যাগ্রহীর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। এরকম একটা সমাধান অপ্রত্যাশিতভাবে এসেও গেল। নড়িয়াড তালুকের মামলতদার আমাকে বলে পাঠালেন যে যদি ধনী পাটীদাররা খাজনা পরিশোধ করে তাহলে দরিদ্রদের খাজনা আদায় স্থগিত রাখা হবে। এ ব্যাপারে আমি লিখিত অঙ্গীকার চাইলাম এবং আমাকে লিখে দেয়া হলো। কিন্তু একজন মামলতদার যেহেতু কেবল তার নিজের তালুকের দায়িত্ব নিতে পারেন, আমি কালেক্টরের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলাম, কারণ তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি পুরো জেলার জন্য অঙ্গীকারনামা দিতে পারেন। তিনি জবাব দিলেন মামলতদারের পত্র মোতাবেক খাজনা স্থগিতের আদেশ ইতিমধ্যেই জারী করা হয়েছে। আমি এটা জানতাম না, কিন্তু এটা সত্য ছিল, জনগণের প্রতিজ্ঞা পূরণ হলো। স্মরণ করা যেতে পারে, আমাদের প্রতিজ্ঞার লক্ষ্য এটাই ছিল, আর তাই ঐ আদেশ পেয়ে আমরা সন্তোষ প্রকাশ করলাম।

তবে আমি এ সমাপ্তিতে মোটেই খুশী হতে পারিনি। কারণ প্রতিটি সত্যাগ্রহ যে সম্মান নিয়ে শেষ হওয়া উচিত এক্ষেত্রে তা হয়নি। কালেক্টর এমনভাবে কাজ করে যেতে থাকলেন যেন তিনি বিরোধের নিষ্পত্তিমূলক কিছুই করছেন না। গরিবদের খাজনা স্থগিত হওয়ার কথা, কিন্তু কোনো গরিব এর উপকার পেল না। কে গরিব তা নির্ধারণের অধিকার জনগণের, কিন্তু জনগণ সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারল না। দুঃখের ব্যাপার যে অধিকার প্রয়োগের শক্তিও তাদের ছিল না। যদিও এ সমাপ্তি সত্যাগ্রহের বিজয় হিসেবে উদযাপন করা হলো, আমি এতে উচ্ছ্বসিত হতে পারলাম না, কারণ এতে পূর্ণ বিজয়ের উপাদানের ঘাটতি ছিল।

একটা সত্যাগ্রহ অভিযানের সমাপ্তি তখনই মূল্যবান বলা যেতে পারে যখন সত্যাগ্রহীরা অনুভব করে যে তারা শুরুর সময়ের চাইতে নিজেরা আরো শক্তিশালী ও তেজোদ্দীপ্ত।

অবশ্য এ অভিযানের ফলে পরোক্ষ উপকার হয়েছিল, যা আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি এবং যে উপকার আমরা ভোগ করছি। খেদা সত্যাগ্রহ গুজরাটের কৃষকদের মধ্যে জাগরণের শুরু হিসেবে উল্লেখযোগ্য, এটাই তাদের সত্যিকার রাজনৈতিক শিক্ষার শুরু।

ডা. বেসান্টের হোমরুল আন্দোলন অবশ্যই কৃষকদেরকে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু খেদা অভিযান শিক্ষিত গণকর্মীদেরকে কৃষকের প্রকৃত জীবনযাত্রার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করেছে। তারা কৃষকদের সাথে একাত্মতা বোধ করতে

www.pathagar.com

শিখেছে। তারা সঠিক কাজের পরিবেশ পেল, তাদের ত্যাগের সামর্থ্য বাড়ল। এ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বল্লভভাই নিজেকে আবিষ্কার করলেন এটা কোনো ছোট অর্জন নয়। আমরা এর পরিমাপ বুঝতে পারলাম গত বছর বন্যার ত্রাণকার্যের সময় এবং এ বছর বারদোলী সত্যাগ্রহের সময়। গুজরাটের জনজীবন নতুন শক্তি ও তেজে ভরে উঠল। পাটীদার চাষীরা তাদের শক্তিমত্তার অবিস্মরণীয় চেতনা লাভ করল। জনগণের মনে এ শিক্ষা স্থায়ী ছাপ ফেলল যে জনগণের মুক্তি তাদের নিজেদের হাতেই, তাদের কষ্ট ভোগ ও ত্যাগ স্বীকারের সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। খেদা অভিযানের মাধ্যমে গুজরাটের মাটিতে সত্যাগ্রহের শিকড় প্রোথিত হলো।

সুতরাং যদিও সত্যাগ্রহের সমাপ্তিতে আমার আনন্দিত হওয়ার কিছু ছিল না, খেদার কৃষকরা উৎফুল্ল হয়েছিল, কারণ তারা জানত যে তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের চেষ্টার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তারা তাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার করার জন্য একটা সত্য ও অব্যর্থ উপায় খুঁজে পেয়েছে। এ জানাটাই তাদের উৎফুল্ল হওয়ার কারণ হিসেবে যথেষ্ট।

এতদসত্ত্বেও খেদার কৃষকরা সত্যাগ্রহের অন্তর্নিহিত অর্থ পুরোপুরি বুঝতে পারেনি এবং তারা তাদের ক্ষতির মাধ্যমে তা দেখতে পেয়েছে, যা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখতে পাব।

ছাব্বিশ
ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা

খেদা অভিযান যখন শুরু হয়েছিল তখনো ইউরোপ জুড়ে মহাযুদ্ধ চলছিল। এখন একটা সংকট দেখা দিল, ভাইসরয় সব নেতাদের নিয়ে দিল্লীতে একটা যুদ্ধ সম্মেলন আহ্বান করলেন। আমাকেও ঐ সম্মেলনে যোগ দিতে অনুরোধ করা হলো। আমি ইতিপূর্বে ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করেছি।

আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আমি দিল্লী গেলাম। তবে সম্মেলনে যোগদানে আমার আপত্তি ছিল, তার প্রধান কারণ সম্মেলন থেকে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মতো নেতাদের বাদ দেয়া। তারা তখন জেলে ছিলেন। যদিও আমি তাদের অনেক প্রশংসা শুনেছি, কিন্তু আমার সাথে তাদের মাত্র একবার কি দু'বার দেখা হয়েছে। প্রত্যেকে তাদের সেবা ও সাহসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। হাকিম সাহেবের সাথে তখনো আমার ঘনিষ্ঠতা হয়নি, কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল রুদ্র ও দীনবন্ধু এন্ড্রুজ আমার কাছে তার অনেক প্রশংসা করেছেন। কলকাতায় মুসলিম লীগের সম্মেলনে মি. শুয়াইব কোরেশী ও মি. খাজার সাথে আমার দেখা হয়েছে। ডা. আনসারী ও আব্দুর রহমানের সাথেও আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। আমি ভালো মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব চাইলাম এবং মুসলমানদের দেশ প্রেমিক প্রতিনিধিদের সাথে ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে মুসলিম মানসিকতা বুঝতে চাইছিলাম। সুতরাং তাদের সাথে সখ্যতা গড়ে

www.pathagar.com

তুলতে তারা আমাকে যেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছে সেখানেই আমি গিয়েছি, এজন্য আমাকে কোনো চাপ দিতে হয়নি।

অনেক আগেই দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সত্যিকার বন্ধুত্ব নেই। তাদের ঐক্যের পথে বাধাগুলো দূর করার একটা সুযোগও আমি হাতছাড়া করিনি। কাউকে আশ্বস্ত করার জন্য অতি প্রশংসা বা তোষামোদ করা অথবা আত্মসম্মান বিসর্জন দেয়া আমার স্বভাবে ছিল না। তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্বাস জন্মেছিল যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রশ্নে আমার অহিংস নীতি সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং এ বিষয়টি অহিংসা নিয়ে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার সবচেয়ে প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। সে বিশ্বাস আমার এখনো আছে। জীবনের প্রতি মুহূর্তেই আমি উপলব্ধি করছি যে ঈশ্বর আমাকে পরীক্ষা করছেন।

এ ব্যাপারে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে আমি আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের সাথে যোগাযোগের ওপর গুরুত্ব দিলাম। কিন্তু তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার আগেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। মওলানা মুহাম্মদ আলী যখনই তার জেলাররা সুযোগ দিত তখনই বেতুল ও ছিন্দওয়াড়া থেকে আমাকে লম্বা চিঠি লিখতেন। আমি ভ্রাতৃদ্বয়ের সাথে দেখা করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করলাম, কিন্তু কোনো ফল হলো না।

আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের গ্রেফতারের পরে মুসলিম বন্ধুরা আমাকে আমন্ত্রণ করলেন কোলকাতায় মুসলিম লীগের সম্মেলনে যোগদান করতে। আমাকে বক্তৃতা করার অনুরোধ করা হলে আমি আমার বক্তব্যে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তি অর্জনের জন্য মুসলমানদের কর্তব্যের ওপর জোর দিলাম। এর অল্প কিছুক্ষণ পরেই এসব বন্ধুরা আমাকে আলীগড়ের মুসলিম কলেজে নিয়ে গেল। সেখানে আমি যুবকদেরকে মাতৃভূমির সেবায় "ফকির" হয়ে যাওয়ার আহ্বান জানালাম।

এরপর আমি আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তির জন্য গভর্নমেন্টের সাথে পত্র যোগাযোগ শুরু করলাম। ঐ প্রসঙ্গে আমি খিলাফত সম্পর্কে ভ্রাতৃদ্বয়ের মতাদর্শ ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানলাম। আমি মুসলমান বন্ধুদের সাথে আলোচনা করলাম। আমি উপলব্ধি করলাম যে মুসলমানদের প্রকৃত বন্ধু হতে চাইলে আমাকে ভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তি আদায় ও খিলাফত প্রশ্নের সমাধানে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে। তাদের দাবিতে অনৈতিক কিছু না থাকলে এসব প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধানে আমার বিতর্কে জড়ানো উচিত নয়। মানুষে মানুষে ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্য আছে এবং প্রত্যেকের ধর্ম বিশ্বাস তার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ। ধর্ম বিষয়ে সকল মানুষের বিশ্বাস এক হলে পৃথিবীতে কেবল একটি ধর্ম থাকত। সময় এগিয়ে যাবার সাথে সাথে আমি দেখতে পেলাম খিলাফত সম্পর্কে মুসলমানদের দাবিতে নৈতিকতা বিরোধী কিছু তো নেইই বরং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীও তাদের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন। সুতরাং আমি অনুভব করলাম যে প্রধানমন্ত্রীও যাতে তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন সে বিষয়ে সাধ্যমতো চেষ্টা করতে আমি বাধ্য। প্রতিশ্রুতিটা এত স্পষ্টভাষায় দেয়া হয়েছিল যে মুসলিমদের দাবির যথার্থতা পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল শুধুমাত্র আমার বিবেককে সন্তুষ্ট করতে।

www.pathagar.com

খেলাফত প্রশ্নে বন্ধু ও সমালোচকরা আমার মনোভাবের সমালোচনা করেছেন। সেসব সমালোচনা সত্ত্বেও আমি মনে করি আমার মনোভাব পরিবর্তনের কোনো যুক্তি নেই অথবা মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য অনুশোচনারও কোনো কারণ নেই। সেরকম পরিস্থিতি আবার সৃষ্টি হলে আমি আবারো একই মনোভাব দেখাব। সুতরাং আমি যখন দিল্লী গেলাম আমার পুরোপুরি ইচ্ছে ছিল ভাইসরয়ের কাছে মুসলিমদের বিষয় পেশ করার। খেলাফত প্রশ্নটি তখন সেরূপ ছিল না।

কিন্তু দিল্লী পৌঁছার পরে সম্মেলনে আমার যোগদানের পথে আরেকটি বাধার সৃষ্টি হলো। দীনবন্ধু এন্ড্রুজ যুদ্ধ সম্মেলনে আমার যোগদানের বিষয়ে নীতিগত বৈধতার প্রশ্ন তুললেন। তিনি আমাকে বৃটিশ সংবাদপত্রে ইংল্যান্ড ও ইতালির মধ্যকার গোপন চুক্তির বিষয়ে প্রকাশিত বিতর্ক সম্পর্কে বললেন। মি. এন্ড্রুজের প্রশ্ন হলো ইংল্যান্ড যদি অন্য কোনো ইউরোপীয়ান শক্তির সাথে গোপন চুক্তি করে থাকে তাহলে আমি সম্মেলনে যোগ দেব কিভাবে? আমি চুক্তির সম্পর্কে কিছু জানতাম না। দীনবন্ধু এন্ড্রুজের কথাই আমার জন্য যথেষ্ট ছিল। সুতরাং আমি লর্ড চেমসফোর্ডকে পত্র লিখে সম্মেলনে যোগদান করতে আমার দ্বিধার কথা জানালাম। তিনি বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। তার সাথে এবং তার প্রাইভেট সেক্রেটারী মি. মাফির সাথে আমার দীর্ঘ আলোচনা হলো। এর ফলে আমি সম্মেলনে যোগ দিতে সম্মত হলাম। ভাইসরয়ের যুক্তির সারমর্ম ছিল এ রকম : " আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন না যে বৃটিশ কেবিনেট (মন্ত্রী পরিষদ) যা করছে তার সবই ভাইসরয় জানেন। আমি দাবি করি না, এবং কেউই দাবি করতে পারে না যে, বৃটিশ গভর্নমেন্টের সব কিছুই নির্ভুল। কিন্তু যদি আপনারা স্বীকার করেন যে মোটের ওপর বৃটিশ সাম্রাজ্য ভালোর পক্ষের শক্তি, আপনারা যদি বিশ্বাস করেন যে ভারত মোটের ওপর বৃটিশ শাসনে উপকৃত হয়েছে, তাহলে আপনারা কি স্বীকার করবেন না যে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের উচিত বৃটিশ সাম্রাজ্যকে প্রয়োজনের সময়ে সাহায্য করা? বৃটিশ পত্র-পত্রিকায় গোপন চুক্তি সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে আমিও তা পড়েছি। আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করছি যে সংবাদপত্রগুলো প্রায়ই মিথ্যা গুজব ছড়ায়। এরকম সংকটময় মুহূর্তে খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়ে আপনারা কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সাহায্য করতে অস্বীকার করতে পারেন? যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর আপনারা যে কোনো নৈতিকতার প্রশ্ন তুলতে পারেন এবং যত খুশি আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন, কিন্তু এখন নয়।"

এ যুক্তি নতুন কিছু নয়। তবে যেভাবে এবং যে সময়ে তা তুলে ধরা হলো তার কারণে এটা আমার কাছে নতুন বলে মনে হলো এবং আমি সম্মেলনে যোগদানে সম্মত হলাম। মুসলিমদের দাবির বিষয়ে ভাইসরয়কে পত্র লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম।

www.pathagar.com

সাতাশ

সেনা সংগ্রহ অভিযান

সুতরাং আমি সম্মেলনে যোগ দিলাম। ভাইসরয় খুব আশান্বিত ছিলেন যেন আমি সৈন্য সংগ্রহের প্রস্তাব সমর্থন করি। আমি অনুমতি চাইলাম হিন্দুস্তানী ভাষা হিন্দীতে কথা বলার। ভাইসরয় আমার অনুরোধে সম্মত হলেন, তবে তিনি পরামর্শ দিলেন হিন্দীর সাথে ইংরেজীতেও বলতে। আমার কোনো বক্তৃতা তৈরি ছিল না। আমি মাত্র একটা বাক্য বললাম যার মর্ম কথা হলো : "সম্পূর্ণ দায়িত্ব বোধ নিয়ে আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করছি।"

হিন্দুস্তানী ভাষা ব্যবহারের জন্য অনেকেই আমাকে অভিন্দন জানালেন। তারা বললেন তাদের স্মরণকালের মধ্যে এরকম সভায় হিন্দুস্তানী ভাষায় কারো কথা বলার নজির এটাই প্রথম। এ অভিন্দন এবং ভাইসরয়ের মিটিং-এ আমিই হিন্দুস্তানী বলা প্রথম ব্যক্তি এ আবিষ্কার আমার জাত্যাভিমানে আঘাত করল। আমি নিজের মধ্যেই যেন কুঁকড়ে গেলাম। এটা কি দুঃখজনক ব্যাপার যে নিজ দেশের ভাষা দেশে অনুষ্ঠিত সভায়, দেশের কাজে ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং সেখানে আমার মতো ভবঘুরে লোকের হিন্দুস্তানী ভাষায় বক্তব্য দেয়া আবার অভিনন্দনের ব্যাপার হবে! এ ধরনের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয় আমরা অধঃপতনের কোন পর্যায়ে নেমে গিয়েছি। সম্মেলনে আমি যে একটা বাক্য উচ্চারণ করেছিলাম তা আমার জন্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। সম্মেলনে যোগদান অথবা উপস্থিত প্রস্তাব সমর্থন কোনোটাই ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। দিল্লীতে অবস্থানকালেই আমার আরো একটা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার ছিল। ভাইসরয়ের কাছে আমার পত্র লেখার কথা ছিল। সেটা আমার জন্য সহজ ছিল না। ঐ পত্রে গভর্নমেন্ট ও জনগণের স্বার্থে কিভাবে এবং কেন আমি সম্মেলনে যোগদান করলাম তা ব্যাখ্যা করা এবং গভর্নমেন্টের কাছ থেকে জনগণ কি আশা করে তা পরিষ্কার করে বলা আমার কর্তব্য বলে মনে হলো।

আমার পত্রে সম্মেলন থেকে লোকমান্য তিলক ও আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের মতো নেতাদের বাদ দেয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম এবং জনগণের ন্যূনতম রাজনৈতিক দাবি এবং যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে মুসলমানদের দাবি সম্পর্কে বর্ণনা করলাম। আমি পত্রটা ছাপিয়ে বিতরণের অনুমতি চাইলাম এবং ভাইসরয় সানন্দে অনুমতি দিলেন।

পত্রটা সিমলাতে পাঠাতে হয়েছিল, কারণ সম্মেলন শেষ হবার সাথে সাথেই ভাইসরয় সেখানে চলে গিয়েছিলেন। পত্রটা আমার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং তা ডাকে পাঠানোর অর্থ বিলম্বে পৌছানো। আমি সময় বাঁচাতে চেয়েছিলাম আবার এটা আমার পরিচিত কোনো বাহকের মাধ্যমে পাঠানোর ইচ্ছেও ছিল না। আমি একজন বিশ্বস্ত লোককে খুঁজছিলাম যে আমার পত্রটা বয়ে নিয়ে ভাইসরয়ের বাসায় ব্যক্তিগতভাবে হস্তান্তর করবে। দীনবন্ধু এন্ড্রুজ ও প্রিন্সিপ্যাল রুদ্র ক্যামব্রীজ মিশনের পাদ্রী আয়ারল্যান্ডের মাধ্যমে পত্রটা পাঠানোর পরামর্শ দিলেন। তিনি

www.pathagar.com

পত্রটা নিয়ে যেতে রাজি হলেন, যদি তাকে সেটা পড়তে দেয়া হয় এবং যদি সেটা তার কাছে ভালো মনে হয়। এতে আমার কোনো আপত্তি ছিল না, কারণ পত্রটা কোনোক্রমেই ব্যক্তিগত ছিল না। তিনি এটা পড়লেন, পছন্দ করলেন এবং এটি বয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। আমি তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রেনভাড়া দিতে চাইলাম কিন্তু তিনি ইন্টারক্লাশে ভ্রমণে অভ্যস্ত বলে তা নিতে রাজি হলেন না। রাত্রিকালে ভ্রমণ করতে হবে জেনেও তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রেনভাড়া নিতে রাজি হননি। তার সরলতা ও সোজাসুজি কথাবার্তা ও আচরণ আমাকে মুগ্ধ করল। এভাবে একজন খাঁটি মনের মানুষের হাতে পত্রটা প্রেরিত হওয়ায় আমার চিন্তা অনুযায়ী প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া গেল। এতে আমার মনে প্রশান্তি এলো এবং আমার পথও পরিষ্কার করে দিল।

আমার বাধ্যবাধকতার অপর দিকটি ছিল সৈন্য সংগ্রহ করা। খেদা ছাড়া আর কোথা হতে শুরু করব? আর আমার নিজের সহকর্মী ছাড়া কাদেরকে প্রথম সৈনিক হিসেবে নাম লেখাতে আহ্বান জানাব? সুতরাং নড়িয়াড পৌঁছার সাথে সাথেই আমি বল্লভভাই ও অন্য বন্ধুদের সাথে সভা করলাম। তাদের কেহ কেহ আমার প্রস্তাব সহজে মেনে নিতে পারল না। প্রস্তাবটা যাদের পছন্দ হলো তাদেরও এর সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। গভর্নমেন্ট এবং যাদের কাছে আমি আবেদন জানাব উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা হারিয়ে যায়নি। যদিও গভর্নমেন্ট অফিসারদের থেকে প্রাপ্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদের স্মৃতিতে তখনো বিদ্যমান ছিল।

এতদসত্ত্বেও তারা কাজ শুরু করার পক্ষে ছিল। আমি কাজ শুরু করে দেবার সাথে সাথেই আমার চোখ খুলে গেল। আমার আশাবাদ নিষ্ঠুর ধাক্কা খেল। খাজনা রহিত করার অভিযানে যেখানে লোকে চাওয়ামাত্র বিনামূল্যে তাদের গরুর গাড়ি দিয়েছে, যেখানে একজন প্রয়োজন সেখানে দু'জন স্বেচ্ছাসেবক এগিয়ে এসেছে, এখন সেখানে ভাড়ার বিনিময়েও গাড়ি পাওয়া কঠিন হলো, স্বেচ্ছাসেবক পাওয়ার তো প্রশ্নই নেই। কিন্তু আমরা হতাশ হওয়ার পাত্র নই। আমরা গরুর গাড়ির ব্যবহার বাদ দিয়ে পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এ হিসেবে আমাদেরকে ক্লান্ত পদযাত্রায় দিনে বিশ মাইল পর্যন্ত ভ্রমণ করতে হচ্ছিল। যেখানে আমাদেরকে গাড়িই দেয়া হচ্ছিল না, সেখানে লোকে আমাদেরকে খাওয়াবে সেরকম আশা করাই বৃথা। খাবার চাওয়াটাও সঙ্গত ছিল না। সুতরাং সিদ্ধান্ত নেয়া হলো প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবককে তার ব্যাগে খাবার নিয়ে নিতে হবে। বিছানা বা চাদরের প্রয়োজন ছিল না কারণ তখন ছিল গ্রীষ্মকাল।

আমরা যেখানে গিয়েছি সেখানেই সভা করেছি। সভায় লোক হয়েছে, কিন্তু একজন দু'জনের বেশি সৈনিক হিসেবে নাম লেখাচ্ছিল না। "আপনি তো অহিংসার পূজারী, আমাদেরকে আপনি অস্ত্র তুলে নিতে বলছেন কিভাবে?" "আমাদের সহযোগিতা পেতে গভর্নমেন্ট ভারতের জন্য কি ভালো কাজ করেছে?" আমাদেরকে এরকম অনেক প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হচ্ছিল।

যাহোক, ধৈর্যের সাথে আমাদের কাজ চালিয়ে যাবার ফল পেতে শুরু করলাম। বেশ কিছু লোকের নাম তালিকাভুক্ত করা হলো এবং আমরা আশা

www.pathagar.com

করতে থাকলাম যে প্রথম দলটি পাঠানোর পর নিয়মিত আরো দল পাঠাতে পারব। ইতিমধ্যে আমি নতুন তালিকাভুক্তদের কোথায় রাখা হবে তা নিয়ে কমিশনারের সাথে আলোচনা শুরু করলাম।

প্রতিটি ডিভিশনের কমিশনারগণ দিল্লীর আদলে সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। গুজরাটেও এরকম এক সম্মেলন হলো। আমাকে ও আমার সহকর্মীদেরকে তাতে আমন্ত্রণ জানানো হলো। আমরা যোগদান করলাম, কিন্তু আমার মনে হলো এখানে আমার অবস্থান দিল্লীর চেয়েও কম সম্মানজনক। এই দাসত্বসুলভ আনুগত্যের পরিবেশে আমি অস্বস্তিবোধ করছিলাম। আমি মোটামুটি লম্বা বক্তৃতা দিলাম। আমার বক্তব্যে কর্মকর্তাদের সন্তুষ্ট করার মতো কিছুই ছিল না, বরং দু'একটা শক্ত কথা ছিল।

আমি সৈনিক হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার আবেদন জানিয়ে জনগণের মাঝে প্রচার পত্র বিলি করলাম। আমি তাতে যেসব যুক্তি দেখিয়েছিলাম তার মধ্যে একটা যুক্তি কমিশনারের অপছন্দ হলো, তা হলো, "ভারতে বৃটিশ শাসনের বহু অপকর্মের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ জাতিকে অস্ত্র ধারণে বিরত রাখার আইনটি ইতিহাসে সবচেয়ে কালো আইনরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আমরা যদি এ অস্ত্র আইন রদ করাতে চাই, আমরা যদি অস্ত্রের ব্যবহার শিখতে চাই তাহলে এটা আমাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। গভর্নমেন্টের সংকটকালে যদি মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে এগিয়ে আসে তাহলে অবিশ্বাস দূর হবে এবং অস্ত্র রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হবে।" কমিশনার এর প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন যে আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও সম্মেলনে আমার যোগদানকে তিনি যথাযথ মূল্যায়ন করছেন এবং আমি যথাসাধ্য সৌজন্যের সাথে আমার অবস্থানের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরলাম।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত ভাইসরয়কে লেখা চিঠিটা ছিল নিম্নরূপ :

"আপনি অবগত আছেন যে সতর্ক বিবেচনার পর আমি আপনার বরাবরে পেশ করতে সংকোচ বোধ করছিলাম যে আমি এমাসের ২৬ তারিখের (এপ্রিল) পত্রে উল্লিখিত কারণে সম্মেলনে যোগ দিতে পারছি না, কিন্তু আপনি সদয় হয়ে আমাকে যে সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করেছিলেন তারপর আমি নিজেকে সম্মেলনে যোগ দিতে রাজি করালাম, অন্য কোনো কারণে না হলেও অন্তত আপনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধার কারণে। আমার সম্মেলন বর্জনের কারণগুলোর মধ্যে একটি এবং সেটাই সম্ভবত সবচেয়ে জোরালো কারণ, হলো লোকমান্য তিলক, মিসেস বেসান্ট এবং আলী ভ্রাতৃদ্বয়, যাদেরকে আমি জনগণের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা বলে গণ্য করি, তাদেরকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। আমি এখনো উপলব্ধি করি যে তাদেরকে আমন্ত্রণ না জানানো একটা বিরাট ভুল ছিল এবং আমি শ্রদ্ধার সাথে পরামর্শ দিচ্ছি যে, সম্ভবত ঐ ভুল সংশোধন করা যায় যদি এই নেতৃবৃন্দকে আসন্ন প্রাদেশিক সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তাদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে গভর্নমেন্টকে সাহায্য করতে বলা হয়। আমি এটাও উল্লেখ করতে চাই যে কোনো

www.pathagar.com

গভর্নমেন্টই নেতাদের অগ্রাহ্য করে চলতে পারে না, বিশেষত এদের মতো নেতারা যারা জনগণের বিরাট অংশের নেতৃত্ব দেন, যদিও তারা মৌলিক বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। একই সাথে আমি আনন্দের সাথে বলতে সমর্থ হচ্ছি যে সম্মেলনের কমিটিতে স্বাধীনভাবে সকল দলের মত প্রকাশের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। আমার ব্যাপারে বলতে চাই যে আমি ইচ্ছে করেই সম্মেলনে বা কমিটিতে, যেখানে আমি সেবা দানের সম্মান লাভ করেছিলাম, আমার মতামত প্রকাশে বিরত ছিলাম। আমি উপলব্ধি করলাম যে সম্মেলনে উত্থাপিত প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের মধ্যেই আমি এর উদ্দেশ্য সফল করার বিষয়ে সর্বোত্তম অবদান রাখতে পারি এবং আমি সেটা করেছি কোনোরকম রাখ-ঢাক না করেই। আমি আশা করছি যত তাড়াতাড়ি গভর্নমেন্ট আমার প্রস্তাব মেনে নেবে তত তাড়াতাড়ি আমার কথাকে কাজে পরিণত করতে পারব, প্রস্তাবটা এতদসঙ্গে পৃথক পত্র মাধ্যমে পেশ করছি।

আমি স্বীকার করছি যে সাম্রাজ্যের বিপদের সময় আমাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক একে অকুণ্ঠ ও দ্ব্যর্থহীন সমর্থন দিতে হবে, কারণ অন্যান্য ডোমিনিয়নের মতো একই অর্থে আমরাও অদূর ভবিষ্যতে এ সাম্রাজ্যের অংশীদার হওয়ার আশা পোষণ করি। কিন্তু সহজ সত্য হলো যে আমাদের লক্ষ্য আরো দ্রুত অর্জিত হবে এ আশায় আমরা এভাবে সাড়া দিচ্ছি। সে বিবেচনায় কর্তব্য পালন যেমন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পারস্পরিক অধিকার অর্পণ করে সেই অধিকারে জনগণের বিশ্বাস যে আপনার বক্তৃতায় যে আসন্ন সংস্কারের ইঙ্গিত আপনি দিয়েছেন তাতে কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনার সাধারণ নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং আমি নিশ্চিত যে এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে সম্মেলনের অনেক সদস্য গভর্নমেন্টের প্রতি তাদের পূর্ণ আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

আমি যদি আমার দেশবাসীকে এ যাবৎ গৃহীত পদক্ষেপের পেছনে ফিরিয়ে নিতে পারতাম তাহলে কংগ্রেসে গৃহীত সকল প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে এবং যুদ্ধকালীন অনিশ্চয়তার মধ্যে বা "দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট" এর দাবি না তুলতে বলতাম। আমি ভারত মাতার সকল সক্ষম সন্তানকে সাম্রাজ্যের সংকটময় মুহূর্তে উৎসর্গ করতে বলতাম এবং আমি জানি ভারত এ কাজের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের সবচাইতে অনুগৃহীত অংশীদার হতে পারত এবং জাতিগত বৈষম্য অতীতের বিষয়ে পরিণত হতো। কিন্তু বাস্তবে ভারতে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী কিছুটা কম কার্যকর উপায় অবলম্বন করেছে এবং এখন আর এটা বলা সম্ভব নয় যে ভারতের গণমানুষের ওপর শিক্ষিত গোষ্ঠীর কোনো প্রভাব নেই। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার পর থেকেই আমি রায়তদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি এবং আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই যে তাদের মধ্যে স্ব-শাসনের (Home Rule) আকাঙ্ক্ষা বদ্ধমূল হয়েছে। সর্বশেষ কংগ্রেস অধিবেশনসমূহে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং পার্লামেন্টারী বিধি দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বৃটিশ ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে আমি নিজেও অংশ নিয়েছিলাম। আমি

www.pathagar.com

স্বীকার করছি যে এটা একটা সাহসী পদক্ষেপ হবে, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে স্ব-শাসনের (Home Rule) সুনির্দিষ্ট রূপরেখা এবং স্বল্পতম সময়ে তা বাস্তবায়ন ব্যতীত ভারতীয় জনগণকে সন্তুষ্ট করা যাবে না। আমি জানি ভারতে এমন বহু লোক রয়েছে যারা স্ব-শাসনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনো ত্যাগকেই বড় মনে করে না এবং তারা যথেষ্ট সচেতন এবং বুঝে যে, যে সাম্রাজ্যে তারা চূড়ান্ত মর্যাদা লাভের প্রত্যাশী তাকে রক্ষার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে একইভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে আসন্ন বিপদ থেকে মুক্ত করতে আমরা নিজেদেরকে নীরবে সর্বান্তঃকরণে নিয়োজিত করার মাধ্যমে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারি। এ মৌলিক সত্যকে অস্বীকার করা জাতীয়ভাবে আত্মহত্যার সামিল। আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, আমরা যদি সাম্রাজ্য রক্ষায় ব্রতী হই তবে তার বিনিময়ে আমাদেরকে স্ব-শাসন লাভ করতে হবে।

সুতরাং আমার নিকট এটা পরিষ্কার যে সাম্রাজ্যের সুরক্ষায় যেমন লোকবল দিয়ে সাহায্য করা উচিত, আর্থিক সাহায্যের বিষয়ে আমি তেমনটা বলতে পারি না। রায়তদের সাথে ঘনিষ্ঠ মেলামেশায় আমি নিশ্চিত হয়েছি যে ভারত ইতিমধ্যেই রাজকীয় কোষাগারে তার সাধ্যের অতিরিক্ত অর্থ দান করেছে। আমি জানি আমার এ বক্তব্যে আমার দেশবাসীর সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

আমার বিশ্বাস এ সম্মেলন আমার জন্য, এবং আমাদের অনেকের জন্য, জনগণের সেবায় জীবন উৎসর্গের একটা পদক্ষেপ, কিন্তু আমাদের অবস্থা স্বতন্ত্র। আমরা আজ অংশীদারিত্বের বাইরে। উত্তম ভবিষ্যতের আশায় আমাদের আত্মোৎসর্গ করতে হচ্ছে। আমাদের সে আশা কি তা পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় না বললে আমি আপনার কাছে ও আমার দেশের কাছে মিথ্যাচারী বলে গণ্য হব। আমি আশা পূরণের জন্য দেন-দরবার করছি না, কিন্তু আপনার জানা উচিত যে অপূর্ণ আশা মোহমুক্তি ঘটায়।

একটা বিষয় এখানে উল্লেখ করতে চাই। আপনি আমাদের অভ্যন্তরীণ বিভেদ ত্যাগ করার আবেদন জানিয়েছেন। আবেদনে যদি কর্মকর্তাদের অন্যায় অত্যাচার সহ্য করা অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে আমি এতে সাড়া দিতে অপারগ। সংগঠিত অত্যাচার আমি সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করব। কর্মকর্তাদের প্রতি আবেদন জানাতে হবে তারা যেন একটা প্রাণীর ওপরেও অত্যাচার না চালায়, তারা যেন জনগণের সাথে আলোচনা করে এবং জনমতকে সম্মান করে, যা আগে কখনো করত না। চাম্পারানে যুগ-যুগের স্বৈরাচার প্রতিরোধ করে আমি বৃটিশ ন্যায় বিচারের চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব দেখিয়েছি। খেদাতে যে জনগণ গভর্নমেন্টকে অভিশাপ দিচ্ছিল তারা এখন উপলব্ধি করছে যে গভর্নমেন্ট নয়, যারা ক্ষমতা এবং ক্ষমতার প্রতিনিধিত্বকারী তারাই দুর্ভোগের মূল। সুতরাং তাদের তিক্ততা দূর হচ্ছে এবং তারা নিজেরাই বলছে যে গভর্নমেন্টকে অবশ্যই জনগণের গভর্নমেন্ট হতে হবে, কারণ যেখানে অন্যায় অত্যাচার দৃষ্ট হয় সেখানে এ ধরনের গভর্নমেন্ট

www.pathagar.com

শৃঙ্খলাপূর্ণ ও সশ্রদ্ধ অবাধ্যতা সহ্য করে থাকে। এভাবে চাম্পারান ও খেদার ঘটনা যুদ্ধের পক্ষে আমার সরাসরি, সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ অবদান। আমাকে ঐ কার্যক্রম অনুসরণে বিরত থাকতে বলার অর্থ আমার জীবনের কার্যক্রমে বিরতি টানতে বলা। আমি যদি পশুশক্তির বদলে আত্মার শক্তির ব্যবহার জনপ্রিয় করতে পারতাম, যার অপর নাম প্রেম শক্তি, তাহলে আমি জানি আপনাকে এমন এক ভারত উপহার দিতে পারতাম যা সারা দুনিয়া গোল্লায় গেলেও পরোয়া করত না। সুতরাং সুসময়ে হোক বা অসময়ে হোক, আমার জীবনে শৃঙ্খলা অনুশীলনের মাধ্যমে এ চিরন্তন কষ্ট ভোগের নীতির প্রতিফলন ঘটিয়ে যাব এবং যারা বুঝে তাদের কাছে তুলে ধরব এটা গ্রহণ করার জন্য। আর আমি যদি অন্য কোনো কাজে অংশ নেই সেখানেও আমার উদ্দেশ্য হবে এই অতুলনীয় নীতির শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা।

সবশেষে আশা করব, আপনি মহামান্য সম্রাটের মন্ত্রীদেরকে মুসলিম সাম্রাজ্যগুলোর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে বলবেন। আমি নিশ্চিত যে আপনি জানেন এ ব্যাপারে প্রতিটি মুসলমানের গভীর আগ্রহ রয়েছে। একজন হিন্দু হিসেবে আমি তাদের দাবির প্রতি উদাসীন থাকতে পারি না। তাদের দুঃখ অবশ্যই আমাদেরও দুঃখ। মুসলমান রাজ্যগুলোর অধিকারের প্রতি এবং মুসলিম জনমত, বিশেষত তাদের ধর্মীয় উপাসনালয়ের প্রতি সর্বোত্তম বিবেচনা প্রসূত সম্মান প্রদর্শন এবং ভারতের স্ব-শাসনের (Home Rule) দাবির প্রতি আপনার ন্যায়ানুগ ও সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে সাম্রাজ্যের সুরক্ষা নিহিত রয়েছে। আমি এটা লিখছি, কারণ আমি ইংরেজ জাতিকে ভালোবাসি এবং কামনা করি প্রতিটি ভারতীয়ের মনে ইংরেজের আনুগত্য জেগে উঠুক।"

আঠাশ
মৃত্যুর সন্নিকটে

সেনা-সংগ্রহের অভিযানকালে আমি আমার স্বাস্থ্য প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছিলাম। ঐ দিনগুলোতে আমার খাবার ছিল মূলত বাদাম, মাখন ও লেবু। আমি জানতাম বেশি করে মাখন খেয়ে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করা সম্ভব, তা সত্ত্বেও আমি তাই করলাম। এতে আমি সামান্য আমাশয়ে আক্রান্ত হলাম। এ ব্যাপারে আমি তেমন গুরুত্ব দিলাম না এবং সেদিনই বিকেলে আশ্রমে গেলাম, যেমন মাঝে মধ্যেই যেতাম। সে সময়ে আমি ওষুধ খুব একটা খেতাম না। ভাবলাম এক-আধ বেলা না খেলে ভালো হয়ে যাব এবং আসলেই পরদিন সকালের খাবার না খাওয়ায় মোটামুটি ভালো বোধ করলাম। তবে আমি জানতাম যে পুরোপুরি সুস্থ হতে হলে আমাকে উপোষ অব্যাহত রাখতে হবে এবং যদি কিছু খেতেই হয় তাহলে ফলের রস ছাড়া আর কিছু খাওয়া উচিত হবে না।

সেদিন কোনো উৎসব পার্বণ ছিল। যদিও কস্তুরবাইকে বলেছিলাম আমি দুপুরে কিছুই খাব না, কিন্তু সে আমাকে লোভ দেখাল। আর আমিও রাজি হলাম।

www.pathagar.com

আমি যেহেতু দুধ ও দুধের তৈরি খাবার না খাওয়ার শপথ করেছিলাম, সে আমার জন্য গমের পরিজ ও ঘি এর বদলে তেল দিয়ে বিশেষ মিষ্টান্ন তৈরি করেছিল। সে আমার জন্য পুরো এক বাটি মুগ আলাদা করে রেখে দিয়েছিল। এগুলো আমার প্রিয় খাবার ছিল এবং আমি সাথে সাথেই খেয়ে ফেললাম। আশা ছিল কস্তরবাইকে খুশী করতে এবং জিহ্বার স্বাদ মেটাতে অল্প করে খেলে কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু শয়তান সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। অল্প একটু খাওয়ার বদলে আমি পেট পুরে খেয়েছিলাম। আর তা মৃত্যুদূতকে ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট ছিল। এক ঘন্টার মধ্যেই আমাশয় প্রবল বিক্রমে আবির্ভূত হলো।

একই দিন বিকেলে আমার নড়িয়াড ফিরে যাবার কথা। আমি অতি কষ্টে হেঁটে সবরমতি স্টেশনে পৌঁছলাম, যার দূরত্ব মাত্র দশ ফার্লং। শ্রীযুক্ত বল্লভভাই আহমেদাবাদ থেকে আমাদের সঙ্গী হলেন। তিনি দেখলেন আমি অসুস্থ, কিন্তু আমি তাকে বুঝতে দিলাম না ব্যথাটা কত অসহনীয় ছিল।

বেলা প্রায় দশটা নাগাদ আমরা নড়িয়াড পৌঁছলাম। আমাদের হেডকোয়ার্টার ছিল হিন্দু অনাথাশ্রম, স্টেশন থেকে যার দূরত্ব মাত্র আধা মাইল, কিন্তু আমার মনে হলো দশ মাইল। কোনোরকমে আমি কোয়ার্টারে পৌঁছলাম, কিন্তু পেটের তীব্র ব্যথা ক্রমশ বাড়তেই থাকল। অনেকটা দূরের সাধারণ পায়খানা ব্যবহারের পরিবর্তে আমি পাশের রুমে একটা কমোড এনে দিতে বললাম। এটার কথা বলতে আমার লজ্জা লাগছিল, কিন্তু আর কোনো উপায় ছিল না। শ্রীযুক্ত ফুলচাঁদ তখনই একটা কমোড কিনে আনলেন। সকল বন্ধুরা আমাকে ঘিরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। তাদের ভালোবাসা ও যত্ন-আত্তির কমতি ছিল না, কিন্তু তাতে আমার ব্যথা কমল না। আর আমার একগুঁয়েমি তাদেরকে আরো অসহায় করে তুলল। আমি কোনো ওষুধ খেতে রাজি হলাম না। আমি কোনো ওষুধ না খেয়ে অতীত ভুলক্রটির প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কষ্ট ভোগ করাই শ্রেয় মনে করলাম। সুতরাং তারা অসহায় হয়ে বিষণ্নভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। চব্বিশ ঘন্টায় আমার প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ বার পায়খানা হলো। আমি উপোষ করতে থাকলাম, প্রথম দিকে ফলের রসও খেলাম না। ক্ষুধা একেবারেই ছিল না। আমি সর্বদা ভেবেছি যে আমার শরীর লোহার মতো পেটা, কিন্তু এখন দেখলাম শরীরটা একতাল কাদার মতো হয়ে গেছে। এর প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ডা. কানুগা এলেন এবং ওষুধ খেতে আমাকে অনুরোধ করলেন। আমি সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলাম। তিনি আমাকে একটা ইঞ্জেকশান দিতে চাইলেন। আমি তাতেও রাজি হলাম না। সে সময়ে ইঞ্জেকশান সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই হাস্যকর ছিল। আমার বিশ্বাস ছিল যে ইঞ্জেকশান অবশ্যই কোনো ধরনের সিরাম (জৈব শরীরের তরল নির্যাস)। পরে আমি আবিষ্কার করলাম যে ডাক্তার আমাকে যে ইঞ্জেকশান দিতে চেয়েছিলেন তা ছিল উদ্ভিদের নির্যাস, কিন্তু আমার এ আবিষ্কার হয়েছিল অনেক দেরীতে এবং তা কোনো কাজে লাগল না। পাতলা পায়খানা চলতেই থাকল এবং তা আমাকে দুর্বল করে ফেলল। দুর্বলতা থেকে

www.pathagar.com

শুরু হলো বিকারসহ জ্বর। বন্ধুরা আরো ভয় পেয়ে গেলেন এবং আরো ডাক্তার ডেকে আনলেন। কিন্তু যে রুগী তাদের কথা শুনবে না তাকে নিয়ে তারা কি করবেন?

শেঠ অম্বালাল তার স্ত্রীসহ নড়িয়াডে এলেন, আমার সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করলেন এবং আমাকে অতি যত্নের সাথে এখান থেকে সরিয়ে আহমেদাবাদে তার মির্জাপুর বাংলোতে নিয়ে গেলেন। আমার এ অসুস্থতার সময়ে আমি যে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও সেবা-যত্ন পেয়েছি তার বেশি কারো পক্ষেই পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এক ধরনের মৃদু জ্বর লেগেই রইল এবং তা দিনে দিনে আমার শরীর ক্ষয় করতে থাকল। আমার মনে হলো এ অসুস্থতা দীর্ঘদিন চলবেই এবং তা প্রাণঘাতীও হতে পারে। শেঠ অম্বালালের গৃহে আমাকে ঘিরে ভালোবাসা ও যত্নের বারি বর্ষণ হতে থাকল, তা সত্ত্বেও আমি অস্থির বোধ করতে থাকলাম এবং আমাকে আশ্রমে পাঠাতে অনুরোধ করলাম। আমার পীড়াপীড়িতে তাকে রাজি হতে হলো।

আমি যখন আশ্রমের বিছানায় শুয়ে ব্যথায় কাতর হয়ে এপাশ-ওপাশ করছিলাম, শ্রীযুক্ত বল্লভভাই খবর নিয়ে এলেন যে জার্মানী পুরোপুরি পরাজিত হয়েছে এবং কমিশনার বলে পাঠিয়েছেন যে সেনা-সংগ্রহের আর প্রয়োজন নেই। সেনা-সংগ্রহের ব্যাপারে আমাকে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না এ সংবাদটা আমার জন্য ছিল খুবই স্বস্তিদায়ক।

এরপর আমি জল চিকিৎসা শুরু করলাম এবং কিছুটা আরাম হলো, কিন্তু শরীর পুনর্গঠনের কাজটা খুবই কঠিন। অনেকগুলো ডাক্তার আমাকে অনেক পরামর্শ দিলেন, কিন্তু কোনোটাই গ্রহণ করতে সম্মত হলাম না। দু'তিনজন ডাক্তার দুধ না খাওয়ার শপথের প্রেক্ষিতে দুধের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে মাংসের সুরুয়া খাবার পরামর্শ দিলেন এবং তারা তাদের পরামর্শের সমর্থনে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিলেন। তাদের একজন ডিম খাওয়ার জোর সুপারিশ করলেন। কিন্তু তাদের সকল পরামর্শের বিপরীতে আমার একটাই উত্তর—না।

আমার বেলায় শাস্ত্র ঘেঁটে পথ্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। পথ্যের ব্যাপারটি আমার জীবন যাপন পদ্ধতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যা বাইরের কোনো প্রামাণ্য গ্রন্থের নির্দেশনার ওপর নির্ভরশীল নয়। ওগুলোর ওপর নির্ভর করে আমার বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই। যে নিয়ম নীতি আমি আমার স্ত্রী, সন্তান ও বন্ধুদের ক্ষেত্রে নির্দয়ভাবে প্রয়োগ করেছি, আমার নিজের ক্ষেত্রে আমি তা কিভাবে পরিত্যাগ করব?

জীবনের প্রথম এই দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা আমাকে অনন্য সুযোগ এনে দিল আমার নীতিগুলো পরীক্ষা ও প্রয়োগ করে ফলাফল যাচাই এর। এক রাতে আমি সব আশা ছেড়ে দিলাম। উপলব্ধি করলাম আমি মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে গেছি। আমি অনুসূয়াবেনকে খবর পাঠালাম। সে আশ্রমে ছুটে এলো। বল্লভভাই এলেন ডা. কানুগাকে সাথে নিয়ে। তিনি আমার নাড়ী পরীক্ষা করে বললেন, "নাড়ীর

www.pathagar.com

স্পন্দন খুব ভালো। বিপদের কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। প্রচণ্ড দুর্বলতার কারণে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন।" কিন্তু আমি তার কথায় আশ্বস্ত হতে পারলাম না। সারারাত নিদ্রাহীন কেটে গেল। মৃত্যু ছাড়াই সকাল এলো। কিন্তু মৃত্যু আসছে এ চিন্তা থেকে মুক্তি পেলাম না। আর তাই জেগে থাকা পুরো সময় আশ্রমবাসীদের গীতাপাঠ শুনে কাটালাম। আমি নিজে পড়তে পারছিলাম না। কথা বলতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না। সামান্যতম কথা বলা মানেই মস্তিষ্কের ওপর চাপ পড়া। বাঁচার আগ্রহ শেষ হয়ে গিয়েছিল, যেহেতু আমি বাঁচার জন্য বাঁচতে চাইনি। এরকম অসহায় অবস্থায় বেঁচে থাকা, কোনো কাজ করতে না পারা, বন্ধু ও সহকর্মীদের সেবা-যত্ন নেয়া এবং শরীরের ক্ষয়ে যাওয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা এ যে কি যন্ত্রণার তা বলে বোঝানো যাবে না।

আমি যখন এভাবে মৃত্যুর প্রহর গুনছি, ডা. তালভালকর একদিন একটা অদ্ভুত প্রাণী নিয়ে এলেন। তিনি মহারাষ্ট্রের লোক। তার কোনো খ্যাতি ছিল না, কিন্তু যে মুহূর্তে আমি দেখলাম, মনে হলো তিনিও আমার মত বাতিকগ্রস্ত লোক। তিনি আমার ওপর তার চিকিৎসা বিদ্যার পরীক্ষা করতে এসেছেন। কোনো ডিগ্রী গ্রহণ ছাড়াই তিনি গ্র্যান্ড মেডিক্যাল কলেজে তার পড়ালেখা প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। পরবর্তীতে জেনেছিলাম যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ছিলেন। তার নাম শ্রীযুক্ত কেলকার, তিনি স্বাধীনচেতা একগুঁয়ে মেজাজের লোক। তিনি বরফ চিকিৎসার দোহাই দেন এবং আমার ওপর তা প্রয়োগ করতে চান। আমরা তার নাম দিলাম "বরফ ডাক্তার"। তিনি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললেন যে তিনি এমন কিছু কিছু আবিষ্কার করেছেন যা অনেক ডিগ্রীধারী ডাক্তারও করতে পারেন না। তবে এটা তার জন্য এবং আমার জন্যও দুঃখের বিষয় যে তার চিকিৎসা পদ্ধতিতে তিনি আমার বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারেন নি। আমি তার চিকিৎসা পদ্ধতি কতকটা বিশ্বাস করি, তবে আমার ভয় হয় যে, তিনি অতি দ্রুত ফল পেতে উদগ্রীব।

কিন্তু তার আবিষ্কারের গুরুত্ব যাই হোক, আমার শরীরের ওপর পরীক্ষা চালাতে তাকে অনুমতি দিলাম। বাহ্যিক চিকিৎসায় আমি আপত্তি করলাম না। সারা শরীর বরফ দিয়ে ঢেকে দেয়া ছিল এ চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত। আমার ওপর তার চিকিৎসার ফলাফল সম্পর্কে তার দাবি যদিও আমি সমর্থন করি না, কিন্তু তা আমার মনে নতুন আশা ও নতুন শক্তি সঞ্চার করল এবং মনের ক্রিয়ার প্রভাব শরীরের ওপরও পড়ল। আমার ক্ষুধা হতে লাগল এবং পাঁচ থেকে দশ মিনিট মৃদু হাঁটাহাঁটি করতে শুরু করলাম। তিনি এখন আমার পথ্য সংস্কারের পরামর্শ দিলেন। বললেন, "আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে আপনি আরো শক্তি পাবেন এবং দ্রুত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠবেন যদি আপনি কাঁচা ডিম খান। ডিম দুধের মতোই নির্দোষ। ডিম-দুধ অবশ্যই মাংসের পর্যায়ে পড়ে না। আর সব ডিম থেকে যে বাচ্চা হয় না আপনি জানেন? বাজারে ভ্রূণবিহীন ডিমও পাওয়া যায়।" আমি অবশ্য ভ্রূণহীন ডিমও খেতে প্রস্তুত ছিলাম না। তবে স্বাস্থ্যের যে উন্নতি হলো তা গণকাজে পুনরায় অংশগ্রহণে আমাকে আগ্রহী করতে যথেষ্ট ছিল।

www.pathagar.com

উনত্রিশ

রাউলাট বিল এবং আমার উভয় সংকট

ডাক্তার ও বন্ধুরা আশ্বাস দিলেন যে মাথেরানে গেলে দ্রুত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে সহায়ক হবে, সুতরাং আমি সেখানে গেলাম। কিন্তু মাথেরানের পানি অত্যন্ত খর হওয়ায় সেখানে আমার অবস্থান কঠিন হয়ে পড়ল। আমাশয়ে আক্রান্ত হওয়ার ফলে আমার মলদ্বারের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়েছিল এবং ফিসার থাকায় মলত্যাগের সময় তীব্র যন্ত্রণাদায়ক ব্যথা হতো, যার ফলে খাবার গ্রহণের কথা চিন্তা করলেই ভয়ে কুঁকড়ে যেতাম। এক সপ্তাহ না যেতেই মাথেরান থেকে পালাতে হলো। শংকরলাল বংকর নিজেই এখন আমার স্বাস্থ্য তদারকীর দায়িত্ব নিয়ে নিলেন এবং ডা. দালালকে ডাকা হলো। তার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা আমাকে মুগ্ধ করল।

তিনি বললেন, "আপনি দুধ না খেলে আমি আপনার শরীর পুনর্গঠন করে দিতে পারব না। তার সাথে যদি আপনি আয়রন ও আর্সেনিক ইঞ্জেকশান নেন তাহলে আপনার শরীর সম্পূর্ণ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারি।"

"আপনি ইঞ্জেকশানগুলো দিতে পারেন, কিন্তু দুধের ব্যাপারটা আলাদা, আমার দুধ না খাওয়ার শপথ রয়েছে"—আমি জবাব দিলাম।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার শপথের আসল ধরনটা কি?"

আমি তাকে পুরো ইতিহাস বললাম এবং এর পিছনের কারণ, কিভাবে আমি জানলাম গরু-মহিষের ওপর কি ধরনের অত্যাচার করা হয় এবং তা থেকে কিভাবে দুধের ওপর আমার ঘৃণা জন্মাল। তদুপরি, বরাবরই আমার বিশ্বাস ছিল যে দুধ মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য নয়। তাই আমি এর ব্যবহার সম্পূর্ণ বর্জন করেছি। কস্তুরবাই আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ আমাদের এসব কথা শুনছিল।

সে বাধা দিয়ে বলল, "কিন্তু সেক্ষেত্রে ছাগলের দুধ খেতে নিশ্চয়ই তোমার আপত্তি থাকবে না।"

ডাক্তারও সায় দিয়ে বললেন, "যদি ছাগ-দুধ পান করেন তাহলেই যথেষ্ট।"

আমি রাজি হলাম। সত্যাগ্রহ সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয়ার প্রবল আগ্রহ আমার ভেতর বাঁচার জোরালো ইচ্ছে জাগিয়ে তুলল। সুতরাং আমি আমার শপথের কথার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে বিসর্জন দিলাম। কারণ যদিও আমি শপথ গ্রহণকালে গরু-মহিষের কথা মনে রেখে শপথ নিয়েছিলাম, স্বাভাবিকভাবেই তা সকল প্রাণীর দুধের বেলায় প্রযোজ্য। আর যতদিন আমি মনে করব যে দুধ মানুষের স্বাভাবিক খাবার নয় ততদিন পর্যন্ত আমার দুধপান করা উচিত নয়। এসব জানা সত্ত্বেও আমি ছাগ-দুধ পান করতে রাজি হলাম। বাঁচার ইচ্ছা সত্যের প্রতি অনুরাগের চেয়ে প্রবল বলে প্রমাণিত হলো এবং একবারের জন্য হলেও সত্যের পূজারী সত্যাগ্রহ সংগ্রামের স্বার্থে তার পবিত্র আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলো। এ ঘটনার স্মৃতিচারণে আমার বুকের ভিতর যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে ওঠে, আমাকে অনুতাপে দগ্ধ করে এবং আমি সারাক্ষণ চিন্তা করছি কিভাবে ছাগ-

www.pathagar.com

দুধ ছেড়ে দেয়া যায়। কিন্তু আমি আজো সেই সূক্ষ্মতম লোভ, সেবার বাসনা যা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারিনি।

অহিংসার বিষয়ে গবেষণার অংশ হিসেবে পথ্য বিদ্যায় আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমার কাছে প্রিয়। এগুলো আমার কাছে বিনোদন ও আনন্দদায়ক। কিন্তু আমার ছাগ-দুধ পান পথ্য সংক্রান্ত অহিংসার দৃষ্টিকোণ হতে ততটা পীড়া দেয় না, যতটা সত্যের বরখেলাপের জন্য, কারণ এটা আমার জন্য শপথ ভঙ্গের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। আমার মনে হয় অহিংসার চেয়ে সত্যের আদর্শ আমি ভালো বুঝি এবং আমার অভিজ্ঞতাও বলে যে আমি যদি সত্যকে ছেড়ে দেই, তাহলে কখনোই অহিংসার ধাঁধার সমাধান খুঁজে পাব না। সত্যের আদর্শের দাবি হলো শপথ গ্রহণ করলে তা কথায় ও অন্তরে পালন করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে আমি কেবল শপথের কথার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে এর আত্মাকে হত্যা করেছি এবং সেটাই আমাকে পীড়া দেয়। কিন্তু এরূপ পরিষ্কার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আমার সামনের পথ আমি সোজা দেখতে পাচ্ছি না। অন্য কথায় বলতে গেলে সম্ভবত সোজা পথে চলার সাহস আমার নেই। গোড়াতে দুটোই এক ও অভিন্ন, কারণ সন্দেহ নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাসের অভাব বা দুর্বলতার ফল। সুতরাং আমার দিবা-রাত্রির প্রার্থনা হলো "ঈশ্বর, আমার বিশ্বাস পোক্ত করো।"

আমি ছাগ-দুধ পান শুরু করার অল্পদিন পরেই ডা. দালাল আমার ফিসারের সফল অপারেশন করলেন। শরীর সেরে ওঠার সাথে সাথে আমার বাঁচার ইচ্ছাও পুনর্জাগরিত হলো, বিশেষ করে তা এ কারণে যে ঈশ্বর আমার জন্য কাজ জমা করে রেখেছিলেন।

আমি অসুস্থতা থেকে সেরে উঠতে না উঠতেই সংবাদপত্র পড়তে গিয়ে এতে রাউলাট কমিটির সদ্য প্রকাশিত রিপোর্টটি পড়লাম। এর সুপারিশগুলো আমাকে চমকে দিল। শংকরলাল বংকর ও উমর সোবহানী আমাকে এ ব্যাপারে দ্রুত কিছু করার জন্য অনুরোধ জানালেন। মাসখানেকের মধ্যে আমি আহমেদাবাদে গেলাম। বল্লভভাই আমাকে প্রায় প্রতিদিন দেখতে আসতেন, আমি তাকে আমার আশঙ্কার কথা জানালাম। আমি তাকে বললাম, "কিছু একটা অবশ্যই করতে হবে।" এর জবাবে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, " কিন্তু এ পরিস্থিতিতে আমরা কি করতে পারি?" আমি জবাব দিলাম, "এটা প্রতিরোধের জন্য যদি অল্প কজন লোকের স্বাক্ষর নেয়া যায় এবং তা অগ্রাহ্য করে যদি প্রস্তাবিত ব্যবস্থাবলী আইনে পরিণত হয়, তাহলে দেরী না করে এখনই আমাদের সত্যাগ্রহ শুরু করা উচিত। আমি যদি এভাবে বিছানায় পড়ে না থাকতাম তাহলে একাই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতাম এবং অন্যরাও আমার অনুসরণ করবে বলে আশা করতাম। কিন্তু আমার শরীরের বর্তমান এ অসহায় অবস্থায় আমি নিজেকে একাজের জন্য একেবারেই অনুপযুক্ত মনে করছি।"

এসব কথাবার্তার পরে আমার সাথে যোগাযোগ আছে এমন ব্যক্তিদের নিয়ে ছোট একটি সভা আহ্বানের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। আমার মনে হলো রিপোর্টে প্রকাশিত স্বাক্ষর থেকে রাউলাট কমিটির সুপারিশগুলোর ন্যায্যতা প্রমাণিত হয় না

www.pathagar.com

এবং আমার মতে সেগুলো এমন যে আত্ম-সম্মানবোধসম্পন্ন কোনো লোকই তা মেনে নিতে পারে না।

অবশেষে প্রস্তাবিত সভাটি আশ্রমে অনুষ্ঠিত হলো। জনা কুড়ি লোককে এতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে, যারা এতে যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যরা ছাড়াও ছিলেন বল্লভভাই, শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু, মি. হরনিব্যান, প্রয়াত মি. উমর সোবহানী, শ্রীযুক্ত শংকরলাল বংকর এবং শ্রীমতি অনুসূয়াবেন। এ মিটিং-এ সত্যাগ্রহ অঙ্গীকার নামার খসড়া করা হলো এবং আমার যতদূর মনে পড়ে, উপস্থিত সকলে তা স্বাক্ষর করলেন। আমি তখন কোনো পত্রিকা সম্পাদনা করছিলাম না, কিন্তু দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে মাঝে মধ্যে আমার মতামত প্রকাশ করতাম। এক্ষেত্রে আমি সে পদ্ধতি কাজে লাগালাম। শংকরলাল বংকর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে আন্দোলন গড়ে তুললেন এবং এই প্রথম আমি তার সাংগঠনিক ও দীর্ঘমেয়াদী কাজের দায়িত্ব গ্রহণের আশ্চর্য ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারলাম।

বিদ্যমান কোনো প্রতিষ্ঠান সত্যাগ্রহের মতো নতুন অস্ত্র তুলে নেবে এমনটা আশা করা যেহেতু বৃথা মনে হলো, আমার উদ্যোগে "সত্যাগ্রহ সভা" নামে একটি পৃথক সংগঠন স্থাপিত হলো। এর প্রধান সদস্যদের নেয়া হলো বোম্বে থেকে, আর তাই এর হেডকোয়ার্টার বোম্বেতেই স্থাপন করা হলো। সত্যাগ্রহে যোগ দিতে আগ্রহীরা বিপুল সংখ্যায় সত্যাগ্রহ অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করতে লাগল, বুলেটিন (পুস্তিকা) প্রকাশ করা হলো এবং খেদা অভিযানের আদলে সর্বত্র জনসভা অনুষ্ঠিত হতে থাকল।

আমি সত্যাগ্রহ সভার প্রেসিডেন্ট হলাম। শীঘ্রই আমি বুঝতে পারলাম এ সভার সদস্যভুক্ত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠি ও আমার মধ্যে কোনো চুক্তি সম্পাদনের তেমন সম্ভাবনা নেই। সভায় গুজরাটি ভাষা ব্যবহার ও কর্ম সম্পাদনে আমার কিছু কিছু বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে আমার অনড় মনোভাব তাদের মধ্যে বেশ উদ্বেগ ও বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করল। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলতে চাই যে তাদের অধিকাংশই উদারতার সাথে আমার খাম-খেয়ালীপনা মেনে নিয়েছিলেন।

কিন্তু একেবারে প্রথম থেকেই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে সভা বেশিদিন স্থায়ী হবে না। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম ইতিমেধ্যই সভার অনেক সদস্যই সত্য ও অহিংসার ওপর আমার গুরুত্ব প্রদানকে অপছন্দ করতে শুরু করেছেন। তা সত্ত্বেও প্রথম দিকে আমাদের নতুন কর্মকাণ্ড পূর্ণ উদ্যমে চলতে থাকল এবং আন্দোলন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল।

ত্রিশ
সেই অপূর্ব দৃশ্য

এভাবে একদিকে রাউলাট কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনের আকার ও তীব্রতা বৃদ্ধি পেল, অপরদিকে গভর্নমেন্ট তার রিপোর্টের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য আরো বেশি বেশি স্থির প্রতিজ্ঞ হলো এবং রাউলাট বিল প্রকাশ করা হলো।

www.pathagar.com

আমি ভারতের লেজিসলেটিভ চেম্বারের কর্মপন্থা দেখার জন্য জীবনে একবারই সেখানে গিয়েছি এবং তা এই বিলের ওপর বিতর্ক অনুষ্ঠানকালে। শাস্ত্রীজী একটা আবেগপূর্ণ ভাষণ দিলেন, যে ভাষণে তিনি গভর্নমেন্টের প্রতি গম্ভীর সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। ভাইসরয়কে মনে হলো মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে ভাষণ শুনছেন, তার চোখ শাস্ত্রীজীর মুখের ওপর নিবদ্ধ, যে মুখ থেকে অনর্গল উত্তপ্ত বাক্যস্রোত বেরিয়ে আসছে। ঐ মুহূর্তে মনে হচ্ছিল যেন ভাইসরয় গভীরভাবে প্রভাবিত না হয়ে পারবেন না, তা এতই জীবন্ত ও আবেগময় ছিল।

কিন্তু সত্যিকার ঘুমন্ত লোককেই কেবল জাগানো যায়, যে ঘুমের ভান করে তাকে জাগানোর যত চেষ্টাই করা হোক না কেন তাতে কোনো ফল হবে না। বাস্তবে গভর্নমেন্টের অবস্থা তাই ছিল। গভর্নমেন্ট শুধু আইনগত আনুষ্ঠানিকতার প্রহসন সম্পন্ন করতে আগ্রহী ছিল। তাদের সিদ্ধান্ত আগেই নেয়া হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং শাস্ত্রীজীর গম্ভীর সতর্কবাণী গভর্নমেন্টের ওপর কোনোই প্রভাব ফেলল না।

এ পরিস্থিতিতে আমার চীৎকার হবে অরণ্যে রোদন। আমি ভাইসরয়কে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করলাম। আমি তাকে সম্বোধন করে ব্যক্তিগতভাবে জনগণের পক্ষ থেকে পত্র লিখলাম যার মাধ্যমে আমি পরিষ্কার করে বললাম যে গভর্নমেন্টের গৃহীত পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে সত্যাগ্রহের আশ্রয় নেয়া ছাড়া আমার জন্য আর কোনো পথ খোলা রইল না। কিন্তু সবই বৃথা হলো।

বিলটি তখন আইন আকারে গেজেটে প্রকাশিত হয়নি। আমার শরীরের অবস্থা খুব দুর্বল ছিল, কিন্তু আমি যখন মাদ্রাজ থেকে আমন্ত্রণ পেলাম আমি লম্বা পথ ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিলাম। সে সময়ে আমি সভায় প্রয়োজন মত উচ্চস্বরে কথা বলতে পারছিলাম না। মিটিং-এ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করার শক্তিও তখন ছিল না। দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে গেলেই আমার সম্পূর্ণ শরীর কাঁপতে থাকে এবং বক্তৃতা শুরু করার চেষ্টা করতেই বুকে প্রচণ্ড ধরফড়ানি শুরু হয়।

দক্ষিণ ভারতে আমি সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছি। আমার দক্ষিণ আফ্রিকার কাজকে ধন্যবাদ। আমার মনে হয় তামিল ও তেলেগু জনগণের ওপর আমার এক ধরনের বিশেষ অধিকার রয়েছে এবং দক্ষিণের ভালো মানুষেরা সে বিশ্বাসকে কখনো মিথ্যা প্রমাণ করেনি। আমন্ত্রণ পত্রটা এসেছিল প্রয়াত শ্রীযুক্ত কস্তরীরাঙ্গা আইয়েঙ্গার এর স্বাক্ষরে। কিন্তু আমি পরে মাদ্রাজের পথে ভ্রমণকালে জানতে পারলাম আমন্ত্রণের পিছনে সক্রিয় ব্যক্তি হলেন রাজা গোপালাচারী। বলা যেতে পারে তার সাথে এটাই আমার প্রথম পরিচয়, বিশেষ করে এবারেই প্রথম আমরা একে অপরকে ব্যক্তিগতভাবে চিনলাম।

রাজা গোপালাচারী তখন শ্রীযুক্ত কস্তরীরাঙ্গা আইয়েঙ্গার-এর মতো বন্ধুদের চাপাচাপি ও অনুরোধে সবেমাত্র সালেম ত্যাগ করে মাদ্রাজে আইন ব্যবসার জন্য বসতি স্থাপন করেছেন, এবং এর পেছনের উদ্দেশ্য ছিল আরো বেশি করে জনগণের কাজে অংশগ্রহণ। মাদ্রাজে আমরা তার বাড়িতেই উঠলাম। তার সাথে মাত্র দিন দুই থেকেই আমি এ তথ্য জানতে পারলাম। কারণ, যে বাংলোতে

www.pathagar.com

আমরা উঠেছি সেটির মালিক যেহেতু কস্তরীরাঙ্গা আইয়েঙ্গার, আমার ধারণা হয়েছিল যে আমরা তারই অতিথি। মহাদেব দেশাই আমাকে শুধরে দিলেন। তিনি খুব দ্রুত রাজা গোপালাচারীর সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচিতি গড়ে তুললেন, যিনি স্বভাবজাত লাজুকতার কারণে নিজেকে সর্বদা পর্দার আড়ালে রাখতেন। কিন্তু মহাদেব আমাকে সঠিক পথে পরিচালনা করলেন। তিনি আমাকে একদিন বললেন, "আপনার কাজ এই ব্যক্তির সাথে, একে আপনার গড়ে নিতে হবে।"

এবং আমি তাই করলাম। আমরা প্রতিদিন যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতাম কিন্তু জনসভা অনুষ্ঠানের বেশি অন্য কোনো কর্মসূচীর কথা আমি তখন ভাবতে পারতাম না। রাউলাট বিল যদি শেষ পর্যন্ত পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয়, তাহলে এর বিরুদ্ধে কিভাবে আমি নাগরিক আইন অমান্য করা শুরু করব তা ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। কেবল গভর্নমেন্ট সুযোগ দিলেই কেউ আইন অমান্য করতে পারে। সে ব্যাপারে ব্যর্থ হলে, আমরা কি অন্য দেওয়ানী আইন অমান্য করতে পারি? তা যদি সম্ভব হয় তাহলে এর সীমারেখা কতদূর হবে? এগুলো এবং আরো অনেক প্রশ্ন আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হলো।

এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে শ্রীযুক্ত কস্তরীরাঙ্গা আইয়েঙ্গার নেতাদের একটা ছোট সম্মেলন ডাকলেন। যারা এতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘবাচারী। তিনি পরামর্শ দিলেন আমার উচিত সত্যাগ্রহ বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা সহ একটি সংক্ষিপ্ত ম্যানুয়াল রচনা করা। এ কাজটা করা আমার সামর্থ্যের বাইরে ছিল এবং আমি তার কাছে সেটা স্বীকারও করলাম।

আমরা যখন এ ধরনের চিন্তাভাবনা করছিলাম তখন খবর এলো রাউলাট বিল আইন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। সে রাতে এ প্রসঙ্গে চিন্তা করতে করতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরের দিকে আমি অন্য দিনের চেয়ে কিছুটা আগে জেগে উঠলাম। সেই ঊষালগ্নে তখনো আমার আধাঘুম আধা জাগ্রত অবস্থায় হঠাৎ করে স্বপ্নে দেখার মতো ধারণাটা মাথায় এলো। ভোর বেলাতেই আমি পুরো ঘটনাটা রাজা গোপালাচারীকে বললাম।

"গত রাতে স্বপ্নে আমি ধারণা পেলাম যে আমাদের সারা দেশব্যাপী সাধারণ হরতাল আহ্বান করা উচিত। সত্যাগ্রহ একটা আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়া এবং আমাদের সংগ্রাম হলো পবিত্র সংগ্রাম এবং আমার মনে হচ্ছে এ কাজটা আত্মশুদ্ধির পদক্ষেপ দিয়ে শুরু করাই যথোপোযুক্ত হবে। সুতরাং ভারতের সকল মানুষের উচিত ঐ দিন সকল কাজকর্ম বন্ধ রেখে উপোষ ও প্রার্থনার মাধ্যমে দিনটি পালন করা। মুসলমানরা একদিনের বেশি উপোষ নাও করতে পারে, তাই উপোসের মেয়াদ হবে চব্বিশ ঘন্টা। এটা বলা খুবই শক্ত যে আমাদের এ আবেদনে সকল প্রদেশের লোক সাড়া দেবে কি না, তবে বোম্বে, মাদ্রাজ, বিহার ও সিন্ধুর ব্যাপারে আমি মোটামুটি নিশ্চিত। আমার মনে হয় যদি এ কয়টি স্থানের লোকেরাও হরতাল যথাযোগ্যভাবে পালন করে, তাহলেও আমাদের সন্তুষ্টির যথেষ্ট কারণ আছে।"

www.pathagar.com

রাজা গোপালাচারী সাথে সাথেই আমার পরামর্শ লুফে নিলেন। অন্য বন্ধুরাও যখন শুনলেন তারাও এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেন। আমি একটা আবেদনের মুসাবিদা করলাম। হরতালের তারিখ নির্ধারিত হলো ১৯১৯ সালের ৩০শে মার্চ, কিন্তু পরে তা পরিবর্তন করে ৬ই এপ্রিল করা হলো। এর ফলে জনগণ হরতালের জন্য সংক্ষিপ্ত সময়ের নোটিশ পেল। যেহেতু তৎক্ষণাৎ কাজ শুরু করতে হচ্ছিল সেহেতু এর চেয়ে দীর্ঘ সময়ের নোটিশ দেয়া সম্ভব ছিল না।

কিন্তু এসব কিভাবে ঘটল তা কে জানে? ঐ দিন সম্পূর্ণ ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, শহরে-গ্রামে সর্বত্র সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হলো। এটা ছিল সবচেয়ে আশ্চর্য এক দৃশ্য।

একত্রিশ
সেই স্মরণীয় সপ্তাহ

দক্ষিণ ভারতে সংক্ষিপ্ত সফরের পর শ্রীযুক্ত শংকরলাল বংকরের তারবার্তা পেয়ে সম্ভবত এপ্রিলের ৪ তারিখে বোম্বেতে ফিরে এলাম। তারবার্তায় ৬ই এপ্রিলের হরতাল উদযাপনে আমাকে হাজির থাকতে বলা হয়েছিল।

ইতিমধ্যে দিল্লীতে ৩০শে মার্চ তারিখেই হরতাল পালিত হলো। প্রয়াত স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী ও হাকিম আজমল খান সাহেবের কথাই সেখানে আইন। ৩০শে মার্চের হরতাল স্থগিত করে ৬ই এপ্রিলে পালনের তারবার্তা দিল্লীতে দেরীতে পৌঁছেছিল। আগে কখনো দিল্লীবাসী এমন হরতাল দেখেনি। হিন্দু-মুসলমান মিলে যেন একদেহ একপ্রাণ হয়ে গিয়েছিল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীকে জুম্মা মসজিদে ভাষণ দেবার আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন। এতসব ঘটনা ছিল কর্তৃপক্ষের সহ্যসীমার অতীত। হরতালের মিছিল যখন রেলওয়ে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল পুলিশ তা রুখে দাঁড়াল এবং গুলি চালাল, এতে অনেকে নিহত হলো এবং দিল্লীতে দমন-পীড়নের রাজত্ব শুরু হলো। শ্রদ্ধানন্দজী আমাকে জরুরিভাবে দিল্লীতে ডেকে পাঠালেন। ফেরৎ তারবার্তায় আমি জানালাম যে বোম্বেতে ৬ই এপ্রিলের হরতাল পালন শেষ করেই আমি দিল্লীর পথে রওনা হব।

দিল্লীর ঘটনার কম-বেশি পুনরাবৃত্তি ঘটল লাহোর ও অমৃতসরে। অমৃতসর থেকে ডা. সত্যপাল ও ডা. কিচলু সেখানে যাবার জন্য আমাকে জরুরি অনুরোধ বার্তা পাঠালেন। সে সময়ে তাদের সাথে আমার আদৌ পরিচয় ছিল না, কিন্তু দিল্লীর পরে অমৃতসর যাবার ইচ্ছে আছে বলে আমি তাদেরকে জানালাম।

৬ তারিখ ভোর বেলায় বোম্বের নাগরিকরা চৌপাটিতে জড়ো হলো সমুদ্র স্নানের জন্য। তারপর তারা মিছিল সহকারে ঠাকুরদ্বার গেল। মিছিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক মহিলা ও শিশুরাও ছিল। মুসলমানরাও বিপুল সংখ্যায় এতে যোগ দিয়েছিল। ঠাকুরদ্বার থেকে মিছিলে আমরা যারা ছিলাম তাদের মধ্য থেকে ক'জনকে মুসলমান বন্ধুরা ধরে নিয়ে গেল নিকটবর্তী এক মসজিদে যেখানে মিসেস নাইডু ও আমাকে বক্তৃতা করতে হলো। শ্রীযুক্ত বিতালদাস জেরাজানি প্রস্তাব

www.pathagar.com

করলেন যে আমাদের উচিত ঐ মুহূর্তে এবং ঐ স্থানেই স্বদেশী এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের শপথ গ্রহণের ঘোষণা দেয়া, কিন্তু শপথ করা এবং করানোর ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা উচিত নয় এবং জনগণ যা করছে তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত এ যুক্তিতে আমি ঐ প্রস্তাবে বাধা দিলাম। আমি যুক্তি দেখালাম একবার শপথ নেয়া হলে, পরে তা কখনো ভঙ্গ করা যায় না, সুতরাং স্বদেশী শপথের তাৎপর্য আগে স্পষ্টভাবে বুঝা প্রয়োজন এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের শপথের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুদায়িত্বও সকলকে ভালো করে বুঝতে হবে। সবশেষে আমি পরামর্শ দিলাম যে যারা শপথ নিতে চায় তারা পরদিন সকালে এ উদ্দেশে পুনরায় সমবেত হতে পারে।

বলা বাহুল্য যে বোম্বের হরতাল পুরোপুরি সফল হলো। নাগরিক আইন অমান্য শুরু করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে দু'তিনটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছিল। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে কেবল সেই সব আইনের ক্ষেত্রে নাগরিক আইন অমান্য করা হবে যেগুলো জনগণ সচরাচর অমান্য করে থাকে। লবণকর এ ধরনের একটি চরম অপ্রিয় আইন যা বাতিল করানোর জন্য গত কিছুদিন যাবৎ জোর আন্দোলন চলছিল। তাই আমি পরামর্শ দিলাম যে লবণ আইন ভঙ্গ করে জনগণ সমুদ্রের পানি থেকে তাদের ঘরেই লবণ তৈরি করে নিতে পারে। আমার অন্য পরামর্শ ছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত পুস্তিকা বিক্রয় সম্পর্কিত। আমার দুটি বই 'হিন্দ স্বরাজ' ও 'সর্বোদয়া' (রাশকিনের Unto This Last বই এর গুজরাটী সংস্করণ) যা ইতিমধ্যেই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, এ ব্যাপারে বেশ কাজে লাগল। এগুলো ছাপানো ও প্রকাশ্যে বিক্রী করা নাগরিক আইন অমান্যের সবচেয়ে সহজ পন্থা বলে মনে হলো। তাই এ বইগুলো যথেষ্ট সংখ্যায় ছাপানো হলো এবং সেদিন সভার পরে তা বিক্রির ব্যবস্থা নেয়া হলো। তদনুযায়ী ৬ তারিখ বিকেলে স্বেচ্ছসেবী সেনাদল জনগণের মাঝে নিষিদ্ধ বই বিক্রীর জন্য এগিয়ে এলো। শ্রীমতি সরোজনী দেবী ও আমি গাড়িতে করে বের হলাম। বই দুটোর সব কপি বিক্রী হয়ে গেল। বিক্রীলব্ধ টাকা নাগরিক আইন অমান্য অভিযান এগিয়ে নেয়ার কাজে ব্যয় করার জন্য রাখা হলো। বই দুটোর প্রতি কপির দাম রাখা হয়েছিল চার আনা করে কিন্তু আমার মনে পড়ে না কেউ আমার কাছ থেকে তা কেবল নির্ধারিত দামে কিনেছে। অনেক লোক বই কিনতে তাদের পকেটে যা ছিল সবই দিয়ে দিয়েছিল। মাত্র এক কপি বই এর দাম হিসেবে পাঁচ টাকা দশ টাকার নোট একেবারে উড়ে আসতে লাগল। আমার মনে পড়ে একটা কপি পঞ্চাশ টাকায়ও বিক্রী হয়েছিল। জনগণকে ভালো করে বোঝানো হয়েছিল যে এ নিষিদ্ধ বই কেনার জন্য তাদেরকে গ্রেফতার করা ও জেল দেয়া হতে পারে। কিন্তু সে মুহূর্তে তারা জেলে যাবার ভয় ঝেড়ে ফেলেছিল।

পরে জানা গেল যে গভর্নমেন্ট নিজ সুবিধামতো ধরে নিয়েছিল যে কোনো নিষিদ্ধ বই বিক্রী করা হয়নি এবং আমরা যে বইগুলো বিক্রী করেছি তা নিষিদ্ধ বই এর আওতায় পড়ে না। পুনঃমুদ্রিত বইগুলোকে নিষিদ্ধ বই এর নতুন সংস্করণ

www.pathagar.com

বলে গণ্য করা হলো যা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ নয়। এ খবরে সাধারণ লোকজন কিছুটা হতাশ হলো।

পরদিন সকালে আরেকটা সভা করা হলো স্বদেশী ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের শপথ করানোর জন্য। বিথালদাস জিরাজানী প্রথমবারের মতো বুঝতে পারলেন যে কোনো বস্তু চকচক করলেই তা সোনা হয় না। মাত্র কয়েকজন আগ্রহী পাওয়া গেল। বিশেষ করে কয়েকজন ভগ্নির কথা আমার মনে পড়ে যারা ঐ উপলক্ষ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। পুরুষ মানুষ যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। আমি আগেই শপথ নামার খসড়া করে সাথে নিয়ে এসেছিলাম। শপথ বাক্য পাঠ করানোর আগে উপস্থিত সকলের সামনে আমি তার অর্থ ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বললাম। উপস্থিতি কম হওয়ায় আমি ব্যথিত বা আশ্চর্য হইনি, কারণ জনগণের মানসিকতার এ বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য আমি লক্ষ্য করেছি যে উত্তেজনাপূর্ণ কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ বেশি থাকে, আর গঠনমূলক শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা তারা পছন্দ করে না। এ পার্থক্য আজো অব্যাহত রয়েছে।

কিন্তু এ বিষয়টি আমি আলাদা একটা অধ্যায়ে উল্লেখ করব। মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ৭ তারিখ রাতে আমি দিল্লী ও অমৃতসরের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। ৮ তারিখে মথুরায় পৌছে আমি আমার সম্ভাব্য গ্রেফতারের গুজব শুনতে পেলাম। মথুরার পরবর্তী বিরতি স্টেশনে আচার্য গিদওয়ানী আমার সাথে দেখা করতে এলেন এবং নিশ্চিত খবর জানালেন যে আমাকে গ্রেফতার করা হবে এবং প্রয়োজনবোধে তার সাহায্য নিতে বললেন। আমি তার সাহায্যের প্রস্তাবের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানালাম এবং আশ্বাস দিলাম যে যখনই প্রয়োজন মনে করব আমি তার সাহায্য গ্রহণ করতে ভুলব না।

আমার ট্রেন পালওয়াল রেলওয়ে স্টেশনে পৌছার আগেই আমাকে এই মর্মে একটি লিখিত আদেশ প্রদান করা হলো যে পাঞ্জাবের সীমানার মধ্যে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ সেখানে আমার উপস্থিতির কারণে শান্তি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পুলিশ আমাকে ট্রেন থেকে নামতে বলল। আমি নামতে অস্বীকার করে বললাম, "আমি জরুরি আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে পাঞ্জাবে যাচ্ছি, কোনো অস্থিরতা উস্কে দিতে নয় বরং অস্থির পরিস্থিতি শান্ত করতে। সুতরাং আমি দুঃখিত যে এ আদেশ আমার পক্ষে মানা সম্ভব নয়।"

অবশেষে ট্রেন পালওয়াল স্টেশনে পৌছল। মহাদেব আমার সাথে ছিলেন। আমি তাকে দিল্লী গিয়ে এখানে যা ঘটেছে তার সংবাদ স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীকে বলতে এবং জনগণকে শান্ত থাকতে বললাম। তাকে গিয়ে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে কেন আমি আমাকে প্রদত্ত আদেশ অমান্য করার এবং আদেশ অমান্যের জন্য শাস্তি ভোগের সিদ্ধান্ত নিলাম এবং এটাও ব্যাখ্যা করতে যে আমার ওপর শাস্তি আরোপ করা সত্ত্বেও যদি আমরা পরিপূর্ণ শান্তি বজায় রাখতে পারি তবে কেন তা ভাইসরয়কে আমাদের পক্ষে আকৃষ্ট করবে।

www.pathagar.com

পালওয়াল স্টেশনে আমাকে ট্রেন থেকে নামিয়ে পুলিশের হেফাজতে রাখা হলো। অল্পক্ষণের মধ্যে দিল্লী থেকে একটা ট্রেন এলো। পুলিশের পাহারায় আমাকে একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠতে বাধ্য করা হলো। মথুরায় পৌছার পর আমাকে পুলিশ ব্যারাকে নেয়া হলো, কিন্তু কোনো পুলিশ কর্মচারী বলতে পারল না আমাকে নিয়ে তারা কি করতে চায় অথবা এরপর আমাকে কোথায় নেয়া হবে। পরদিন ভোর চারটায় আমাকে জাগানো হলো এবং বোম্বেগামী একটা মালগাড়িতে আমাকে তুলে দেয়া হলো। দুপুরে আমাকে আবার সওয়াই মাধোপুর স্টেশনে নামানো হলো। পুলিশ ইন্সপেক্টর মি. বাউরিং লাহোরগামী একটা ট্রেনে এখানে এসে পৌছালেন এবং আমার দায়িত্ব নিলেন। তার সাথে আমাকে একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠানো হলো এবং একজন সাধারণ কয়েদী থেকে আমি "ভদ্রলোক" কয়েদীতে উন্নীত হলাম। অফিসারটি স্যার মাইকেল ও'ডয়ার এর লম্বা প্রশস্তি গাথা শুরু করলেন। তিনি বলে চললেন, আমার বিরুদ্ধে স্যার মাইকেলের ব্যক্তিগত কোনো অভিযোগ নেই, কেবলমাত্র আমি পাঞ্জাবে প্রবেশ করলে সেখানে শান্তি বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। সবশেষে তিনি আমাকে স্বেচ্ছায় বোম্বে ফিরে যেতে এবং পাঞ্জাবের সীমান্ত অতিক্রম না করতে রাজি হওয়ার অনুরোধ জানালেন। আমি জবাব দিলাম যে সম্ভবত আমি আদেশ মানতে পারব না এবং স্বেচ্ছায় ফিরে যেতেও আমি প্রস্তুত নই। এর প্রেক্ষিতে অফিসারটি আর কোনো উপায়ন্তর না দেখে বললেন তাহলে তিনি আমার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু আমাকে নিয়ে আপনারা কি করতে চান?" তিনি জবাব দিলেন যে তিনি নিজেও তা জানেন না, তবে পরবর্তী আদেশের অপেক্ষা করছেন। তিনি বললেন, "আপাতত আপনাকে আমি বোম্বে নিয়ে যাচ্ছি।"

আমরা সুরাট পৌছলাম। এখানে আমাকে আরেকজন পুলিশ অফিসারের নিকট হস্তান্তর করা হলো। আমরা যখন বোম্বে পৌছলাম অফিসারটি বললেন, "আপনি এখন মুক্ত।" তিনি আরো বললেন, "তবে ভালো হবে যদি আপনি মেরিন লাইনের নিকট নেমে যান, আপনার জন্য আমি সেখানে ট্রেন থামানোর ব্যবস্থা করব। কোলাবাতে বিরাট জনসমাগম হওয়ার সম্ভবনা আছে।" আমি তাকে বললাম যে আমি তার ইচ্ছে পূরণ করতে পারলে খুশী হব। তিনি খুশী হলেন এবং আমাকে ধন্যবাদ জানালেন। তদনুযায়ী আমি মেরিন লাইনে নেমে গেলাম। ঠিক সে সময়ে ঘটনাচক্রে এক বন্ধুর গাড়ি সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। গাড়িটি আমাকে তুলে নিয়ে রেবাশংকর জাবেরীর বাড়িতে নামিয়ে দিল। এ বন্ধুটি আমাকে বললেন যে আমার গ্রেফতারের খবর জনগণকে উত্তেজিত করেছে এবং তাদেরকে উন্মত্ত করে তুলেছে। তিনি আরো বললেন, "পাইধুনির নিকটে যে কোনো মুহূর্তে বিক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটার আশঙ্কা রয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ ইতিমধ্যেই সেখানে পৌছে গেছে।"

www.pathagar.com

আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছতেই ওমর সোবহানী ও অনুসূয়াবেন আমার কাছে এসে বলল এক্ষুনি মোটর গাড়িতে পাইধুনি চলুন। জনগণ অধৈর্য হয়ে উঠেছে, তারা চরমভাবে উত্তেজিত হয়ে আছে। আমরা তাদেরকে শান্ত করতে পারছি না। শুধুমাত্র আপনার উপস্থিতি তাদেরকে শান্ত করতে পারে।

আমি গাড়িতে উঠলাম। পাইধুনির কাছে পৌঁছতেই দেখতে পেলাম বিরাট জনতার সমাবেশ। আমাকে দেখে তারা আনন্দে পাগল হয়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ একটা মিছিল সংগঠিত করা হলো এবং আকাশ বিদীর্ণ করে ধ্বনি উঠল 'বন্দে মাতরম' এবং 'আল্লাহু আকবার'। পাইধুনিতে আমরা একদল অশ্বারোহী পুলিশ দেখতে পেলাম। ওপর থেকে বৃষ্টির মতো ভাঙা ইট পড়ছিল। আমি জনতাকে শান্ত হওয়ার অনুরোধ করলাম, কিন্তু মনে হলো যেন ইটবৃষ্টি থেকে আমরাও রেহাই পাব না। আব্দুর রহমান স্ট্রীট থেকে মিছিলটি বের হয়ে যখন ক্রফোর্ড মার্কেটের দিকে অগ্রসর হতে যাচ্ছিল হঠাৎ তারা একদল অশ্বারোহী পুলিশের সম্মুখীন হলো, যারা এখানে এসেছে মিছিলটা দুর্গের দিকে যেতে বাধা দিতে। জনতা লোকে গাদাগাদি ছিল। তারা পুলিশের কর্ডন প্রায় ভেদ করে ফেলেছিল। এই বিশাল জনসমুদ্রে আমার কথা শুনতে পাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। ঠিক তখনই পুলিশের অধিনায়ক কর্মকর্তা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার নির্দেশ দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ পুলিশের দল তাদের লাঠি ঘুরিয়ে জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্য মনে হলো আমিও আহত হব। কিন্তু আমার আশঙ্কা অমূলক ছিল, কারণ তারা গাড়ির পাশ দিয়ে দ্রুত চলে যাবার সময় তাদের হাতের লাঠি গাড়িটিকে হালকাভাবে ছুঁয়ে গেল। মানুষের সারি দ্রুত ভেঙে পড়ল, এবং তারা পুরোপুরি হতবিহ্বল হয়ে পড়ল যা শীঘ্রই বিশৃংখলায় পরিণত হলো। কেউ কেউ পদদলিত হলো, অন্যরা গুরুতর আঘাতে ও ভীড়ের চাপে চ্যাপটা হয়ে গেল। সেই গাদাগাদি মানুষের স্তূপের মধ্যে না ছিল ঘোড়া যাতায়াতের কোনো জায়গা, আর না ছিল জনতার ছত্রভঙ্গ হয়ে বের হয়ে যাবার কোনো পথ। সুতরাং অশ্বারোহীরা চোখ বুজে জনতার ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। আমি কল্পনাও করতে পারলাম না তারা কি দেখতে পাচ্ছে না যে তারা কি করছে। পুরো ঘটনাটা এক ভয়ংকর দৃশ্যের অবতারণা করল। ঘোড়াসওয়ার এবং জনতা একত্রে মিলে পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে থাকল।

এভাবে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হলো এবং তাদের অগ্রগতি রোধ করা হলো। আমাদের মোটরগাড়ি এগিয়ে যেতে দেয়া হলো। আমি কমিশনারের অফিসের সামনে গাড়ি থামিয়ে দিলাম এবং পুলিশের আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ করতে নেমে পড়লাম।

বত্রিশ

সেই স্মরণীয় সপ্তাহ-২

সুতরাং আমি কমিশনার মি. গ্রিফিথের অফিসে গেলাম। অফিসে যাবার সিঁড়ির পাশে পুরো এলাকায় আপাদমস্তক অস্ত্রধারী সৈন্যদের দেখলাম, যেন তারা যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে আছে। বারান্দা জুড়ে উত্তেজিত লোকের আনাগোনা দেখলাম।

www.pathagar.com

আমাকে যখন অফিসে ঢুকতে দেয়া হলো আমি মি. বাউরিংকে মি. গ্রিফিথের সাথে বসা দেখতে পেলাম।

আমি যে দৃশ্য দেখেছি কমিশনারের কাছে তার বর্ণনা দিলাম। তিনি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, "মিছিলটা দুর্গের দিকে যাক সেটা আমি চাইনি। সেখানে যেতে দিলে অবশ্যই শান্তি ভঙ্গ হতো এবং যেহেতু দেখলাম যে মানুষকে বুঝিয়ে বললে শুনবে না, তাই অশ্বারোহী পুলিশকে জনতার মধ্যে লাঠিচার্জ করতে আদেশ দেয়া ছাড়া আমার অন্য কোনো উপায় ছিল না।

আমি বললাম, "কিন্তু আপনি কি জানতেন এর পরিণতি কি হবে? ঘোড়াগুলো বাধ্য হয়েছে মানুষকে পদদলিত করতে। আমার মনে হয় অশ্বারোহী দল পাঠানোর কোনো প্রয়োজনই ছিল না।"

মি. গ্রিফিথ বললেন, "সে বিচার আপনি করতে পারেন না। জনগণের ওপর আপনার শিক্ষার কি প্রভাব পড়ছে তা আমরা পুলিশ অফিসাররা ভালো করেই জানি। আমরা যদি কঠোর ব্যবস্থা দিয়ে শুরু না করতাম, পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত। আমি আপনাকে বলছি, জনগণ আপনারও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত। আইন অমান্য করা তাদের মধ্যে দ্রুত সাড়া জাগাবে; শান্তি রক্ষা করা যে কর্তব্য তা বোঝার শক্তি তাদের নেই। আপনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু জনগণ সেটা বুঝবে না। তারা তাদের স্বভাবের অনুসরণ করবে।"

আমি জবাবে বললাম, "এখানেই আমি আপনার সাথে একমত নই। জনগণ স্বভাবজাতভাবে উচ্ছৃঙ্খল নয়, বরং শান্তিপ্রিয়।"

এভাবে আমরা অনেকক্ষণ ধরে বাদানুবাদ করলাম। অবশেষে মি. গ্রিফিথ বললেন, "কিন্তু ধরুন আপনি বুঝতে পারলেন যে আপনার শিক্ষা জনগণের ওপর প্রভাব ফেলতে পারছে না, তখন আপনি কি করবেন?"

"সেরকম বুঝতে পারলে আমি নাগরিক আইন অমান্য স্থগিত করব।"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন? আপনি মি. বাউরিংকে বলেছেন যে মুহূর্তে আপনি ছাড়া পাবেন সে মুহূর্তেই পাঞ্জাব রওনা হবেন।"

"হ্যাঁ, পরবর্তী ট্রেনেই আমি যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আজ আর যাবার প্রশ্নই আসে না!"

"আপনি ধৈর্য ধরুন, নিশ্চিতভাবেই আপনার ওপর শান্তি নেমে আসছে। আপনি কি জানেন আহমেদাবাদে কি ঘটেছে? আর অমৃতসরে কি ঘটেছে? সব জায়গায় জনগণ প্রায় পাগল হয়ে উঠেছে। সব খবর আমার কাছে এখনো পৌঁছেনি। টেলিগ্রাফের তার কয়েক জায়গায় কেটে গেছে। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি এসব বিশৃংখলার দায় আপনার ওপর বর্তাবে।"

"আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, যদি আমার কারণে কোথাও শান্তি ভঙ্গ হয়ে থাকে তার দায়িত্ব আমি নিতে প্রস্তুত আছি। আহমেদাবাদে অশান্তি হয়ে থাকলে তার জন্য আমি গভীরভাবে ব্যথিত ও বিস্মিত। অমৃতসরের জন্য আমি জবাবদিহি

www.pathagar.com

করতে পারি না। আমি সেখানে কখনো যাইনি, সেখানে কেউ আমাকে চেনেও না। কিন্তু পাঞ্জাবের ব্যাপারে আমি অন্তত এটুকু নিশ্চিত যে পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট যদি আমাকে সেখানে প্রবেশে বাধা না দিতেন তাহলে আমি সেখানে শান্তি রক্ষার কাজে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করতে পারতাম। আমাকে বাধা দিয়ে তারা জনগণকে অহেতুক উস্কানি দিয়েছে।"

এভাবে আমরা বাদানুবাদ করতেই থাকলাম। আমাদের পক্ষে মতৈক্যে পৌঁছা কিছুতেই সম্ভব হলো না। আমি তাকে বললাম যে চৌপাটিতে আমার একটা সভা করার এবং জনগণকে শান্তি রক্ষার আহ্বান জানানোর ইচ্ছে আছে, একথা বলে আমি চলে এলাম। চৌপাটির বালুকাভূমিতে সভা অনুষ্ঠিত হলো। অহিংসার কর্তব্য ও সত্যাগ্রহের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমি লম্বা বক্তৃতা করলাম। বললাম, "সত্যাগ্রহ মূলত সত্যনিষ্ঠ লোকদের অস্ত্র। একজন সত্যাগ্রহী অহিংসার প্রতি দায়বদ্ধ এবং জনগণ যদি চিন্তায়, কথায় ও কাজে তা পালন না করে তাহলে আমি সত্যাগ্রহের ডাক দেব না।"

অনুসূয়াবেনও আহমেদাবাদে নতুন করে শান্তিভঙ্গের খবর পেয়েছিলেন। কেউ একজন গুজব ছড়িয়েছিল যে তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। এ গ্রেফতারের গুজবে জনগণ উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল, কাজ বন্ধ করেছিল, সহিংসতা করেছিল এবং একজন সার্জেন্টকে পিটিয়ে মেরে ফেলেছিল।

আমি আহমেদাবাদ রওনা হলাম। জানতে পারলাম যে, নড়িয়াড রেলওয়ে স্টেশনের কাছে রেল লাইন তুলে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল, বিরামগাঁও-এ একজন সরকারী কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং আহমেদাবাদে সামরিক আইন বলবৎ করা হয়েছে। লোকজন ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। তারা সহিংস কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছিল এবং সুদে আসলে তার প্রতিদান দিতে বাধ্য হচ্ছে।

স্টেশনে একজন পুলিশ অফিসার অপেক্ষা করছিলেন আমাকে পাহারা দিয়ে কমিশনার মি. প্রাটের কাছে নিয়ে যেতে। আমি তাকে রাগান্বিত দেখতে পেলাম। আমি তার সাথে ভদ্রভাবে কথা বললাম এবং শান্তিভঙ্গের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম। আমি পরামর্শ দিলাম যে সামরিক আইন জারীর কোনো প্রয়োজন ছিল না এবং শান্তি ফিরিয়ে আনার যে কোনো প্রচেষ্টায় আমি সহায়তা করতে প্রস্তুত আছি বলে ঘোষণা দিলাম। সবরমতি আশ্রমের মাঠে একটি জনসভা করার জন্য আমি অনুমতি চাইলাম। প্রস্তাবটি তাদের পছন্দ হলো এবং জনসভা অনুষ্ঠিত হলো, আমার মনে হয় ১৩ই এপ্রিল, রবিবারে এবং ঐ দিন বা পরের দিন সামরিক আইন তুলে নেয়া হলো। জনসভার বক্তৃতায় জনগণ যে ভুল করেছে তা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, আমি নিজে আবেদন জানালাম তারাও যেন এক দিনের উপোষ করে এবং উপদেশ দিলাম যারা সহিংস কর্মকাণ্ড করেছে তারা যেন তাদের দোষ স্বীকার করে।

আমার কর্তব্য কি হবে তা আমি স্পষ্ট দিবালোকের মতো দেখতে পেলাম। আমি দেখতে পেলাম, যে শ্রমিকদের মাঝে আমি আমার জীবনের একটা লম্বা

www.pathagar.com

সময় কাটিয়েছি, আমি যাদের সেবা করেছি এবং যাদের কাছে থেকে আমি ভালো প্রতিদান আশা করেছিলাম, তারাই দাঙ্গায় অংশ নিয়েছে এ সত্য আমার কাছে অসহনীয় ছিল এবং আমার মনে হলো আমিও তাদের দোষের অংশীদার।

আমি যেমন জনগণকে তাদের দোষ স্বীকার করার পরামর্শ দিলাম, তেমনি গভর্নমেন্টকে পরামর্শ দিলাম তাদের অপরাধ মার্জনা করে দিতে। কোনো পক্ষই আমার পরামর্শ গ্রহণ করেনি।

প্রয়াত স্যার রামনভাই এবং আহমেদাবাদের আরো কিছু নাগরিক আমার কাছে এলেন সত্যাগ্রহ স্থগিত করার আবেদন নিয়ে। আবেদনের প্রয়োজন ছিল না, কারণ আমি ইতিমধ্যেই মনস্থির করে ফেলেছিলাম যে যতদিন জনগণ শান্তির শিক্ষা গ্রহণ না করবে ততদিন সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখব। বন্ধুরা খুশী হয়ে চলে গেলেন।

তবে অন্যরা এ সিদ্ধান্তে খুশী হতে পারেননি। তারা ভাবলেন আমি যদি সর্বত্র শান্তি আশা করি এবং শান্তিকে সত্যাগ্রহ শুরুর পূর্ব শর্ত বলে গণ্য করি তাহলে গণ-সত্যাগ্রহ একটা অসম্ভব বিষয় হয়ে উঠবে। আমি দুঃখ প্রকাশসহ তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করছি। আমি যাদের মাঝে কাজ করেছি, এবং যারা অহিংসার জন্য প্রস্তুত বলে আশা করেছি, তারা যদি অহিংস না থাকতে পারে তাহলে নিশ্চিতভাবেই সত্যাগ্রহ অসম্ভব হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যারা জনগণকে সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব দিতে চায়, প্রত্যাশিত অহিংসার মধ্যে জনগণকে সীমাবদ্ধ রাখার সামর্থ্য তাদের থাকা উচিত। সে বিশ্বাস আমি আজো একইভাবে পোষণ করি।

তেত্রিশ
হিমালয় পর্বতসম ভ্রান্তি

আহমেদাবাদ মিটিং এর পরপরই আমি নড়িয়াডে গেলাম। এখানেই আমি প্রথম "হিমালয় সম ভ্রান্তি" কথাটা ব্যবহার করলাম যা পরবর্তীতে বহুলভাবে প্রচলিত হয়েছে। আহমেদাবাদ থাকতেই আমার ভুল বুঝতে শুরু করেছিলাম। যখন আমি নড়িয়াড পৌঁছে সেখানকার বাস্তব অবস্থা দেখলাম, এবং শুনলাম যে খেদা জেলায় বহু লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে, হঠাৎ আমার কাছে পরিষ্কার হলো যে খেদা জেলায় এবং অন্যান্য স্থানে জনগণকে অপরিণত অবস্থায় নাগরিক আইন অমান্যের ডাক দিয়ে আমি চরম ভুল করেছি বলে এখন আমার মনে হচ্ছে। আমি একটা জনসভায় বক্তৃতা করছিলাম। আমার ভুলের স্বীকারোক্তির ফলে আমাকে প্রচুর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শিকার হতে হলো। কিন্তু ঐ স্বীকারোক্তির জন্য আমি কখনো অনুতপ্ত হইনি। কারণ আমি সর্বদা বিশ্বাস করে এসেছি যে যখন কেউ তার নিজের ভুলগুলো বড় করে দেখবে এবং এর উল্টোভাবে অন্যদেরটা ছোট করে দেখবে, কেবল তখনই সে দুটোর তুলনামূলক অবস্থান বিচারে সমর্থ হবে। আমি আরো বিশ্বাস করি যে, যে সত্যাগ্রহী হতে চায় তার জন্য সুবিবেচনা ও বিবেক সম্পন্নভাবে এ নীতি পালন করা অপরিহার্য।

www.pathagar.com

এবারে দেখা যাক হিমালয়সম ভ্রান্তিটা কি ছিল। নাগরিক আইন অমান্য অনুশীলনের যোগ্যতা অর্জনের পূর্বে যে কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি স্বেচ্ছায় শ্রদ্ধাশীল আনুগত্য দেখাতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা আইন মেনে চলি আইন ভঙ্গের জন্য শাস্তির ভয়ে এবং বিশেষ করে যেসব আইনের সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক নেই সেসব আইনের ক্ষেত্রে এ কথা বেশি প্রযোজ্য। উদাহরণ স্বরূপ, একজন সৎ, সম্মানিত ব্যক্তি সহসা চুরি করতে যাবে না, চুরির বিরুদ্ধে আইন থাকুক বা নাই থাকুক। কিন্তু সেই একই লোক অন্ধকারে বাইসাইকেলে হেডলাইট জ্বালানোর আইন পালনে ব্যর্থতার জন্য অনুতপ্ত হবে না। এ ব্যাপারে আরো সতর্ক হবার উপদেশ দেয়া হলেও তিনি দয়া করে তা মানবেন কিনা তাতে আসলেই সন্দেহ আছে। কিন্তু শুধুমাত্র আইন ভঙ্গের জন্য বিচারের সম্মুখীন হবার ঝামেলা এড়ানোর জন্য হলেও তিনি এ জাতীয় বাধ্যতামূলক যে কোনো আইন পালন করবেন। তবে এ ধরনের আনুগত্য সত্যাগ্রহীর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য থেকে আলাদা। একজন সত্যাগ্রহী বুদ্ধিমত্তার সাথে তার সমাজের আইন এবং নিজের স্বাধীন ইচ্ছা মেনে চলে, কারণ এটাকে সে তার পবিত্র কর্তব্য বলে গণ্য করে। এভাবে যখন কোনো ব্যক্তি সুবিবেচনার সাথে সমাজের আইন মেনে চলবে কেবল তখনই সে বিচার করতে পারবে কোন আইনগুলো বিশেষভাবে ভালো ও ন্যায়সঙ্গত এবং কোনগুলো অন্যায্য ও দুরাচারী। কেবল মাত্র তখনই তার ভেতরে সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতিতে কিছু কিছু আইনের ক্ষেত্রে নাগরিক আইন অমান্যের অধিকার জন্মাবে। আমার ভ্রান্তি নিহিত ছিল এই অপরিহার্য সীমারেখা মেনে চলতে ব্যর্থতার মাঝে। আমি জনগণকে নাগরিক আইন অমান্যের ডাক দিয়েছিলাম তারা নিজেদেরকে এভাবে যোগ্য করে তোলার আগেই এবং এ ভুল আমার কাছে মনে হয়েছে হিমালয় পর্বতের উচ্চতাসম বিশাল। আমি খেদা জেলায় প্রবেশ করার সাথে সাথেই আমার মনে খেদার সত্যাগ্রহ সংগ্রামের সকল স্মৃতি ফিরে এলো এবং আমি ভেবে অবাক হলাম কিভাবে আমি এ স্পষ্ট ভুল বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। আমি বুঝলাম যে কোনো জনগোষ্ঠী নাগরিক আইন অমান্যের যোগ্যতা অর্জনের পূর্বে তাদেরকে এর গভীর তাৎপর্য পুরোপুরি বুঝতে হবে। নাগরিক আইন অমান্য পুনরায় গণহারে শুরু করার পূর্বে একদল সুপ্রশিক্ষিত, বিশুদ্ধচিত্ত স্বেচ্ছাসেবী গড়ে তোলা প্রয়োজন যারা সত্যাগ্রহের কঠোর শর্তগুলো পুরোপুরি বুঝে। তারা এগুলো জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবে এবং বিনিদ্র সতর্কতার সাথে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারবে। মনের মাঝে এসব চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমি বোম্বে পৌঁছলাম, সেখানে সত্যাগ্রহ সভার মাধ্যমে একটি সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকদল গড়ে তুললাম এবং তাদের সাহায্যে জনগণকে সত্যাগ্রহের অর্থ ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য শিক্ষা দেয়ার কাজ শুরু করলাম। মূলত এ বিষয়ের ওপর শিক্ষামূলক পুস্তিকা প্রকাশ করে কাজটা চলতে থাকল।

কিন্তু এ কাজ যখন চলছিল, আমি দেখলাম জনগণকে সত্যাগ্রহের শান্তিপূর্ণ দিকে আগ্রহী করে তোলা একটা কঠিন কাজ। স্বেচ্ছাসেবকরা নিজেরাও বেশি

www.pathagar.com

সংখ্যায় নাম লেখাতে ব্যর্থ হলো। আর যারা তালিকাভুক্ত হলো তারাও নিয়মিত সুশৃংখলাবদ্ধ ট্রেনিং নিল না এবং যতই দিন যেতে লাগল নতুন সদস্যদের সংখ্যা বাড়ার পরিবর্তে ক্রমশ কমতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম যে নাগরিক আইন অমান্যের ট্রেনিং এর অগ্রগতি প্রথমে যতটা দ্রুত হবে বলে আশা করেছিলাম বাস্তবে তা হবে না।

চৌত্রিশ
নবজীবন ও ইয়ং ইন্ডিয়া

এভাবে একদিকে যখন অহিংসা সংরক্ষণের এ আন্দোলন চলছিল, যদিও ধীর গতিতে, অপরদিকে গভর্নমেন্টের বেআইনী দমন পীড়নের নীতিও পুরোদমে চলছিল এবং পাঞ্জাবে তার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটল। নেতাদেরকে গ্রেফতার করা হলো, সামরিক আইন, যার অপর নাম আইনহীন আইন, জারী করা হলো, বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠিত হলো। এ ট্রাইবুনালগুলো ন্যায় বিচারের আদালত নয় বরং স্বৈরশাসকের অযৌক্তিক ইচ্ছা কার্যকর করার হাতিয়ার। সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই শাস্তির রায় দেয়া হচ্ছিল যা ন্যায় বিচারের নগ্ন লংঘন। অমৃতসরে নারী-পুরুষদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল কেঁচোর মতো পেটের ওপর ভর করে ক্রলিং করতে। এ নিষ্ঠুরতার সামনে আমার চোখে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের গুরুত্ব ম্লান হয়ে গেল, যদিও এই হত্যাকাণ্ডই মূলত ভারতের জনগণের ও বিশ্ববাসীর মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিল।

আমাকে পরিণতির কথা না ভেবে তৎক্ষণাৎ পাঞ্জাব যাবার অনুরোধ করা হলো। আমি ভাইসরয়ের কাছে পত্র লিখে সেখানে যাবার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু অনুমতি লাভে ব্যর্থ হলাম। প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়া গেলে আমাকে পাঞ্জাবের সীমান্ত অতিক্রম করতে দেয়া হবে না, তবে নাগরিক আইন অমান্য করে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সুতরাং আমি একটা গভীর উভয় সংকটে পড়লাম। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছিল তাতে মনে হলো আমার পাঞ্জাবে প্রবেশের বিরুদ্ধে প্রদত্ত আদেশ ভঙ্গ করলে তা নাগরিক আইন অমান্যের পর্যায়ে পড়বে না, কারণ আমি যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চেয়েছিলাম আমার চারপাশে তা ছিল না এবং পাঞ্জাবে লাগামহীন দমন-পীড়ন বিক্ষোভের অনুভূতিকে আরো জোরদার করে পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়েছে। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে আমার পক্ষে নাগরিক আইন অমান্যের ডাক দেয়া যদি সম্ভব হয়ও তবে তা হবে আগুনে ঘৃতাহুতির সামিল। অতএব আমি বন্ধুদের পরামর্শ সত্ত্বেও পাঞ্জাবে না যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। এটা আমার জন্য তেতো ওষুধ গেলার মতো। পাঞ্জাব থেকে প্রতিদিন নগ্ন অন্যায়-নির্যাতনের খবর ভেসে আসতে লাগল, কিন্তু আমি অসহায়ভাবে বসে থাকা এবং দাঁতে দাঁত চাপা ছাড়া কিছুই করতে পারলাম না।

ঠিক তখন মি. হর্নিম্যান যার হাতে "দি বোম্বে ক্রনিকল" ভয়ঙ্কর শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, গভর্নমেন্ট তাকে হঠাৎ লাপাত্তা করে দিল। গভর্নমেন্টের এ কাজ আমার

www.pathagar.com

কাছে জঘন্য দুরভিসন্ধিমূলক বলে মনে হলো যার দুর্গন্ধ এখনো আমার নাকে লেগে আছে। আমি জানি মি. হর্নিম্যান কখনো নৈরাজ্য চাননি। তিনি চাননি যে সত্যাগ্রহ কমিটির অনুমতি ছাড়া আমি পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করি এবং নাগরিক আইন অমান্যের সিদ্ধান্ত স্থগিত করার প্রতি তিনি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন। আমি তার কাছ থেকে একটা চিঠিও পেয়েছিলাম, আমি নাগরিক আইন অমান্য স্থগিত ঘোষণার পূর্বেই তিনি ঐ চিঠিতে আমাকে তা স্থগিতের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কেবল বোম্বে ও আহমেদাবাদের দূরত্বের কারণে আমি সে চিঠি আমার ঘোষণার পরে পেয়েছিলাম। তাই তার নির্বাসন আমাকে ব্যথিত ও বিস্মিত করেছে।

এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে 'দি বোম্বে ক্রনিকল' পত্রিকার পরিচালকবৃন্দ আমাকে পত্রিকাটির দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করলেন। মি. ব্রেলভি আগে থেকেই এখানে কর্মরত ছিলেন, তাই আমার বেশি কিছু করণীয় ছিল না, কিন্তু আমার স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে যে কোনো দায়িত্ব আমার ওপর অতিরিক্ত কিছু চাপ সৃষ্টি করত।

কিন্তু গভর্নমেন্ট যেন আমাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো, কারণ গভর্নমেন্টের এক আদেশে ক্রনিকলের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হলো।

যে বন্ধুরা ক্রনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতেন, যেমন মি. উমর সোবহানী ও মি. শংকরলাল বংকর, তারা এ সময়ে ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকাটিও নিয়ন্ত্রণ করতেন। তারা পরামর্শ দিলেন দি ক্রনিকল বন্ধ করে দেয়ার প্রেক্ষিতে আমার ইয়ং ইন্ডিয়ার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত এবং আগেরটির অভাব পূরণ করতে ইয়ং ইন্ডিয়াকে সপ্তাহে একবারের পরিবর্তে দু'বার প্রকাশ করা উচিত। আমিও তাই ভাবছিলাম। সত্যাগ্রহের অন্তর্নিহিত অর্থ জনগণের নিকট ব্যাপক প্রচারের জন্য আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম এবং আশা করছিলাম এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অন্তত পাঞ্জাব পরিস্থিতির কিছুটা উপকার করতে পারব। কারণ আমার সকল লেখার পেছনে সত্যাগ্রহ সুপ্ত ছিল এবং সেটা গভর্নমেন্টও জানত। সুতরাং আমি বন্ধুদের পরামর্শ সাথে সাথেই গ্রহণ করলাম।

কিন্তু প্রশ্ন হলো ইংরেজি মাধ্যমে কি করে সাধারণ লোকদেরকে সত্যাগ্রহের শিক্ষা দেয়া যাবে? আমার প্রধান কর্মক্ষেত্র হলো গুজরাট। ইন্দুলাল ইয়াগনিক সে সময়ে সোবহানী-বংকর গ্রুপের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি এ বন্ধুদের আর্থিক সহায়তায় গুজরাটী ভাষায় মাসিক নবজীবন সম্পাদনা করছিলেন। তারা ঐ মাসিক পত্রিকাটি আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিলেন এবং ইন্দুলাল আমার তত্ত্বাবধানে এ পত্রিকায় কাজ করার ইচ্ছে ব্যক্ত করলেন। এ মাসিক পত্রিকাটিকে সাপ্তাহিক পত্রিকায় রূপান্তর করা হলো।

ইতিমধ্যে দি ক্রনিকলকে পুনরুজ্জীবিত করা হলো। সুতরাং ইয়ং ইন্ডিয়াকে মূল সাপ্তাহিক পত্রিকায় ফিরিয়ে নেয়া হলো। দুটো সাপ্তাহিকী ভিন্ন ভিন্ন দু'জায়গা থেকে বের করা আমার কাছে খুব অসুবিধাজনক মনে হলো এবং এতে ব্যয়ও

www.pathagar.com

বেশি। যেহেতু নবজীবন ইতিপূর্বেই আহমেদাবাদ থেকে প্রকাশিত হচ্ছিল, আমার পরামর্শে ইয়ং ইন্ডিয়াও সেখানে স্থানান্তরিত হলো।

এ পরিবর্তনের পেছনে আরো কারণ ছিল। ইতিপূর্বে আমার ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন পত্রিকার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা হয়েছিল যে এ ধরনের পত্রিকার জন্য নিজস্ব প্রেস থাকা প্রয়োজন। তদুপরি, সে সময়ে ভারতে প্রেস সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন এমন ছিল যে আমি যদি আমার মতামত অবাধে প্রকাশ করতে চাই, বিদ্যমান প্রেসগুলো স্বভাবতই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হতো, তারা সেগুলো ছাপতে দ্বিধাবোধ করত। সুতরাং আমাদের নিজেদের একটা প্রেস স্থাপন জরুরি হয়ে পড়ল এবং যেহেতু সেটা আহমেদাবাদে স্থাপন করা সুবিধাজনক, সে কারণে ইয়ং ইন্ডিয়াকেও ওখানে স্থানান্তর করতে হয়েছিল।

এ পত্রিকাগুলোর মাধ্যমে আমি আমার সাধ্যমতো শিক্ষিত জনগণের মাঝে সত্যাগ্রহের শিক্ষা বিস্তারের কাজ শুরু করে দিলাম। দুটো পত্রিকারই প্রচার সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেল এবং তা এক সময়ে প্রতিটি প্রায় চল্লিশ হাজারে উন্নীত হলো। কিন্তু নবজীবনের প্রচার সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়লেও ইয়ং ইন্ডিয়ার প্রচার সংখ্যা ধীরগতিতে বাড়ল। আমার কারারুদ্ধ হওয়ার পরে দুটো পত্রিকারই প্রচার সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে গেল এবং এখনো তা আট হাজারের নিচে। প্রথম থেকেই এসব পত্রিকায় আমি বিজ্ঞাপন গ্রহণের বিরোধী ছিলাম। আমি মনে করি না যে এতে কোনো ক্ষতি হয়েছিল। আমার বিশ্বাস যে বিজ্ঞাপন গ্রহণ না করায় তা পত্রিকাগুলোর নিজস্ব স্বাধীনতা রক্ষায় বিরাট সহায়ক হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিকভাবেই এ পত্রিকাগুলো আমাকে কিছুটা শান্তিতে থাকতে দিয়েছিল, কারণ যখন নাগরিক আইন অমান্য অতি শীঘ্রই শুরু করা সম্ভব ছিল না, সে পরিস্থিতিতে এগুলো আমাকে আমার মতামত অবাধে প্রচার করতে এবং জনগণকে সাহস যোগাতে উত্তম সহায়তা প্রদান করেছে এবং সামরিক আইনের স্বেচ্ছাচারিতা লাঘব করতে তাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যে যতটা সম্ভব অবদান রেখেছে।

পঁয়ত্রিশ
পাঞ্জাবে

পাঞ্জাবে যতকিছু ঘটেছে তার জন্য স্যার মাইকেল ও'ডায়ার আমাকে দোষী সাব্যস্ত করলেন এবং পাঞ্জাবের কিছু ক্রুদ্ধ যুবক সামরিক আইন জারীর জন্য আমাকে দায়ী করল। তারা জোর দিয়ে বলল যে আমি যদি কেবল নাগরিক আইন অমান্য স্থগিত না করতাম তাহলে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটত না। তাদের কেউ কেউ আমাকে এমন ভয়ও দেখাল যে আমি পাঞ্জাবে গেলে আমাকে হত্যা করা হবে।

কিন্তু আমি অনুভব করলাম, আমার অবস্থান এত সঠিক ও প্রশ্নাতীত ছিল যে কোনো বুদ্ধিমান লোকের জন্য তা ভুল বুঝার অবকাশ ছিল না।

www.pathagar.com

আমি পাঞ্জাবে যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। আমি আগে কখনো সেখানে যাইনি। আর সে কারণেই সেখানকার অবস্থা নিজের চোখে দেখার জন্য বেশি করে আমি উদগ্রীব ছিলাম। ডা. সত্যপাল, ডা. কিচলু ও পণ্ডিত রামভাজ দত্ত চৌধুরী যারা আমাকে পাঞ্জাব যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তারা সকলেই এ সময়ে জেলে ছিলেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম যে গভর্নমেন্ট তাদেরকে ও তাদের সাথে গ্রেফতারকৃত অন্যদেরকে বেশি দিন জেলে রাখতে পারবে না। আমি যখনই বোম্বে গিয়েছি অনেক পাঞ্জাবী আমার সাথে দেখা করতে আসতেন। আমি তাদেরকে এ পরিস্থিতিতে সাহস দিতাম এবং তারা স্বস্তি নিয়ে ফিরে যেত। আমার সে সময়ের আত্মবিশ্বাস অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ত।

কিন্তু আমার পাঞ্জাব যাওয়া বার বার স্থগিত করতে হলো। যতবারই আমি পাঞ্জাব যাবার অনুমতি চাই, ততবারই ভাইসরয় বলেন, "এখন নয়" এবং এভাবেই ব্যাপারটি ঝুলে থাকল।

ইতিমধ্যে সামরিক আইন চলাকালে পাঞ্জাব গভর্নমেন্টের কর্মকাণ্ড তদন্তের জন্য হান্টার কমিটি ঘোষণা করা হলো। মি. সি. এফ. এন্ড্রুজ তখন পাঞ্জাবে পৌঁছলেন। তার চিঠিতে সেখানকার অবস্থার হৃদয় বিদারক চিত্র ফুটে উঠল এবং আমার ধারণা হলো যে সামরিক আইনের নামে পরিচালিত বর্বরতা সংবাদপত্রে যতটা প্রকাশ পেয়েছে, বাস্তবে তার চেয়েও বেশি ছিল। তিনি আমাকে জরুরিভাবে সেখানে গিয়ে তার সাথে একযোগে কাজ করতে পীড়াপীড়ি করলেন। একই সময়ে মি. মালব্যজী আমাকে তৎক্ষণাৎ পাঞ্জাবে যাবার অনুরোধ জানিয়ে টেলিগ্রাম করলেন। আমি আবারো ভাইসরয়কে টেলিগ্রাম করে জানতে চাইলাম, আমি এখন পাঞ্জাবে যেতে পারি কি না। ফেরত টেলিগ্রামে তিনি জবাব দিলেন একটা নির্দিষ্ট তারিখের পরে যেতে পারব। এখন আমার সঠিক মনে পড়ছে না, তবে মনে হয় তারিখটা ছিল ১৭ই অক্টোবর।

লাহোরে পৌঁছে যে দৃশ্য আমি দেখলাম তা আমার স্মৃতি থেকে কখনো মুছে যাবে না। রেলওয়ে স্টেশনে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পুরোটাই যেন ছিল উদ্বেলিত মানবস্তূপ। জনসাধারণ সকলেই ঘর ছেড়ে প্রবল আগ্রহ নিয়ে চলে এসেছিল যেন দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর তারা তাদের প্রিয়জনকে দেখতে চায় এবং তারা ছিল আনন্দে পাগলপ্রায়। আমাকে পণ্ডিত রামভাজ দত্তর বাংলোতে উঠানো হলো এবং আমাকে আপ্যায়নের ভার পড়ল শ্রীমতি সরলা দেবীর ওপর। আসলেই আপ্যায়নের এ দায়িত্ব ছিল গুরু দায়িত্ব, কারণ এখনকার মত তখনো যেখানেই আমাকে থাকতে দেয়া হতো তা প্রকৃত সরাইখানায় পরিণত হতো।

দেখলাম, পাঞ্জাবের প্রধান নেতারা জেলে থাকায় পণ্ডিত মালব্যজী, পণ্ডিত মতিলালজী এবং প্রয়াত স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী যথার্থভাবে তাদের শূন্যস্থান পূরণ করেছেন। মালব্যজী ও শ্রদ্ধানন্দজীকে আমি আগে থেকেই ঘনিষ্ঠভাবে চিনি, কিন্তু এ উপলক্ষ্যে এবারই প্রথম ব্যক্তিগতভাবে মতিলালজীর সাথে আমার পরিচয় হলো। এসব নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যারা জেলে যাবার সুযোগ

www.pathagar.com

পাননি তাদের সবার মাঝে আমি তৎক্ষণাৎ পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলাম, আমি যে তাদের মাঝে একজন আগন্তুক সেটা মনেই হলো না।

হান্টার কমিটিতে সাক্ষ্য না দেয়ার সিদ্ধান্ত আমরা কিভাবে নিয়েছিলাম তা এখন ইতিহাসের বিষয়বস্তু। সে সিদ্ধান্তের কারণগুলো তখনকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এখানে তার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন নেই। এটা বলাই যথেষ্ট যে সময়ের এ ব্যবধানে তখনকার ঘটনাবলীর প্রতি তাকিয়ে এখনো আমার মনে হয় যে আমাদের কমিটি বয়কটের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঠিক ও যথাযথ ছিল।

হান্টার কমিটি বয়কট করার পরবর্তী যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ হিসেবে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সমান্তরাল তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য একটি বেসরকারী তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, প্রয়াত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, আব্বাস তৈয়বজী, এম আর জয়াকর এবং আমি নিজে এ কমিটির সদস্য হলাম। প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিত মালব্যজী আমাদেরকে নিয়োগ করলেন। তদন্তের প্রয়োজনে আমরা নিজেরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লাম। কমিটির কাজের সমন্বয়ের দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর এবং সবচেয়ে বেশি এলাকায় তদন্ত পরিচালনার দায়িত্ব আমার ভাগে পড়েছিল বলে আমি পাঞ্জাবের জনগণ ও পাঞ্জাবের গ্রামগুলো খুব কাছে থেকে দেখার বিরল সুযোগ পেলাম।

আমার তদন্তের ফাঁকে আমি পাঞ্জাবের মহিলাদের সম্পর্কে জানলাম। মনে হলো আমরা যেন যুগ যুগ ধরে একে অপরকে চিনি। আমি যেখানেই গিয়েছি তারা এসে ভীড় জমিয়েছে এবং আমার সামনে সুতোর স্তূপ হাজির করেছে। তদন্তের কাজ করতে গিয়ে আমার কাছে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠল যে খাদির কাজের জন্য পাঞ্জাব একটা উত্তম ক্ষেত্র হতে পারে।

জনগণের ওপর নির্মম নির্যাতনের বিষয়ে আমার তদন্ত যতই এগিয়ে চলল, গভর্নমেন্টের জুলুম এবং অফিসারদের স্বৈরাচারী নির্যাতনের কাহিনী তত বেশি জানতে পারলাম। এরকম অত্যাচারের কাহিনী শোনার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না এবং তা আমাকে গভীরভাবে মর্মাহত করল। আমাকে তখন যেটা বেশি আশ্চর্য করেছে এবং এখনো করে যে, যুদ্ধের সময় যে প্রদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সৈন্য বৃটিশ গভর্নমেন্টের সাথে যোগ দিয়েছে এই মাত্রাতিরিক্ত বর্বরতা কি তাদেরই প্রাপ্য।

এ কমিটির রিপোর্টের খসড়া প্রস্তুতের দায়িত্বও আমার ওপর বর্তাল। পাঞ্জাবের জনগণের ওপর কি নির্মম বর্বরতা চালানো হয়েছিল সে সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য আমি আগ্রহী পাঠককে সে রিপোর্টটি পড়ে দেখার পরামর্শ দিচ্ছি। সে সম্পর্কে এখানে এটুকুই বলতে চাই যে, ঐ রিপোর্টে একটি ঘটনাও জেনেশুনে অতিরঞ্জিত করা হয়নি এবং প্রতিটি বক্তব্যের সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে। তদুপরি যে সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রকাশ করা হয়েছে তা কমিটির কাছে রক্ষিত বিপুল সাক্ষ্য-প্রমাণের ভগ্নাংশ মাত্র। যে বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ দেখা দিয়েছে তা রিপোর্ট থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। যেহেতু এ রিপোর্ট তৈরিই

www.pathagar.com

করা হয়েছিল সত্য উদঘাটনের জন্য এবং কেবলমাত্র সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাই এ রিপোর্ট পড়ে পাঠক জানতে পারবেন বৃটিশ গভর্নমেন্ট ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য জনগণের ওপর কতটা অমানবিক, বর্বর ও নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাতে সক্ষম। আমি যতদূর জানি এ রিপোর্টের একটি বক্তব্যও আজ পর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি।

ছত্রিশ

খিলাফত কি গো-রক্ষার বিরুদ্ধে?

পাঞ্জাবের এ কালো অধ্যায়ের বর্ণনা আপাতত বন্ধ রাখছি।

পাঞ্জাবে বর্বরতার বিষয়ে কংগ্রেসের তদন্ত শুরু হওয়ার পরপরই দিল্লীতে অনুষ্ঠিতব্য খেলাফত প্রশ্নে আলোচনার জন্য হিন্দু-মুসলমানদের যৌথ সম্মেলনে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ পত্র পেলাম। এর স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন প্রয়াত হেকিম আজমল খান সাহেব এবং মি. আসফ আলী। এতে উল্লেখ করা হয়েছিল প্রয়াত স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী উপস্থিত থাকবেন এবং আমার যদি সঠিকভাবে মনে থাকে, তিনি সম্মেলনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার কথা ছিল। যতদূর মনে পড়ে, সম্মেলনের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে উল্লেখ ছিল খিলাফতের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা এবং হিন্দু ও মুসলমানদের শান্তি উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া উচিত কি না সে প্রশ্নে আলোচনা। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমন্ত্রণপত্রে আরো উলেখ করা হয়েছিল যে, শুধুমাত্র খিলাফত প্রসঙ্গই নয় বরং গো-রক্ষা বিষয়েও সম্মেলনে আলোচনা হবে। সুতরাং গো-রক্ষা প্রশ্নের সমাধানে পৌঁছার এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ। এ পত্রে গো-রক্ষা প্রশ্নের উল্লেখ আমার পছন্দ হলো না। সুতরাং আমি আমন্ত্রণের জবাবে প্রেরিত পত্রে সম্মেলনে যোগ দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে পরামর্শ দিলাম যে দুটি প্রশ্ন একত্রে গুলিয়ে ফেলা অথবা দরকষাকষির মনোভাব নিয়ে বিবেচনা করা উচিত হবে না বরং দুটি বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং আলাদাভাবে বিবেচনা করতে হবে।

আমার মনে এরকম চিন্তাভাবনা নিয়ে আমি সম্মেলনে যোগ দিতে গেলাম। এ সম্মেলনে অনেক লোক সমাগম হয়েছিল যদিও পরবর্তী সম্মেলনগুলোতে আরো বেশি হাজারে হাজারে লোকের সমাবেশ হয়েছিল। আমি পূর্বে উল্লিখিত প্রশ্ন নিয়ে সম্মেলনে উপস্থিত স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর সাথে আলোচনা করলাম। তিনি আমার যুক্তি সমর্থন করলেন এবং আমাকে বিষয়টি সম্মেলনে উত্থাপন করতে বললেন। আমি এ বিষয়ে প্রয়াত হেকিম সাহেবের সাথেও আলোচনা করলাম। সম্মেলনে আমি যুক্তি উপস্থাপন করলাম যে যদি খিলাফত প্রশ্নের ন্যায়সঙ্গত ও আইনগত ভিত্তি থাকে, আমার বিশ্বাস তা ছিল, এবং গভর্নমেন্ট যদি প্রকৃতই বড় ধরনের অবিচার করে থাকে, তাহলে খিলাফতের ভুলের প্রতিকারের দাবিতে হিন্দুরা মুসলমানদের পাশে দাঁড়াতে বাধ্য। এ প্রসঙ্গে গো-রক্ষার প্রশ্ন উত্থাপন করা অথবা এটাকে মুসলমানদের সাথে সমঝোতায় আসার সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করা যেমন তাদের জন্য বেমানান হবে, তেমনি খিলাফত প্রশ্নে হিন্দুদের

www.pathagar.com

সমর্থনের মূল্য হিসেবে গরু জবাই করার প্রস্তাব করা মুসলমানদের জন্যেও বেমানান হবে। কিন্তু যদি মুসলমানরা একই দেশ মাতৃকার সন্তান ও তাদের প্রতিবেশী হিসেবে তাদের প্রতি কর্তব্যবোধ থেকে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে স্বেচ্ছায় গরু জবাই বন্ধ করে দেন তাহলে এটা তাদের জন্য বিরাট মহত্ত্বের ও উদারতার পরিচয় বহন করবে। আমি যুক্তি দেখালাম এ ধরনের স্বাধীন মনোভাব পোষণ তাদের কর্তব্য এবং এতে তাদের আচরণের প্রতি অন্যদের শ্রদ্ধা বেড়ে যাবে। কিন্তু যদি মুসলমানেরা প্রতিবেশী সুলভ দায়িত্ব হিসেবে গরু জবাই বন্ধ করে তাহলে হিন্দুরা খিলাফত প্রশ্নে তাদের সমর্থন করুক বা না করুক তা বিবেচনায় না এনেই সেটা করতে হবে। আমি যুক্তি দেখালাম, "যদি ব্যাপারটা এরকম হয়, তাহলে দুটি প্রসঙ্গ আলাদাভাবে আলোচনা করতে হবে এবং সম্মেলনের বিতর্ক শুধুমাত্র খিলাফত প্রশ্নে সীমাবদ্ধ থাকবে।" উপস্থিত সকলের কাছে আমার যুক্তি গ্রহণযোগ্য হলো এবং এর ফলে এ সম্মেলনে গো-রক্ষা প্রশ্ন আলোচিত হলো না।

কিন্তু আমার সতর্কবাণী সত্ত্বেও মওলানা আব্দুল বারী সাহেব বললেন, "হিন্দুরা আমাদের সাহায্য করুক আর নাই করুক, হিন্দুদের স্বদেশী হিসেবে তাদের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে মুসলমানদের গরু জবাই বন্ধ করা উচিত।" এবং এক পর্যায়ে মনে হলো তারা আসলেই এটা বন্ধ করতে চান।

কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন খিলাফত প্রশ্নের সাথে পাঞ্জাব প্রসঙ্গও যুক্ত হওয়া উচিত। আমি সে প্রস্তাবের বিরোধীতা করলাম। বললাম, "পাঞ্জাব প্রশ্নটি আমাদের স্থানীয় বিষয়, সুতরাং শান্তি উৎসবে যোগ দেয়া না দেয়ার সিদ্ধান্তের সাথে সম্পর্কহীন। খিলাফত প্রসঙ্গটি সরাসরি শান্তি উৎসব সম্পর্কিত, এর সাথে যদি আমরা স্থানীয় প্রসঙ্গ গুলিয়ে ফেলি তাহলে আমরা গুরুতর অবিবেচক বলে চিহ্নিত হবো। আমার যুক্তি সহজেই গৃহীত হলো।

মাওলানা হযরত মোহানী এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমি তাকে আগেও চিনতাম, কিন্তু কেবল এখানে এসে আবিষ্কার করলাম তিনি কত বড় মাপের যোদ্ধা। শুরু থেকেই আমাদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল এবং কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য এখনো রয়ে গেছে।

সম্মেলনে অনেক প্রস্তাব পাশ হলো যার মধ্যে একটি প্রস্তাবে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের প্রতি স্বদেশী শপথ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং এর স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে বিদেশী পণ্য বর্জনের ডাক দেয়া হয়েছিল। খাদি তখনো উপযুক্ত স্থান পায়নি। এ প্রস্তাব হযরত সাহেবের কাছে গ্রহণযোগ্য হলো না। তার লক্ষ্য ছিল, যদি খিলাফত প্রশ্নে ন্যায়বিচার না করা হয় তাহলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ওপর প্রতিশোধ নেয়া হবে। তদনুযায়ী তিনি এর বিপরীতে আরেকটি প্রস্তাব আনলেন যে যতদূর সম্ভব সকল প্রকার বৃটিশ পণ্য বর্জন করতে হবে। নীতিগত প্রশ্নে এবং বাস্তবতার নিরিখে আমি এ প্রস্তাবের বিরোধীতা করে যে সব যুক্তি তুলে ধরেছিলাম সেগুলো এখন বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। সম্মেলনে আমি অহিংসার বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গিও ব্যক্ত করলাম। লক্ষ্য করলাম আমার যুক্তি শ্রোতাদের ওপর

www.pathagar.com

গভীর প্রভাব ফেলছে। আমার আগে হযরত মোহানীর বক্তৃতা এত সোচ্চার সমর্থন পেল যে মনে হলো আমার আবেদন অরণ্যে রোদন বিবেচিত হতে পারে। সম্মেলনে যদি আমার মতামত ব্যক্ত না করি তাহলে সেটা আমার কর্তব্যের বিচ্যুতি হবে শুধুমাত্র এ কারণে আমি বক্তব্য পেশ করতে সাহসী হলাম। কিন্তু দেখে আশ্চর্য হলাম যে, আমার বক্তব্য উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ সবচেয়ে বেশি মনোযোগ সহকারে শুনলেন, এবং মঞ্চে বসা সকলের পূর্ণ সমর্থন পেল এবং বক্তার পর বক্তা আমার বক্তব্যের সমর্থনে বক্তৃতা করলেন। নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারলেন যে বৃটিশ পণ্য বর্জন শুধু উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হবে তাই নয়, এ প্রস্তাব গৃহীত হলে তা বরং আমাদেরকে হাসির পাত্রে পরিণত করবে। সম্মেলনে উপস্থিত এমন কোনো লোক ছিল না যার গায়ে বৃটিশের তৈরি কোনো বস্ত্র ছিল না। সুতরাং শ্রোতাদের অনেকেই বুঝলেন যে এ প্রস্তাব গৃহীত হলে তা ক্ষতিকর না হয়ে পারে না এবং যারা এ প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন তারাও এটা পাশ করাতে পারলেন না।

"শুধুমাত্র বিদেশী কাপড় বর্জন করেই আমরা তুষ্ট থাকতে পারি না। কারণ কেউ জানে না বিদেশী কাপড় বয়কট সঠিকভাবে কার্যকর করার আগে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী স্বদেশী কাপড় তৈরি করতে কতদিন লাগবে? আমরা এমন কিছু করতে চাই যা বৃটিশদের ওপর তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলবে। তবে আমাদেরকে আরো কোনো উপায় বাৎলে দিন যাতে আমরা আরো দ্রুত, আরো শীঘ্রই ফল পেতে পারি..." মওলানা হযরত মোহানী এ মর্মে তার মতামত ব্যক্ত করলেন। আমি যখন তার বক্তব্য শুনছিলাম আমার মনে হলো, বিদেশি কাপড় বর্জন ছাড়াও অতিরিক্ত আরো কিছু করা প্রয়োজন। সে সময়ে বিদেশী কাপড় সম্পূর্ণরূপে বর্জন আমার কাছেও অবাস্তব বলে মনে হলো। তখন আমি জানতাম না যে আমরা চাইলেই আমাদের কাপড়ের চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদি তৈরি করতে পারতাম, এ বিষয়টা পরবর্তীতে বুঝতে পারলাম। অপরদিকে আমি তখন এটাও জানতাম যে বিদেশী কাপড় বর্জনের জন্য আমরা যদি কেবল মিলের ওপর নির্ভর করি, তাহলেও আমরা ভুল করব। মওলানা যখন তার বক্তব্য শেষ করলেন তখনো আমি এভাবে চিন্তার গোলক ধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছিলাম।

সঠিক হিন্দী ও উর্দু শব্দ না জানা আমার ভাব প্রকাশের অন্তরায় ছিল। বিশেষভাবে উত্তর ভারতের মুসলমান শ্রোতাদের সামনে যুক্তিতর্ক সম্বলিত বক্তৃতা করা আমার জীবনে এটাই প্রথম। আমি কোলকাতায় মুসলিম লীগের সম্মেলনে উর্দুতে বক্তৃতা করেছিলাম, কিন্তু তা ছিল মাত্র কয়েক মিনিটের এবং সে বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল শ্রোতাদের কাছে আবেগপূর্ণ আবেদন জানানো। কিন্তু এখানে উল্টো আমাকে বৈরী না হলেও সমালোচক শ্রোতাদের মুখোমুখি হতে হলো, যাদের কাছে আমার মতামতের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে। তবে আমি সকল জড়তা ঝেড়ে ফেলেছিলাম। আমি সেখানে গিয়েছি দিল্লীর নির্ভুল চোস্ত উর্দুভাষী শ্রোতাদের সামনে বক্তৃতা করতে নয় বরং একটা সমাবেশে আমার মতামত যতটা পারি ভাঙা ভাঙা হিন্দী ভাষায় ব্যক্ত করতে। এবং এতে আমি সফল হয়েছি। এ সভায় আমার কাছে প্রমাণিত হলো যে কেবলমাত্র হিন্দী-উর্দুই

www.pathagar.com

বহুভাষী ভারতের যোগাযোগ মাধ্যম হতে পারে। আমি যদি ইংরেজি বলতাম তাহলে শ্রোতাদের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিলাম তা করতে পারতাম না এবং মওলানাও মনে করতেন না যে তাকে তার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়ার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। আর যদি তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতেন তাহলে আমি সেটা কার্যকরভাবে গ্রহণও করতে পারতাম না।

আমার নতুন আইডিয়া ব্যক্ত করার জন্য উপযুক্ত হিন্দী বা উর্দু শব্দ খুঁজে পেলাম না এবং এতে আমি কিছুটা অসুবিধায় পড়লাম। অবশেষে আমি তা বর্ণনার জন্য "অসহযোগ" শব্দটি ব্যবহার করলাম, যা এ সভায় আমি প্রথমবার উচ্চারণ করলাম। মওলানা যখন তার বক্তৃতা করছিলেন, আমার মনে হলো, যে গভর্নমেন্টেকে তিনি একাধিক উপায়ে সাহায্য করেছেন সে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে তিনি বৃথাই কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বলছেন। যদি এক্ষেত্রে সশস্ত্র প্রতিরোধের আশ্রয় নেয়া অসম্ভব বা অনভিপ্রেত হয় তাহলে আমার মনে হলো যে গভর্নমেন্টের প্রতি সত্যিকার প্রতিরোধ গড়ে তোলার উপায় হলো তার সাথে সহযোগিতা বন্ধ করে দেয়া। এভাবে আমি "অসহযোগ" শব্দটি খুঁজে পেলাম। সে সময়ে এ শব্দটির বহুমূখী তাৎপর্য সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না। তাই আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে শুধু এটুকু বললাম :

"মুসলমানরা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। যদি শান্তি প্রস্তাব তাদের জন্য অনুকূল না হয়, ঈশ্বর না করুন, তারা গভর্নমেন্টের সাথে সব ধরনের সহযোগিতা বন্ধ করে দেবেন। এভাবে সহযোগিতা বন্ধ করা জনগণের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। গভর্নমেন্টের দেয়া খেতাব ও সম্মান ধরে রাখতে বা গভর্নমেন্টের সেবা করা অব্যাহত রাখতে আমরা বাধ্য নই। খিলাফতের মতো বড় ইস্যুতে যদি গভর্নমেন্ট বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে আমাদের অসহযোগীতা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সুতরাং গভর্নমেন্টের বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষেত্রে আমাদের অসহযোগিতার অধিকার আছে।"

কিন্তু "অসহযোগিতা" শব্দটি প্রচলিত হয়ে উঠতে মাসের পর মাস চলে গেল। তখনকার মতো শব্দটি সম্মেলনের কার্যবিবরণীতে বন্দী হয়ে থাকল। আসলে গভর্নমেন্ট কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে না সে প্রত্যাশায় একমাস পরে কংগ্রেসের অমৃতসর অধিবেশনে আমি সহযোগিতার প্রস্তাব সমর্থন করেছিলাম।

সাইত্রিশ
অমৃতসর কংগ্রেস

যে শত শত পাঞ্জাবীকে সামরিক শাসনাধীনে গঠিত নামমাত্র আদালত বা ট্রাইবুনালে ন্যূনতম সাক্ষ্যের ভিত্তিতে জেলে ঢুকানো হয়েছিল পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট তাদেরকে বেশিদিন আটকে রাখতে পারল না। এ নগ্ন অবিচারের প্রতিবাদে এমন হৈ চৈ শুরু হলো যে তাদেরকে আর কারাগারে রাখা সম্ভব হলো না। কংগ্রেসের অধিবেশন চলতে থাকা অবস্থাতেই লালা হরকৃষ্ণলাল ও অন্যান্য নেতাদেরকে

www.pathagar.com

মুক্তি দেয়া হলো। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ও জেল থেকে সরাসরি কংগ্রেসে উপস্থিত হলেন। জনগণের আনন্দের সীমা রইল না। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, যিনি তার চমৎকার আইন ব্যবসা বিসর্জন দিয়ে পাঞ্জাবকে তার সদর দপ্তর বানিয়েছিলেন এবং উত্তম সেবা দিয়েছিলেন, তাকে কংগ্রেস অধিবেশনের প্রেসিডেন্ট এবং প্রয়াত স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীকে অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছিল।

এ সময় পর্যন্ত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে আমার অবদান জাতীয় ভাষা হিন্দীতে বক্তৃতার মাধ্যমে হিন্দীর পক্ষে প্রচারণা এবং এসব বক্তৃতায় প্রবাসী ভারতীয়দের কল্যাণ সাধনে সীমাবদ্ধ ছিল। এ বছরে এর চেয়ে বেশি কিছু করব এমন প্রত্যাশাও ছিল না। কিন্তু অতীতে অনেকবার যেমনটা হয়েছে, এবারেও তেমনি হঠাৎ করে দায়িত্বপূর্ণ কাজ আমার ওপর এসে পড়ল।

নতুন সংস্কারের জন্য সবেমাত্র রাজার ঘোষণা এসেছে। এ ঘোষণা আমার কাছে যেমন সম্পূর্ণ সন্তোষজনক মনে হয়নি, তেমনি প্রত্যেকের কাছে অসন্তোষজনক মনে হয়েছে। কিন্তু আমি সে সময়ে অনুভব করলাম যে ক্রটিপূর্ণ হলেও সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত। রাজার ঘোষণায় এবং এর ভাষায় লর্ড সিনহার হাত রয়েছে বলে আমার মনে হলো এবং এতে কিছুটা আশার আলো দেখতে পেলাম। কিন্তু প্রয়াত লোকমান্য ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মতো অভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ অসম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। পণ্ডিত মালব্যজী নীরব থাকলেন।

পণ্ডিত মালব্যজী আমাকে তার রুমে ডেকে নিয়ে সমর্থন জানালেন। হিন্দু ইউনিভার্সিটির ভিত্তি স্থাপনের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমি তার সহজ সরল জীবন যাত্রার সামান্য দেখেছিলাম কিন্তু এ অনুষ্ঠানে তার সাথে একই রুমে অবস্থান করে আমি তার দৈনন্দিন রুটিনের খুঁটিনাটি কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেলাম এবং আমি যা দেখলাম তা আমাকে আনন্দে, বিস্ময়ে অভিভূত করল। তার রুমের অবস্থা দেখে মনে হলো তা যেন দরিদ্রদের বিনে পয়সার পান্থশালা। এখানে এত ভীড় থাকত যে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়া যেত না। সুযোগ সন্ধানী সাক্ষাৎ প্রার্থীসহ সকলের জন্য সর্বদা তার দ্বার উন্মুক্ত ছিল এবং তারা যত খুশী সময় নিয়ে তার সাথে কথা বলতে পারত। এ সংকীর্ণ স্থানের এক কোনে স্বমহিমায় আমার চারপাই (হালকা খাট) স্থাপিত হয়েছিল।

কিন্তু পুরো অধ্যায় জুড়ে আমি মালব্যজীর জীবনযাত্রার বর্ণনা দিতে চাই না, বরং আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

এভাবে আমি প্রতিদিন মালব্যজীর সাথে আলোচনা করতে সমর্থ হয়েছি, যিনি বড় ভাই এর মতো সস্নেহে আমাকে বিভিন্ন পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমি দেখলাম যে সংস্কার প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় আমার অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক ছিল। পাঞ্জাবের অত্যাচার নির্যাতনের ওপর কংগ্রেসের তদন্ত রিপোর্ট প্রণয়নের দায়িত্ব পালন শেষে মনে হলো ঐ প্রসঙ্গে বাকী করণীয় কাজের প্রতি আমাকে অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে। ঐ ব্যাপারে গভর্নমেন্টের সাথেও কাজ করার ছিল। অনুরূপভাবে খিলাফত প্রশ্নেও করণীয় ছিল। ঐ সময় আমি আরো বিশ্বাস করতাম যে ভারতীয় দাবির ব্যাপারে মি. মন্টেগু নিজে

www.pathagar.com

বিশ্বাসভঙ্গ করবেন না, বা কাউকে তা করতে দেবেন না। আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্য নেতাদেরকে কারাগার থেকে মুক্তিদান আমার কাছে শুভলক্ষণ বলে মনে হলো। এ পরিস্থিতিতে আমি উপলব্ধি করলাম যে গভর্নমেন্টের সংস্কার প্রস্তাব বর্জনের পরিবর্তে তা গ্রহণ করার পক্ষে একটি প্রস্তাব পাশ করাই সঠিক হবে। অপরদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে সংস্কার প্রস্তাব পুরোপুরি অসম্পূর্ণ ও অসন্তোষজনক হিসেবে প্রত্যাখ্যান করা উচিত। প্রয়াত লোকমান্য কম-বেশি নিরপেক্ষ ছিলেন, তবে দেশবন্ধু যে প্রস্তাব অনুমোদন করবেন সেদিকেই তিনি সমর্থন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

এদের মতো পরিপক্ব সু-পরিক্ষিত এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করার চিন্তাও আমার কাছে অসহনীয় ছিল। কিন্তু অপরদিকে বিবেকের কণ্ঠস্বরও ছিল পরিষ্কার। আমি কংগ্রেস অধিবেশন থেকে পালিয়ে যেতে চাইলাম এবং পণ্ডিত মালব্যজী ও মতিলালজীকে বললাম যে কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনগুলোতে আমি যদি অনুপস্থিত থাকি তাহলে জনস্বার্থেই তা করব। এর মাধ্যমে এসব সম্মানিত নেতাদের সাথে আমার মতপার্থক্য ব্যক্ত করা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারব।

কিন্তু এই দু'জন জ্যেষ্ঠ নেতার কাছে আমার পরামর্শ গৃহীত হলো না। আমার প্রস্তাব কানাকানি করে কোনোভাবে লালা হরকিষণলালের কানে পৌঁছাল। তিনি বললেন, "এটা কখনোই হতে পারবে না। এটা পাঞ্জাবীদের অনুভূতিতে গুরুতর আঘাত হানবে।" আমি বিষয়টি নিয়ে লোকমান্য, দেশবন্ধু ও মি. জিন্নাহ'র সাথে আলাপ করলাম কিন্তু সমাধানের কোনো পথ পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত মালব্যজীর কাছে আমার দুঃখের কথা বললাম। আমি তাকে বললাম, "আমি সমঝোতার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না এবং আমার প্রস্তাব যদি আমাকে উত্থাপন করতে হয় তাহলে দলাদলির সৃষ্টি হবে এবং ভোট গ্রহণের প্রয়োজন হবে। আমি এর পক্ষে কোনো যুক্তি দেখি না। প্রচলিত নিয়মে কংগ্রেসের অধিবেশনে কোনো প্রস্তাবের পক্ষে ভোট নেয়া হয় হাত তুলে সমর্থন জানানোর মাধ্যমে। এতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি ও দর্শনার্থীদের মধ্যকার পার্থক্য বিলীন হয়ে যায়। আবার এরকম বিশাল সমাবেশে ভোট গণনার কোনো উপায়ও আমাদের হাতে নেই। সুতরাং এর ফল এই হবে যে যদিও আমি একটি দলের সমর্থন পেতে চাই তাহলে এর সুযোগ নেই এবং তা অর্থবহ হবে না।" কিন্তু লালা হরকিষণলাল আমাকে উদ্ধারে এগিয়ে এলেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হলেন। তিনি বললেন, "যেদিন কংগ্রেসে ভোট হবে সেদিন আমরা কংগ্রেসের প্যান্ডেলে দর্শনার্থীদের আসার অনুমতি দেব না। আর গণনার ব্যাপারটাও আমি দেখব। কিন্তু আপনি কংগ্রেস অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকতে পারবেন না।" আমি আত্মসমর্পণ করলাম, আমার প্রস্তাবের খসড়া করলাম এবং দুরু দুরু বুকে তা পেশ করার উদ্যোগ নিলাম। পণ্ডিত মালব্যজী ও মি. জিন্নাহ আমার প্রস্তাব সমর্থন করার কথা। আমি লক্ষ্য করলাম যদিও আমাদের মধ্যকার মতপার্থক্য সকল প্রকার তিক্ততামুক্ত ছিল এবং যদিও আমাদের বক্তৃতায় ঠাণ্ডা যুক্তি প্রদর্শন ব্যতীত আর কিছু ছিল না, জনগণ আমাদের মতপার্থক্যকে মেনে নিতে পারল না, তারা এতে ব্যথিত হলো। তারা ঐক্য চাচ্ছিল।

www.pathagar.com

যখন বক্তৃতা দেয়া হচ্ছিল তখনও মঞ্চে মতপার্থ্যক্য নিরসনের চেষ্টা চলছিল এবং নেতাদের মধ্যে এ উদ্দেশ্যে আবার নোট চালাচালি হচ্ছিল। মালব্যজী পার্থক্য দূর করতে কোনো কিছুই বাদ রাখেননি। ঠিক তখনই জেরামদাস আমাকে তার সংশোধনী হস্তান্তর করলেন এবং তার নিজস্ব মধুর ভঙ্গিতে প্রতিনিধিদেরকে বিভক্তির উভয়-সংকট থেকে রক্ষা করার অনুরোধ জানালেন। তার সংশোধনী আমার পছন্দ হলো। মালব্যজীর চোখ সবার চোখে আশার আলো খুঁজে ফিরছিল। আমি তাকে বললাম জেরামদাসের সংশোধনী উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে হয় না। অতঃপর এটা লোকমান্যকে দেখানো হলে তিনি বললেন, "সিআর দাস যদি এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন তাহলে আমারও আপত্তি নেই।" অবশেষে দেশবন্ধু নরম হলেন, এবং সমর্থনের জন্য শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পালের দিকে তাকালেন। মালব্যজী আশ্বান্বিত হয়ে উঠলেন। তিনি সংশোধনীর কাগজটি ছিনিয়ে নিলেন এবং দেশবন্ধু স্পষ্ট করে "হ্যাঁ" বলার আগেই চিৎকার করে উঠলেন, "প্রতিনিধি ভাইয়েরা, আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে একটা সমঝোতায় পৌঁছানো গেছে।" এরপর যা ঘটল তা বর্ণনার অতীত। হাততালিতে পুরো প্যান্ডেল মুখরিত হয়ে উঠল এবং শ্রোতাদের ক্ষণপূর্বের মলিন চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এখানে সংশোধনীর মূল বক্তব্য বর্ণনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আমার উদ্দেশ্য হলো সত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অংশ হিসেবে কিভাবে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এখানে তাই বর্ণনা করা।

এ সমঝোতা আমার দায়িত্ব আরো বাড়িয়ে দিল।

আটত্রিশ
কংগ্রেসে দীক্ষা গ্রহণ

অমৃতসরে কংগ্রেসের কার্যক্রমে অংশগ্রহণকে আমি কংগ্রেসের রাজনীতিতে আমার প্রকৃত প্রবেশ বলে গণ্য করি। ইতিপূর্বে অন্যান্য স্থানে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান সম্ভবত কংগ্রেসের প্রতি আমার আনুগত্যের নবায়নের বেশি কিছু নয়। এসব অনুষ্ঠানে এসে আমি সর্বদা অনুভব করেছি যে একান্ত ব্যক্তিগত কাজের কথা বাদ দিলে কংগ্রেসের কাজ ছাড়া আমার আর কোনো কাজ নেই, আর অন্য কোনো কাজে আমার আগ্রহও ছিল না।

অমৃতসরে আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে একটি বা দুটি কাজে আমার দক্ষতা রয়েছে যা কংগ্রেসের কাজে লাগবে। আমি ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছি যে প্রয়াত লোকমান্য, দেশবন্ধু, পণ্ডিত মতিলাল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আমার পাঞ্জাবের তদন্ত কাজে সন্তুষ্ট হয়েছেন। তারা আমাকে তাদের ঘরোয়া সভায় আমন্ত্রণ করতেন যেখানে, আমি দেখেছি, বিভিন্ন বিষয়ে কমিটি গঠনের প্রাথমিক প্রস্তাব গ্রহণ করা হতো। এসব সমাবেশে কেবল তাদেরকেই আমন্ত্রণ করা হতো যারা বিশেষভাবে নেতাদের বিশ্বাস অর্জন করত এবং যাদের সেবা তাদের দরকার হতো। এসব সভায় মাঝে মাঝে সুবিধাভোগীরাও প্রবেশাধিকার পেত।

www.pathagar.com

আগামী বছরের জন্য দুটি বিষয় আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল, কারণ ওগুলোতেই আমার আগ্রহ ছিল। এগুলোর একটি হলো জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ। কংগ্রেস এ বিষয়ে বিপুল করতালির মধ্যে একটি প্রস্তাব পাশ করল। এর জন্য প্রায় পাঁচ লাখ টাকার একটি তহবিলের প্রয়োজন ছিল। তহবিল সংগ্রহের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্তদের মধ্যে আমিও নির্বাচিত হলাম। পণ্ডিত মালব্যজী গণকাজের ক্ষেত্রে দরিদ্রদের রাজপুত্র বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তবে আমি জানতাম যে ঐ বিষয়ে আমি নিজেও খুব একটা পিছিয়ে নেই। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতেই এ বিষয়ে আমি আমার সামর্থ্য বুঝে গেছি। ভারতের স্বচ্ছল ব্যক্তিদের কাছ থেকে রাজকীয় দান আদায়ের ক্ষেত্রে মালব্যজীর যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অলৌকিক ক্ষমতা ছিল, আমার তা ছিল না। তবে আমি জানতাম যে জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মৃতিস্তম্ভের জন্য রাজা-মহারাজাদের দান গ্রহণের প্রশ্নই আসতে পারে না। সুতরাং অর্থ সংগ্রহের প্রধান দায়িত্ব, যেমনটা আশা করেছিলাম, আমার ঘাড়েই পড়ল। বোম্বের দানশীল ব্যক্তিরা অত্যন্ত উদার হস্তে দান করলেন এবং স্মৃতিস্তম্ভের জন্য গঠিত ট্রাস্টের ব্যাংক একাউন্টে এখনো মোটা অংকের টাকা জমা রয়েছে। কিন্তু দেশ আজ যে সমস্যার সম্মুখীন তা হলো, যে মাটিতে হিন্দু, মুসলমান ও শিখরা সম্মিলিতভাবে রক্ত ঢেলে দিয়েছে তার পবিত্র স্মৃতি রক্ষার জন্য কি ধরনের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় এ তিন সম্প্রদায় বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হবার পরিবর্তে একে অপরের সাথে সংঘাতে লিপ্ত এবং স্মৃতিস্তম্ভের তহবিল কিভাবে ব্যবহার হবে জাতি আজ তা ভেবে পাচ্ছে না।

আমার অপার সহজাত দক্ষতা, যা কংগ্রেস কাজে লাগাতে পারত, তা হলো আমার খসড়া প্রণয়নের ক্ষমতা। কংগ্রেসের নেতারা দেখতে পেয়েছিলেন যে আমার মধ্যে সংক্ষিপ্ত প্রকাশ ক্ষমতা আছে, যা আমি দীর্ঘ অনুশীলনে আয়ত্ত করেছিলাম। কংগ্রেসের বিদ্যমান সংবিধান হচ্ছে গোখলের অবদান। তিনি অল্প কয়েকটি নিয়ম তৈরি করে দিয়েছিলেন যা কংগ্রেসের কার্য পরিচালনার ভিত্তি রচনা করেছিল। এসব নিয়ম তৈরির মজার ইতিহাস আমি গোখলের মুখ থেকেই শুনেছিলাম। কিন্তু এখন সবাই বুঝতে পারছে যে কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান কর্মকাণ্ড নির্বাহের জন্য এ নিয়মগুলো আজ আর পর্যাপ্ত নয়। প্রতি বছরেই নতুন নতুন প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। সে সময়ে কংগ্রেসের এক অধিবেশন থেকে অন্য অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়ে আসলে কোনো কর্মকাণ্ড ছিল না অথবা বছরের যে কোনো সময়ে আকস্মিক ব্যয় নির্বাহের কোনো পরিকল্পনাও ছিল না। বিদ্যমান নিয়মে তিনজন সেক্রেটারী নিয়োগের সংস্থান রাখা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তাদের একজন মাত্র কার্যনির্বাহী সেক্রেটারী এবং তিনিও আবার পূর্ণ সময়ের জন্য নিয়োজিত নন। তিনি এককভাবে কি করে কংগ্রেস অফিস চালাবেন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করবেন অথবা বিগত বছরে কংগ্রেস কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তির দায়িত্ব বর্তমান বছরে পালন করবেন? সুতরাং কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে এ প্রসঙ্গটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে বলে সবাই অনুভব করলেন। গণ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য কংগ্রেসের স্থূল

www.pathagar.com

আকার-আয়তনও ছিল অসুবিধাজনক। কংগ্রেসের অধিবেশনে কতজন প্রতিনিধি যোগ দিতে পারবে বা প্রতিটি প্রদেশ কতজন প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে তার কোনো সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না। সুতরাং বর্তমান নৈরাজ্যকর অবস্থার উন্নতি সাধনের আবশ্যকতা সবাই অনুভব করছিলেন। এক শর্তে আমি কংগ্রেসের সংবিধান রচনার দায়িত্ব নিতে রাজি হলাম। আমি দেখলাম দু'জন নেতা আছেন—লোকমান্য ও দেশবন্ধু, জনগণের ওপর যাদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। আমি অনুরোধ জানালাম যে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সংবিধান রচনা কমিটির সাথে তারাও যুক্ত থাকবেন। কিন্তু যেহেতু সংবিধান তৈরির কাজে তারা স্পষ্টতই ব্যক্তিগতভাবে সময় দিতে পারবেন না, আমি পরামর্শ দিলাম তাদের মনোনীত বিশ্বস্ত দু'জনকে সংবিধান কমিটিতে আমার সাথে নিয়োগ দেয়া হোক এবং এ কমিটির সদস্য সংখ্যা তিনজনে সীমাবদ্ধ রাখা হোক। প্রয়াত লোকমান্য ও দেশবন্ধু আমার এ পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং তাদের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে যথাক্রমে শ্রীযুক্ত কেলকার ও আই. বি. সেনের নাম প্রস্তাব করলেন। সংবিধান কমিটি একবারও একত্রিত হতে পারেনি, তবে আমরা পত্র লিখে একে অপরের সাথে আলোচনা করতাম এবং সবশেষে একটি সর্বসম্মত রিপোর্ট প্রণয়নে সক্ষম হলাম। এ সংবিধানকে আমি কিছুটা আমার গর্বের বস্তু বলে গণ্য করতাম। আমার অভিমত হলো আমরা যদি এ সংবিধানকে পূর্ণ রূপ দিতে পারতাম তাহলে এর মাধ্যমেই আমরা স্বরাজ অর্জন করতে পারতাম। এ দায়িত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে বলা যেতে পারে আমি সত্যিকারভাবে কংগ্রেসের রাজনীতিতে প্রবেশ করলাম।

উনচল্লিশ
খাদির জন্ম

১৯০৮ সালে যখন আমি ভারতের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের ধন্বন্তরী দাওয়াই হিসেবে "হিন্দ স্বরাজ" বইতে হস্তচালিত তাঁত ও চরকার কথা উল্লেখ করেছিলাম তখন কোথাও তাঁত ও চরকা দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ঐ বইতে আমি ধরে নিয়েছিলাম যে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি পেতে ভারতের জনগণকে যা কিছু সাহায্য করবে তাই স্বরাজ কায়েম করতে সহায়ক হবে। ১৯১৫ সালে যখন আমি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে আসি তখনো আমি কোনো চরকা দেখিনি। যখন সবরমতিতে সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপিত হলো আমরা সেখানে অল্প কয়েকটি হস্তচালিত তাঁত স্থাপন করলাম। কিন্তু সেগুলো চালু করতে গিয়েই আমরা সমস্যায় পড়লাম। আমরা সবাই বিভিন্ন পেশায় বা ব্যবসায়ে জড়িত, আমরা কেউই হস্তশিল্পী নই। আমাদের একজন বুনন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন দেখা দিল যে তাঁতগুলো চালু করার পূর্বে তাঁত বোনা শিক্ষা দেবে। অবশেষে পালানপুর থেকে একজনকে খুঁজে আনা হলো, কিন্তু সে তার বিদ্যার পুরোটা আমাদেরকে শেখাল না। কিন্তু মগনলাল গান্ধী সহজে দমবার পাত্র নন। যন্ত্রপাতির বিষয়ে সহজাত মেধার বলে সে অচিরেই তাঁত চালানোর সম্পূর্ণ কৌশল আয়ত্ত করল এবং একের পর এক কয়েকজনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আশ্রমে তাঁতীর অভাব পূরণ করা হলো।

www.pathagar.com

আমরা নিজেদের লক্ষ্য স্থির করেছিলাম যে নিজের হাতে তৈরি কাপড়ে আমাদের সম্পূর্ণ চাহিদা পূরণ করব। সুতরাং আমরা তখনই মিলের তৈরি কাপড় পরা ছেড়ে দিলাম, এবং আশ্রমের সকল সদস্য কেবল ভারতীয় সুতায় হাতে তৈরি কাপড় পরার সিদ্ধান্ত নিল। এ অভ্যাস করতে গিয়ে আমাদের মস্ত বড় অভিজ্ঞতা হলো। আমরা সরাসরি তাঁতীদের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনযাত্রা, তাদের উৎপাদনের পরিমাণ, তাদের সুতার সরবরাহ প্রাপ্তিতে সমস্যা, কিভাবে তারা প্রতারণার শিকার হচ্ছে এবং সবশেষে তারা কিভাবে ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা বহন করছে ইত্যাদি বিষয় জানতে পারলাম। তাৎক্ষণিকভাবে আমরা আমাদের প্রয়োজনমত সব কাপড় তৈরি করতে সমর্থ হলাম না। তাই এর বিকল্প ছিল তাঁতীদের কাছ থেকে হাতে বোনা কাপড়ের সরবরাহ নেয়া। কিন্তু ভারতীয় মিলের সুতায় তৈরি কাপড় বস্ত্র ব্যবসায়ী বা তাঁতীদের কাছ থেকে সরাসরি সংগ্রহ করা সহজসাধ্য ছিল না। যেহেতু ভারতীয় মিলে চিকন সুতা তৈরি হতো না, চিকন কাপড় তৈরি করতে তাঁতীরা বিদেশী সুতা ব্যবহার করতে বাধ্য হতো। অদ্যাবধি ভারতীয় মিলে উন্নত মানের সুতার উৎপাদন অত্যন্ত সীমিত, আর সর্বোচ্চ মানের সুতা তারা একবারেই উৎপাদন করতে পারে না। বহু চেষ্টার পর অবশেষে আমরা কয়েকজন তাঁতীকে খুঁজে পেলাম যারা আমাদের জন্য দয়া করে স্বদেশী সুতা তৈরি করে দিতে সম্মত হলো এবং তা কেবলমাত্র এই শর্তে যে তারা যে কাপড় তৈরি করবে তার পুরোটাই আশ্রমকে কিনে নিতে হবে। এভাবে মিলের তৈরি সুতায় বোনা কাপড় নিজেরা পরে এবং বন্ধুদের মধ্যে এর প্রচার করে আমরা নিজেরা ভারতীয় সুতার কলের স্বেচ্ছাসেবী এজেন্ট বনে গেলাম। এর বিনিময়ে সুতার মিলের সাথে আমাদের সম্পর্ক গড়ে উঠল এবং আমরা তাদের ব্যবস্থাপনা ও সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারলাম। আমরা দেখতে পেলাম, মিলগুলোর লক্ষ্য ছিল তাদের তৈরি সুতা ব্যবহার করে বেশি বেশি কাপড় উৎপাদন করা। হ্যান্ডলুম তাঁতীদের সাথে সহযোগিতা করতে আদৌ তারা ইচ্ছুক ছিল না, যদি বা করত তা ছিল একান্ত বাধ্য হয়ে এবং অস্থায়ীভাবে। আমরা নিজেদের সুতা নিজেরাই তৈরি করে নিতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলাম। এটা পরিষ্কার যে যতদিন পর্যন্ত আমরা নিজেদের সুতা নিজেরা তৈরি করতে না পারব ততদিন পর্যন্ত আমাদেরকে মিলের ওপর নির্ভর করতে হবে। আমরা বুঝতে পারলাম যে ভারতীয় স্পিনিং মিলের এজেন্ট হিসেবে বহাল থেকে আমরা দেশের কোনো সেবা করতে পারব না।

আমাদের সমস্যার যেন শেষ নেই। আমরা না পেলাম সুতা কাটার কোনো চরকা, আর না পেলাম সুতা কাটা শেখানোর কোনো কারিগর। আশ্রমে কাপড় বোনার জন্য আমরা ববিন হিসেবে কিছু চাকা ব্যবহার করেছিলাম। কিন্তু চরকার চাকা হিসেবে এগুলোই যে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে আমাদের কোনো ধারণা ছিল না। একদিন কালিদাস জাভেরী একজন মহিলাকে খুঁজে পেল এবং জানাল কিভাবে সুতা তৈরি করতে হয় তা সে হাতে-কলমে দেখিয়ে দেবে। নতুন কিছু শেখার ব্যাপারে খ্যাতি আছে এমন একজন সদস্যকে আমরা সেই মহিলার কাছে পাঠালাম। কিন্তু সেও সেই গোপন কৌশল না শিখেই ফিরে এলো।

এভাবে সময় পার হতে লাগল এবং সময়ের সাথে সাথে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাবার উপক্রম হলো। আশ্রমে বেড়াতে আসা সকল দর্শনার্থী, যাদের হাতে

www.pathagar.com

তৈরি সুতা সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা থাকতে পারে বলে সন্দেহ হলো, তাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে জানতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঐ কৌশলটির জ্ঞান কেবল মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাদের সবাই প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। যদি কোথাও কোনো অজ্ঞাত স্থানে তাদের কেউ জীবিত থেকে থাকে তাহলে কেবল তাদের কোনো জ্ঞাতি মহিলাই তার সন্ধান দিতে পারত।

১৯১৭ সালে আমার গুজরাটি বন্ধুরা আমাকে ব্রোচ শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে নিয়ে গেলেন। এখানে এসে আমি সেই প্রখ্যাত মহিলা গঙ্গাবেনকে আবিষ্কার করলাম। তিনি ছিলেন বিধবা, কিন্তু তার উদ্যমী মনোবল ছিল অসীম। প্রচলিত অর্থে তার শিক্ষা তেমন ছিল না, কিন্তু সাহস ও বুদ্ধিতে আমাদের সাধারণ শিক্ষিত মহিলাদের তিনি অতিক্রম করেছিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন এবং নিগৃহীতদের মধ্যে নির্ভয়ে চলাফেরা করতেন ও তাদের সেবা করতেন। তার নিজের সহায় সম্বল ছিল এবং প্রয়োজনও ছিল খুব সীমিত। তার সুঠাম দৈহিক গঠন ছিল এবং কোনো সঙ্গী ছাড়াই সর্বত্র চলাফেরা করতেন। তিনি স্বচ্ছন্দে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন। গোধরা সম্মেলনে আমি তার সম্পর্কে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পেরেছিলাম। তার কাছে চরকা সম্পর্কিত আমার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করলাম এবং তিনি আন্তরিক ও অব্যাহতভাবে চরকার খোঁজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমার বোঝা অনেকটা হালকা করে দিলেন।

চল্লিশ
অবশেষে পেলাম!

অবশেষে গুজরাটে এসে অশেষ ঘোরাঘুরির পর গঙ্গাবেন বরোদা রাজ্যের বিজাপুরে চরকার খোঁজ পেলেন। সেখানকার বেশ কিছু লোকের ঘরে তাদের চরকা ছিল, কিন্তু বহুদিন পূর্বে সেগুলো অকেজো আসবাবপত্রের সাথে তুলে রাখা হয়েছিল। তারা আবার সুতাকাটা শুরু করতে রাজি আছে বলে গঙ্গাবেনকে জানাল, যদি কেউ তাদেরকে নিয়মিত স্লিভার (চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো লম্বা তুলার আঁশ। উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ না পাওয়ায় অনুবাদে ইংরেজি শব্দই ব্যবহার করা হলো) সরবরাহ করে এবং তাদের তৈরি সুতা কেনার প্রতিশ্রুতি দেয়। গঙ্গাবেন এ আনন্দ সংবাদ আমাকে জানালেন। স্লিভার সরবরাহ কঠিন কাজ বলে মনে হলো। আমি বিষয়টি প্রয়াত ওমর সোবহানীকে বললে তিনি তৎক্ষণাৎ তার মিল থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্লিভার সরবরাহের ব্যবস্থা করে এ সমস্যার সমাধান করলেন। ওমর সোবহানীর কাছ থেকে স্লিভার পাওয়ার পর তা গঙ্গাবেনকে পাঠালাম এবং শীগগিরই এত বেশি তুলা তৈরি হয়ে আসতে লাগল যে তা ব্যবহার করে কুলিয়ে ওঠা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল।

মি. ওমর সোবহানীর বদান্যতা ছিল বিশাল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কারো পক্ষেই অনির্দিষ্টকাল ধরে এরকম সুযোগ নেয়া উচিত নয়। তার কাছ থেকে অব্যাহতভাবে স্লিভার নিতে আমি বিব্রত বোধ করছিলাম। তদুপরি আমার মনে হলো মিলের

www.pathagar.com

তৈরি স্লিভার ব্যবহার করা আমাদের নীতিগতভাবে ভুল হচ্ছে। মিলের তৈরি স্লিভার যদি ব্যবহার করা হয়, তাহলে মিলের তৈরি সুতাই বা ব্যবহার করা হবে না কেন? মিলওয়ালারা কিভাবে তাদের স্লিভার তৈরি করে? মনে এসব চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আমি গঙ্গাবেনকে পরামর্শ দিলাম স্লিভার সরবরাহ করতে পারে এমন লোক খুঁজে বের করতে হবে। তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে এ দায়িত্ব নিলেন। তিনি তুলার আঁশ আচড়ানোর জন্য লোক নিয়োগ করলেন। সে প্রতিমাসে পঁয়ত্রিশ টাকা বেতন দাবি করল। সে সময়ে কোনো দাবিই আমার কাছে বেশি মনে হয়নি। সে কয়েকজন যুবককে আচড়ানো তুলা থেকে স্লিভার তৈরির প্রশিক্ষণ দিল। বোম্বেতে আমি তুলা ভিক্ষা চাইলাম। শ্রীযুক্ত যশবন্তপ্রসাদ দেশাই তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন। এভাবে গঙ্গাবেনের উদ্যোগ আশাতীতভাবে উন্নতি লাভ করল। বিজাপুরে যে সুতা তৈরি হচ্ছিল তা দিয়ে কাপড় বোনার জন্য তিনি তাঁতী খুঁজে বের করলেন। এবং অতি শীঘ্রই বিজাপুর খাদি স্বনামে বিখ্যাত হয়ে উঠল।

বিজাপুরে যখন এসব ঘটনা ঘটছে আশ্রমে তখন চরকা দ্রুত প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল। মগনলাল গান্ধী চরকার ওপর তার চমৎকার যান্ত্রিক মেধা খাটিয়ে এর অনেক উন্নতি ঘটালেন এবং চরকা ও এর আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি আশ্রমেই তৈরি হতে লাগল। আশ্রমে তৈরি প্রথম খাদির দাম পড়ল প্রতি গজ সতের আনা। এই মোটা খাদি আমি বন্ধুদেরকে এ দামে কিনতে উদ্বুদ্ধ করতে দ্বিধা করলাম না, এবং তারাও তা স্বেচ্ছায় কিনল।

বোম্বেতে আমি রোগে শয্যাশায়ী হলাম। কিন্তু সেখানে চরকার খোঁজে বের হবার মতো শারীরিক সুস্থতা আমার ছিল। অবশেষে হঠাৎ করে আমি সুতাকাটার দু'জন কারিগরকে পেয়ে গেলাম। তারা এক সের তুলা, অর্থাৎ আটাশ তোলা বা এক পাউন্ডের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ তুলার জন্য এক টাকা মজুরী চাইল। আমি তখন খাদির অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির দিক সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম। হাতে তৈরি সুতার যে কোনো দামই আমার কাছে বেশি মনে হয়নি। বিজাপুরে তৈরি সুতার যে দাম দিয়েছি তার সাথে তুলনা করে দেখলাম আমাকে ঠকানো হচ্ছে। সুতার কারিগররা তাদের মজুরীর হার কমাতে রাজি হলো না। সুতরাং তাদের সাথে আমি কাজ বন্ধ করে দিলাম। কিন্তু যে উদ্দেশে তাদের প্রয়োজন হয়েছিল তা পূরণ হয়ে গেল। তারা শ্রীমতি অবন্তিকাবাই, রামিবাই কামদার, শ্রীযুক্ত শংকরলাল বংকরের বিধবা মাতা ও শ্রীমতি বসুমতীবেন–এঁদেরকে সুতাকাটা শিখিয়েছিল। চরকা আমার ঘরে আনন্দের গুঞ্জন তুলল এবং কোনো অতিরঞ্জন ছাড়াই বলতে চাই যে এ গুঞ্জন আমার ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে বিরাট অবদান রেখেছিল। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে শারীরিক অপেক্ষা এর মানসিক প্রভাব আমার ওপর বেশি ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় মানসিক অবস্থার সাথে মানুষের শরীর কত জোরালোভাবে সাড়া দেয়। আমি নিজেও চরকায় হাত লাগিয়েছিলাম, কিন্তু সে সময়ে এ বিদ্যায় বেশি দূর এগোতে পারিনি।

বোম্বেতে আবারো হাতে তৈরি স্লিভার সরবরাহের সেই পুরনো সমস্যা দেখা দিল। একজন তুলা ধুনকার প্রতিদিন শ্রীযুক্ত রেভাশংকরের বাড়ির পাশ দিয়ে তার ধুনের টুংটাং শব্দ তুলে যাওয়া আসা করত। আমি তাকে ডেকে আনালাম এবং

www.pathagar.com

জানতে পারলাম যে সে তোষক-গদিতে ভরার জন্য তুলা ধুনে। সে স্লিভার তৈরির জন্য তুলা ধুনে দিতে রাজি হলো, কিন্তু অনেক বেশি মজুরী চাইল, সেটাও আমি দিতে রাজি হলাম। এভাবে তৈরি সুতা আমি কয়েকজন বৈষ্ণব বন্ধুকে পাঠালাম এগুলো দিয়ে পবিত্র একাদশীর মালা তৈরির জন্য। শ্রীযুক্ত শিবাজী বোম্বেতে সুতাকাটা শেখানোর ক্লাশ শুরু করেছিলেন। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় হলো। কিন্তু দেশপ্রেমিক বন্ধুরা মিলে এ ব্যয়ভার বহন করলেন, খাদির ওপর যাদের আস্থা গড়ে উঠেছিল। এভাবে যে অর্থ ব্যয় হয়েছিল আমার মতে তা অপচয় হয়নি। এর মাধ্যমে আমাদের অমূল্য অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল এবং তা আমাদের সামনে চরকার উজ্জ্বল সম্ভাবনা তুলে ধরেছিল।

এবারে আমার পোষাক হিসেবে শুধুমাত্র খাদি ব্যবহারের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলাম। আমার ধুতি তখনো ভারতীয় মিলের তৈরি ছিল। আশ্রমে ও বিজাপুরে তৈরি মোটা খাদির প্রস্থ ছিল মাত্র তিরিশ ইঞ্চি। আমি গঙ্গাবেনকে নোটিশ দিয়ে দিলাম যে যদি এক মাসের মধ্যে সে আমাকে পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি প্রস্থের খাদি ধুতি তৈরি করে দিতে না পারে তাহলে আমি খাটো মোটা ধুতিই পরা শুরু করে দেব। এ চরমপত্র তাকে মানসিকভাবে আঘাত দিল, কিন্তু আমার দাবি পূরণে সে তার যোগ্যতার প্রমাণ দিল। এক মাস শেষ হবার আগেই সে আমাকে এক জোড়া পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি বহরের খাদি ধুতি পাঠাল এবং আমাকে সম্ভাব্য কঠিন একটা অবস্থা থেকে রেহাই দিল।

প্রায় এ সময়েই শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীদাস তাঁতী দম্পতি রামজী ও তার স্ত্রী গঙ্গাবেনকে লাথী থেকে আশ্রমে নিয়ে এলেন এবং আশ্রমেই খাদি ধুতি বুননের ব্যবস্থা করলেন। খাদি ধুতির প্রসারে এ দম্পতির অবদান কোনোক্রমেই নগণ্য নয়। তারা গুজরাট ও এর বাইরে বহু লোককে হাতে তৈরি সুতার কাপড় বোনা শেখালেন। গঙ্গাবেন যখন তার তাঁতে বসে কাপড় বুনতেন তখন সে দৃশ্য ছিল দেখার মতো। যখন এই অশিক্ষিত, আত্ম-নিমগ্ন বোনটি তার তাঁত চালাতেন তখন তিনি তার কাজে এমনভাবে ডুবে থাকতেন যে তার মনোযোগ অন্যদিকে ফেরানো কঠিন হতো এবং এ সময়ে তার প্রিয় তাঁত থেকে তার দৃষ্টি ফেরানো ছিল আরো কঠিন।

একচল্লিশ
একটি শিক্ষণীয় কথোপকথন

খাদি আন্দোলন, যাকে তখন স্বদেশী আন্দোলন বলা হতো, একেবারে শুরু থেকেই মিল মালিকদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিল। প্রয়াত ওমর সোবহানী, যিনি নিজে একজন সফল মিল মালিক, তিনি আমাকে শুধু তার নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই দেননি, অন্যান্য মিল মালিকদের মতামত সম্পর্কেও আমাকে অবহিত রাখতেন। মিল মালিকদের একজনের যুক্তি তাকে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল। তিনি আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন ঐ মালিকের সাথে দেখা করতে। আমি রাজি হলাম। মি. সোবহানী তার সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। মিল মালিক এভাবে কথোপকথন শুরু করলেন—

www.pathagar.com

"এর আগেও স্বদেশী আন্দোলন হয়েছিল আপনি কি তা জানেন?"

"হ্যাঁ, জানি", আমি জবাব দিলাম।

"তাহলে আপনি এটাও জানেন যে ঐ সময়ে আমরা মিল মালিকরা স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগ পুরো মাত্রায় নিয়েছিলাম। আন্দোলন যখন তুঙ্গে আমরা তখন কাপড়ের দাম বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তার চেয়ে খারাপ কাজও আমরা করেছিলাম।"

"হ্যাঁ, আমি এ সম্পর্কে কিছুটা শুনেছিলাম এবং এতে আমি দুঃখ পেয়েছিলাম।"

"আমি বুঝি যে আপনি দুঃখ পেয়েছিলেন, কিন্তু আমি তার কোনো সংগত কারণ দেখি না। আমরা কেবল মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যবসা করি না। আমরা লাভের জন্য ব্যবসা করি, আমাদের অংশীদারদের সন্তুষ্ট রাখতে হয়। কোনো বস্তুর দাম কত হবে তা নির্ভর করে সেটার চাহিদার ওপরে। চাহিদা ও যোগানের আইন কে অমান্য করতে পারে? বাঙালীদের জানা উচিত যে তাদের আন্দোলনের ফলে স্বদেশী কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে দাম অবশ্যই বেড়ে যাবে।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "বাঙালীদের স্বভাব আমার মতোই বিশ্বাস প্রবণ। তাদের বিশ্বাস ছিল যে মিল মালিকরা এতটা নীচু, স্বার্থপর ও দেশপ্রেম বিবর্জিত হবে না যে তারা প্রয়োজনের মুহূর্তেও দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং এতদূর পর্যন্ত নিচে নামবে না যে বিদেশী কাপড়কেও স্বদেশী বলে চালানোর মতো প্রতারণার আশ্রয় নেবে।"

তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, "আমি আপনার বিশ্বাস প্রবণতা সম্পর্কে জানি। আর সেজন্যেই আমি আপনাকে কষ্ট করে আমার কাছে আসতে বলেছি, যাতে সরলমনা বাঙালীদের মতো আবারো একই ভুল করে না বসেন সে বিষয়ে সতর্ক করে দিতে।"

এ কথাগুলো বলে মিল মালিক তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কেরানীকে ইশারা করলেন তার মিলে কি কি উৎপাদিত হচ্ছে তার নমুনা দেখাতে। সেগুলোর দিকে দেখিয়ে বললেন, "এ কাপড়গুলো দেখুন। এগুলো আমার মিলের উৎপাদিত সর্বশেষ ভ্যারাইটি। এর চাহিদাও বাড়ছে ব্যাপক হারে। বর্জ্য তুলা থেকে আমরা এগুলো উৎপাদন করছি। সে কারণে স্বাভাবিকভাবেই এর দাম সস্তা। আমরা এগুলো উত্তরে সুদূর হিমালয় পর্যন্ত পাঠাচ্ছি। সারা দেশে আমাদের এজেন্সি রয়েছে। এমন স্থানেও আমাদের এজেন্সি আছে যেখানে আপনার কণ্ঠস্বর বা আপনার লোকেরা কখনো পৌছাতে পারবে না। অতএব আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের এজেন্টের অভাব নেই। তাছাড়া আপনার জানা উচিত যে, ভারত যে পরিমাণ কাপড় উৎপাদন করে চাহিদার তুলনায় তা অনেক কম। সুতরাং স্বদেশী কাপড়ের প্রশ্নটি উৎপাদনের সিদ্ধান্তের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যে মুহূর্তে আমরা আমাদের উৎপাদন পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়াতে পারব এবং প্রয়োজন অনুযায়ী এর গুণগত মান উন্নত করতে পারব, সে মুহূর্তেই বিদেশী কাপড়ের আমদানী আপনা আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং আপনার নিকট আমার পরামর্শ হচ্ছে, আপনার আন্দোলন যে পথে এগুচ্ছে তা থেকে বিরত থাকুন, বরং আরো বেশি

www.pathagar.com

করে মিল স্থাপনের প্রতি আপনার মনোযোগ ঘুরিয়ে দিন। আমাদের যা প্রয়োজন তা হলো উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রচারণার মাধ্যমে অহেতুক চাহিদা বৃদ্ধি নয়।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমি যদি ইতিমধ্যেই সে পথে আমার প্রচেষ্টা নিয়োজিত করে থাকি তাহলে কি আপনি আমাকে আশীর্বাদ করবেন?"

কিছুটা হতভম্ব হয়ে তিনি বলে উঠলেন, "তা কি করে হয়? কিন্তু হতে পারে, আপনি নতুন মিল স্থাপনে উৎসাহ দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছেন, সে ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই অভিন্দন পাবার যোগ্য।"

আমি ব্যাখ্যা করে বললাম, "আমি ঠিক তা করছি না, তবে আমি হাতে সুতা কাটার চরকা পুনঃপ্রচলনের চেষ্টা করছি।"

আরো বেশি হতবুদ্ধি হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "সেটা আবার কি?" আমি তাকে সুতা কাটার চরকা সম্পর্কে বললাম, এর পেছনে আমার অনুসন্ধানের দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করলাম এবং আরো বললাম, "আমি আপনার সাথে সম্পূর্ণ একমত, আমি মিলের এজেন্ট হলে কোনো লাভ হবে না। তাতে দেশের ভালো হবার চেয়ে মন্দই হবে বেশি। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের মিলগুলোর খরিদ্দারের অভাব থাকবে না। আমার কাজ হওয়া উচিত, এবং আমি সেটাই করছি, হাতে তৈরি সুতার কাপড় উৎপাদনকে সংগঠিত করা এবং এভাবে উৎপাদিত খাদির বিপণন করা। সুতরাং খাদি উৎপাদনে আমি আমার মনোযোগ নিবিষ্ট করছি। আমি এই স্বদেশীর শপথ করেই এটা বলছি, কারণ এর মাধ্যমেই আমি ভারতের অর্ধাহারী, অর্ধ বেকার মহিলাদের কাজের ব্যবস্থা করতে পারব। আমার যা চাই তা হলো এ মহিলারা সুতা কাটবে এবং সে সুতায় তৈরি খাদি ভারতের জনগণ পরবে। আমি জানি না এ আন্দোলন কতটা সফল হবে, বর্তমানে এটা প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। কিন্তু এর সাফল্যে আমি পূর্ণ আস্থাবান। কোনোক্রমেই এতে ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই। উল্টো এ আন্দোলনের ফলে দেশে কাপড়ের উৎপাদন যতটাই বাড়বে, হোক না তা অতি সামান্য, ততটাই দেশের জন্য নিরেট লাভ। আশা করি এবার আপনি বুঝবেন যে আপনি যেসব ত্রুটির কথা বলছেন, আমার আন্দোলন তা থেকে মুক্ত।"

তিনি জবাব দিলেন, "আপনার আন্দোলনের লক্ষ্য যদি হয় অতিরিক্ত উৎপাদন তাহলে এর বিরুদ্ধে আমার বলার কিছু নেই। এই যন্ত্রশক্তির যুগে হাতে সুতা কাটার চরকা কোনো অবদান রাখতে পারবে কি না সেটাও একটা প্রশ্ন। তবে আমি আপনার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।"

বিয়াল্লিশ
আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান জোয়ার

খাদির অগ্রগতি এখানে আর অধিক বর্ণনা করতে চাই না। আমার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যা জনগণের দৃষ্টিতে প্রশংসিত হয়েছে তার ইতিহাস এ অধ্যায়গুলোতে বর্ণনা করলে তা হবে মূল বিষয় থেকে বিচ্যুতি, কারণ সেগুলোর প্রতিটির বর্ণনায় বিষয় ভিত্তিক আলাদা প্রবন্ধ রচনার প্রয়োজন হবে। আমার এ অধ্যায়গুলো লেখার

www.pathagar.com

উদ্দেশ্য হলো এটা দেখানো যে সত্য নিয়ে আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলাকালে কিভাবে কিছু কিছু বিষয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার সামনে ধরা দিয়েছে।

এবারে অসহযোগ আন্দোলনের কথায় আবার ফিরে আসি। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে যখন খিলাফত আন্দোলন পূর্ণ উদ্যমে চলছিল তখন আমি এ বিষয়ে প্রয়াত মওলানা আব্দুল বারী ও অন্যান্য উলেমাদের সাথে বিশেষ করে একজন মুসলমানের পক্ষে অহিংসার নীতি কতটা পালন করা সম্ভব তার সীমারেখা সম্পর্কে আলোচনা করলাম। পরিশেষে তারা সবাই স্বীকার করলেন যে ইসলাম তার অনুসারীদেরকে নীতিগতভাবে অহিংসার অনুসরণ করতে নিষেধ করে না, বরং একবার ঐ নীতি পালনের শপথ নিলে তা বিশ্বস্ততার সাথে পালন করতে তারা বাধ্য। অবশেষে খিলাফত সম্মেলনে অসহযোগ প্রস্তাব উত্থাপিত হলো এবং দীর্ঘ আলোচনার পর তা গৃহীত হলো। একবার এলাহাবাদে এক কমিটিতে এ বিষয়ে কিভাবে সারা রাত ধরে আলোচনা হয়েছিল সে ঘটনা এখনো আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রথম দিকে প্রয়াত হেকিম সাহেব অহিংস অসহযোগের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু তার সন্দেহ দূর হবার পর তিনি মনে প্রাণে এর সমর্থক হয়ে উঠলেন এবং তার সহায়তা এ আন্দোলনের জন্য অতি মূল্যবান বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

এর অল্প ক'দিন পরেই গুজরাটে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক সম্মেলনে আমি অসহযোগ প্রস্তাব উত্থাপন করলাম। বিরোধী পক্ষ প্রাথমিক যুক্তি দেখালেন যে কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্বে প্রাদেশিক সম্মেলনের এ ধরনের প্রস্তাব গ্রহণের কোনো এখতিয়ার নেই। এর বিপক্ষে আমি বললাম যে এসব নিয়ন্ত্রণ আন্দোলনকে কেবল পেছনের দিকে ঠেলে দিতে পারে। কিন্তু সামনের দিকে এগুতে হলে এটা মেনে নিতে হবে যে অধস্তন সংগঠনগুলো প্রস্তাব গ্রহণে শুধু ক্ষমতবানই নয়, বরং কর্তব্য হিসেবে এটা করতে তারা বাধ্য, অবশ্য তাদের যদি প্রয়োজনীয় সাহস ও আস্থা থাকে। আমি যুক্তি দেখালাম, কেউ যদি মূল প্রতিষ্ঠানের সম্মান বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে কোনো অনুমতির প্রয়োজন নেই, তবে শর্ত হলো যে সেটা তার নিজ দায়িত্বে করতে হবে। অতঃপর প্রস্তাবের ইতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা হলো এবং এ আলোচনার বৈশিষ্ট ছিল যুক্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এক মধুর বিতর্ক। প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটি হলে তা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হয়ে গেল। সাফল্যের সাথে এ প্রস্তাব পাশের পেছনে শ্রীযুক্ত বল্লভভাই ও আব্বাস তৈয়বজীর অবদান কম ছিল না। আব্বাস তৈয়বজী ছিলেন এ সম্মেলনের সভাপতি এবং অসহযোগ প্রস্তাবের অনুকূলে তার পক্ষপাতিত্ব ছিল।

এ প্রশ্নে আলোচনা করতে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রস্তুতিও নেয়া হলো। লালা লাজপত রায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। বোম্বে থেকে কোলকাতা পর্যন্ত কংগ্রেস ও খিলাফত স্পেশাল ট্রেন চালানো হলো। এ উপলক্ষে কোলকাতায় অগণিত প্রতিনিধি দল ও দর্শনার্থীর সমাগম হয়েছিল।

www.pathagar.com

মওলানা শওকত আলীর অনুরোধে ট্রেনে বসে আমি অসহযোগ প্রস্তাবের একটি খসড়া তৈরি করলাম। এই সময়কাল পর্যন্ত আমার খসড়াতে আমি কম বেশি "অসহযোগ" শব্দটির ব্যবহার এড়িয়ে গিয়েছি। তবে বক্তৃতাতে আমি শব্দটি অবশ্যই ব্যবহার করতাম। এ বিষয়ে আমার শব্দভাণ্ডার তখনো গড়ে ওঠার পর্যায়ে ছিল। দেখতে পেলাম যে সম্পূর্ণ মুসলমান শ্রোতাদের কাছে আমি সংস্কৃত শব্দে আমার "অহিংসা" কথার অর্থ পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারছিলাম না। তাই আমি মওলানা আবুল কালাম আজাদকে এর অন্য কয়েকটি প্রতিশব্দ খুঁজে দিতে বললাম। তিনি "বা-আমান" শব্দটি বের করে দিলেন। অনুরূপভাবে অসহযোগের প্রতিশব্দ হিসেবে "তরক-ই-মাবালত" ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন।

এভাবে আমি যখন অসহযোগ শব্দের যথাযথ হিন্দী, গুজরাটি ও উর্দু প্রতিশব্দ খুঁজে বের করতে ব্যস্ত তখন সেই ঘটনাবহুল কংগ্রেসে উত্থাপনের জন্য অসহযোগ প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করার ডাক পেলাম। আমার মূল খসড়াতে ভুলক্রমে "অহিংসা" শব্দটি বাদ পড়ে গিয়েছিল। এ ভুলটি না দেখেই আমি খসড়াটি আমার সাথে একই কম্পার্টমেন্টে ভ্রমণরত মওলানা শওকত আলীকে হস্তান্তর করেছিলাম। রাতের বেলা আমি ভুলটি ধরতে পারলাম। সকালবেলা আমি মহাদেবের মাধ্যমে বার্তা পাঠালাম যে খসড়া প্রস্তাবটি প্রেসে পাঠানোর আগে ভুলটা সংশোধন করতে হবে। কিন্তু আমার ধারণা যে সংশোধন করতে পারার পূর্বেই খসড়াটি ছাপা হয়ে গিয়েছিল। নাগরিক কমিটি ঐ দিনই বিকেলে মিলিত হবার কথা ছিল। সুতরাং আমি খসড়ার ছাপানো কপিগুলোতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করলাম। পরবর্তীতে দেখলাম আমি খসড়া প্রস্তাবসহ প্রস্তুত না থাকলে বড় রকমের অসুবিধায় পড়ে যেতাম।

এতদসত্ত্বেও বাস্তবে আমার অবস্থা ছিল বড় করুণ। আমি ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না কে প্রস্তাবটি সমর্থন করবে, আর কে বিরোধীতা করবে। লালাজী কী মনোভাব গ্রহণ করবেন সে সম্পর্কেও আমার কোনো ধারণা ছিল না। কোলকাতার দ্বন্দ্বে আমি কেবল প্রবীণ যোদ্ধাদের প্রবল ব্যূহ দেখতে পাচ্ছিলাম। তাদের কয়েকজন হলেন ডা. বেসান্ট, পণ্ডিত মালব্যজী, শ্রীযুক্ত বিজয়ারাঘবাচারী, পণ্ডিত মতিলালজী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

আমার প্রস্তাবে পাঞ্জাব ও খিলাফতের অন্যায়ের প্রতিকারের লক্ষ্যে অসহযোগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সেটা অবশ্য শ্রীযুক্ত বিজয়ারাঘবাচারীর মনোপূত ছিল না। তিনি যুক্তি দেখালেন, "অসহযোগের ঘোষণা দিতে কোনো বিশেষ অন্যায়ের প্রসঙ্গ টানতে হবে কেন? স্বরাজের অনুপস্থিতিই তো সবচেয়ে বড় অন্যায় যার কারণে সারা দেশ কারাদণ্ড ভোগ করছে। শুধু এর বিরুদ্ধেই তো অসহযোগের ঘোষণা দেয়া উচিত।" পণ্ডিত মতিলালও চাইলেন যে প্রস্তাবে স্বরাজের দাবি অন্তর্ভুক্ত করা হোক। আমি তৎক্ষণাৎ তাদের পরামর্শ গ্রহণ করলাম এবং আমার প্রস্তাবে স্বরাজের দাবি অন্তর্ভুক্ত করলাম। এ প্রস্তাবের ওপর বিস্তারিত, গুরুগম্ভীর ও তুমুল বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবার পর তা পাশ করা হলো।

মতিলালজী ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি এ আন্দোলনে যোগ দিলেন। আমার প্রস্তাব নিয়ে তার সাথে আমার যে মধুর আলোচনা হয়েছিল তা আজো আমার মনে

www.pathagar.com

আছে। শব্দ চয়নে তিনি কিছু পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছিলেন যা আমি গ্রহণ করেছিলাম। তিনি দেশবন্ধুকে আন্দোলনের পক্ষে আনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। দেশবন্ধুর মনোভাব এ আন্দোলনের অনুকূলেই ছিল, কিন্তু এ আন্দোলনের কর্মসূচী পালনে জনগণের সামর্থ্য আছে কি না সে বিষয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন। কেবল কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে এসে তিনি ও লালাজী এ প্রস্তাব মনেপ্রাণে গ্রহণ করলেন।

কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে আমি প্রয়াত লোকমান্যের অভাব গভীরভাবে অনুভব করলাম। অদ্যাবধি আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তখন যদি লোকমান্য জীবিত থাকতেন তাহলে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করতেন। আর যদি তিনি তা নাও করতেন, এবং আন্দোলনের বিরোধীতাও করতেন, তাহলে তার বিরোধীতাকেও আমার জন্য বিশেষ সুযোগ ও শিক্ষা বলে গণ্য করতাম। আমাদের মধ্যে সর্বদাই মতপার্থক্য ছিল, কিন্তু তা কখনো তিক্ততায় গড়ায়নি। তিনি আমাকে সর্বদা বিশ্বাস করতে দিয়েছেন যে, আমাদের মধ্যকার বন্ধন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আমি যখন এ লাইনগুলো লিখছি তখনো তার মৃত্যুর সময়কার অবস্থা আমার মানসপটে উজ্জ্বলভাবে বিরাজ করছে। প্রায় মধ্যরাতে পটবর্ধন, যে তখন আমার সাথে কাজ করত, টেলিফোনে আমাকে তাঁর মৃত্যু সংবাদ দিল। সে সময়ে আমি সহকর্মী পরিবেষ্টিত ছিলাম। খবরটা শোনামাত্র আমার মুখ থেকে আপনা আপনি বের হয়ে গেল, "আমার সবচেয়ে শক্ত সুরক্ষ, প্রাচীর ভেঙে পড়ল।" তখন অসহযোগ আন্দোলন পূর্ণ উদ্যমে চলছিল এবং আমি তার কাছ থেকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পাবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। অসহযোগ আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে এর প্রতি তাঁর মনোভাব কি হতো তা সর্বদা অনুমান সাপেক্ষ। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে তাঁর মৃত্যুতে সৃষ্ট গভীর শূন্যতা যারা কোলকাতায় উপস্থিত ছিলেন তারা সবাই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন। জাতির ইতিহাসের সেই ক্রান্তিলগ্নে প্রত্যেকেই তাঁর সৎ পরামর্শের অভাব অনুভব করলেন।

তেতাল্লিশ
নাগপুরে

কোলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলো নাগপুরের বার্ষিক অধিবেশনে চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল। কোলকাতার মতো এখানেও প্রতিনিধি দল ও দর্শনার্থীদের প্রচণ্ড ভীড় হলো। তখনো কংগ্রেসে যোগদানের জন্য প্রতিনিধি দলের সংখ্যা সীমিত করা হয়নি। ফলে, আমার যতদূর মনে পড়ে, এ উপলক্ষে জনসমাগম চৌদ্দ হাজারে পৌঁছেছিল। স্কুল বয়কট করার ব্যাপারে লালাজী সামান্য সংশোধনীর প্রস্তাব করলেন এবং আমি তা গ্রহণ করলাম। অনুরূপভাবে দেশবন্ধুর অনুরোধেও কিছু সংশোধনী আনা হলো, অতঃপর অসহযোগ প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাশ হয়ে গেল।

এ অধিবেশনেই কংগ্রেসের সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাবও উত্থাপনের কথা ছিল। এ সংক্রান্ত সাব কমিটির প্রস্তাবের খসড়া কোলকাতার বিশেষ অধিবেশনে

www.pathagar.com

পেশ করা হয়েছিল। সুতরাং এ বিষয়ের ওপর পরিপূর্ণভাবে মতামত ব্যক্ত করা এবং তার ওপর বিতর্কও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নাগপুর অধিবেশনে এটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য উত্থাপিত হলো। শ্রীযুক্ত বিজয়া রাঘবাচারিয়া এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন। মাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীসহ নাগরিক কমিটি খসড়া প্রস্তাবটি পাশ করল। আমার খসড়া প্রস্তাবে প্রতিনিধি দলের সদস্য সংখ্যা, যতদূর মনে পড়ে, ১৫০০ জনে নির্ধারণ করা হয়েছিল। নাগরিক কমিটি এ সংখ্যা বাড়িয়ে ৬০০০ করল। আমার মতে এ সংখ্যা বৃদ্ধি ছিল দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফল এবং অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে আমার মতামতই সঠিক ছিল। আমি এখনো মনে করি যে প্রতিনিধি দলের সদস্য সংখ্যা বেশি হলেই তা ভালোভাবে কার্য পরিচালনায় সহায়ক হবে বা এটা গণতন্ত্রের মূল নীতির সুরক্ষা দেবে এমন বিশ্বাস পোষণ করা সম্পূর্ণ ভুল। পনেরশ' প্রতিনিধি যারা জনগণের স্বার্থ রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, উদারমনা ও সত্যনিষ্ঠ, তারা যেনতেনভাবে বছাই করা ছয় হাজার দায়িত্ব জ্ঞানহীন লোকের তুলনায় গণতন্ত্র রক্ষায় অনেক বেশি কার্যকর হবে। গণতন্ত্র সুরক্ষার জন্য জনগণের অবশ্যই তীক্ষ্ণ স্বাধীনতাবোধ, আত্ম-সম্মানবোধ ও তাদের মধ্যে ঐক্য থাকতে হবে এবং তারা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনেও ভালো ও সত্যনিষ্ঠ লোকদের বাছাই করতে চেষ্টা করবে। কিন্তু নাগরিক কমিটি যেভাবে সংখ্যা দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়েছেন তাতে তারা ছয় হাজারের বেশি সদস্য নিতেও আগ্রহী। সুতরাং প্রতিনিধি সংখ্যা ছয় হাজারে নির্ধারণ গুণগত মানের প্রশ্নে সমঝোতার পর্যায়ে পড়ে।

কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি হবে তা তুমুল আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হলো। আমি যে খসড়া সংবিধান পেশ করেছিলাম তাতে কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল সম্ভব হলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে থেকে স্বরাজ অর্জন করা, তা সম্ভব না হলে প্রয়োজনবোধে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে বাদ দিয়ে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা। কংগ্রেসের একটা অংশ কেবল বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে থেকে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যে এর লক্ষ্য সীমিত রাখতে চাইল। পণ্ডিত মালব্যজী ও মি. জিন্নাহ এ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করলেন। কিন্তু তারা বেশি সংখ্যক ভোট পেলেন না। আবার খসড়া সংবিধানে এটাও বলা হয়েছিল যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পন্থা হতে হবে শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সংগত। এ শর্তেরও বিরোধীতা এলো, যুক্তি দেখানো হলো যে কি পন্থা অবলম্বন করা হবে তার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যাবে না। কিন্তু কংগ্রেস শিক্ষণীয় ও খোলামেলা আলোচনার পর মূল খসড়া সংবিধানই গ্রহণ করল। আমার মতে, জনগণ যদি এই সংবিধান কার্যকর করতে সততা, বুদ্ধিমত্তা ও উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করে তাহলে এটা হবে গণশিক্ষার একটি শক্তিশালী হাতিয়ার এবং এটা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া আমাদেরকে স্বরাজ এনে দেবে। কিন্তু এ বিষয়ের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রস্তাব, অস্পৃশ্যতা দূর করার প্রস্তাব এবং খাদি সংক্রান্ত প্রস্তাবও কংগ্রেসে পাশ হলো। এবং তখন থেকেই কংগ্রেসের হিন্দু সদস্যরা হিন্দুবাদকে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন এবং কংগ্রেস খাদির মাধ্যমে ভারতের "কংকাল" (দরিদ্র

www.pathagar.com

জনগোষ্ঠী) এর সাথে জীবন্ত আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে তুলেছে। খিলাফত প্রশ্নে অসহযোগ প্রস্তাব গ্রহণ ছিল কংগ্রেসের হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথে একটি বড় ও বাস্তব পদক্ষেপ।

চুয়াল্লিশ
বিদায়

এবার সময় এসেছে এ অধ্যায়গুলোর ইতি টানার।

এ সময় থেকে আমার পরবর্তী জীবন এমনই সর্বজনীন হয়ে উঠল যে আমার জীবনের কোনো কিছুই আর জনগণের অজানা থাকল না। তদুপরি ১৯২১ সাল থেকে কংগ্রেস নেতাদের সাথে এত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি যে, সে সময় থেকে আমার জীবনের কোনো ঘটনাই তাদের সাথে আমার সম্পর্কের উল্লেখ ছাড়া বর্ণনা করা যায় না। কারণ যদিও শ্রদ্ধানন্দজী, দেশবন্ধু, হেকিম সাহেব ও লালাজী আজ আর আমাদের মাঝে নেই, আমাদের সৌভাগ্য যে কংগ্রেসের আরো অনেক অভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ আজো জীবিত আছেন এবং তারা আমাদের মাঝে থেকে কাজ করে যাচ্ছেন। আমি ইতিপূর্বে কংগ্রেসের যে পরিবর্তনের বর্ণনা দিয়েছি সে সময় থেকে কংগ্রেসের ইতিহাস এখনো নির্মিত হচ্ছে। এবং গত সাত বছরে আমার প্রধান পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো সবই করা হয়েছে কংগ্রেসের মাধ্যমে। সুতরাং আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষার আরো বর্ণনা দিতে গেলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে আমার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করতেই হবে। আর কেবলমাত্র শালীনতাবোধ থেকে হলেও বর্তমান সময়ে আমি তা করতে পারি না। সবশেষে, আমার বর্তমান পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলকে সিদ্ধান্তমূলক বলে গণ্য করা যায় না। সুতরাং আমার আশু কর্তব্য হচ্ছে এ কাহিনীর এখানেই ইতি টানা। আসলে আমার কলমও নিজে থেকেই আর এগুতে চাচ্ছে না।

তীব্র মনোবেদনা ছাড়া আমি পাঠকদের থেকে বিদায় নিতে পারছি না। আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আমি অতি মূল্যবান বলে গণ্য করি। জানি না আমি সেগুলোর প্রতি সুবিচার করতে পেরেছি কি না। শুধু এটুকু বলতে পারি প্রতিটি ঘটনার বর্ণনায় সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চেষ্টার ক্রটি করিনি। সত্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে সত্য যেরূপে আমার কাছে ধরা দিয়েছে, যে উপায়ে আমি সত্যের দ্বারপ্রান্তে নীত হয়েছি, আমার অবিরাম চেষ্টা ছিল তার হুবহু বর্ণনা তুলে ধরা। সত্যের অনুশীলন আমাকে অবর্ণনীয় মানসিক প্রশান্তি এনে দিয়েছে, কারণ আমার প্রিয় প্রত্যাশা হচ্ছে এ অনুশীলন দোদুল্যচিত্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সত্য ও অহিংসার প্রতি বিশ্বাস জাগিয়ে তুলবে।

আমার একইরূপ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি যে সত্য ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নেই। এবং এ অধ্যায়গুলোর প্রতিটি পৃষ্ঠা যদি পাঠকের কাছে ঘোষণা না করে যে সত্য উপলব্ধির একমাত্র পথ হচ্ছে অহিংসা, তাহলে এ অধ্যায়গুলো লিখতে গিয়ে আমার সকল শ্রম বৃথা হয়েছে বলতে হবে। আর যদি এ ব্যাপারে আমার প্রচেষ্টা বৃথা প্রমাণিত হয়েই থাকে, তাহলেও পাঠক জেনে রাখুন যে সে ব্যর্থতার দায়ভার মহৎ নীতির নয়, নীতির বাহনের। সর্বোপরি অহিংসার পেছনে

www.pathagar.com

আমার প্রচেষ্টা যতই আন্তরিক হোক না কেন, তা এখন পর্যন্ত অসম্পূর্ণ ও অপর্যাপ্ত রয়েছে। সুতরাং সত্যের দ্রুত অপসৃয়মান যে ক্ষুদ্র জ্যোতি আমি দেখতে সমর্থ হয়েছি তা সত্যের অবর্ণনীয় দীপ্তি, যা আমাদের নিজ চোখে দেখা প্রতিদিনের সূর্যের চেয়েও লক্ষ লক্ষ গুণ প্রখর, তার সম্পর্কে কোনো ধারণা দিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আমি যা ধরতে পেরেছি তা সেই মহা শক্তিশালী দ্যুতির দুর্বলতম ক্ষীণ রশ্মি মাত্র। কিন্তু আমার সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল হিসেবে আমি আস্থার সাথে এটুকু বলতে পারি যে অহিংসার পূর্ণ উপলব্ধির পরেই কেবল সত্যের নিখুঁত চিত্র মানস পটে প্রতিভাত হতে পারে।

সর্বজনীন ও সর্বব্যাপী সত্যের মহিমা কেউ সামনাসামনি দেখতে চাইলে হীনতম সৃষ্টিকেও তার নিজের মতো ভালোবাসার সামর্থ্য থাকতে হবে। এবং যে ব্যক্তি তা দেখার আশা করে সে জীবনের কোনো ক্ষেত্র থেকেই দূরে থাকতে পারে না। সে কারণেই সত্যের প্রতি আমার নিষ্ঠা আমাকে রাজনীতির অঙ্গনে টেনে এনেছে এবং সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন অথচ বিনয়ের সাথে আমি বলতে পারি যে, যারা বলেন রাজনীতির সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই তারা ধর্মের অর্থ কি তা-ই জানেন না।

আত্মশুদ্ধি ব্যতীত সকল জীবিত প্রাণীর সাথে একাত্মতা অনুভব করা অসম্ভব; আত্মশুদ্ধি ব্যতীত অহিংসার নীতি পালন নিষ্ফল স্বপ্ন হয়েই থাকবে; যে হৃদয় পুত-পবিত্র নয় সে হৃদয় কখনো ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারে না। সুতরাং আত্মশুদ্ধির অর্থ অবশ্যই হতে হবে জীবনের প্রতি পদে শুদ্ধতা অর্জন। আর শুদ্ধতা একটি সংক্রামক গুণ বিধায় কেউ নিজেকে শুদ্ধ করলে তা স্বাভাবিকভাবেই তার চারপাশের পরিবেশকেও শুদ্ধ করে তোলে।

কিন্তু আত্মশুদ্ধির পথ বড়ই কঠিন ও খাড়া। নিখুঁত শুদ্ধতা অর্জন করতে হলে চিন্তা, কথা ও কাজে সম্পূর্ণরূপে আবেগমুক্ত হতে হবে; ভালোবাসা ও ঘৃণা, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বিপরীতমুখী স্রোতের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। আমি জানি অবিরাম চেষ্টা সত্ত্বেও এখনো আমার মধ্যে সে ত্রিমুখী শুদ্ধতা নেই। সে কারণেই সারা দুনিয়ার প্রশংসাও আমাকে মোহিত করে না, প্রকৃতপক্ষে তা আমাকে দংশন করে। বাহুবলে সারা পৃথিবী জয় করে নেয়ার চাইতে সূক্ষ্ম আবেগকে জয় করা আমার কাছে অনেক বেশি কঠিন মনে হয়। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই আমি আমার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত আবেগের অস্তিত্ব টের পাচ্ছি। আমার মধ্যে আবেগের অস্তিত্বের চেতনা আমাকে পরাজিত না করলেও অপমান বোধে জর্জরিত করে। আমার অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা আমাকে লালন করেছে এবং বিপুল আনন্দ দিয়েছে। কিন্তু আমি জানি যে আমাকে সামনে আরো কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে। নিজেকে আমার শূন্যে পরিণত করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ স্বেচ্ছায় নিজেকে তার সহচর প্রাণীদের মধ্যে সর্বপশ্চাতে বিবেচনা করতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার পরিত্রাণ নেই। অহিংসা হচ্ছে বিনয়ের দূরতম সীমারেখা।

পরিশেষে সাময়িক বিদায়কালে পাঠককে আমার সাথে সত্যের ঈশ্বরের কাছে এ প্রার্থনায় যোগ দিতে আহ্বান জানাচ্ছি যে তিনি আমাকে চিন্তায়, কথায় ও কাজে অহিংসার আশীর্বাদে পূর্ণ করুন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মহাত্মা গান্ধী ছিলেন অহিংসবাদের পূজক। নিজের জীবন ও কর্মে তিনি অহিংসবাদকে সফলতার সঙ্গে লালন করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল দিনগুলোতে উপনিবেশবাদী ইংরেজরা যখন ভারতবাসীর উপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়ে যাচ্ছিল, মহাত্মা গান্ধী তখন অস্ত্র হিসেবে তাঁর অহিংস মানবতাবাদ নীতি প্রয়োগ করেছেন। যার সফলতার মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। বিশাল এক কর্মময় জীবনের অধিকারী ছিলেন গান্ধী। জীবন-চলারপথে অগণিত ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। কাজ করতে হয়েছে সমসাময়িক বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে। সেইসব স্মৃতিচারণে সমৃদ্ধ 'আমার আত্মজীবনী' মহাত্মা গান্ধী। যারা সত্য, সুন্দর ও শান্তির সমর্থক, তারা গান্ধীর লেখা এই বইটির সমাদর করবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

ISBN: 978-984-8939-58-1